182.Qb.878.34.

২৯ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩১২ ।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত ।

১৩১২ সালের

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

উত্তরার্দ্ধ

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।)

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
অনন্ত জীবন	শ্রীশশধর রায় এম, এ,	৬৪১, ১০৪৬, ১১৫২
অগ্নিহোত্রীর প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত	৯৯১
অত্যাচারীর প্রতি (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	১০৮৭
আশ্রয় (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ	৬৩৫
আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার	শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল শ্রীরোহিনী কুমার সেন গুপ্ত শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য	৬৪৬, ৮৫০, ৯৩৯
আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর	৮৭৩
উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮০১
কনে-বদল (প্রহসন)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৯৯২, ১০৮৯
ঘরের কথা	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৬৬৭, ৭৯১, ৮৬৬, ৯৮৩
চীন জাহাজের যাত্রী	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ	৬৭৭
জীবন-সঙ্গীত (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর	১০৫২
ঢাকার কাটরা	শ্রীআজিজর রহমান্	৯৮৯
তেল, নুন, লকড়ি	শ্রী প্রমথ নাথ চৌধুরী এম, এ	৯০৫, ১০৭১
তাম্রলিপ্তী	... ...	১০৫৪, ১১২৯

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
দশভুজা (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন	৬০৩
দিদি-হারা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী	৭৯০
দোললীলা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	১৪১
নৌচালন বিদ্যা	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ	৮৩৪
নরবলি	শ্রীভুতনাথ ভাদুড়ী	৯৬৭
প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ	৭৫৪, ১১১২
পাণিনি-তত্ত্ব	শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য এম, এ	৯২৬
প্রত্যাগমন (কবিতা)	শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন	৬৫২
প্রতারিত (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১০২৫
ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি.এ	৭৪০, ১০৩৬
বত্রিশ সিংহাসন	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	৬২৫
বুশিদো	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬৩৬
বর্ণচিত্র	শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী	৬৫৪
বঙ্গ নারীর রাখী বন্ধন (কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী	৬৬৫
বন্দনা (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	৭০৫
বঙ্গ ভাষার উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম	শ্রীপরেশনাথ সেন	৭২৯
ভিক্ষা (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৭৯৯
ভয় নাই (কবিতা)	... ...	৯৮১
মহানাটক	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬০৪, ৭০৬, ৮২২, ৮৯৭, ১০২০, ১১২৪

	রচয়িতা	পৃ
কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	৭৩৯
চরিত্র	শ্রীপ্রমথনাথ সেন	৭৬৪
া	শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী	৯৭৩
ন (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৮
র স্বদেশ-ব্রত	শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী	
দাস ও তাঁহার পত্নী	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮৭৮
সাময়িক ভারত	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬৭০, ৮ ৯৫৬, ১০১৩, ১১
স্বদেশের প্রতি (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	৮
সুপ্রভাত (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	
সম্মোহন-বিদ্যা	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৯৪৬, ১০৮২,
সাময়িক কথা	...	...

খেয়াল খাতা।

ঋণ শোধ (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	
কণিকা	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৮৮৩,
গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা ম	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
ঘুঘু	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	
চুট্‌কী	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০১,
তুলনা	শ্রীব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ সেন	
দান (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	

ষয়	রচয়িতা	
নাম	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	
বসন্তের উদয় (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	
বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিবিধ কবিতা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮৩, ৮৯
য়াকরণ-বৈঠক	শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক	

182.Qb.878.34.

২৯ বর্ষ, কার্ত্তিক ১৩১২।

ভারতী

শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদিত।

তুলনা অনাবশ্যক !

এসেন্স দেলখোস।

নিজের সৌরভ মাধুর্য্যে

এবং

সৌরভের দীর্ঘ-স্থায়িত্বে

রুমালের এসেন্সরূপে

কেবল ভারতের সম্ভ্রান্ত সমাজেই

সমাদৃত এরূপ নহে,

পূর্ব্বউপদ্বীপে, সিংহলে

এমন কি চীন দেশের বহু স্থলেও

সমাদরে ব্যবহৃত হইতেছে।

এইচ বসু,

ম্যানুফ্যাক্চারিং পারফিউমার,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

[বর্ত্তমানবর্ষের কুন্তলীন পঞ্জিকা অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিট পাইলে পাঠান হয়।]

11 NOV 05

১৩১২ সালের

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

উত্তরার্দ্ধ

(কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।)

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
অনন্ত জীবন	শ্রীশশধর রায় এম,এ,	৬৪১, ১০৪৬, ১১৫২
অগ্নিহোত্রীর প্রার্থনা (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত	৯৯১
অত্যাচারীর প্রতি (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	১০৮৭
আশ্রয় (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি,এ	৬৩৫
আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার	শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল শ্রীরোহিনী কুমার সেন গুপ্ত শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য	৬৪৬, ৮৫০, ৯৩৯
আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র	শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর	৮৭৩
উদ্বোধন (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮০১
কনে-বদল (প্রহসন)	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৯৯২, ১০৮৯
ঘরের কথা	শ্রীঅমৃতলাল বসু	৬৬৭, ৭৯১, ৮৬৬, ৯৮৩
চীন জাহাজের যাত্রী	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ	৬৭৭
জীবন-সঙ্গীত (কবিতা)	শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর	১০৫২
ঢাকার কাটরা	শ্রীআজিজর রহমান্	৯৮৯
তেল, নুন, লকড়ি	শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী এম, এ	৯০৫, ১০৭১
তাম্রলিপ্তী	... ...	১০৫৪, ১১২৯

বিষয়	রচয়িতা	পৃষ্ঠা
দশভুজা (কবিতা)	শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন	৬০৩
দিদি-হারা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী	৭৯০
দোললীলা (কবিতা)	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	১৪১
নৌচালন বিদ্যা	শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ	৮৩৪
নরবলি	শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী	৯৬৭
প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ	৭৫৪, ১১১২
পাণিনি-তত্ত্ব	শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য এম, এ	৯২৬
প্রত্যাগমন (কবিতা)	শ্রীঅতুল প্রসাদ সেন	৬৫২
প্রতারিত (গল্প)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	১০২৫
ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার	শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি.এ	৭৪০, ১০৩৬
বত্রিশ সিংহাসন	শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী	৬২৫
বুশিদো	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬৩৬
বর্ণচিত্র	শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী	৬৫৪
বঙ্গ নারীর রাখী বন্ধন (কবিতা)	শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী	৬৬৫
বন্দনা (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	৭০৫
বঙ্গ ভাষার উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম	শ্রীপরেশনাথ সেন	৭২৯
ভিক্ষা (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৭৯৯
ভয় নাই (কবিতা)	... ...	৯৮১
মহানাটক	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬০৪, ৭০৬, ৮২২, ৮৯৭, ১০২০, ১১২৪

	রচয়িতা	পৃ
কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	৭৩৯
চরিত্র	শ্রীপ্রমথনাথ সেন	৭৬৪
া	শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী	৯৭৩
ন (কবিতা)	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৬৮
র স্বদেশ-ব্রত	শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী	৮
দাস ও তাঁহার পত্নী	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৮৭৮
সাময়িক ভারত	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	৬৭০, ৮৫ ৯৫৬, ১০১৩, ১১
স্বদেশের প্রতি (কবিতা)	শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত	৮
সুপ্রভাত (কবিতা)	শ্রীরমণীমোহন ঘোষ	
সম্মোহন-বিদ্যা	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৯৪৬, ১০৮২,	
সাময়িক কথা	... ...	

খেয়াল খাতা ।

ঋণ শোধ (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	
কণিকা	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	৮৮৩,
গোরাচাঁদ বনাম শ্যামা ম	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	
ঘুঘু	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	
চুটকী	শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০১
তুলনা	শ্রীব্রজেন্দ্র কৃষ্ণ সেন	
দান (কবিতা)	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী	

ষয়	রচয়িতা	
নাম	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	
বসন্তের উদয় (কবিতা)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার	
বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	
বিবিধ কবিতা	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৮৩, ৮৯
য়াকরণ-বৈঠক	শ্রীসত্যোপেন্দ্র মল্লিক	

দশভুজা।

দশভুজে! দশভুজে শত শত আশীর্ব্বাদ লয়ে,
এস মা এস মা আজি দশদিক রূপে আলো করি!
আমরা সন্তান সব, পথ চেয়ে আছি বঙ্গালয়ে;
দশ বাহু প্রসারিয়ে, কোলে তুলি, রাজরাজেশ্বরি,
লও, লও আমা সবে!—অশ্রুজলে আঁখি গেছে ভরি,
মুছ মা কনকাঞ্চলে তপ্ত বারি! জননী-হৃদয়ে
ওই স্তন্য ক্ষীরসুধা, বিন্দু বিন্দু পড়ে আহা ঝরি,
মাগো মা পিয়াও তাহা, পিয়াও এ পিপাসু তনয়ে!
জ্যোৎস্নামহিমাময়ী মরি মরি শারদী যামিনী,
পাতিয়াছে বনপথে তোর লাগি কনক-আসন!
ফলায়েছে অলক্তের নব রাগ রক্ত-কমলিনী,
করিতে রঞ্জন মাগো আহা তোর ও রাঙা চরণ!
কি উৎসর্গ! কি আনন্দ! কোটি কোটি ঝরিছে সেফালি!
আমরাও তোর পদে দিনু আজি এ জীবন ঢালি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মহানাটক।

পঞ্চম অঙ্ক।

রাম-হতে কেহ আর নহে বলীয়ান ;
দারাপহরণ চেয়ে নাহি অপমান।
তথাপি শ্রীরাম করি' বরষা যাপন
শরতের প্রতীক্ষায় রহিলা এখন ॥

(এই মাল্যবান পর্ব্বতে বিরহী রাম)

রাম।— তব নেত্র-সম কান্তি যে করে ধারণ
সেই নীলোৎপল এবে সলিলে মগন।
যাহার তুলনা তব মুখের সহিত
প্রিয়ে ! সেই চন্দ্র এবে মেঘেতে আবৃত।
তব গতি হেরিয়া যে গতিভঙ্গি করে
সে মরাল গেছে চলি' মানঃ সরোবরে।
সাদৃশ্য-দর্শনে করি চিত্ত বিনোদন,
প্রতিকূল দৈব তাও সহিতে অক্ষম ॥

লক্ষ্মণ।— শিথিল রাখিয়া মাথা ধনুর আগায়,
রচিয়া দ্বিতীয় মৌর্ব্বী অশ্রুর ধারায়,
মেঘধ্বনি মুহুর্মুহ করিয়া শ্রবণ
কি যেন কিসের ধ্যানে হইয়া মগন,
বিকল বিহ্বল আর্য্য ব্যাকুল অধীর,
নাহি হন অগ্রসর— না রহেন স্থির ॥

দুঃসহ ক্লান্তিকর গ্রীষ্মের মরমচ্ছেদী
উঠে ঝঞ্ঝানিল ;
তাহার তাড়নে ব্যাপ্ত ঘনঘটা,—নভস্তল
করি' তোলে নীল।

আকাশ হইল এবে　ছিদ্রময় কটাহের প্রায়,
তাহা হতে জলকণা　পড়ে ঝরি অজস্র ধারায়॥
মন্দ মন্দ বহে বায়ু,　মেঘদল করে গরজন,
চমকে বিজুলি-লতা,　ময়ূরেরা করয়ে কূজন;
—এইরূপ দৃশ্য মাঝে　অবস্থিত রঘুর নন্দন,
মূর্চ্ছাই হইল তাঁর　এ সময়ে একাবলম্বন।

রাম।— হরধনু-ভঙ্গ-কষ্ট　পরশুরামেরে পূর্ব্বে
মোর সাথে, রণমাঝে করিয়া দর্শন,
শঙ্কা-শশাঙ্ক-ম্লান　হয় যাঁর মুখ-পদ্ম
—সে সীতারে হয় মোর সতত স্মরণ॥
সুস্নিগ্ধ শ্যামল-কান্তি　নভোমাঝে সঞ্চরয়ে
বলাকার শ্রেণী;
বহিয়া সলিল-কণা　বহে বায়ু, খ্যালে শিখী
করি' কেকাধ্বনি;
কঠোর-হৃদয় অতি　আমি রাম—সব করি সহ্য;
সীতার কি হবে আহা!　দেবি ওগো! থাকো ধরি' ধৈর্য্য।
নীলোৎপল মনে করি'　তব নেত্রোপরে,
বন্ধুক-কুসুম ভাবি'　ও তব অধরে,
পদ্ম ভাবি' পাণিতলে,　মধুক-কুসুম ভাবি'
ও তব কপোলে,
আত্মীয় স্বজন ভাবি'　ঘন নীল ওই তব
কবরী-কুন্তলে,
উড়িয়া বসিছে আসি　দুর্নিবার মধুকরগণ;
—আর কোন্ স্থান তব　হে তরুনি করিবে রক্ষণ?
কর্ত্তব্যে সচিব মোর,　কিঙ্করী করমে,
ধরম-ব্যাপারে পত্নী,　ধরিত্রী ক্ষমায়,
স্নেহেতে জননী-সম,　কামিনী শয়নে,
চিরসখী সহচরী　সঙ্গিনী ক্রীড়ায়,
এ হেন প্রিয়া সে মোর　—কহিনু তোমায়।

এ ভুবন-মাঝে যেই মন্মথ-জীবন-ঔষধি,
রমণীর শিরোমণি, মম কুল-দেব-প্রতিনিধি,
নেত্রোৎসব নারীদের, মত্তগজ-গতি যেই,
চারু চন্দ্রাননা,
—জানকী প্রিয়া সে মোর কষ্টে কাটাইছে কাল
কোথায় ললনা॥

আর দেখ লক্ষ্মণ!
"এ হেন সুরজ-কুলে জন্মে নাই কোন একজন
যার পত্নী, কামুকেরা কোন-কালে করিল হরণ"
—এইরূপ বলাবলি পরস্পর করে মুনিগণ;
তাঁহাদের মুখে শুনি' কুলাঙ্গার রামের চরিত
ইন্দ্র-অর্দ্ধাসনস্থিত পিতা মোর হবেন দুঃখিত॥
নৃপাত্মজ রামচন্দ্র— তাঁর পত্নী সীতা
পঞ্চবটী বনে থাকি' হইলেন হৃতা;
—এই কথা জন মাঝে হইয়াছে চারিদিকে
বহুল প্রচার
—শুনিয়া বলেন রাম:— "কোথা ধনু কোথা ধনু
ধনু সে আমার?"
পরে রাম, মহাতেজা লক্ষ্মণেরে করি' আহবান
পাঠাইলা সুগ্রীব-সদন;
লক্ষ্মণ তথায় গিয়া যুদ্ধের উদ্যোগ-তরে
স্কন্ধাবার করিলা স্থাপন।
শ্রীরাম আছেন বনে; প্রেরিত হইনু এবে
কপিবর-পুরী মাঝে
আমি এ লক্ষ্মণ।
কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারে আসি', কহিলা লক্ষ্মণ সেই
কপিবর সুগ্রীবেরে
রামের বচন।

"রাম"—এই শব্দ শুনি'　　বিস্মিত ও সচকিত
বানর প্রমত্ত
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে　　—"রাম নামে কোনো কিছু
আছে কি পদার্থ ?"

লক্ষ্মণ।—ওগো কপিপতি :—
বিশ্বামিত্র-হিত-তরে　　যজ্ঞ-কার্য্য সমাপিতে
যে করিলা তাড়কা নিধন ;
জানকী-লাভের আশে　　হরধনুর্ভঙ্গ যেই
অনায়াসে করিলা সাধন,
ভর্গবে করিলা জয়,　　মারীচ রাক্ষসেরে যে
এক বাণে বধিল হেলায়,
বালিরে করিল নাশ,　　—সেই সে রাঘব সিংহ
আহবান করেন তোমায় ॥
শ্রীরাম-চরণের আদেশ তোমাকে আমি জ্ঞাপন করচি, শ্রবণ কর :—
যে বাণে বালিরে আমি করেছি নিহত
এখনো সে বাণ আছে অটুট অক্ষত।
সুগ্রীব ! এখনো কর প্রতিজ্ঞা পালন,
কোরো না বালীর তুমি পথানুসরণ ॥

সুগ্রীব।—(আসিয়া) দেখুন নরেশ্বর !
এই যে মোদের চির-বানর-স্বভাব অবনীতে,
—আমি তো ছাড়িতে চাই—মোরে সে যে না চাহে ছাড়িতে ॥
দগধ বিদগ্ধ হোক　　কাঞ্চন তবু না ছাড়ে
কান্তমূর্ত্তি তার।
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হোক　　স্বাদুতা তবু না ছাড়ে
ইক্ষু আপনার।
ঘৃষ্ট হোক বারম্বার　　চন্দন না ছাড়ে নিজ
চারুগন্ধ তবু ;
প্রাণান্তেও সজ্জনের　　প্রকৃতি, বিকৃত ভাব
নাহি ধরে কভু ॥

(শ্রীরাম সুগ্রীবকে দেখিয়া)

ভরতে দিলেন রাজ্য পূজ্যপাদ পিতা,
দশানন সম্প্রতি হরি লয় সীতা ;
—এইরূপ চিন্তা করি' ব্যাকুল-পরাণ
কাঁদিতে লাগিল রাম ত্যজি' ধনুর্ব্বাণ।

গ্রীব।— পৃথ্বী-আদি সবে-মাত্র চৌদ্দ ভুবন,
একমাত্র নভস্তল —নাহি অন্যতন ;
এই অল্প-পরিমাণ ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে,
কোথায় লুকাবে সীতা ? —বল' দেখি মোরে।
অবশ্য পাইব মোরা তাঁহার সন্ধান !
কেন তবে রঘুপতি ত্যজ ধনুর্ব্বাণ ?

রাম।— মহৎ বিপদ আসি' হলো উপস্থিত,
কোন-মতে স্থির থাকা নহেক উচিত।
শঙ্কা ত্যজি' লঙ্কাপুরে করিয়া গমন
ফিরিয়া আসিতে পুন কে পারে এখন ?

অঞ্জনা-নন্দন এই কপিকুলোদ্ভব হনুমান
লঙ্কায় প্রেরণ-যোগ্য—দেও আজ্ঞা, কহে জাম্ববান।

(হনুমান রামকে প্রণাম করিয়া)

হনুমান।— বিশাল প্রাকার যার —শোভে যেথা বহুল তোরণ,
সেই লঙ্কা নগরীকে করিব কি হেথা আনয়ন ?
অথবা সমস্ত সৈন্য তথায় লইয়া
লঙ্কাপুরী উর্দ্ধে আমি ধরিব তুলিয়া ?
কিম্বা উচ্চ পরবত হেলায় করিয়া উত্তোলন,
তাহা-দিয়া করিব কি সুদুস্তর সাগর বন্ধন ?
কি করিব বল' দেব, আমি তব আদেশের বাধ্য,
এ মোর বাহুর কাছে নাহি প্রভু কিছুই অসাধ্য॥

রাম।— তেজের মহত্ত্ব তব   এই বাক্যে হে ম
হ'ল উদ্‌ঘোষিত ;
বৃথায় করিবে শ্রম,   কেবা জানে আছে কি
জানকী জীবিত॥

কূর্ম্ম যার মূল সম,   আলবাল যাহার সাগর,
দিক্‌দশ লতা যার,   পল্লব যাহার জলধর,
নক্ষত্রাদি চন্দ্র সূর্য্য   যাহার প্রসূন ফল-রূপ,
সেই ব্যোম-মহীরুহ   আছে এই করতলে, ভূপ।"
মারুতির এই কথা   শুনিয়া সহসা রঘুপতি,
সীতা অন্বেষিতে আজ্ঞা   দিলা তারে হয়ে হৃষ্ট অতি॥

হনুমান।— কোথায় অযোধ্যাপুরী,   রাম বা কোথায়,
আইলা দণ্ডক-বনে   পিতার আজ্ঞায়,
কোথায় মারীচ নামে   স্বর্ণময় ছদ্মবেশী মৃগ,
জানকী-হরণ কোথা,   রাম মিত্র কোথা বা সুগ্রীব,
জানকীর অন্বেষণে   আমি কিনা হইনু প্রেরিত ;
—যাহা অসম্ভব তাও   —ক্রূর বিধি করে সংঘটিত॥
লঙ্কা নামে আছে পুরী   সুদুস্তর জলধির পারে,
জানকীও অবস্থিতা   সেই লঙ্কা-নগরী-মাঝারে।
শতেক যোজন-হতে   যেই পারে করিতে দর্শন
এ হেন "সম্পাতি" হতে   এ সমস্ত শুনি' বিবরণ,
অতি ক্ষুদ্র এ শরীরে   কেমনে সাগর হব পার
তাই ভাবি' নিজ তনু   করে হনু এমনি বিস্তার
যাহে ব্যাপ্ত হল ব্যোমে   বিপুল কুন্তল জটা তার।
বীর শ্রেষ্ঠ রঘুনাথ-পদরজ করিয়া স্মরণ,
জাম্ববানে নতশিরে করিয়া বন্দন,
সেনাপতি-পদযুগ আলিঙ্গণ করি',
অশ্রুমুখ সুহৃজ্জনে সান্ত্বনা বিতরি',

"মহেন্দ্র"-শিখর পরে হয়ে অধিষ্ঠান,
উদ্যত লঙ্ঘিতে সিন্ধু বীর হনুমান।

ভাল লাঙ্গুল-ধ্বজ উত্তোলিয়া গগন-মণ্ডলে,
গতি-বেগে দুই ভাগ করি' দিয়া জলদ-পটলে,
জঙ্ঘা-সঞ্চালন-ভরে জলনিধি করি' উচ্ছলিত,
(পৃষ্ঠদেশে কত জন্তু মুক্তীবৎ আছে অধিষ্ঠিত)
সিন্দুর-অরুণ-রুচি তনু-হতে তেজচ্ছটা
দূর হতে করিয়া বিস্তার,
উদ্ভাসিত করি' তুলে দীপ্ত-সূর্য্য-বিম্ব-সম
দিক-বারণের চারি ধার॥

প্রথমে কিরীট-রত্ন, ললাট-তিলক তার পর,
কণ্ঠ-হার-মধ্যমণি অলোকিত হয় অনন্তর।
ক্রমে ভানু একে-একে এই সব করি' সমুজ্জ্বল
শেষে উদ্ভাসিত করে মারুতীর চরণ-কমল॥

পরে বীর হনুমান, সলিল-স্তম্ভিত-দৃষ্টি
জলচরগণে
আকুল করিয়া তুলি', —দিক মুখরিত করি'
প্রখর গমনে,
সাগর লঙ্ঘিতে সেই খগপতি গরুড়ের-মত
উঠিতে প্রচণ্ডবেগে নভস্তলে হইল উদ্যত॥

লাঙ্গুলে সুরঙ্গ দেবে করিয়া বেষ্টিত,
মস্তক-কিরীটে শশী করি' কবলিত,
জটাজূটে মেঘজালে করিয়া বিধুর,
দন্তের ছটায় করি' তারা-গর্ব্ব চুর,
ভীম-অট্টহাস-সহ হয়ে পার জলধি-মণ্ডল,
লঙ্ঘন করিল আর লঙ্কেশের প্রতাপ-অনল॥

একাকী যাবেন নাকি হনুমান রাবণের কাছে
মহা-কোলাহল-ধ্বনি ওঠে তাই কপি-সৈন্য-মাঝে॥

সুরসা-নাগিনী-মুখে　　প্রবেশিয়া,—তাহা-হতে
হইয়া নির্গত,
সিন্ধু-মাঝে আবির্ভূত　　মৈনাক-পর্ব্বতে করি'
পূজা বিধিমত ;
নভোমার্গ-রোধকারী　　নিশাচরী সিংহিকায়
করিয়া নিধন
পবন-নন্দন হনু　　লঙ্ঘিয়া জলধি, করে
লঙ্কায় গমন ॥
নিশাতে লঙ্কায় গিয়া　　জানকীরে অন্বেষিয়া
সর্ব্বত্র অতীব যতনে,
গৃহে গৃহে, জলে স্থলে,　　বিটপে, বৃক্ষের মাঝে,
কুম্ভকর্ণ-রাক্ষস-ভবনে,
ইন্দ্রজিত-গৃহমাঝে,　　কন্দরে গহ্বরে বনে,
করিয়াও বহুল সন্ধান
কোথাও সে জানকীর　　না পাইয়া দরশন
চিন্তিত হইল হনুমান।

হনুমান।—　রাবণের মাতা, ভ্রাতা　　পত্নী, মন্ত্রী, সচিবাদি
সুবিখ্যাত যত পুত্র—সবার আলয়,
লঙ্কেশের শ্রীমন্দির,　　নিভৃত বিহার-ভূমি
অন্বেষণ করিলাম সর্ব্বদেশময় ;
—কুত্রাপি না পাইলাম　　সীতারে খুঁজিয়া আমি,
মনে মোর তাই এই শঙ্কা উপস্থিত।
বুঝি বা জনক-সুতা　　রাবণের ভয়ে ভীতা
সাগর-লঙ্ঘন কালে জলে নিপতিত।
সঙ্কুচিয়া নিজতনু,　　শরৎ-চন্দ্রিকা-ধৌত
মহাদীপ্তি-সমুজ্জ্বল-সৌধ-সুশোভিত
লঙ্কাপুরী নিরখিয়া,　　পরে অশোকের বনে
জানকীরে নেহারিয়া রাক্ষসী-বেষ্টিত

অশোকের তরু'পরে করি আরোহণ
রহিল প্রচ্ছন্ন হয়ে পবন-নন্দন ॥
কোথা কুল অকলঙ্ক আয়তাক্ষী জনক সুতার,
আর কোথা রাক্ষসের সঙ্গজাত অপবাদ তাঁর ॥
তাই বলি, জীবলোকে এসব কেবল
পুরব-জনমকৃত করমের ফল ॥

(রাবণ স্বয়ং আসিয়া সীতার প্রতি)

রাবণ।— হে সুন্দরি চন্দ্রাননে! প্রাণ-সঞ্জীবন মহৌষধি!
বাঁচাও পরাণ মোর প্রাণেশ্বরি, মনমথ-নন্দি ॥
একমাত্র মুখে রাম সুললিত মুখ তব
করেন চুম্বন;
চুম্বিবে বিচিত্রভাবে তব ওই মুখ, মোর
দশটি আনন।
তাই বলি হে মানিনি ছাড় তব পণ।
পূরাও প্রাণের তৃষা, বাঁচাও জীবন ॥
জনক-নন্দিনি ওগো! কুমন্ত্রি তাপস কোন
নিশ্চয় কুবুদ্ধি এই
দিয়াছে তোমায়;
সুরগণ-মুকুটেতে ঘৃষ্ট যার পাদপদ্ম
সেই আমি দেখ এবে
নমি তব পায়।
তবু ওই মর্ত্ত্য কীটে তব অনুরাগ?
আশ্চর্য্য! বুঝিতে নারি তব মনোভাব ॥
ত্যজ মান এবে সীতা রাজাদর করহ গ্রহণ।
দেখ আসি' স্বর্ণ লঙ্কা', লঙ্কেশ্বর বাঁচাও জীবন ॥
এক-ন্যূন শত পত্নী ত্যজি' মন্দোদরীর সহিত
সমস্ত এ রাজ্য, তব সেবায় করিব নিয়োজিত ॥

পুরাকালে মহেশ্বর   করিলা যাহার মুণ্ড
মাথায় ধারণ।
সেই সব মুণ্ড দেখ   তব পদে হে সুন্দরি
হইল স্থাপন।
অবজ্ঞা আমারে তুমি কর কি কারণ?

যার কারা-গৃহে মূঢ়   বহুদিন করিলি যাপন
—সেই কার্ত্তবীর্য্য বীরে   যে করিল সংগ্রামে নিধন,
শম্ভুহতে যার শিক্ষা   সর্ব্বমন্ত্র বেদ বিদ্যাত্রয়ী,
—আমার জীবন-নাথ   সে পরশুরামের বিজয়ী॥
পড়িয়া সে দশানন   জানকী-চরণতলে
করে ধরি' পাদপদ্ম   এই কথা তাঁরে বলে॥
বাসব্ও যাঁহার পদে   হয়েছে লুণ্ঠিত
সেই আমি তব পদে   হয়েছি পতিত॥
তবু আমাপ্রতি তুষ্টি না হল তোমার,
তোমারে তুষিতে বল' কি করিব আর?
শুনি' রাবণের বাক্য   নম্রাননা সীতা কহে
তৎক্ষণাৎ হয়ে অতি রুষ্ট;—
রাবণের মুণ্ডে যবে   গৃধ্রপদ হবে ন্যস্ত
তখনি হইব আমি তুষ্ট॥
বায়স গরুড় মাঝে আছে যে অন্তর,
বনে—সিংহ-শৃগালের সাথে।
খদ্যোত রবিতে যেই ভেদ পরস্পর,
সেই ভেদ তোতে রঘুনাথে॥

(রাবণ চলিয়া গেলে ত্রিজটার প্রতি)

সীতা। ত্রিজটে! তোমার আমি   এই কথা জিজ্ঞাসি এখন।
নীতিজ্ঞ নৃপ-শেখর   এমন যে রাজা দশানন্
পরনারী-মোরে কেন   বন-হতে করিল হরণ?

ত্রিজটা।— মনমথ-শরাহত হয় যেই—সীতা!
—বল দেখি মোরে,—তার নীতি থাকে কোথা?
যাবৎ পুরুষ কোন নাহি হয় কাম-শরাহত।
তাবৎ বিশিষ্ট বলি' লোকমাঝে হয় সে প্রখ্যাত॥

যার বক্ষে হল জীর্ণ   বজ্রীর সে কুলিশ প্রচণ্ড,
হরি-চক্র হ'ল বক্র,   যমদণ্ড হ'ল খণ্ড খণ্ড,
পাশী বরুণের পাশ   একেবারে হ'ল বিদলিত,
—সেই লঙ্কেশের বক্ষে   কামশর হইয়া পতিত
না হইল ভগ্ন, কিন্তু   মগ্ন হয়ে করে অবস্থান।
না জানি সে কোন শাখী   যার পুষ্প—সখি!—পুষ্প বাণ॥
শিরীষ-কুসুমপ্রায়   সীতার হৃদয়ে যেই বাণ
মগ্ন হওয়া দূরে থাক্   ভগ্ন হয়ে হল খান খান
সেই মনমথ বাণ   বজ্রজয়ী রাবণ হৃদয়ে
আপুঙ্খ প্রবেশ করি'   দেখ এবে রহে মগ্ন হয়ে।
রামের মহিমা ইথে   পরিব্যক্ত হয় বিলক্ষণ;
আপন অর্দ্ধাঙ্গে দেখ   অলক্ষিতে করেন রক্ষণ॥

হনুমান।—(সীতাকে দর্শন করিয়া)

কে তুমি বলনা মোরে   ওগো পদ্মপলাশ-লোচনা,
পীতবর্ণে-সুরঞ্জিত   কৌশেয়-বসন-পরিধানা,
তরুর শাখার পরে   পৃষ্ঠদেশ করিয়া নির্ভর,
কেগো তুমি অনিন্দিতা   বলদেখি আমারে সত্বর।
কি হেতু ও-নেত্র হতে   শোক-বারি ঝরে অবিরল?
—আহা যেন জল-ভরা   পদ্মপত্র করে টল টল॥

সীতা।— জনক বিদেহ-পুত্র   —ওগো আমি, তাঁহারি দুহিতা,
ধীমান্ সে শ্রীরামের   ভার্য্যা আমি—নাম মোর সীতা।
শত্রুঘাতী সেই রাম   রঘুবংশ ও জনক
-কুলের রক্ষক।

ত্রিজটা।— মনমথ-শরাহত হয় যেই—সীতা।
—বল দেখি মোরে,—তার নীতি থাকে কোথা?
যাবৎ পুরুষ কোন নাহি হয় কাম-শরাহত।
তাবৎ বিশিষ্ট বলি' লোকমাঝে হয় সে প্রখ্যাত॥

যার বক্ষে হল জীর্ণ বজ্রীর সে কুলিশ প্রচণ্ড,
হরি-চক্র হ'ল বক্র, যমদণ্ড হ'ল খণ্ড খণ্ড,
পাশী বরুণের পাশ একেবারে হ'ল বিদলিত,
—সেই লঙ্কেশের বক্ষে কামশর হইয়া পতিত
না হইল ভগ্ন, কিন্তু মগ্ন হয়ে করে অবস্থান।
না জানি সে কোন শাখী যার পুষ্প—সখি!—পুষ্প বাণ॥
শিরীষ-কুসুমপ্রায় সীতার হৃদয়ে যেই বাণ
মগ্ন হওয়া দূরে থাক্ ভগ্ন হয়ে হল খান খান
সেই মনমথ বাণ বজ্রজয়ী রাবণ হৃদয়ে
আপুঙ্খ প্রবেশ করি' দেখ এবে রহে মগ্ন হয়ে।
রামের মহিমা ইথে পরিব্যক্ত হয় বিলক্ষণ;
আপন অর্দ্ধাঙ্গে দেখ অলক্ষিতে করেন রক্ষণ॥

হনুমান।—(সীতাকে দর্শন করিয়া)

কে তুমি বলনা মোরে ওগো পদ্মপলাশ-লোচনা;
পীতবর্ণে-সুরঞ্জিত কৌশেয়-বসন-পরিধানা,
তরুর শাখার পরে পৃষ্ঠদেশ করিয়া নির্ভর,
কেগো তুমি অনিন্দিতা বলদেখি আমারে সত্বর।
কি হেতু ও-নেত্র হতে শোক-বারি ঝরে অবিরল?
—আহা যেন জল-ভরা পদ্মপত্র করে চল চল॥

সীতা।— জনক বিদেহ-পুত্র —ওগো আমি, তাঁহারি দুহিতা,
ধীমান্ সে শ্রীরামের ভার্য্যা আমি—নাম মোর সীতা।
শত্রুঘাতী সেই রাম রঘুবংশ ও জনক
-কুলের রক্ষক।

ধর্ম্মেরো রক্ষিত তিনি　　—তাঁহাতেই হয় রক্ষা
এই জীবলোক॥
বেদ-আদি ধনুর্ব্বেদে নিষ্ঠা তাঁর আছে বিলক্ষণ ;
বৃহৎস্কন্ধ, মহাবাহু, কম্বুগ্রীব, সুপ্রশস্ত-মন॥

[হনু]মান।—(মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া)
* সু-বর্ণ সু-বর্ণ এই সু-বর্ণ-অঙ্গুরী
পাঠাইলা রামচন্দ্র শুনগো সুন্দরি

হনুমান।—মা জানকি!
সীতা।—　—কে গো তুমি?—শাখামৃগ?—কাহার প্রেরিত?
হনুমান।—　পাঠাইলেন রামভদ্র।
সীতা।　　—হস্তে একি?
হনুমান।—　　অঙ্গুরি মুদ্রিত।
নিজকরে অঙ্গুরীটি, লকে সীতা, করি' আলিঙ্গন
প্রেম-অশ্রু বিসর্জ্জিলা—গাত্রে হল পুলক-উদ্গম।

সীতা।　মুদ্রা, প্রিয় সখি মোর, আছত গো ভাল?
মুদ্র।　জানকি! কুশল মোর—রামেরো কুশল।
সীতা।　সত্য কি আমারে সখি প্রাণনাথ করেন স্মরণ?
প্রোষিতা সীতার কথা কখন কি করেন ভাষণ?
মুদ্রা।—　"আমার বিরহে সীতা　কোথা এই দীর্ঘকাল
করেন যাপন?"
—এই তাঁর জলপনা　এই তাঁর মন্ত্রণা,
ধ্যান অনুক্ষণ।
এইরূপে শুখাইছে দেহখানি তাঁর,
আর হয় থাকি-থাকি মূর্চ্ছা বারম্বার।

---

* সু-বর্ণ=উৎকৃষ্ট রং যার সু-বর্ণ=উৎকৃষ্ট "রাম" নাম-অক্ষর যাহাতে লখিত ; সুবর্ণ=স্বর্ণ।

সীতা। বল' সখি অঙ্গুরীয়, —ভাল তো আছেন রাম
লক্ষ্মণ-সহিত ?

অঙ্গুরী।— আছেন কুশলে তাঁরা, চিন্তায় হয়োনা সীতা
বিষাকুল-চিত।
ও-নামে ডেকো না মোরে নামান্তরে এবে তুমি
কোরো সম্বোধন।
তোমার বিরহে রাম বহুদিন হতে মোরে
বলেন কঙ্কণ॥

রাম-প্রতিবিম্ব ছিল অঙ্গুরীয়-মণির উপরে,
দেখিতে লাগিলা তাই সীতাদেবী কতই আদরে।
বুঝি বা আমারি-মত চিন্তাজ্বরে তাঁরো এই দশা
—এইরূপ ভাবি' সীতা মূরছিতা হইলা সহসা॥

হনুমান।— প্রতিদিন অতিদীন রামে হেরি' রতিহীন,
দ্বিধা যে হলনা গিরিবর
তাহার কারণ এই অশনি-কঠিন সে যে,
বজ্রপাত সয়েছে বিস্তর।
পৃথিবীও না হইল ফাটি' দুই খান
—কেননা সে "সর্ব্বংসহা" ধরে এই নাম॥

(আশ্বাসিত করিয়া)

কিবা দূর ইন্দুমুখি রাম-শর-কাছে ?
কপি-সেনাপতিদের দুর্গম কি-আছে ?
তোমা প্রতি আজ দেবি অদৃষ্ট প্রসন্ন,
কুপিত লক্ষ্মণ-কাছে রাক্ষস নগণ্য॥
যাঁহার নিকটে চন্দ্র দিনেশ-কিরণ সম তায়,
সলিল—স্ফুলিঙ্গবৎ, কর্পূর—কুলিশের প্রায়,
শশিকলা *শম্পা সম, বায়ু বাড়বানলের মতো,
চন্দন যাঁহার কাছে দাবানলরূপে প্রতিভাত

---

* শম্পা—বিদ্যুৎ।

—সেই রাম-সন্নিধানে লয়ে যাও এ মোর সন্দেশ,
এখনি করহ যাত্রা বিলম্ব কোরো নাকো লেশ ॥
দিয়ো গো একটি ফল শ্রীরামের চরণকমলে,
দুটি ফল দিয়ো তুমি সেথাকার সৈন্যদলবলে,
একটি সুরম্য ফল দিবে কপি-সেনাপতি-হাতে,
লক্ষ্মণে একটি ফল —মোর শত আশীর্ব্বাদ সাথে,
তারপর, সৈন্যমাঝে তুমি যে গো সুধীর-প্রকৃতি
তুমিও একটি ফল খেয়ো বৎস এ মোর মিনতি ॥

কি করে' তুমি সাগর পার হবে বল দিকি ?

তোমার প্রসাদ আর পবন-প্রসাদে,
আর তব ভরতার চরণ-প্রসাদে,
—এ তিন প্রসাদে আমি হয়ে বলীয়ান
লঙ্ঘিব সমুদ্র তুচ্ছ গোষ্পদ-সমান ॥

সীতা-সম্ভাষণ-অন্তে কাননটি ভাঙিবারে
হনুমান হইয়া উৎসুক,
গলিত-নখর-দন্ত শীর্ণকায় অতি বৃদ্ধ
দ্বিজচ্ছলে ধরে ছদ্মরূপ,
শুক্ল-কেশ বৃদ্ধ হয়ে বন সন্নিকটে গিয়ে
রক্ষিজনে মন্দ মন্দ
কহিল বচন :—
ওহে ভাই ! ভূমিপতি একটি অমৃত ফল
যাচি আমি, কৃপা করি'
কর বিতরণ।

(হনুমান-কর্ত্তৃক প্রমদ-বন ভগ্ন হইলে রাবণের প্রতি উদ্যানপাল)

উদ্যানপাল।— যে অরণ্যে মন্দমন্দ বহে সমীরণ,
সূর্য্য যেথা ভয়ে-ভয়ে বরষে' কিরণ,
মেঘ যেথা জলদানে সর্ব্বদাই হন ভীত অতি,
ভাঙিলে প্রাচীর যার বিশ্বকর্ম্মা যান দ্রুতগতি,

ভ্রমণ করিল সেই সুললিত বন,
কোথা-হতে কপি এক আসিয়া রাজন্ ;
লাঙ্গুলে উপাড়ি' তরু নিষ্ঠুর বানর কোথাকার
সুরম্য এ কেলীবন ভাঙ্গি' করে সব চুরমার।
যতেক উদ্যান-পাল সবারেই ফেলিল বধিয়া,
আমি মাত্র বার্ত্তা দিতে দৈবক্রমে আইনু বাঁচিয়া।
লঙ্কাপুরী মাঝে আসি' পবন নন্দন
প্রকাশ করিল যবে উৎকট বিক্রম,
কি কি দশা রাবণের বল দেখি হল উপস্থিত ?
"বধিয়াছে" শুনি' রাজা কোপে প্রজ্বলিত ;
"কপি"—শুনি' লজ্জা-বশে নত হল মাথা ;
"লঙ্ঘিল হেলায় সিন্ধু" শুনি এই কথা,
কাঁপি উঠিলেন ভয়ে —কাঁপে তাহে কর্ণের কুণ্ডল ;
"রামদূত কপি"—শুনি ; হইলেন ঈর্ষার বিকল ॥

(অক্ষ নিহত হইলে ও ইন্দ্রজিৎ অগ্রে যাত্রা করিলে পারিপার্শ্বিক)

পারিপার্শ্বিক।— প্রাকার তোরণময়ী অলঙ্ঘ্য এ লঙ্কাপুরী,
—এক কপি-বীর আসি পশিল হেথায় ;
রাবণ-কুমার অক্ষ হইয়া অতীব রুষ্ট
কুমারের অভিমুখে ঐ দেখ ধায় ॥

(অক্ষ নিহত হইলে ও ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করিলে)

কুমার অক্ষেরে তুই কি প্রকারে বধ করি
কোথায় পলালি ওরে
বানর অধম ?
দশানন-আজ্ঞাক্রমে আজিকে বধিবে তোরে
দর্পোদ্ধত মেঘনাদ
রাবণ-নন্দন ॥

রাম-আগমন-বার্ত্তা সীতা-কাছে নিবেদন করি',
সান্ত্বনা প্রবোধ আদি দিয়া তাঁরে বহুক্ষণ ধরি,
রামের প্রত্যয় তরে সীমন্ত-মণিটি তাঁর
করিয়া গ্রহণ,
ভাঙ্গি অশোকের বন. অক্ষ-আদি রক্ষোগণে
হনুমান করিয়া নিধন,
রাবণেরে দেখিবারে স্ববন্ধন ইচ্ছা করি'
সৌম্য মূর্ত্তি করিল ধারণ॥
ওরেরে বানর দূত ! একি অদ্ভুত কাণ্ড
—একি আচরণ ?
জলজন্তু-পরিবৃত দুস্তর জলধি এই
তরঙ্গ-ভীষণ
কেমনে লঙ্ঘিয়া এলি বিনা-রথে, কেবা তোরে
করিল প্রেরণ ?
বল্ তুই—করিতেছি অভয় প্রদান।
বধিব না,—কহ মোরে কিবা তব নাম॥
ন্ু।— বিজয়ী শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটে অবস্থিত
লক্ষণের সনে ;
সীতা-অন্বষণ-কার্য্যে পাঠালেন মোরে তিনি
আদর যতনে।
লঙ্ঘিয়া শম্ভুর বর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী যেগো
তুমি দশানন
তুমি কি জান না মোরে, আমি কপি হনুমান্
পবন-নন্দন ?
মহাবল বালি বীরে করিয়া বিনাশ,
কপি-সেনাদলে দিয়া সান্ত্বনা আশ্বাস
সদানন্দ জয়ী কৃতী. সখা সুগ্রীবেরে রাম
সিংহাসনে বসাইয়া, করি' কপি-রাজ,

২

আর চিন্তি' দেব-বাক্য —"জানকী-হরণ-হেতু"—
তব কালরূপে এবে করেন বিরাজ ॥

রাবণ।— রাম-দূত ওরে কপি ! "বালি-ছাড়া নাহি বলী"
বল' কোন্ মুখে ?
আমি বীর দশানন —এই কথা কহ তুমি
আমার সম্মুখে ?

হনু।— বালি-কক্ষ-মাঝে থাকি হয়ে ছিল তোমার যে
হেলন দোলন,
পুনঃ সেই দশা তব একটু দেখিতে ইচ্ছা
হয় হে রাজন ॥

রাবণ।— কে তুই বানর ওরে ?

হনু।— তব পুত্র-হন্তা, লঙ্কা-স্বামি !
কোদণ্ডের দীক্ষা গুরু খর-ঘাতী রামদূত আমি।
এই মোর সুকঠোর দোর্দণ্ডের ঘায়
কোথা থাকে চিত্রকূট —মেরু বা কোথায় ?
একটি রাবণ হয়ে কি কহিছ তুমি ?
—কোটি রাবণে যে আমি কীট তুল্য গণি।
একা আমি হনুমান্ পবন-নন্দন কপি,
কোটীশ্বর তুমি দশানন।
তোমারে জিনিয়া আমি মম প্রভু-প্রণয়িনী
জানকীরে লইতে সক্ষম।
তবে কিনা, সুগ্রীবেরে বসুমতী দান করি'
রামচন্দ্র মহাশক্তিমান,
আপন দক্ষিণ হাতে তোমা বধিবেন তিনি
—করিলেন বচন প্রদান।
রাবণ রাক্ষসাধম পশু ওরে ! মূর্খের অধম !
শীঘ্র কর্ গর্ব্ব ত্যাগ, হিত-তরে বলি এ বচন ;—
জানকীরে দিয়া অগ্রে শ্রীরাম-চরণ-যুগ
মাথায় করি লহ ;

এইরূপে নিজ রাজ্য　　অকণ্টক করি' রাখ
পুত্র পৌত্র-সহ ॥
রক্ষিবারে চাস্ যদি　　পুত্র পৌত্র আপনারে
—ভ্রাতৃবর্গ কুটুম্বক
সৈন্য পরিজন,
আর এ উজ্জ্বল রাজ্য ;　　—স্বেচ্ছাক্রমে, মহাবীর
রামহস্তে জানকীরে
করহ অর্পণ ॥
লোকনাথ শ্রীরামের　　প্রিয়ারে না দিস্ যদি,
শোন্‌রে রাবণ,
—দেখিবি রামের মুখ,　　জলধি হইবে বদ্ধ,
আর কপিগণ
আক্রমিবে লঙ্কাপুরী　　—ভ্রাতৃবন্ধু আত্মীয়ের
দেখিবি মরণ।
অধিক বলিব কিবা,　　ততক্ষণ তুই হেথা
রাজা লঙ্কেশ্বর,
—না আসেন যতক্ষণ　　বিশ্বজয়ী মহাবীর
রাম রঘুবর।
মহাবীর রামচন্দ্র আসিলে হেথায়।
লঙ্কামাঝে লঙ্কেশ্বর থাকেন কোথায় ?

রাবণ।— (ক্রোধানলে প্রজ্জ্বলিত)

বিভীষণ। রুক্ষবাদী যেই দূত— দণ্ড তার　　শোনো গো রাজন—
কশাঘাত, বৈরূপ্য,　দাগ-দেওয়া,　মস্তকমুণ্ডন।
দৃষ্ট নাহি হয় কভু　শাস্ত্রাদিতে　দূতের নিধন ॥

শচঃ— লাঙ্গুল্‌ইতো কপিদের　একমাত্র সাধের ভূষণ ;
জ্বালাইয়া দেও তাহা　—দগ্ধ হয়ে করুক গমন ॥
কাটিতে উদ্যত যবে—　"বধযোগ্য নহে দূত"
—এই বিভীষণ-বাক্য
শুনিয়া রাবণ

বিরূপ করিয়া দিতে ঘৃত-সিক্ত বস্ত্রে বাঁধি
হনুর লাঙ্গুলে অগ্নি
করিল অর্পণ ॥

বিভীষণ। অগ্নি হ'ল প্রজ্বলিত আজ্ঞা কর জলদেরে
—সুপ্রচুর অম্বুরাশি করুক বর্ষণ।
বহিছে পবন, কিন্তু তব আজ্ঞা বশে নহে
তোমায় কহিনু আমি—শোনো গো রাজন ॥
এই বাক্যানলে যথা দহিল রাবণ-হৃদি
লঙ্কাপুরীও তথা হয় নি দহন ॥

বাড়ব-অনল-সহ সাগর যেমন,
তপনমণ্ডল-সহ যেমতি গগন,
বিদ্যুৎ-অঞ্চল-সহ জলদ যেমতি,
ললাটের নেত্র-সহ যথা পশুপতি,
প্রলয়াগ্নি-সহ যথা কল্পান্তের কাল,
ইন্দ্র-ধনু-সাথে যথা জলদের জাল,
ধ্রুব-মণ্ডলের সাথে মেরুগিরি যথা
পুচ্ছ-সহ হনুমান বিরাজেন তথা ॥

হনু।— নির্লজ্জ রাবণ ওরে! রাম লক্ষ্মণের সাথে
না করিয়া সম্মুখ-সংগ্রাম,
অসাক্ষাতে চুরি করি' হরিলি সীতারে তুই
—যিনি সদা ভয়ে কম্পমান।
হর্ম্ম্য প্রাসাদ আদি বরগৃহে-পরিপূর্ণ,
ব্যাপ্ত লোকজনে
কাঞ্চন-স্ফটিক-রত্ন —মুক্তামতী লঙ্কা, তব
চক্ষের সামনে
দগ্ধ করিতেছি আমি —দুর্ম্মতি পাপিষ্ঠ তুই
দেখ্ রে নয়নে ॥

তন্নার্ত্ত জনদের　　গৃহেগৃহে সঞ্চারিয়া
সেই সে আগুন,
উল্কামুখী-মুখ হতে　　বাহিরি'—প্রভাব তার
হইয়া দ্বিগুণ,
সমস্ত সে লঙ্কাপুরী করিল দহন,
কার্ সাধ্য শিখা তার করে নিবারণ ॥

রাবণ।— শীঘ্র রক্ষা কর্ ওরে　　অশ্বশালা, হস্তিশালা,
শ্রীগৃহ, শয্যা গৃহ আর
নিবাস ও ধনালয় ;　　প্রবল পবনে দেখ
দীপ্তানল হয়েছে বিস্তার।
ধুমব্যাকুলিত-নেত্র　　যুবতীজনেরা সবে
বক্ষস্থলী করিছে তাড়ন ;
বালবৃদ্ধ নারী যত　　বিহ্বল হইয়া ভয়ে
হাহা রবে করিছে ক্রন্দন ॥

ঘোর হুতাশনে দগ্ধ　　লঙ্কাপুরী হেরিয়া রাবণ,
জল যাচি,' দশমুখে　　জলধিরে করে সম্বোধন :—
নীরধি অম্বুধি, ওগো !　　অপাংনিধি পয়োনিধি
অম্ভোধি, পয়োধি এসো　　হে বারিধি বারানিধি !
হে নিকুম্ভ ! কুম্ভোদর !　　কুম্ভকর্ণ আর,
তোমাদের কুম্ভনাম　　নামমাত্র সার ;
অনল করিছে গ্রাস　　মন্দোদরী-গেহ,
জল আনি' নিবাবেনা　　তোমরা কি কেহ ?

টুটিল বন্ধন নিজ　　সূরজ-মণ্ডলগ্রাসী
বীর হনুমান ;
মৃতপ্রায় জানকীরে　　সঞ্জীবনী মহৌষধি
করিল প্রদান ;
বধিল রাক্ষস-সৈন্য　　ভৎসিল দশাননে
কঠোর ভাষায়,

প্রজ্জ্বলিত পুচ্ছ দিয়া আগুন জ্বালায়ে দিল
সমস্ত লঙ্কায়।

এইরূপে কপি-কার্য্য করি' সমাপন,
জানকীর কাছে হনু করয়ে গমন।
আসিয়া অশোকবনে বলিল সীতায়
লঙ্কা দগ্ধ হল দেবি, দাও গো বিদায়॥

আরোহণে দক্ষ হনু বেলাদ্রি-শেখরোপরি
করি' আরোহণ
—পূর্ব্বাচলে সূর্য্য যথা —মহাসিন্ধু-অম্বুরাশি
করিল লঙ্ঘন।

সেই বেগ-ভরে বায়ু হয়ে উৎপাদিত
সমস্ত সাগর-জল করিল ক্ষুভিত।
নাগেন্দ্র বাসুকি আদি বাহিরিয়া সিন্ধুগর্ভ-হতে
কীর্ত্তি-হার-রূপে লগ্ন হল হনুমানের কণ্ঠেতে॥

মহা বেগবান হনু পবন-নন্দন
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে লঙ্কা করিল দহন॥
জানকীরে নানামতে করি আশ্বাসিত
জাম্ববান আদি-সাথে হইল মিলিত॥

তাদের নিকটে সব লঙ্কা-কথা করি' নিবেদন,
সুগ্রীবের প্রিয় স্থান মধুবনে করিয়া স্মরণ
ভুক্তিতে তথায় সবে হৃষ্ট মনে করিল গমন।
যা ছিল সঞ্চিত মধু করিতে লাগিল তারা পান;
রক্ষক সে দধিমুখ মানা করি' হল হতমান।
বলবান্ বানরেরা প্রহার করিল দধিমুখে,
অভিযোগ করিবারে আসিল সে সুগ্রীব-সম্মুখে॥

ইতি—সন্দেশাহরণ নামক পঞ্চম অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর

বত্রিশ সিংহাসন।

,লিত ভাষায় দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার নাম বত্রিশ সিংহাসন। এই গ্রন্থ কালিদাস কৃত বলিয়া সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ হা কালিদাসেরই রচিত বটে, কিন্তু যাঁহার সুধানিষ্যন্দনী লেখনী ইতে কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ, অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আবির্ভাব হইয়াছে, এ গ্রন্থ সে কালিদাসের রচিত নহে; ইহার প্রণেতা ভোজ-রাজীয় কালিদাস।

মধ্যভারতে মৌ-ছাউনী হইতে বরোদা রাজ্যে যাইবার রাজপথের পার্শ্বে মণ্ডু নামে একটি রাজধানী আছে। ঐ রাজধানীতে একটি ত্ররাজ রাজ্য করেন। এই রাজবংশটি অতি প্রাচীন। মণ্ডুর বর্ত্তমান নরপতি ভোজবংশীয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব রাজধানী ধারা নগরীতে বিদ্যমান ছিল। তজ্জন্য এখনও সরকারী চিঠিপত্রে ইঁহারা "ধার রাজ" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ধারা নগরীর পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ভোজ-প্রবন্ধ ও অন্যান্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থে ধারা নগরীর বর্ণনা আছে। মণ্ডু হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে পর্ব্বতোপরি ধারা নগরীর শ্বেত কৃষ্ণ ও লোহিত পাষাণনির্মি অট্টালিকা ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং সুদীর্ঘ জলাশয় সক- অদ্যাপি সেই প্রাচীন হিন্দুরাজধানীর স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। এখন যে সকল মনোহর দেবালয় অট্টালিকা ও মহৎ ...হাও নাকি ঐ প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশে...

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন "খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইঁহারা ধারা ন রাজধানী স্থাপন করেন।" কাহার কাহারও মত এই যে, দিত্যের বংশেই ধারানগরীর অধীশ্বর সুপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ জ করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ মত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। সে যাহা হ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে যে সকল নরপতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভোজরাজ বি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভোজরাজ যে অতিশয় পরাক্রান্ত নরপতি ছিলে স্থানে স্থানে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুরাগ বিদ্যাবত্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থ সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ, জ্যোতিঃসারসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ভোজরাজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় ধারানগরীর অধিশ্বর ভোজেরও একটি নবরত্নসভা ছিল উক্ত সভায় কালিদাস প্রভৃতি নয়টি সদস্য ছিলেন। এই ভোজরাজী কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের বয়স্য কালিদাসের সমানধর্ম্মা না হইলে কবিত্বসম্পদে একান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। শ্রুতবোধ, নলোদয়, পুষ্পবা বিলাস, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গাররসাষ্টক এবং দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা তাঁহার লেখনী নির্গত। শ্রুতবোধ ছন্দোনিয়ামক গ্রন্থ এবং অপর পাঁচ খানির মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ব্যতীত সব কয়খানিই কাব্য। দ্বাত্রিংশৎ লিকাকে 'আখ্যায়িকা' বা 'কথা' নামে অভিহিত করা যাইতে ...। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই এই প্রবন্ধের বর্ণনীয়, তদ্বিষয়ে কিছু লিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

াত্রিংশৎ পুত্তলিকার সংস্কৃত, পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের সংস্কৃত মধুর এবং অনায়াসগম্য। যাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ছ, তিনিই বুঝিতে পারেন। ান্ত্রিক ...

ছল তাহা গ্রন্থপাঠে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন সামাজিক ক্রিয়া চর্ম্মে আড়ম্বরপ্রিয়তা, অলৌকিক কার্য্যে বিশ্বাস, অবরোধপ্রথার বাড়াবাড়িও নিতান্ত অল্প ছিল না। যদিও এই গ্রন্থোক্ত গল্পগুলি পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত, তথাপি উহা পাঠে সে সময়ের সমাজের একটি ূর্ণ চিত্র মনোমধ্যে সমুদিত হয়। গ্রন্থখানি উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বক্রমাদিত্য ও ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজের চরিত্র কথায় পরিপূর্ণ। ভোজের চরিত্র অপেক্ষা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র কত উন্নত ছিল, তাহাও বিশেষভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ঐ গ্রন্থরচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইল।

উজ্জয়িনী নগরীর কথা কে না জানেন? যে সময় সেই সুপ্রসিদ্ধ গরীতে রাজা ভর্ত্তৃহরি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত সেই সময় কোন মন্ত্রশাস্ত্র- ৎ ব্রাহ্মণ নানাবিধ কঠোর অনুষ্ঠানদ্বারা ভুবনেশ্বরীদেবীকে প্রসন্ন রয়া একটি ফল প্রাপ্ত হন। ঐ ফলের গুণ এই, যে ঐ ফল ভক্ষণ াবে তাহার জরা কিংবা মৃত্যু হইবে না। ব্রাহ্মণ সেই অপূর্ব্ব ভক্ষণ করিতে গিয়া চিন্তা করিলেন, আমি দরিদ্র, অমর হইয়া করিব? বরং এই ভিক্ষাবৃত্তির হস্ত হইতে যত শীঘ্র অব্যাহতি ়া যায়, সেই মঙ্গল। বরং কোন পরোপকারী ব্যক্তিকে ইহা ন করিলে জগতের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে। আমাদের রাজা পরোপকারে সদা অনুরক্ত, অতএব তাঁহাকেই ইহা প্রদান করিব। ইহা ভাবিতে ভাবিতে গিয়া সেই ব্রাহ্মণ রাজা ভর্ত্তৃহরিকে ঐ ফলটি প্রদান করিলেন। রাজা ভর্ত্তৃহরি ব্রাহ্মণকে বহুবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রদান করিয়া ঐ ফল গ্রহণ করিলেন। রাজার মহিষী াঙ্গসেনা যুবতী এবং অদ্বিতীয় সুন্দরী; তিনি রাজার প্রাণ অপে-

বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিতে পারিব না, অতএব এই ফল অনঙ্গসেনা-কেই প্রদান করি।" তাহার পর তিনি অনঙ্গসেনাকেই উহা প্রদা- করিয়াছিলেন। মহিষীর আবার অন্য একটি মাথুরিক (জুয়াখেলার অড্ডাধারী) প্রণয়ী ছিল, তিনি তাহাকে ঐ ফলটি দিলেন। ঐ ব্যা অপর একটি প্রিয়তমা দাসীকে উহা অর্পণ করিল। ঐ দাসীর এ গোয়ালার সঙ্গে ভাব ছিল, সে তাহাকে ঐ ফল দিল। তাহার আবা এক গোময়ধারিণী (ঘুঁটে ওয়ালা) প্রণয়পাত্রী ছিল, সে তাহাকে উহা প্রদান করিল।

তাহার পরদিন সেই গোময়ধারিণী গ্রামের বাহির হইতে ঘুঁটে সংগ্রহ করিয়া ঘুঁটের ঝাড় মাথায় রাজপথে আসিতেছিল, ঐ ফলটি তাহার ঘুঁটের ঝুড়ির উপরে বসান ছিল। সেই সময় রাজা ভর্তৃহ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তি কৌতূহলপ্রযুক্ত হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়াই ঘুঁটের ঝাড় হইতে ফলটি তু লইলেন। তাহার পর, সেই ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিে "ওহে ব্রাহ্মণ! সেইরূপ ফল আর কি পাওয়া যায়?" ব্রাহ্মণ বলি "মহারাজ! সে যে দেবতার প্রসাদলব্ধ, তাহা আর কোথায় পা যাইবে?" রাজা তখন ফলটি দেখাইলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিে "ঐ ফল ভক্ষিত হইয়াছিল কি না?" রাজা বলিলেন "আমি ভোজনের নিমিত্ত আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা অনঙ্গসেনাকে দিয়াছি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "তবে তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন।" তাহার পর রাজা, মহিষী অনঙ্গসেনাকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অনঙ্গসেনা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া কম্পিত কলেবরে বলিলেন, "তাহা মাথুরিকে দিয়াছিলাম।" রাজা ক্র

" মনোহর রূপযৌবনে পুরুষের অভিমান করা বৃথা। কারণ পুরু যতই রূপবান কিংবা গুণবান্ হউন না কেন, রমণীর চিত্তহর তাঁহার শক্তি নাই। এ বিষয়ে কন্দর্পই প্রমদাগণের প্রভু, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা করেন রমণীগণের দ্বারা তাহাই করাইতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন এবং ক্নি ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যকে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া বসন পরিধানপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন।

রাজা বিক্রমাদিত্য রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া মন্ত্রিসমাজ ও প্রজাবর্গের পরিতোষবিধানপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কোনও সময়ে এক দিগম্বর আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বলিলেন "মহারাজ! আমি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাশ্মশানে অঘোর-মন্ত্র দ্বারা হোম করিব, অতএব আপনাকে উত্তরসাধক (সহায়) হইতে হইবে"। রাজা সেই দিগম্বরের নিকট উত্তরসাধক হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। উক্ত দৈব কার্য্য সম্পন্ন করায় তাঁহ প্রতি বেতাল (কোনও দৈববলসম্পন্ন যক্ষ) প্রসন্ন হইলেন এ তাঁহার প্রসাদে অষ্টমহাসিদ্ধি লাভ হইল। তাহার পর হইতে র বিক্রমাদিত্য যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতেই সি লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে, বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তিকথা দেবলো পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। দেবরাজের সভায় রম্ভা এবং উর্ব্বশী নিয়্ম রূপে নৃত্য করিয়া থাকেন। এই উভয় নর্ত্তকীর মধ্যে কে নৃত্য কার্য্যে অধিক নিপুণা, এই কথা লইয়া দেবতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। কতকগুলি দেবতা রম্ভার এবং কতকগুলি দেবতা উর্ব্বশীর ...শংসা করিতে লাগিলেন কিন্তু

াঠাইলেন। কারণ, সে সময়ে ত্রিভুবনে বিক্রমাদিত্যের স্থায় কহই নৃত্যগীতবিশারদ ছিল না। রাজা বিক্রমাদিত্য অমরাবতীতে উপস্থিত হইলে দেবরাজের রঙ্গালয়ে দুইদিন মহাসমারোহে নৃত্য হইল; রঙ্গক্ষেত্রে সমস্ত দেবতাই উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন রম্ভা দ্বিতীয় দিন উর্ব্বশী নৃত্য করিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য, উর্ব্বশীর রই অধিক প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকেই জয় প্রদান করিলেন। দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এই রম্ভা ও উর্ব্বশীর নৃত্যের মধ্যে ইতর-বিশেষ কি বুঝাইয়া দিন; কারণ আমাদের ত উভয়ের নৃত্যেই মন মোহিত হইয়াছিল"। তখন রাজা বিক্রমাদিত্য, নৃত্যশাস্ত্র-সংক্রান্ত একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা উর্ব্বশীর নৃত্যের বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিলেন। দেবরাজ, উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বস্ত্রাদিদ্বারা বিক্রমাদিত্যকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং গমনকালে একখানি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সিংহাসন উপহার প্রদান করিলেন। ঐ সিংহাসনের সোপানে বত্রিশটি পুত্তলিকা আছে, সিংহাসনে আরোহণ কালে তাহাদের মস্তকে পা দিয়া আরোহণ করিতে হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য দেবরাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঐ সিংহাসনসহ উজ্জয়িনীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার পর, শুভদিন ও শুভলগ্নে নানাবিধ দৈব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বহুদিন রাজা বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনকাল অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যময় ছিল। ভারতবর্ষে বহু নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিক্রমাদিত্যের স্থায় খ্যাতিলাভ অল্প রাজার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে. রাজা বিক্রমাদিত্য যখন পরিণতবয়সে উপনীত, সেই সময়ে একদি ...মা ভূমি— দিগদাহ ও উল্কাপাত হইতে লাগিল। রাজ শঙ্কি

জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিলেন,—"মহারাজ! এ সমস্ত অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ, ইহাতে এই জানা যায়, অদ্য পৃথিবীতে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই মহারাজের হন্তা হইবে"। রাজা তৎক্ষণাৎ নানা দেশে গুপ্তচর পাঠাইলেন। একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ! প্রতিষ্ঠান নগরে (পৈঠানে) এক কুম্ভকারের গৃহে কোন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী কন্যা বাস করিতেন। সেই বালিকা কন্যার গর্ভে নাগরাজের ঔরসে ঐ দিবস আশ্চর্য্য লক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঐ পুত্রের নাম রাখা হইয়াছে "শালিবাহন"। এই সংবাদে বিক্রমাদিত্যের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, ক্রমে ক্রমে সেই সন্দেহ ভয়ে পরিণত হইল। শালিবাহন কেবল কৈশোর অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময়ে একদিন বিক্রমাদিত্য খড়্গহস্তে প্রতিষ্ঠান নগরে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর, যেই সেই বালক শালিবাহনের মস্তকে খড়্গ নিক্ষেপ করিলেন, অমনি খড়্গ হস্তচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে পতিত হইল। শালিবাহনও নিরস্ত না থাকিয়া সবলে বিক্রমাদিত্যের মস্তকে যষ্টির আঘাত করিলেন। বিক্রমাদিত্য উহার বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইলেন।

উজ্জয়িনীতে হাহাকার উত্থিত হইল। বিক্রমাদিত্যের অনেক পত্নী ছিলেন, তাঁহারা সকলেই অগ্নিপ্রবেশের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "রাজা অপুত্রক, রাজ্যাধিকারী কে হইবে? অতএব দেখ রাণীদের মধ্যে কেহ যদি অন্তঃসত্ত্বা থাকেন"। তাহার পর, অনুসন্ধানে জানা গেল এক রাণী গর্ভবতী আছেন। মন্ত্রিবর্গ তাঁহার গর্ভাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে, আকাশ হইতে এইরূপ দৈববাণী শ্রুত হইল, "এ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজ্য করিতে পারেন

নিক্ষিপ্ত হউক”। মন্ত্রীরা তাহাই করিলেন। কোন সন্তঃকৃষ্ট পবিত্র ক্ষেত্রে সেই সিংহাসন নিক্ষিপ্ত করিয়া আসিলেন। তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়া গেলে ভোজরাজ মালবরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ধারানগরীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। একদিন তিনি সৈন্যসামন্তসহ মৃগয়া করিতে করিতে বনের নিকটস্থ এক শস্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ক্ষেত্রে প্রচুর চণক হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রের উচ্চভূমিস্থিত মঞ্চে বসিয়া পাখী উড়াইতেছেন। মঞ্চস্থিত ব্রাহ্মণ রাজাকে দেখিবামাত্র দূর হইতে আদর সহকারে লিতে লাগিলেন “রাজন্! আসুন, এখানে উপবেশন করুন, অদ্য আপনি আমার অতিথি, আপনাকে বড় ক্ষুধার্ত্ত দেখা যাইতেছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক চণকফল ভক্ষণে ক্ষুধানিবৃত্ত করুন।” রাজা ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট হইয়া চণকভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ পাখী তাড়াইয়া যেই নীচে নামিলেন অমনি তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন “রাজন্ এ কি করিতেছেন, কেন এই গরীব ব্রাহ্মণের শস্য নষ্ট করিতেছেন? অন্যে অপরাধ করিলে আপনি তাহার শাসন করিবেন, আপনি যদি স্বয়ং অপরাধ করেন, তাহা হইলে কাহার নিকট অভিযোগ করিব? রাজা উহা শুনিয়া লজ্জিত ও ফলভক্ষণে বিরত হইলেন। আবার যেই ব্রাহ্মণ পাখী তাড়াইবার জন্য মঞ্চে উঠিলেন, অমনি তাঁহার সুমতি উপস্থিত হইল। তিনি রাজাকে পুনরায় আদর সহকারে ফলভক্ষণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজা যেই ফল ভক্ষণ করিবেন, ব্রাহ্মণ তখন নীচে নামিয়াছিলেন, অমনি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি চারিবার এইরূপ করাতে রাজার হইল “এই ব্রাহ্মণ যখন মঞ্চে অবস্থান করেন, তখন ইঁহার

স্বাভাবিক বুদ্ধি উপস্থিত হয়। অতএব আমি এই মঞ্চে আরোহণ করিয়া দেখিব।" তাহার পর, তিনি কৌতুহলপ্রযুক্ত সেই মঞ্চে উঠিলেন, অমনি তাঁহার মন বিশ্বপ্রেমে আর্দ্র হইল; রাজা ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে জগতের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করা যায়, কিসে লোকের সর্ব্ববিধ অভাব নিরাকরণ করা যায়, কিসে জগতের লোককে সুখী ও সন্তুষ্ট করা যায়? এমন কি, তখন তাঁহার মনে হইল, কেহ যদি সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দেহ প্রার্থনা করে, তাহাও তিনি দিতে কুণ্ঠিত নহেন। তাহার পর, রাজা ভোজমঞ্চ হইতে নামিয়া ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এই ক্ষেত্রের কোন মাহাত্ম্য আছে, নতুবা মঞ্চে আরোহণ করিলে আমার অন্তঃকরণ ঐ রূপ উদারভাবসম্পন্ন হইবে কেন? অনন্তর রাজা বহুধন দান করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঐ ক্ষেত্র ক্রয় করিয়া লইলেন। তাহার পর, খনকদ্বারা নিম্নভাগ খুঁড়িলে এক দিব্য সিংহাসন বাহির হইল। রাজা ঐ সিংহাসন রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন কিন্তু উহা এতই ভারবোধ হইল যে, কেহ উহা নড়াইতে পারিল না। তাহার পর ব্রাহ্মণগণের উপদেশে ঐ ক্ষেত্রে বেদী নির্ম্মাণ করাইয়া সেই দিব্য সিংহাসনের উদ্দেশে পূজা ও হোম করিলেন। অর্চ্চনা শেষ হইয়া গেলে সিংহাসন একান্ত লঘু বলিয়া বোধ হইল। রাজা সিংহাসন রাজধানীতে আনয়ন করিয়া আস্থান-মণ্ডপে স্থাপন করিলেন। তাহার পর, শুভদিন দেখিয়া সেই সিংহাসনের সোপানস্থিত প্রথম পুত্তলিকার মস্তকে পা দিয়া উঠিতে যাইবেন, অমনি পুত্তলিকা মনুষ্যোচিত ভাষায় বলিতে লাগিল, 'রাজন্, এই সিংহাসন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের, তিনি অদ্ভুত শক্তিশালী ছিলেন, যদি আপনি তাঁহার ন্যায় গুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন। নতুবা করিবেন না। রাজা ভোজ বলিলেন, "মহারাজ বিক্রমাদিত্য কি-

গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহা বর্ণন কর, তখন পুত্তলিকা গল্পচ্ছলে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণন করিতে লাগিল এবং গল্প শেষ হইলেই দিব্যরথে আকাশে চলিয়া গেল। পুনরায় ভোজরাজ যেই দ্বিতীয় পুত্তলিকার মস্তকে পদস্থাপন করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতে গেলেন অমনি সেও পূর্ব্বোক্তরূপ গল্পচ্ছলে বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণন করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। এইরূপে বত্রিশটি পুত্তলিকা বত্রিশটি গল্পে বিক্রমাদিত্যের গুণবর্ণন করিয়া তিরোহিত হইলে রাজা ভোজ সেই সিংহাসনে আরোহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ঐ দিব্য সিংহাসনে অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

"বুশিদো"।

২

জাপানী নীতি।

বুশিদো অর্থাৎ জাপানী ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে যে নৈতিক গুণ প্রসূত হইয়াছে এবং "বুশিদো"-র গ্রন্থকার jnazo Nitobe উহাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১। প্রথম—ঋজুতা। ছলনা, প্রতারণা, সর্ব্বপ্রকার কুটী· ব্যবহার এই সমস্ত, সামরাইদিগের নিকট যেমন ঘৃণিত এমন আ কিছুই নহে। তবে, সামরাইগণ ঋজুতার যেরূপ অর্থ করেন, আম· হয়ত ঠিক্ সেই অর্থে শব্দটী ব্যবহার করি না। একজন প্রখ্যা সামরাই অথবা "বুশি," ঋজুতাকে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বলিয়া নির্দ্দে করিয়াছেন ;—"বিবেক-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অবিচলিতভাবে কো· কার্য্য অনুসরণ করাকেই ঋজুতা বলে ;—যখন মরণ উচিত মনে হইবে তখন মরা, যখন আঘাত করা উচিত মনে হইবে তখন আঘাত করা" আর একজন ব্যাখ্যা করেন :—ঋজুতাই সেই অস্থি যাহা দেহকে দৃ ও সিধা করিয়া রাখে। অস্থি ব্যতীত, মস্তক যেমন পৃষ্ঠদণ্ডের উপ খাড়া থাকিতে পারে না, হস্ত যেমন নড়িতে পারে না, পদ যেম দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ ঋজুতা ব্যতীত, শুধু গুণে কিংবা বিদ্য সামরাই হওয়া যায় না। যদি শুধু ঋজুতা থাকে, তাহা হইলে অ কোন গুণ না থাকিলেও কিছুই যায়-আসে না।" এমন কি—সাম· তন্ত্রের শেষভাগে যখন জাপান দীর্ঘকাল শান্তি সম্ভোগ করে, এবং ে অবসর-কালে যখন নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ ও ললিত কল

আশ্রয়।

সন্ধ্যা আসিছে মন্দ চরণে
দিগ্‌দিগন্ত ঘিরে,—
এখনো ভ্রান্ত কে আছিস্‌ বসি
শূন্য নদীর তীরে!
এখনি ঘনায়ে আসিবে আঁধার,
আশ্রয় কোথা মিলিবেনা আর,
চিরস্নেহময়ী জননীর কাছে
আয়, ঘরে আয় ফিরে।

সন্ধ্যা আসিছে মন্দ চরণে
দিগ্‌দিগন্ত ঘিরে।
চেয়ে আছে মাতা কুটীর দুয়ারে
জ্বালিয়া প্রদীপ খানি,
আরতি শঙ্খে ওই শোন তাঁ'র
শুভ আহ্বান বাণী।
মা আমার শত অপরাধ ভুলি'
সন্তান বলে' কোলে লয়ে তুলি'
সান্ত্বনা করি' অঞ্চল কোণে
অশ্রু মুছাবে ধীরে।
এখনো ভ্রান্ত কে কাঁদিস্‌ বসি
নির্জ্জন নদী তীরে!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

নুশীলন জাপানে প্রবর্ত্তিত হয়, তখনও, "গিশি" (খাঁটি লোক) এই াখ্যাটি—বিদ্যা ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য নামগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। জাপানের যে "৪৭ জন সত্যনিষ্ঠ পুরুষ" তত্রত্য লোকশিক্ষার প্রধান উপকরণ—তাহাদিগকে জাপানীরা চলিত ভাষায় "গিশি" বলে।

যে যুগে, ধূর্ত্তামি, নীচ ফন্দি, মিথ্যা কথন—সামরিক কৌশল নামে লিত, সেই সময়ে এই পুরুষোচিত গুণটি উজ্জ্বলতম মণির ন্যায় লাকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত—সকলেই এই দুর্লভ গুণের যারপরাই প্রশংসা করিত। ঋজুতার বুৎপত্তিসম্বন্ধে "বুশিদোর" গ্রন্থকার াহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই :—"গিরি" অর্থাৎ ঋজুতা,—স্বকীয় ূল-অর্থ হইতে অল্প অল্প ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বিকৃত অর্থে পরিণত ইয়াছে। "গিরি"র মূল অর্থ—যথার্থ জ্ঞান ; কিন্তু কাল-সহকারে, াহাতে সামাজিক কর্ত্তব্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে ; যে কর্ত্তব্যগুলি লাক-মত ও লোকাচারের দ্বারা অনুশাসিত সেইসব কর্ত্তব্যকেই াপানীরা এখন "গিরি" বলে।

গোড়ায় উহার অর্থ ছিল—বিবেকানুমোদিত বিশুদ্ধ কর্ত্তব্য। যেমন পিতামাতার প্রতি "গিরি", জ্যেষ্ঠদিগের প্রতি "গিরি", কনিষ্ঠদিগের প্রতি "গিরি" ইত্যাদি। কেননা, "যথার্থ জ্ঞান",—অর্থাৎ বিবেক-ুদ্ধি, আমাদিগকে যাহা করিতে বলে তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। ভাবতঃ কর্ত্তব্যগুলি ভালবাসা হইতে প্রসূত হয় ; কিন্তু যেখানে ালবাসা কোন কারণে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেইস্থলে কর্ত্তব্য আসিয়া, কঠোর গুরুমহাশয়ের ন্যায় শাসন করিয়া কাজ আদায় করে। বুশিদোর গ্রন্থকার বলেন, এই যে কর্ত্তব্যজ্ঞান—ইহা কৃত্রিম সামাজিক বস্থার ফল—সভ্যতার ফল। এই কৃত্রিম সমাজনীতির অনুশাসনে, মরাইদিগের বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞান বিকৃত হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম

দেশাচারে পরিণত হইয়াছে। যেমন, প্রথম-জাত সন্তানকে বাঁচাই জন্য, অন্য সন্তানগুলিকে নষ্ট করিতে হইবে—ইহা একটি কর্ত্তব্যের ম পরিগণিত। এই সকল কর্ত্তব্য, দেশাচারের অনুরোধে, লোক-ভ অনুষ্ঠিত হইত। পক্ষান্তরে, ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহসের প্রকৃত ভাব সামরাই অন্তরে আছে বলিয়াই এখনও "গিরি" হইতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হ নাই; নতুবা, এই "গিরি" কেবল বাগ্‌জাল, জল্প, কপটতা ও ভীরুতা আশ্রয় হইয়া থাকিত।

২। দ্বিতীয়—ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহসিকতা। কর্ত্তব্যের উদ্দেশে, ন্যা উদ্দেশে, ধর্ম্মের উদ্দেশে যে সাহস প্রদর্শিত হয়, সেই সাহসই সদ্‌গুে মধ্যে ধর্ত্তব্য। কংফুচু, তাঁহার ন্যায়-প্রকরণ-গ্রন্থে, স্বকীয় অভ্যস্ত রী অনুসারে অভাবের দিক্ দিয়াই, সাহসিকতার ব্যাখ্যা করিয়াছে তিনি বলেন;—"যাহা কর্ত্তব্য তাহা জানিয়াও যদি না করা যায়, তা হইলে, তাহাতে সাহসের অভাব প্রকাশ পায়"। বুশিদোর গ্রন্থক বলেন,—ভাবপক্ষে এই তত্ত্বটি ব্যক্ত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়;—"উ কাজ করাকেই সাহস বলে"। সকল প্রকার বিপদকে আলিঙ্গ করা, মৃত্যুমুখে অগ্রসর হওয়া,—সাধারণতঃ ইহাই সাহস-না পরিচিত। এইরূপ সাহসকেই, সৈনিকেরা প্রশংসা করে; বি জাপানীদের ক্ষাত্রধর্ম্মে এইরূপ সাহসের প্রশংসা নাই। অযে কার্য্যের উদ্দেশে যে মৃত্যু—সে মৃত্যু "কুক্কুরের মৃত্যু"। মি বলেন:—"রণক্ষেত্রে, যুদ্ধের উন্মত্ত সংঘর্ষের মধ্যে, যে-সে লো অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে। কিন্তু যখন বাঁচিয়া থাকা উচিত ত বাঁচিয়া থাকা, যখন মরা উচিত তখন মরিতে পারা—ইহাই প্র সাহসের কাজ।" পাশ্চাত্যদিগের ন্যায়, জাপানীরা নৈতিক সাহস দৈহিক সাহসের পার্থক্য বহুকাল হইতে অবগত আছে।

ধৈর্য্য, বীর্য্য, সাহস, নির্ভীকতা—এই যে সব গুণ,—ইহা

পানী বালকদিগের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। মাতৃক্রোড়
ড়িবার পূর্ব্বেই, শিশুদিগের নিকট বীরত্বের কথা অবৃত্তি করা
ইয়া থাকে। যদি কোন বালক কোন শারীরিক ব্যথায় কাতর
ইয়া কাঁদিয়া উঠে, তাহা হইলে তাহার মাতা তাহাকে এইরূপ
৫র্সনা করেন ঃ—"এই সামান্য ব্যথায় আবার কান্না?—কি ভীরুতা!
দ্ধে যখন একটা হাত কাটা যাবে, কিংবা যখন "হারাকিরি"
র‍্তে হবে, তখন কি হবে বাছা?" সেন্দাই প্রদেশের, অনাহার-ক্লিষ্ট
ভুক্ষু বালক-রাজকুমারের কথা জাপানীদের মধ্যে খুব প্রচলিত।
সই উপাখ্যান-মূলক কোন নাটকে, রাজকুমার তাঁহার ভৃত্যকে এইরূপ
লিতেছেন ঃ—"এই যে নীড়ের মধ্যে ছোট ছোট চড়াই-শাবক
খিতেছ, দেখ উহারা হল্‌দে ঠোঁটগুলি খুলিয়া কেমন হাঁ করিতেছে;
াবার দেখ, উহাদের মা আসিয়া এখন উহাদিগকে দানা খাওয়াইতেছে।
াবকগুলি কেমন আগ্রহের সহিত—কেমন সুখে আহার করিতেছে!
কন্তু, কোন সামরাইর উদর যদি খালি থাকে, তাহা হইলে ক্ষুধিত
ওয়াও তাহার পক্ষে লজ্জার কথা।" শিশু-চিত্তহারী জাপানী উপ-
থার মধ্যে, এইরূপ ধৈর্য্য বীর্য্যের উদাহরণস্বরূপ অনেক গল্প দেখিতে
াওয়া যায়। কিন্তু উহাদিগকে সাহসী ও নির্ভীক করিবার ইহাই
একমাত্র উপায় নহে। পিতামাতারা, অতীব কঠোরভাবে—এমন
ক নিষ্ঠুরভাবে—বালকদিগকে এমন সব কাজ করিতে বলেন যাহাতে
বশেষ সাহস আবশ্যক। সামরাইরা দৃষ্টান্তচ্ছলে বলেন ঃ—"দেখ,
ল্লুকেরা শাবকদিগকে পর্ব্বতের উপর হইতে গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া
য়," সামরাইসমাজে, পিতামাতারা শিশুদিগকে কখন কখন উপবাসী
রিয়া রাখেন, কখন বা ঠাণ্ডা জায়গায় ফেলিয়া রাখেন; উদ্দেশ্য—
হাতে উহারা ধৈর্য্য ও কঠোরতায় দীক্ষিত হয়। কখন কখন, একটা
বাদ দিয়া আসিবার জন্য বালকদিগকে এমন সব লোকের মধ্যে

পাঠান হয় যাহারা একেবারেই অপরিচিত। শিশুদিগকে সূর্যোদে পূর্ব্বেই শয্যা পরিত্যাগ করিতে হয়; প্রাতরাশের পূর্ব্বেই, পাঠ অভ্য করিতে হয়; খুব শীতের সময়ে, খালি-পায়ে হাঁটিয়া গুরু-গৃ যাইতে হয়। প্রতি মাসে একবার কিংবা দুইবার উহারা দলে-দ আসিয়া একত্র হয়, এবং সারা রাত জাগিয়া, প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্র উহাদের নিজ নিজ পাঠ উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করে; সর্ব্বপ্রকার ভীষ স্থানে,—বধ্যভূমিতে, শ্মশানে, "ভুতুড়ে" জায়গায় যাওয়া,—বালকদিগে একটা খেলার মধ্যে পরিগণিত। যে সময়ে, বধ্যদিগের প্রকাশ্যস্থ মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল, তখন সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিবার জন্য, ছো ছোট ছেলেদের সেইখানে পাঠান হইত; শুধু তাহা নহে, অন্ধক রাত্রে সেই স্থানে গিয়া, দেহ-চ্ছিন্ন মুণ্ডটির উপর, তাহাদিগকে এক চিহ্ন দিয়া আসিতে হইত। এই বিষয়ে জাপানীরা, কঠোরতার শিক্ষ প্রাচীন গ্রীশের স্পার্টানদিগকেও হারাইয়াছে। কেহ কেহ ম করিতে পারেন,—এই শিক্ষার ফলে, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি অঙ্কুরেই বিদলিত করা হয়। কিন্তু "বুশিদো"র অন্যান্য নীতিউপদেশে প্রভাবে, ইহার কুফল কতকটা নিবারিত হয়। সেই নীতিউপদেশগু কি—তাহা বারান্তরে বিবৃত করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনন্ত জীবন।

অতি প্রাথমিক জীবগণের (Protozon) দেহ এক একটী জীব-কোষে গঠিত হইয়াছে। ঐ জীব-কোষ জীব-বস্তুতে (Protoplasm) পূর্ণ থাকে। কোষের ভিন্ন ভিন্ন অংশস্থিত জীব-বস্তু প্রায় একই প্রকার, কারণ উহার জীবনব্যাপার জটিল নহে। তবে কোন কোন স্থানের জীব-বস্তু অপর স্থানের জীব-বস্তু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক ভাবাপন্ন। এইরূপ একটী কোষের দ্বারা যে জীব-দেহ গঠিত তাহাকে এক-কোষিক* জীব বলে। আর এইরূপ একাধিক জীবকোষে যে জীবদেহ গঠিত হয় তাহাকে বহু কোষিক† জীব কহে। বহুকোষিক জীবগণের দেহের প্রত্যেক কোষ এক-কোষিক জীবের অনুরূপ। কিন্তু উহাদিগের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কোষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। কারণ উহাদিগের জীবনব্যাপার জটিল, এবং দেহের পৃথক পৃথক প্রদেশ পৃথক পৃথক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে।‡ এক-কোষিক জীব বহু-কোষিক জীবে উন্নত হইতে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অতি নিম্নশ্রেণীস্থ এক-কোষিক জীব হইতে ক্রমে বহু-কোষিক মানবদেহ পর্য্যন্ত গঠিত

---

* Unicellular.

† Multi-Cellular.

‡ Amœba and Varticella are unicellular, each being made of one cell or morphological unit. These animals therefore possess diverse parts in virtue of the specialization, or differentiation, of the protoplasm of single cells. Hydra, on the other hand, is multicellular, being made up of very numerous cells, each of which is morphologically equivalent to an Amœba. These cells, are modified in various ways, just as part of a single cell may be modified, for the performance of diverse functions.—Davis Tent, Book of Biology, pp 139-40.

হইয়াছে। কিন্তু এত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও কোষস্থ জীব-বস্তুর এক ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অংশ যেন নির্লিপ্ত ভাবে বসিয়া থাকে, সে কোন পরিবর্ত্তনেই যোগ দেয় না। সেই অংশ একাবস্থই থাকিয়া যায়। এই কোষ অথবা কোষাংশই বংশরক্ষক-কোষ (Reproductive cell)।* পরিবর্ত্তনসময়ে মূলকোষ ইহাকে পৃথকরূপে একদিকে সরাইয়া রাখিয়া দেয়। বহু-কৌষিক জীবগণের দেহস্থ প্রত্যেক জীব-কোষ হইতে জীব-বস্তুর সূক্ষ্মাংশ ক্ষরিত হইয়া† একস্থানে সঞ্চিত হয়; এবং তথা হইতে যথাকালে উপযুক্ত ক্ষেত্রে পতিত হইয়া অপত্যরূপে বর্দ্ধিত হয়। উভয় স্থলেই বংশরক্ষক-কোষ নির্লিপ্ত ও অপরিবর্ত্তিত। জীব-দেহ, কালে কতই পরিবর্ত্তিত হইল কিন্তু বংশরক্ষক কোষ এক ভাবেই (Unicellular) রহিয়া গেল। বহুদেহ বহুভাবে উৎপন্ন হইল, ও চলিয়া গেল, কিন্তু বংশরক্ষক কোষকে যুগযুগান্তর হইতে মূলতঃ এক ভাবেই রাখিয়া গেল। এই জন্যই দেহকে অকিঞ্চিৎকর ও পরিবর্ত্তনশীল বলে, আর বংশরক্ষক-কোষের বাহনমাত্র বিবেচনা করা যায়। এই বংশরক্ষক-কোষ পিতৃদেহ হইতে সিঞ্চিত হইয়া পুত্ররূপে, এবং পুত্রদেহ হইতে পৌত্ররূপে, এইরূপ বংশানুক্রমে জীব-প্রবাহ স্থির রাখিতেছে। এক দেহ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে একাংশ দ্বারা অপর দেহ গঠিত করিয়া যাইতেছে। এ ধারা অনন্ত।

---

* At an early stage * * * reproductive cells are set apart. These remain simple and undifferentiated, preserving the structural and functional traditions of the original germ-cell. These cells and the results of their division are but little implicated in the differentiation which makes the multi-cellular organism what it is. Geddest Thomson, The Evolution of Sex, pp. 261-2.

† এই গ্রন্থকার অন্যত্র বলিয়াছেন। Admidst all these differentiations they bear a charmed life.

ণ প্রাথমিক জীব হইতে বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য প্রথমজ (Protozon) শ্রেণীস্থ জীবগণের দেহস্থ কোষ বিভক্ত তন জীবে-দেহ গঠিত করে। একটী কোষ দ্বিধা বিভক্ত ঐ বিভক্ত অংশদ্বয়ের প্রত্যেকটী আবার বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণাবয়ব হইল। উহার প্রত্যেকটী আবার বিভক্ত হইল; এবং ঐ ত্যেক বিভক্তাংশ পুনরায় পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইল।* সুতরাং কোনটীই রল না। উহার দেহ যথা সময়ে বিভক্ত হইয়া অন্য জীব-দেহ গঠিত বেল,† এইমাত্র। উহা কেবল বংশরক্ষক কোষ; উহার প্রত্যেক শই বংশ রক্ষা করে। ঐ কোষ বিভক্ত হইবার পর আয়তন যে মাণ ক্ষুদ্র হয়, তাহা অচিরেই পূরণ হইয়া যায়। এমন স্থলে মৃত্যু থায়? কোন অংশই মরিল না। প্রত্যেকেই স্ব স্ব জীবন পার সম্পন্ন করিতেছে। মৃত্যু তখনও জীবরাজ্যে প্রবেশ লাভ তে পারে নাই। অর্থাৎ ঐ সমস্ত প্রাথমিক জীবের স্বাভাবিক নাই। তবে কেহ টিপিয়া মারিলে, কিম্বা অন্য কোন অস্বাভাবিক ণে অবশ্যই তাহাদিগের মৃত্যু হয়। মৃত্যু তাহাদিগের অবশ্যম্ভাবী গাম নহে, আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। জীবনে ও মরণে তখনও ষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই। এক কৌষিক জীবগণের দেহ কেবল একটী রক্ষক কোষ মাত্র। উহার প্রত্যেক অংশই বংশরক্ষা করে। ন্ন পৃথক দেহ নাই সুতরাং মরিবে কি? ক্রমে জীবদেহ যখন ও উন্নত হইয়া উঠিল, তখন বংশবৃদ্ধির প্রণালী কিছু পরিবর্ত্তিত

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ। বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি॥
দি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্—৪।১।

"The bodies of the higher animals which die may from this of view be regarded as something temporary and non-tial, destined merely to carry for a time and nourish the * * llular eggs"—[the egg cells and spremcells.] Ray Sankarta.

হইল। তখন জীবকোষ আর বিভক্ত হয় না; উহার কো
স্ফীত হয় এবং সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়া পৃথক জীবদেহে
হয়। মূল জীবকোষ যেমন তেমনই থাকে। এই সময় মৃত্যু জ
কিঞ্চিৎ ক্ষমতা বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে কোষ
পরিত্যক্ত হইয়া নূতন জীবদেহ গঠিত করে তাহা পুনঃপুনঃ
করিতে করিতে ক্রমে দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া যায়।* এ
অবস্থাকে মৃত্যু না বলিলেও মুমূর্ষু অবস্থা বলা যাইতে পারে
ঐ জীবন-মৃত অবস্থাতেই উহারা দীর্ঘকাল থাকিতে পারে। অবশে
উচ্চশ্রেণীস্থ প্রাণীগণের উপর, মৃত্যু একাধিপত্য স্থাপন করিয়া
ইহাদিগের দেহস্থ ক্ষুদ্র কোষ পরিত্যক্ত হইয়া অপর জাতীয় কো
সহিত মিশ্রিত হইয়া অপত্যরূপে পরিণত হয়। কিন্তু বংশরক্ষাকা
এতাদৃশ বলক্ষয় হয় যে, সেই সুযোগ পাইয়া মৃত্যু আসিয়া প্রবেশ ক
করে। ইহাদিগের দেহ পৃথক, বংশরক্ষক-কোষ পৃথক। সুত
দেহ মরে; মৃত্যু দেহকেই আশ্রয় করে। বংশরক্ষক-কোষ ত
জীবরাজ্যে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ শ্রে
বংশরক্ষককার্য্যে এত অধিক শক্তি ব্যয়িত হয় যে উহারা অনে
ঐ কার্য্য অন্তেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বংশরক্ষা করিয়া উহারা
জীবিত থাকিতে পারে না। উহাদিগের পুংজাতীয়গণের এই অ
বিশেষ বিবেচ্য। আর স্ত্রীজাতীয়গণের অবস্থা বিবেচনা ক
কর্কট শ্রেণীর কথা সহজেই মনে উদয় হয়। কর্কট স্বীয় দে
রসাদি দ্বারা অপত্য পোষণ করিতে নিজে এতই শক্তিহীনা হইয়া
যে, আর জীবিত থাকিতে পারে না। বংশবৃদ্ধি কার্য্যে পিত

---

* আধুনিক কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলেন যে প্রাথমিক জীবেরও পুন
কোষবিভাগবশতঃ শক্তিহীনতা উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কালক্রমে উহা আর
হয় না। কিন্তু এমত এখনও গৃহীত হয় নাই।

.ত্য পোষণকার্য্যে মাতার অত্যন্ত শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়। মৃত্যুও ই অবসরে জীবরাজে সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করে। নতুবা পারিত কনা সন্দেহ। যতদিন ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কোষ বহুবি ভক্ত হইয়া ীবরাজ্যে বংশবৃদ্ধি করিত, ততদিন মৃত্যু (স্বাভাবিক মৃত্যু) প্রবেশ করিতে পারে নাই। শেষে জীবগণ এক-কোষিক অবস্থা হইতে দমে উন্নত হইয়া বহু-কোষিক হইলে এবং উহাদিগের আবশ্যকীয় ক্রিয়াসকল দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশগত হইলে, দেহের শক্তি সামঞ্জস্য ক্ষা হয় নাই। একের শ্রমাধিক্যের ক্লান্তি অন্য কোষকে আক্রমণ .রিয়াছে; একের শক্তিহীনতা অন্যকে অভিভূত করিয়াছে। াহাতেই কালক্রমে বার্দ্ধক্য, জরা ও মৃত্যু জীবরাজ্যের সহচর হইয়া ঠিয়াছে। বহুকোষিক জীবের দেহ মরে,* কিন্তু এক-কোষিক ীবের পৃথক দেহ না থাকায় উহার মৃত্যু নাই। যাহা হউক, বহু- কোষিক জীবের দেহকেও মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় াই। যে দেহকে মারিল তাহাকে সম্পূর্ণ মারিতে পারিল কৈ? সে রিবার পূর্ব্বেই একাংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অপত্যরূপে রাখিয়া গেল। ুতরাং জীবপ্রবাহ এবং দেহপ্রবাহ অক্ষুণ্ণই রহিয়া গেল। মৃত্যু াস্তবিক জীবদেহকে কিছুই করিতে পারিল না। আর, আত্মা? া ত পিতৃরূপে গিয়া পুত্ররূপে আগত হইল মাত্র। কেবল এক দেহ ্যাগ করিয়া অন্যদেহ অবলম্বন করিল মাত্র। সুতরাং এ প্রবাহ নেন্ত। মৃত্যুর এস্থলে কোনই আধিপত্য নাই।

শ্রীশশধর রায়।

* If death do not naturally occur in the Protozon, it is evident ıat it cannot be an inherent characteristic of living matter. et it is universal among the multicellular animals. Death, we ay thus say, is the price paid for a body. * * * By a body meant a complex Colony of Cells, in which there is more or ss division of labour, where the component units are no longer, ce the protozon, in possession of all their faculties; but through vision of labour have only restricted functions and limited wers of self-recuperation.—Geddes and Thomson, The evolu- n of Sex, p. 260.

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

রাজসাহী জেলায় মান্দা থানার এলাকায় কুসম্বিগ্রামে একটি মস্‌জিদ আছে। ইহার আকার প্রায় বাঘার মস্‌জিদের অনুরূপ কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট এবং ইষ্টকের পরিবর্ত্তে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। কুসম্বি মস্‌জিদের ছয়টী চূড়া এব

কুসম্বি-মস্‌জিদ।

অভ্যন্তরভাগের ঠিক মধ্যস্থলে দুইটী থাম আছে ইহার খিলান বাঘা-মস্‌জিদের ন্যায়; লম্বা ভাবে নয়টী এবং তো ভাবে অটটী খিলান আছে। মস্‌জিদের প্রত্যেক কোণে দুইটী করিং ছোট জানালা এবং পূর্ব্বদিকে তিনটী দ্বার বর্ত্তমান আছে। পশ্চিম দিকে মোলমাদিগের উপাসনার নিমিত্ত ঘন সবুজবর্ণের প্রস্তরনির্ম্মি কারুকার্য্যময় দুইটী সুন্দর বক্রাকৃতি বেদী বর্ত্তমান। মস্‌জিদটী প্র ৪০ হস্ত লম্বা, ৩০ হস্ত প্রস্থ এবং দেওয়াল প্রায় পৌনে পাঁচ হা গভীর। মস্‌জিদের বহির্ভাগে স্থপতিকার্য্যকুশলতার কোন নিদর্শ নাই। মধ্যম প্রবেশদ্বারে এই লিপিটী খোদিত আছে,—"মহাপুরু বলিয়াছিলেন,—'যে ব্যক্তি ভগবানের অর্চ্চনার নিমিত্ত পৃথিবী স্থান করিয়া দেন, তিনি শেষের সেই বিচারের দিনে ভগবান কর্ত্তৃ পরিতুষ্ট হন',—ভগবান তাঁহার মস্তকে আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করু এই মস্‌জিদের প্রতিষ্ঠাতা একজন ক্ষমতাশালী এবং সদাশয় সম্রা তিনি সাংসারিক ও পারলৌকিক কার্য্যে জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহ নাম আবুল মোজাফ্‌ফার বাহাদুর, পিতার নাম সোলতান মহম্মদ গাজী পরমেশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার দেশ ও সম্রাজ্য নিরাপদে রাখু তিনি গৌরবদৃপ্ত প্রভাবশালী সম্রাট ও প্রভূত সেনানীর অধী ছিলেন। ৯০৩ হিজরীতে সোলেমনরাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।"

মস্‌জিদের ভিতরে পশ্চিমপার্শ্বে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বেদীর উত্ত

যে আরোহণোপযোগী সিঁড়িসমন্বিত একটী মঞ্চ এবং তথা হইতে ত্তর-পশ্চিম কোণে একটী প্রস্তরময় দরগহ' (Dorgāh) আছে। স্তম্ভগুলি প্রকাণ্ড; ছাদের উপর গুরুভার জঙ্গল ও আবর্জ্জনা পুঞ্জীভূত ইয়া সমগ্র মস্‌জিদটিকে ধরণীবক্ষে পাতিত করিবার জন্য ভ্রূকুটী দর্শন করিতেছে। রাজসাহী জেলার এই মস্‌জিদটি অতীব প্রাচীন সুন্দর। মস্‌জিদের সংলগ্ন প্রায় ৭০ বিঘাব্যাপী বৃহৎ একটী ষ্করিণী স্বচ্ছসলিল বুকে করিয়া টল্‌টল্‌ করিতেছে। মস্‌জিদ ও ষ্করিণীটী পুনঃসংস্কার হইলে ইহা একটী বেশ দর্শনীয় স্থান হয়। নিতে পাই, উহার কর্ত্তৃত্বভার নাকি একজন হিন্দু মোক্তারের স্তে ন্যস্ত হইয়াছে। মোক্তার মহাশয় এদিকে যে দৃষ্টিপাত করেন া, তাহা মস্‌জিদ ও পুষ্করিণীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াই বুঝা যায়।

মস্‌জিদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জনশ্রুতি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে;— ালিসফা (রাজসাহীর একটী পরগণা) নিবাসী চিলমন (Chilman) জুমদার নামক এক জমাদার নিরূপিত সময়ে খাজনা দিতে না পারায় বাব কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। আশ্বিন মাস,—বঙ্গদেশ ারদীয়া উৎসবে উন্মত্ত। এই আনন্দের সময়ে একদা রজনীতে জুমদার, কারাগৃহে বসিয়া মনের আবেগে অতি করুণ-স্বরে গান াহিতেছেন, তাঁহার সেই সঙ্গীতের সুমোহন স্বর-লহরী অনন্ত আকাশ-থে বায়ুতাড়িত হইয়া নবাবের এক বেগমের কর্ণে প্রবেশ করিয়া াহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। পরদিবস প্রত্যূষে নবাব, বেগমের মুখে ই সঙ্গীতের বিষয় অবগত হইয়া, বন্দীকে সম্মুখে হাজির করিতে ারাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন। অধ্যক্ষ, মজুমদারকে নবাবসকাশে পস্থিত করিলে নবাব বলিলেন,—তুমি মোসলমানধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বেগমকে গানে বিমুগ্ধা করিয়াছ, সেই বেগমকে বিবাহ কর। ুমদার প্রথমে এ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইয়া ঘোরতর প্রতিবাদ

করিলে, নবাব তাঁহার বধের আজ্ঞা প্রচার করেন। অবশেষে মজু
জীবনরক্ষার অভিপ্রায়ে নবাবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এ
মোসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সোলেমন খাঁ নামধারণপূর্ব্বক বেগমে
বিবাহ করেন। তৎপরে বেগম সম্রাটকে জ্ঞাপন করিলেন (
তাহাদের স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের কিছুই নাই। ইহাতে সম্র
তাহাদিগকে কালিগাঁ পরগণা লাখেরাজস্বরূপ প্রদান করিয়া সন
দিলেন এবং একপ্রহরের মধ্যে তাঁহারা যত টাকা লইতে পারেন তা
রাজ-কোষ হইতে লইতে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে বেগম
তাহার নব-স্বামী কোষাগারে প্রবেশ করিয়া নিরূপিত সময়ের মধ্যে
পরিমাণ অর্থ লইতে সক্ষম হইলেন তাহা সংগ্রহ করিলেন। তৎপে
তাহারা কুসম্বী গ্রামে উপনীত হইয়া পুরাতন বাস্তুভিটার নিক
একটী সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণ
হইয়াছে এবং নিবিড় জঙ্গলে পরিবেষ্টিত হইয়া মনুষ্যের অগম্য স্থ
হইয়া আছে। পরে তাঁহারা যে একটী ক্ষুদ্র মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে
তাহাও পূর্ব্বোক্ত-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশেষে এই আলোচ্য মস্‌জিদ
নির্ম্মিত হয়। খাঁ, দুইটী পুষ্করিণী খনন করান; একটী হিন্দুশাস্ত্রানুসা
তাঁহার গুরুঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন এবং অপরটী তাঁহার বেগ
সোণাবিবির নামানুযায়ী সোণাদিঘী নামকরণ করেন। সোণাবি
একটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন, এই পুত্র বহুদিবস সুখেস্বচ্ছে
তাঁহাদের বিপুল ধনৈশ্বর্য্য ভোগ দখল করে। কিন্তু সলিমের প্রপৌত্রে
রাজ্য সময় দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ লুটতরাজ দ্বারা কালী
পরগণা অধিকার করিয়া লন। পরে এই পরগণা ইংরেজরাজে
হস্তগত হইলে কতিপয় জমীদার তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লন।

এই দিঘীর জল অতি পরিষ্কার। উহাতে কোন সেওলা
জঙ্গলাদি জন্মে নাই তদ্ধেতু এবং শীতঋতুতে জলের উত্তাপ অপেক্ষা

হওয়ায় লোকে অনুমান করে যে, উহার গহ্বরে ধাতু প্রোথিত
ছ।"

রামপুর-বোয়ালিয়ার উত্তরে নওগাঁ মহকুমারে পশ্চিমে আত্রাই
র তীরে মান্দাগ্রাম অবস্থিত। এই মান্দারের প্রায় চারিমাইল
েণ কুসম্বি গ্রামে কুসম্বি-মস্‌জিদ অবস্থিত আছে*। দুঃখের
এই পুরাতন মস্‌জিদটি অতি শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছে।
চূড়ার মধ্যে এখন মাত্র তিনটী অবশিষ্ট আছে, তাহাও
গ্ন নহে। দেওয়ালগুলি খাড়া হইয়া আছে সত্য, কিন্তু
নে স্থানে প্রস্তর খসিয়া পড়িয়াছে। খিলানের উপর রক্ষিত
কটী প্ল্যাট্‌ফরমের উপর মস্‌জিদের ভিত্তি সংস্থাপিত; নীচের এই
লানের ভিতর গমনাগমনের সরু রাস্তা ছিল। নানারূপ আগাছা
রা এই পথ অবরুদ্ধ হইলেও পথের নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।
জিদটি ভগ্নপ্রবণ হইলেও ১৮৯৭ সালের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইতে
কের তিনটী চূড়ার বিনিময়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ঐ চূড়ার
তনাঘাতে দুইটী ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। এই ভূমিকম্পের
য় ইহার নিকটে 'তাজিয়া' মিশিল সমবেত হইয়াছিল। প্রস্তরের
ড়ি বহিয়া 'মিম্‌বারে' পৌঁছছান যায়, কিন্তু তথায় যাওয়া এখন
রাপদ নহে।

মস্‌জিদের পশ্চাৎভাগে ঘনতৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে
থাই, ছোট পুকুর এবং মোসলমান-ওমরাহদিগের ইষ্টক-নির্ম্মিত
টী আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

---

* এই স্থান হইতে ৬।৭ মাইল দূরে রাজসাহীর অন্তর্গত বাগমারা থানার অধীনেও
কগুলি পুরাতন পুষ্করিণী, সমাধি ও দেবমন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ অতীতের
চয় প্রদান করিতেছে। মাদারিগঞ্জ গ্রামে দুইটী এবং নমাজ গাঁয়ে একটী প্রাচীন
জিদ আছে। তৎসমুদয়ের বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

মিঃ কারষ্টেয়ার্স গ্রামবাসীদিগের নিকট শুনিয়া মস্‌জিদের উৎ যে বিবরণ তাঁহার রিপোর্টে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস যায় কি না ? তৎকালে মুর্শিদাবাদনগরী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, নগরীর প্রাধান্যই অত্যধিক ছিল। জমীদারগণ রাজস্ব-আদায় নবাবকর্ম্মচারীর বিষ-নজরে পড়িলে নানারূপে বিড়ম্বিত হই তাহাও সত্য। ইহাতে কিছুই বিস্ময়কর ব্যাপার নাই। সোণাবিবি যদি সত্য হয়, তবে বোধ হয় সে বেগম ছিল না, খুব সম্ভবতঃ দাসী হইবে। পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতিটি বোধ হয় নিম্নলিখিত বিবরণ হ বিকৃত হইয়া থাকিবে—পূর্ব্বোক্ত জমীদারটি সুন্দর গান-বাজনা কি পারিতেন। সোণাবিবি তাহার সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া নবাবে নিকট তাহার মুক্তির নিমিত্ত এবং তাহার সহিত উদ্বাহ-সূ আবদ্ধ হইবার অনুমতি প্রার্থনা করে। সোণাবিবি মোসলমান র এবং জমীদার হিন্দুপুরুষ, কাজেই নবাব এই বিসদৃশ্য সনি অনুমোদন করেন নাই। জমীদার ধর্ম্মান্তর আশ্রয় করিলে ন তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষরূপে বিদায় করেন। প্রস্থানকালে রাজভাং হইতে বিপুল ধনরত্ন ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত ৩২৭ খ গ্রামসহ কুসম্বীমোজা জায়গীর দান করেন। বন্দী জমীদারটী নবাবের কোনো বেগমকে মুগ্ধ করিতেন তবে বোধ হয় তিনি এভ নিষ্কৃতি পাইতেন না। কোনো নবাবই বেগমের প্রার্থনাক্রমে তাহা পরপুরুষের করে অর্পণ করেন না।

নীচে যে লিপিটি উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠে জানা যায় যে, মস্‌জিদ বাঘার মসজিদ নির্ম্মাণের প্রায় ৩৫ বৎসর পর : হিজরীতে (১৫৫৮-৯ খৃষ্টাব্দে), শূর আফ্‌গান পরিবারের মহাম্মদ ঘাজীর পুত্র সোলতান গিয়াসউদ্দীন- আবুল মজাফর বাহ সাহের রাজত্বকালে সোলাইমন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াে

গিয়াসউদ্দীন বাহাদুরশাহ ৯৬২ হইতে ৯৬৮ হিজরী পর্য্যন্ত
ন। সোলাইমন মস্‌জিদ নির্ম্মাণের উপকরণসমূহ, বিধ্বস্ত
।বহার্য্য হিন্দুমন্দিরাদি হইতে সংগ্রহ করেন কিন্তু নূতন ও
হার্য্য মন্দিরগুলি রক্ষকল্পেও যত্ন করিয়াছিলেন।

রাজসাহির ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ১৯০১
।ব্দে কুসম্বাতে যাইয়া এই মস্‌জিদ দেখেন। তিনি বলেন যে,
স্‌জিদের ভিত্তি-গাত্রে যে প্রস্তর-লিপিখানি ছিল তাহা কালপ্রভাবে
নচ্যুত হইয়া মস্‌জিদের মধ্যম প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে ঝুলান ছিল।
০২ খৃষ্টাব্দে জানা যায় যে, ঐ শিলা-লিপিখানি খুদীমুন্সি নামক
গ্রামবাসী লইয়া গিয়াছে, এখন উহা ঐ মুন্সির বাড়িতেই আছে।
মৌলবী আবদুলওয়ালী বলেন যে, গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংশাবশেষ
।র নিমিত্ত এখন উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, সেই সঙ্গে এই
চীন মস্‌জিদটির সংস্কার করিয়া ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা করা
চত।

উক্ত শিলা-লিপিখানির অর্থ এইরূপ,—"ভগবান সেই মহাপুরুষের
ত শান্তিকণা বর্ষণ করুন, যিনি বলিয়াছেন,—'যে পরমেশ্বরের
।নার্থে পরমেশ্বরের অর্চ্চনার নিমিত্ত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে, সে স্বর্গে
রূপ পরমেশ্বরের নির্ম্মিত আবাসস্থান প্রাপ্ত হয়।' মহাম্মদশাহ
ীর পুত্র মহামহিমান্বিত ও সর্ব্বগুণান্বিত সোলতান গিয়াসউদ্দীন
hiyasu-d-Dunyawa-din) আবুল মোজাফর বাহাদুর শাহের
ত্ব সময়ে (ভগবান তাঁহার রাজ্য ও শাসন অক্ষুণ্ণ রাখুন এবং তাঁহার
।দাও প্রভাব বর্দ্ধিত করুন), ৯৬৩ শালে সোলাইমন কর্ত্তৃক
মিত হইল।"

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

প্রত্যাগমন।

খোল্ মা খোল্ মা দ্বার, বহুদিন পরে
আজি এ তামস-রাতে উল্কার আলোকে
পথ চিনি, পুরাতন মাতৃগৃহে পুনঃ
ফিরিয়া এসেছি ; মোরা কোটি পুত্র তোর,
নহি মা অতিথি ; স্নেহে ডেকে নেগো ঘরে।
নাহি সুখশয্যা পর্ণগৃহে তোর ?—তাহে
ক্ষতি কি মা ? আজ ধর্ম্মদ্বেষ জাতিগর্ব্ব
ভুলি, কণ্ঠে কণ্ঠে মিলি সহোদর সবে
তোর ক্রোড়ে সব ব্যথা জুড়াতে এসেছি ;
নাই থাক্ সুখ শয্যা, তাহে ক্ষতি কিমা ?
অন্ন নাই ঘরে ?—তাহে দুঃখ কি মা তোর ?

মুষ্টি অন্ন যাহা আছে তাই দেগো আজ
কোটি হস্তে বাটি লব মায়ের প্রসাদ
মিটাইব পূর্ণ করি প্রবল এ ক্ষুধা।
কোটি হস্তে ভরা শস্যে করিব শ্যামল
অচিরে প্রান্তর তোর কোটি পুত্র মিলি।
স্বেচ্ছায় ফেলিয়া দূরে মহার্ঘ বসন
ভিক্ষুকের বেশে, মাগো, এসেছি আমরা ;
খুলেদে খুলেদে দ্বার, অয়ি স্নেহময়ী।
বিদেশীবসনে আর ঘুচাতে পারি না লাজ
দেমা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড জীর্ণাঞ্চল হতে
পাইয়া মায়ের দান মিটাই বাসনা।

বর্ণচিত্র।

আমরা বহুপূর্ব্বের একটি প্রবন্ধে রেখা-চিত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি প্রকৃতির অনুকরণে চিত্রে কেমন করিয়া বর্ণ-বিন্যাস করিতে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের বক্তব্য কেবল 'আদর্শ' অ লইয়া। রেখাচিত্র হইতেই হউক, কিংবা বর্ণচিত্রের আদর্শেই হ অথবা ফোটগ্রাফ দেখিয়াই হউক—ছবি দেখিয়া ছবি আঁকা, অপেক্ষা সহজ। কারণ, অল্পপরিসরের মধ্যে বস্তুর আকৃতি ও তদুপরি আলোছায়া বা বর্ণবৈচিত্র্য সমস্তই সমতলের উপর নির্দ্দিষ্ট করা থাকে একটু কর-কৌশলে-'মাছিমারা' গোছের নকল করিলেই হইল! বি পদার্থকেই আদর্শ করিয়া সমতলক্ষেত্রে তাহার চিত্র অঙ্কন করা কঠি কাজ—শুদ্ধ সীমারেখাদ্বারা প্রতিকৃতি আঁকিতেও বিশেষ ক কৌশল আবশ্যক ; আলো ছায়ার পাতনে আরও একটু পর্য্যবেক্ষ শক্তির প্রয়োগ করিতে হয় ; পরে বস্তু-নিহিত নানা বর্ণের বিন্যাস ক তাহা অপেক্ষাও শক্ত ; পরিশেষে কল্পনার সাহায্যে কবিত্বময় পরিস্ফুট করা সম্পূর্ণই প্রতিভাসাপেক্ষ।

যাহা হউক, কোন পদার্থের যত অংশ প্রত্যক্ষ আলোক পায়, যাহা দর্শকের চক্ষে এই আলো প্রতিফলিত করে, চিত্রে তাহা শ্বেত উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে ; আর যে সকল অংশে পূর্ব্ববৎ স আলোক না পড়ে তাহা ঊনাধিক ঘোরালো দেখায়, এবং ত ছায়ামিশ্র বর্ণে চিত্রিত করিতে হয়। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণের উজ্জ্বলত কৃষ্ণবর্ণের মলিনতা দ্বারাই চিত্রকরগণ উচ্চাবচ পদার্থচয়ের একটা

া হয়ে দীন গৃহে কাটাইব দিন
বুও অঞ্চলে তোর অচঞ্চল হয়ে
বাঁধা রব কোটি পুত্র প্রেমের বন্ধনে ;
কে পারিবে মাতৃভক্তে বিভক্ত করিতে ?
কাঙ্গালিনী হলি, ও মা সন্তানবৎসলা,
সন্তানের অযতনে ; বঙ্গের জননী !
সদর্পে করেছি পণ কোটি কণ্ঠে মিলি
আজি হতে তোর দৈন্য স্বহস্তে ঘুচাব
সাজাব স্বদেশী পণ্যে আপন আপণ
পূর্ণ করি ; তুচ্ছ করি বিদেশী বিভব
পুত্রার্জ্জিত ধনে মার অভাব মিটাব,
আবার বসাব তোরে কমল আসনে।

ঐযে খুলিল দ্বার, মার মৌনমুখে
ঈষৎ হাসির রেখা ; হস্ত প্রসারিত
স্নেহে ; দেমা পদধুলি অধম সন্তানে।
আয় ভাই, ত্যাগমন্ত্রে হইয়া দীক্ষিত
স্বার্থ করি বলিদান মার পদাম্বুজে,
তুলিয়া বঙ্গের পুষ্প বঙ্গজননীরে
অর্ঘ্য করি দান ; ঘুচাই দুর্গতি ;
গগন ভরিয়া বলি "বন্দে মাতরম্,"
"বন্দে মাতরম্"—পুনঃ "বন্দে মাতরম্"।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন।

করুন, একটি রক্তজবা কিংবা লাল গোলাপ সীমারেখায় হইয়াছে, এক্ষণে রং ফলাইতে হইবে। আপনি লোহিত-কায় ফুলদলগুলি উন্মীলিত করিতেছেন; তাহাতে ছবিটি মোটামুটি ঠিক হইবে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক হইবে না—তে দলগুলির অধোভাগ ঘোরালো হইয়া আছে, তাহা রিলে উপরিভাগেও আলোর সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য অনেক ধরা তরাং লালফুল আঁকিতে অংশবিশেষে লোহিতবর্ণকে করিয়াই লইতে হইবে, এবং অন্য বর্ণের আভাও ফলাইতে আবার হরিদ্বর্ণের পত্রাবলি-সংবলিত পুষ্পের চিত্রে অনুরূপ রিবর্তনও আবশ্যক।

দি একটি রং অন্য একটি রঙ্গের পার্শ্বে স্থাপিত হয়, তবে ইহা যে বল নিজে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নহে, পার্শ্বস্থিত বর্ণটিকেও পরিবর্ত্তিত রে, সুতরাং উভয় বর্ণই তাহাদিগের স্বকীয় 'রূপ' হইতে বিভিন্ন খায়। ইহাতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, রঞ্জিত বস্তুদুটির আকার' পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু চক্ষুর সৃষ্টি কেবল শ্বেতবর্ণ দৃষ্টির মিত্তই হইয়াছে—সেই জন্য আমাদের চক্ষু, দর্শনকালে পর পর তকগুলি 'ক্রম' অতিক্রম করে বলিয়াই বর্ণসমূহের দিকে তাকাইলে াহারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া 'বোধ' হয়। সুতরাং আলেখ্য াদর্শের 'প্রতীয়মান' বণ অনুকরণ করিলে ভুল হয়; চিত্রণের সময়ে াসল' বর্ণগুলি ধরিতে পারা চাই—নচেৎ তিন নকলে আসল 'খাস্তা' ইয়া যায়।

এইজন্যই একজন ফরাসী চিত্রকরের মূল মন্ত্র ছিল—'আদর্শের ানুকরণ সূক্ষ্মভাবে করিতে হইলে উহার লক্ষিতরূপ হইতে অনৈক্য রিয়াই আঁকিতে হয়।' আমরা এই প্রবন্ধে বর্ণবৈলক্ষণ্যের ধারণ নিয়ম অনুসন্ধান করিব, এবং চিত্রে তাহার কিরূপ প্রয়োগ

করিলে বর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু করিব।

রেখাঙ্কণের মত Perspective অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষি উপরেই বর্ণচিত্রের ভিত্তি স্থাপিত। শুদ্ধ সীমারেখা সর্ব্বদা ছবিতে পরিস্ফুট করা যায়না—উহাতে আলো বিন্যাস না করিলে উহা স্পষ্ট কি অস্পষ্ট, উজ্জল কি ম কি অনুন্নত ইত্যাদি ছবিতে বুঝাইবার উপায় নাই। বর্ণচিত্রে সীমারেখা পৃথক কোন রেখাপাতে সূচিত হয় না- বর্ণকে অন্য বর্ণ হইতে পৃথক্ করে তাহাই সীমারেখা। ছায়া অর্থে শুধু শাদা ও কালো ধরিলেই চলিবে না—যে কোন রঙ্গের মধ্যে শাদা (কিংবা জল) মিশাইয়া আলোর দিকে লওয় আর কালো মিশাইয়া ছায়ার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। সুং প্রত্যেক প্রকারের বর্ণেই অসংখ্য রকমের আলোছায়া ফুটান য বিশুদ্ধ বর্ণের এইরূপ বিভিন্ন পরিবর্ত্তনকে আমরা 'জিল' বলিব—' মিশাইয়া পাতলা হইলে বলিব জিল কমিল, আর কালো মিশা মলিন হইলে বলিব জিল গাঢ় হইল। এইজন্যই কোন শিল্পী শুধু শা কালোর আলোছায়াদ্বারা, কিংবা মাত্র একটি বর্ণের লঘু ও গাঢ় ি প্রয়োগে (যেমন ফোটগ্রাফে, অথবা কাষ্ঠ ও ধাতুফলকে খো ছবিতে) পদার্থের আলেখ্য যথাবৎ অঙ্কিত করিলেও তাঁহাকে ' বিশারদ' (Colourist) এই গৌরবের আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

আরও একপ্রকারে বর্ণের পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়। বে বিশুদ্ধ বর্ণে অন্য এক বর্ণের 'অল্প' পরিমাণ মিশাইলে উহা আর বি বর্ণ থাকে না—যেমন নীল রঙ্গে সামান্য একটু লাল রং দিলে ঠিক বেগুনি রংও হয় না, অথচ উহাকে খাঁটি নীলবর্ণও বলা যায় ন আমরা এই পরিবর্ত্তিত রঙ্গের একটি নাম দিব 'আভা'। সুত

মিশ্রবর্ণকে 'নীলাভা' বলিতে পারি, অর্থাৎ মিশ্রবর্ণের টি স্পষ্টতর প্রতীয়মান হয় তাহাকে সেই বর্ণের "আভা"

ত্রকরগণ নীল, পীত, লোহিত এই তিনটি মূল বর্ণ ও দুটি বর্ণের সমপরিমাণে মিশ্রিত হরিত, ধূমল, কপিল ং ইহাদের আভা সকলকেও বিশুদ্ধ বর্ণই বলিয়া থাকেন। শুদ্ধ বর্ণে কালো রং মিশাইয়া উচ্চতম জিল হইতে গাঢ়তম ন্ত যত রং সে গুলিকে 'বিভক্ত' বর্ণ বা 'ভাঙা' রং বলা গিয়া। আরও একটি কথা আছে—মূল বর্ণ তিনটি কোন বিশেষ াতে মিশাইলে কালো রং উৎপাদিত হয় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। রাং একটুখানি নীল রং যদি পীত ও লোহিতে দেওয়া যায় তবে একটু কালো রং উৎপাদিত হয়, তাহাতেই কমলা রং ভাঙিয়া াইবে। এইরূপে হরিত ও ধূমলকেও ভাঙা যায়।

আলোক হইতেই যাবতীয় রঙ্গের উৎপত্তি। আলোক দ্বিবিধ, প্রাকৃত ও কৃত্রিম। প্রাকৃত আলোক সূর্য্যদেব রৌদ্রাকারে প্রদান করেন, উহা শাদা। জ্বলন্ত পদার্থ হইতে কৃত্রিম আলোক পাওয়া যায়, উহা সচরাচর রঙ্গিল। আলোক আবার দুই প্রকারে পদার্থ সমূহে াতিত হয়। রৌদ্র যদি সাক্ষাৎভাবে পড়ে তবে তাহাকে 'প্রত্যক্ষ' আলো, আর যদি ছড়াইয়া পড়িয়া পদার্থ সকলকে তাহাদের স্বকীয় বর্ণে উদ্ভাসিত করে তবে তাহাকে 'ব্যাপ্ত' আলোক বলে।

আমরা সকলেই জানি এই ব্যাপ্ত দিবালোক সর্ব্বদা শুভ্র নহে—আবহের অবস্থা পরিবর্ত্তন, মেঘের উদয় অনুদয় প্রভৃতি কারণে বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ আভা, প্রভাতের অনীল মলিনতা, চৈত্রের ধূলি-ধুসরতা প্রভৃতি নানারূপে ব্যাপ্ত দিবালোক আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়।

সূর্য্যালোক ত্রিকোণ কাচ ফলকের দ্বারা বিশ্লেষিত হই
বর্ণ উৎপাদন করে তাহাই বিশুদ্ধ বর্ণের আদর্শ। র
বিশুদ্ধ। সে গুলি প্রধানতঃ ক্রমান্বয়ে এই—

লোহিত কমলা পীত হরিত নীল ধূম

এই বিশ্লেষিত বর্ণগুলির সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন, পরস্পর মিলিত হইয়া নানা আভা উৎপাদন করে। অনেকে সাতটি বর্ণ ধরিয়া থাকেন, অর্থাৎ নীল ও ধূমলের মধ্যে (indigo) বর্ণও পৃথক্ গণনা করেন। যাহা হউক, যেমন প্রদেশের ভাষা ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী প্রদেশের ভাষায় পরিণ যেমন বৎসরের একটি ঋতু দাগ না কাটিয়া, তারিখ না আঁটিয়া আর ঋতুতে আস্তে আস্তে বেমালুম মিলিয়া যায়, তেমনি এই বর্ণশ্রে এমন একটি স্থান আছে যেখান হইতে 'খাঁটি' লাল আরম্ভ হইয়া ক্র পীতে যাইতে যাইতে মধ্যপথে 'খাঁটি' কমলার রঙ্গে, পরে ধীরে ধী 'খাঁটি' পীতে পরিণত হয়। পীত আবার ক্রমে সবুজ হইতে হই মাঝখানে 'খাঁটি' সবুজ হইয়া পরে আস্তে আস্তে 'খাঁটি' নীলে যায়- শেষে এই নীলের পরে লালের দেখা হওয়াতে ক্রমশঃ নানা ধূমলা হইয়া মিলাইয়া যায়।

শাস্ত্রমতে ধরিতে গেলে, উপযুক্ত পরিমাণে নীল, পীত, লোহিতে মিশ্রণে সাদা আলো হয়। এই তিনটি বর্ণ স্বতন্ত্রভাবে মিশানও কথা, দুইটির মিশ্রিত বর্ণে তৃতীয়টির মিশ্রণও তাই। যদি লা সবুজের সঙ্গে মিশাই তবেও যে ফল, নীল ও পীতের সহিত মিশাইলে সেই ফল; কেননা, সবুজ যে নীল ও পীতের মিশ্রণেই উৎপন্ন। রং অন্য রঙ্গের সঙ্গে মিশাইয়া শাদা আলো উৎপাদন করা যা

দিগকে পরস্পর অনুপূরক বর্ণ বলে। সুতরাং লোহিত ও হরিত, ও কপিল, পীত ও ধূমল পরস্পর অনুপূরক।*

ারস্পর অনুপূরক বর্ণগুলি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। একখানি া কাগজ টেবিলের উপরে রাখা হইয়াছে। ঘরের দুটি জানালা স্পর সম্মুখীন ভাবে খোলা আছে, তাহাদের মধ্য দিয়া ব্যাপ্ত বালোক আসিতেছে; এখন একখানি রঙ্গিল কাচ এমনভাবে রাখিতে বে যাহাতে তাহার ভিতর দিয়া রঙ্গিল আলো কাগজখানির উপর উৎফলিত হইতে পারে। তার পরে এক টুকরা কাঠ কাগজের রঙ্গিল কাচের কাছে রাখিলে কাগজের উপরে যে ছায়া পড়িবে কি কালো দেখাইবে? না; যে রঙ্গের কাচ দিবে তাহার পূরক রঙ্গের ছায়াই পড়িবে—অর্থাৎ লাল কাচ দিলে সবুজ ছায়া, া কাচ দিলে কমলা-রঙ্গের ছায়া, সবুজ কাচ দিলে লাল ছায়া হইবে।

কাচের কলমে বিশ্লেষিত বর্ণসকল পুনর্ব্বার স্থূলমধ্য কাচপুটক ns) দ্বারা একত্রীভূত করিলে শাদা আলোক হয়, কিন্তু নীল, পীত, াহিত বর্ণের উপাদান একত্র করিলে কখনও শুভ্র বর্ণ হয় না; খুব অনুপাতে মিশাইলেও নয়—তাহা কৃষ্ণ বা ধূসর হইয়া উঠে। বর্ণের দ্রব্য মিশ্রণে যে বর্ণক হয়, (pigment) তাহা তত বিশুদ্ধ না। স্বভাবজাতই এমন অনেক বর্ণক পাওয়া যায়, অথবা নানা ত্রম এমন অনেক বর্ণক প্রস্তুত হইতে পারে যাহাদের বিশুদ্ধি র্ব্বোক্ত বর্ণক অপেক্ষা অধিক। চিত্রকরগণ প্রায় সমস্ত বর্ণকই ং মিশাইয়া প্রস্তুত না করিয়া বর্ণব্যবসায়ীর কাছে ক্রয় করিয়া কন। যাহা হউক, নিজে মিশাইয়া বর্ণক প্রস্তুত করা সম্বন্ধে

---

* মনে রাখিবার নিমিত্ত পরস্পর অনুপূরক বর্ণ গুলির যথাক্রমে হরিলাল, মল, তেলে-বেগুণে বা হলুদবেগুণ, অথবা এইরূপ অন্য এক একটা নাম দেওয়া ত পারে।

একটি কথা বলিয়া রাখি। মনে করুন, বিশুদ্ধ সবুজের আ তজ্জন্ত নীল ও পীত একত্র মিশাইতে হইবে। এখন নীলাভ এবং পীতাভ নীল লইলেই ভাল ফল পাওয়া যাইবে; নীল কি সঙ্গে লাল আভা থাকিলে একটু ধূসর উৎপাদিত হইয়া সবুজ থা হইয়া যাইবে। এইরূপ কমলা রং প্রস্তুত করিতে লাল ও হলু মধ্যে নীলের আভা না থাকে, এবং ধূমল প্রস্তুত করিতে লাল নী মধ্যে যেন পীতের আভা না থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ কেন দৃষ্ট হয় তাহার সন্তোষজ কোন কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পাতাটি কে ফুলটি কেন লাল, চুলগাছি কেন কালো কে বলিবে? বৈ বলেন যে, দ্রব্য সকল কতকগুলি রঙ্গের আভা গ্রহণ করে অর্থাৎ কাগজের মত চুষিয়া লয়—চাই কি হজম করিয়াই ফেলে, কতকগুলি রং প্রতিফলিত করে বা ফিরাইয়া দেয়। এই গৃহীত সর্ব্বদাই প্রতিফলিত বর্ণের অনুপূরক: যথা—

প্রতিফলিত বর্ণ ···	লোহিত	··· পীত	··· নীল
গৃহীত বর্ণ ···	নীল + পীত	লাল + নীল	পীত + লোহি

প্রতিফলিত বর্ণ ···	সবুজ	ধূমল	কমলা
গৃহীত বর্ণ ···	লাল	পীত	নীল

সমস্ত বস্তু হইতেই রঙ্গিল আলোক ছাড়া শাদা আলোকও প্র ফলিত হয়। পদার্থের আকৃতি, উজ্জ্বলতা বা মসৃণতা অনুসারে শ্বেত আলোকের তারতম্য হইয়া থাকে। অমসৃণ শাদা বস্তু হই তদুপরি পতিত আলোকে যত রং যে পরিমাণে আছে তত রং পরিমাণেই প্রতিফলিত হয়, আর কালো বস্তু তত রং সেই পরিমা

করে। তবে কালো দেখা যায় কেমন করিয়া? উহা হইতে আলো কিয়ৎ পরিমাণে ফিরিয়া আসে বলিয়াই উহা আমরা :তে পারি।

বর্ণ-বৈলক্ষণ্য ত্রিবিধ। (১) নানা বর্ণের বস্তুসকল একই সময়ে থিলে তাহাদের রং ও জিল পরিবর্ত্তিত হয়। (২) আবার কোন :র্ণের এক বা একাধিক বস্তুর দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া অন্য দিকে ক্ষু ফিরাইলে ঐ সকল বস্তুর যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তাহার রং বস্তু-৮ত্র বর্ণের অনুপূরক। (৩) কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বর্ণ কিছুক্ষণ 'ণ করিয়া অন্য একটি বর্ণের বস্তু দেখিলে অনুপূরক বর্ণটির থাকিবেই, তৎসঙ্গে নূতন বস্তুটির রঙ্গও দেখা যাইবে।

এই সকল বৈলক্ষণ্য কেন লক্ষিত হয়? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, াদের চক্ষু কেবল শুভ্র আলোক দেখিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে; ২ জন্য যখন কোন উজ্জ্বল রঙ্গিল আলো চোখে পড়ে, তখন চক্ষের র এমন একটি আলোর কথা 'মনে' পড়ে, যাহা সেই আলোর ঙ্গ মিশিলে শ্বেত আলোক উৎপন্ন করিতে সক্ষম। এই দ্বিতীয় ত' আলোক সর্ব্বদাই প্রথমটির অনুপূরক।

একটি লাল গোলাপ দেখিতেছি; চক্ষু অ[illegible] ুজ দেখিতে শুক হইল, এবং বাস্তবিকই সবুজকে [illegible] তছে; এখন কখানি শাদা কাগজের দিকে তাকাইলে [illegible] টির বদলে ার মৃদু সবুজ ছায়া দেখা যাইবে। ই [illegible] রিবর্ত্তন। চ্ছা; লাল গোলাপটির পানে একটু ে [illegible] ক্ত। ! গোলাপটির রং যে একটু ধূসর হই [illegible] ারণ ঙ' সবুজের যোগেই লাল ম্লান হইয় র্ত্তন। এখন পীতবর্ণের নিকটে লাব য়,—আগেকার মত সবুজ স্মৃতিপথে

সবুজ আভা বিশিষ্ট করিয়া দিল। বেস, এখন আগে পীতবর্ণ
পরে লাল দেখিব। হলুদের অনুপূরক হচ্ছে বেগুণ, তাহা লাগে
নীল হইয়া গেল—অর্থাৎ পীত লোহিতের কাছে নীলের অনু
দেখিয়া তাহারই চেহারা চোখে পড়িল! ইহাই মিশ্র বৈলক্ষ
দৃষ্টান্ত।

এই জন্যই কোন চিত্রকর যদি উজ্জ্বল লাল রঙ্গের পরিচ্ছদ চি
নিযুক্ত থাকেন, তবে এক ঘেয়ে দৃষ্টিতে চক্ষু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়
তাঁহার বাঞ্ছিত বিশুদ্ধ বর্ণ অনায়ত্ত হইয়া উঠে। আবার সবুজ
প্রতি খানিক দৃষ্টি রাখিয়া চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া হইলে উহ
হয়।

কোন বস্তুর 'জিলে'র পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করিতে হইবে।
ন্যূনাধিক্য হইলে, সন্নিহিত দুইটি পদার্থের উজ্জ্বল অংশ উজ্জ্বলত
ঘোরালো অংশ আরও ঘোরালো হয়। এইরূপ জিলের বৈলক্ষণ্য র
পদার্থের মত ধূসর বর্ণের পদার্থেও দেখা যায়। দুইটি রঙ্গিল প
পাশাপাশি থাকিলে এবং তাহাদের জিল বিসদৃশ হইলে, পদার্থদ্ব
রং যতদূর সম্ভব ভিন্ন হইয়া গিয়া এই বৈসাদৃশ্য বাড়িয়া যায়।

অতএব ... কেবল পাশাপাশি স্থাপনের দ্বারা দুই রঙ্গের
পরিবর্ত্তন ... পারেন। তিনি উভয়েরই গুরুত্ব বাড়া
অথবা এ... করিয়া অন্যটির গৌরব বাড়াইতে পা
যেখানে ... লের মধ্যে কোন সুখজনক সামঞ্জস্য না থ
সেখা... ইচ্ছামত, ব্যবহার্য্য বর্ণসমূহকে আদর্শ-নি
রং... । সন্তোষদায়ক ফল পাইতে পারেন।

ধূসর বর্ণের সঙ্গে কোন্ কোন্ বর্ণের সা
। যাউক। কোন রঙ্গিল বস্তুর পাশে
ও উজ্জ্বল হয়, পরন্তু উহার অনুপূরক

দিত হইয়া শ্বেত বর্ণের সহিত যুক্ত হয় এবং উহাকে ঈষৎ রঙ্গিল দেয়। শাদা ও কালো পরস্পর অনুপূরক; সেইজন্য এই দুই র দূরে থাকিলে যতটা বিভিন্ন বোধ হয়, কাছাকাছি থাকিলে ক্ষা অধিক বোধ হয়। কারণ, সকল বস্তু হইতেই রঙ্গিল-আলো দা-আলো উভয়ই প্রতিফলিত হয়, সুতরাং অতিরিক্ত শ্বেতবর্ণের ধ্য রঙ্গিল পদার্থ হইতে প্রতিফলিত শাদা রঙ্গের অস্তিত্ব লুপ্ত যায়।

ন রঙ্গিল বস্তুর কাছে কালো থাকিলে কালো হইতে প্রতি- শাদা, কালোর সন্নিহিত বর্ণের অনুপূরক গ্রহণ করে। যদি র্ণ স্থাপিত হয় তবে কমলা বা হলুদের মত উজ্জ্বল অনুপূরক হইয়া কালোকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। কিন্তু বেগুনি বা সবুজের গীর অনুপূরক কৃষ্ণবর্ণকে সবল ও বিশুদ্ধ করে। যদি সবুজ লার কাছে থাকে তবে 'লাল' অনুপূরক উদিত হইয়া কালোকে মরিচার মত করিয়া তুলে। কালোর কাছে যে রংই থাকুক নীচু দেখাইবে; কেবল কমলা, হলুদ ও ধূমল বর্ণের সঙ্গেই লার ভাল মিল পড়ে।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের নীলদেহে পীত বসন, শ্রীরাধিকার স্বর্ণাঙ্গে বসন ও অন্যান্য দেব-দেবীর শরীরে যে সকল পরিচ্ছদ কল্পিত াছে তাহা বর্ণ বৈলক্ষণ্য ও অনুপূরক বর্ণোদয় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। তবে পটে ও প্রতিমায় সাধারণতঃ সকল বর্ণের যে 'চিত্তির' প্রকটিত হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র। আর, তের কৃষ্ণ, নীল, পাটল পিঙ্গলাদি বর্ণের উপমা দেখিয়া আদর্শ বর্ণ করাও কঠিন বটে। মূল বর্ণগুলি ধূসরের নিকটে থাকিলে াদের উজ্জ্বলতা ও বিশুদ্ধতা বাড়ে। নীল ও ধূমলের মত গভীর ঙ্গিল ধূসরের কাছে থাকিলে সান্নিধ্য-সামঞ্জস্য হয়; আর লাল,

কমলা, হলুদ এবং সবুজের পাতলা মিলও ধূসরের পাশে থ
বৈলক্ষণ্য-সামঞ্জস্য হয়।

পরিশেষে বক্তব্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সাবধানে একত্রীভূত সমগ্র আলেখ্যখানির উন্মীলন করিতে হয়—তা বর্ণবিন্যাসের ে হউক, অথবা অঙ্কনের রেখাপাতের সময়েই হউক। অংশ পৃথকভাবে যতই সুন্দর হোক না কেন, যেমনই ঠিকঠাক হো কেন, ন্যূনাধিক্য বা বৈলক্ষণ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সামঞ্জস্য না ক প্রকৃত 'ছবি' হয় না। অনেক চিত্রকর যে কৃতকার্য্যতা ে পারেন না, তাঁহাদের ছবির অংশ গুলি যে ফোটগ্রাফের চেহারার মত সকলটিই প্রধান হইতে চাহে, তাহার কারণ এই করণ নৈপুণ্যের অভাব! যেমন লিখিতে শিখিলেই 'লেখক' যায় না, তেমনি আঁকিতে জানিলেই 'চিত্রকর' হওয়াও সকলের ঘটে না। ফলতঃ রচনায় কবিত্ব ও চিত্রে 'ছবিত্ব' ফুটান প্রকারের জিনিস।

শ্রীবিহারীলাল গোস্বামী।

বঙ্গনারীর রাখীবন্ধন।

অনুপমা আর্য্যবালা করহ স্মরণ!
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধাপণ!
কঠিন পণের গুণে
সাবিত্রী শমনে জিনে
কেমনে দানিয়াছিল মৃতের জীবন!
ব্রতশীলা আর্য্যবালা আছিল কেমন!
রণে ভঙ্গ দিয়ে পতি
ফেরে, শুনে আর্য্য-সতী
করেছিল পুরদ্বারে অর্গল যোজন
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধাপণ!
সে দিন স্মরণ করে,
সে ব্রত হৃদয়ে ধরে,
ঘরে পরে সমাদরে করহ প্রেরণ
সুপবিত্র স্নেহসূত্র—রাখীর বন্ধন।
ভোল হিন্দু মুসলমান
প্রীতিসূত্র কর দান
বাঁধ সূক্ষ্ম সূত্রমূলে বিরাট জীবন
কর মনে দ্রৌপদীর বেণীবাঁধাপণ!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

রাখীবন্ধন।

স্বর্গ হ'তে দেবগণ, পুষ্প বৃষ্টি কর।
প্রতিগৃহে বঙ্গনারী হুলুশঙ্খ ধর।
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, এ কলঙ্ক লেখা,
বঙ্গের ললাটে আর নাহি যাবে দেখা।
হিন্দু মুসলমান কিম্বা স্বদেশী খৃষ্টান,
পূর্ব্ব কি উত্তরবাসী নাহি ব্যবধান,
সব ভাই, এক ঠাঁই এক মন প্রাণ,
সমস্বরে বঙ্গবাসী গায় এক গান।
ঘরে ঘরে কোলাকুলি গলা-গলি আজ,
মাতৃদত্ত উত্তরীয় মোটা শুভ্র সাজ।
জন্মভূমী জননীর আশীর্ব্বাদ লয়ে,
সগৌরবে দাঁড়ায়েছে সবে এক হ'য়ে।
নবপ্রাণে সঞ্জীবিত বঙ্গবাসীগণ,
দেখ সবে, করে আজ এ রাখীবন্ধন।

ঘরের কথা ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

বেলওয়ে আফিষে রাজচন্দ্রের প্রায় পনর বৎসরের কিছু উপর কর্ম্ম করা হইল; বড় বাবুর দাস্যবৃত্তি করিয়া যে রাজচন্দ্রের চাকরী হয়, সেই রাজচন্দ্রের চেষ্টা ও অনুরোধে এক্ষণে অনেক লোক ঐ আফিস হইতে নিজ নিজ অন্ন উপায় করিতেছে। ...দ, সচ্ছল উপার্জ্জন এবং সর্ব্বত্র সম্ভ্রম সত্ত্বেও রাজচন্দ্রের পূর্ব্ব-...বের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, সেই নম্রতা, সেই সকলের ...সখ্য, সেই পরের কাজে ধাওয়া-ধায়ি, সেই পরের অভাবে মুক্তহস্ত। ...ম্ন পার হওয়ায় চাটুয্যেমহাশয় তিনবার সাহেবের নিকট হইতে ...পরিহার করিবার জ্ঞাপন-পত্র প্রাপ্ত হয়েন এবং তিনবারই ...জচন্দ্রের উপরোধে সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যান। কিন্তু ...চন্দ্রের দ্বারা চাটুয্যেমহাশয় যতই অধিক পরিমাণে উপকৃত ...ত লাগিলেন, ততই যেন বেচারীর উপর ব্রাহ্মণের বিদ্বেষ অধিক ...য় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইল যে, রাজচন্দ্রের ...দেখিলেই বাধ্যবাধ্যকতার কথা স্মরণ হইয়া ব্রাহ্মণের সর্ব্বাঙ্গ ...লয়া উঠিত ও তিনি মুখ ফিরাইয়া লইতেন। চল্লিশ বৎসরের ...চন্দ্রের পরমায়ুর আধিক্য দেখিয়া ষষ্ঠি-অতিক্রান্ত ষষ্ঠীর-দাস ...য্যেমহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন। এজন্য চাটুয্যেকে বিশেষ ...ষী করা যায় না, কারণ হস্তী যেমন আপনার আয়তন দেখিতে ...না মনুষ্যও তেমনি নিজের বয়সের পরিমাণ দেখিতে পায় না। ...ণ ভ্রমেও ভাবিতেন না যে তাঁহার ইহসংসারের মিয়াদ ফুরাইয়া ...। একবার কর্ম্মত্যাগের [illegible]

আশ্রয় লইতে তাহার বাটীতে যান এবং তাহার পুত্রকে আদর কা বলেন যে "লুটুবাবু, তোমার বাপ হতে তো কিছু হলো না তুমি ব বড় হয়ে যখন তোমার বাপের কর্ম্মে বাহাল হবে তখন যেন এ বুং ভুলো না।" রাজু যদি সিয়ালদহ হইতে বদলী হইয়া অন্যত্র যায় অপর কোন আফিষে কর্ম্ম হয়, তাহাতে যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এক টাকা বেতনও বৃদ্ধি হয় তাহাও চাটুয্যে ম'শায় কষ্টেশ্রেষ্টে করিতে পারেন; কিন্তু নিত্য উপকারী ও উপকৃতের একস্থানে সঙ্গে অবস্থিতি, সতত পরস্পরের সন্দর্শন, উপকৃতের পক্ষে একেবারে অসহনীয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিল। রাজচন্দ্র, চাটু সঙ্গে কখনও মুরুব্বিয়ানা করিত না, কখনও তাহাকে কোন অসম্মান করিত না বরং যথারীতি ধীর নম্র ব্যবহার করিত; ব্রাহ্মণ সেই বিনম্র সম্ভাষণ, ভদ্র ভাবকে শ্লেষ বলিয়া মনে করিতে একটা কথা বলা হয় নাই। যে বড়বাবুর অনুগ্রহে রাজচন্দ্রের চাক হয় তিনি আর আফিষের বড় বাবু নাই। প্রায় দুই বৎসর হই একদিন ফাল্গুন মাসের শেষে তিনি আফিষের হিসাব নিকাশ ে করিয়া বাসন্তী-বায়ু-বিতাড়িত ধূলিকণা সেবনে প্রাণ পুলকিত মিউনিসিপ্যাল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে বাটী প্রত্যাগত হ পর, মুসম্মৎ ওলাবিবি আসিয়া তাঁহাকে সম্বাদ দিল যে কেরাণীজ শ্রীযুক্ত চিত্রচরণ দাসগুপ্ত মহাশয় তাঁহার হিসাব নিকাশ চুকাইব জন্য মসীসিক্ত লেখনী হস্তে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে তথায় যাই হইবে। বড়বাবু বাঙ্গালী চরিত্রগত দীর্ঘসূত্রতাবশতঃ একটু ইতস্ত করিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা ব্যস্ত হই একজন বাবুকে ডাকিয়া আনিলেন; বাবুটি গুপ্তমহাশয়ের ষ্ট্যাবলি মেণ্ট-খাতাভুক্ত, এখানকার পরিচয় ডাক্তার। ভদ্রলোকটী বড়বা -প-আড়িয়ে পাঠাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগি

লাবিবির কৃপায় বাবুর অন্তঃস্থল অনবরত পরিষ্কার হইতেছিল। ডাক্তার বাবু খড়ীমাটী* গুলিয়া তথায় চুনকামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিজের পকেটস্থ শিঙ্গা দেখাইয়া তাহা ফুঁকিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তুষার ঢালিয়া মস্তকে কাঞ্চনজঙ্ঘার শোভা করিয়া দিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তাহাতেও বড় গোঁ গোঁ করেন, তখন তিনি একমোহর কুলমর্য্যাদা দিয়া একজন পুরুষকে আনাইলেন, ইনি চিত্রগুপ্তের সূর্য্যবংশাবতংশ প্রভুর জ্ঞাতি। পুরুষবর আসিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই বড়বাবু, তাড়াতাড়ি না বেলেস্তারার ওয়েষ্ট-কোট গায়ে দিয়া দুর্গা-শ্রীহরি করিলেন। বের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া বাড়ীতে হরি-বোলের তরঙ্গ উঠিল। কটী কামিনী কি জানি কি বুঝিয়া চিৎকার করায় সাহেব তাহাকে অসভ্য বর্ব্বর মনে করিয়া বীরপদভরে রথারোহণ করিলেন। হয়, তাঁহার মনে হইয়াছিল যে তিনি যে কাল আর উহাদের কুলমর্য্যাদা লইতে আসিবেননা এই শোকে উহারা রোদন তেছে।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

* Chalk mixture.

সমসাময়িক ভারত

ও

জাতীয় আন্দোলন *

(এনেষ্ট পিরিউ প্রণীত)

ভূমিকা।

অ্যাম্‌ষ্টার্‌ডামের "সোশ্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্জাতীয় কং সভায়" বহুদেশ হইতে প্রতিনিধি আসিয়া সমবেত সেই সভায়, পাশাপাশি-উপবিষ্ট রুশ্‌ ও জাপানীরা, প্রতিনিধিগ দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করিয়াছিল—একজন খর্ব্বকায় বৃদ্ধ, তদৃ কিছুমাত্র কম আকর্ষণ করে নাই। মুখবর্ণ শ্যামল, খাঁটি বি সুন্দর পলিত কেশ। তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ ভারতের বর্ত শাসনতন্ত্রের কিরূপ বিদ্বেষী, তাহা তিনি বিদ্যুৎ-স্ফূরিত ভাষায় করেন। তিনি বলেন ;—"ভারতবাসীদিগকে, সরকারী কাজ : একটী সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে, নিয়মের দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হই সমস্ত প্রজাপুঞ্জকে সামান্য মজুরের অবস্থায়—কুলির অবস্থায় পরিণত হইয়াছে !" এই খর্ব্বকায় বৃদ্ধের অদ্ভুত বিদেশী নাম :—দাদা নৌরোজি। তিনি বম্বে হইতে আসিয়াছেন। যাহাদের মৃত "নিঃশব্দতার মন্দির"-চূড়ায় নিক্ষিপ্ত ও গৃধ্রগণ-কর্তৃক কবলিত : থাকে—তিনি সেই অগ্নি-উপাসক পার্শি জাতির অন্তর্ভুক্ত।

---

* L'Inde contemporaine et ...

জাতীয়"-দল-প্রেরিত প্রতিনিধি। এইরূপে, "লিয়াও-ইয়াং"-
দিন পূর্ব্বে,—সকলের চিত্ত বিচলিত করিয়া, ভারতবর্ষ
ষ্ট্রিক রঙ্গভূমে অতর্কিতভাবে প্রবেশ লাভ করে।
ন!—প্রাচ্য ভূপ্রান্তের একটি প্রায়দ্বীপ। এই দেশের সম্বন্ধে,
কবার অনেক চিন্তা-আলোচনা করিয়াছে। যে দেশ ৪০
অবরুদ্ধ ছিল, রহস্যতিমিরে আবৃত ছিল—হঠাৎ এক সময়ে
ইল, রূপান্তরিত হইল; রিউস-নদীর উপর, যেন সুপ্রভাতে
ন একটি সেতু স্থাপিত হয় (পৌরাণিক কথা) সেইরূপ
ঐন্দ্রজালিক বিরাট কারখানা হইতে সদ্য বাহির হইয়া ভারত
র দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এতদিনের পর, এসিয়ার এই
যেন "গাঁজিতে" আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন, যে অসংখ্য
গঠনহীন একটা বিশাল পিণ্ডাকারে অবস্থিতি করিতেছিল,
রর মধ্যে থাকিয়া, এখন উহা আপনাকে অল্পে অল্পে গড়িয়া
,—সজীব করিয়া তুলিতেছে। ভারতবর্ষকে জানিবার
শর-ভাগ কতকগুলি পর্য্যটক ও পণ্ডিতেরই ঔৎসুক্য হইয়া
খন ভারতের অভূতপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যায়,—যখন শুনা
াপথে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য অনাহারে মরিতেছে—তখনই এক
মুদ্রাযন্ত্রের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে; (তাই, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে,
দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়—অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হয়)
হার পর, ভারতের কথা আর কেহ মনেও করেনা। আজ
য়—কাল বলিয়া নয়—চিরকালই ভারতের ধন শোষিত হইয়া
ছ। এই রহস্যময় স্বপ্নদর্শী ভারতীয় জনপুঞ্জ মনে করে—
াদের অদৃষ্ট-লিখন, এবং এই মনে করিয়াই তাহারা

ভারতের সাধারণ প্রজাপুঞ্জ, সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। ভা
মায়াবাদে নাস্তিত্ববাদে জর্জ্জরিত হইলেও, উহারই মধ্য হইতে
সুশিক্ষিত, আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত নব্যবংশীয়েরা, গভীর নি
জাগ্রত হইয়া, ইংরাজের উৎসবে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এই ন
বিভিন্ন জাতিকে, বিভিন্ন বর্ণকে, আপনার দিকে আহ্বান ক
হিন্দু, পার্শি, মুসলমান। এই নব্যভারতের সংবাদপত্রাদি আ
আছে, সভাসমিতি আছে, বক্তা আছে, নেতা আছে। উহাদে
দাবি,—যে পর্য্যন্ত না ইংরাজেরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারে, "ভা
জন্যই ভারত", তাবৎ উহাদের রাজ-পরিষদে অন্ততঃ ভারতবা
যেন একটা আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। যাহারা এই কথা বলে, তা
ক্ষুদ্র দল। ক্ষুদ্র দল?—সংখ্যায় ক্ষুদ্র হইলেও, জ্ঞানদীপ্ত
প্রভাবশালী। এখন যে জাপানকে দেখিতেছ—ইহা ত ৩০ বৎ
(রাষ্ট্রিক জীবনের পক্ষে নিতান্ত স্বল্পকাল) সাধারণ প্রজাপুঞ্জে
সারে ও বিনা-অনুমোদনে, শুধু কতকগুলি লেখক ও রাজম
সংগঠিত হইয়াছে। বর্ণভেদপ্রথার জননী ভারতভূমিতে ও
যে জাতীয়ভাবের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে তাহা অভিনব
অপ্রত্যাশিত নহে। অধুনা ভারতে যে কেন্দ্রগত-শাসন-প্রথা
উহা নবপ্রবর্ত্তিত;—পূর্ব্বে উহা ছিল না। ভারতের
একবার কল্পনা করিয়া দেখ:—শৃঙ্খলা-রহিত, সংমিশ্রিত,
কোলাহলময় মানব-জনতা;—স্বতন্ত্র-শাসিত গড়বন্দি গ্রাম
যাহারা কেবল রাজস্বগ্রাহী রাজপুরুষের দ্বারাই তাহাদের
রাজাকে জানিত; সে সময়ে ভারতের যেরূপ অবস্থা ছিল,
... বিদেশীয়দিগের আক্রমণ—

।ছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও লৌহবর্ত্ম, পত্র-
যালয়, তাড়িৎবার্ত্তাবহ প্রভৃতি,—এই সকল জীবনের
।কর্য্য প্রবর্ত্তিত হইয়া, অনিবার্য্য একতার নিত্য-সহায় ও
হইয়াছে। তখন ভারতের লোক, গ্রামের ভিটাতেই বদ্ধ থাকিয়া,
ধ্যে অবস্থিত হইয়াই জন্মাইত, বাঁচিত, মরিত ; গ্রামই
র ক্ষুদ্র স্বদেশ ছিল ; এক্ষণে উহারা অপেক্ষাকৃত একটি বিস্তৃত
। আভাস পাইয়াছে ; তাহারই অঙ্গীভূত বলিয়া আপনাদিগকে
রিতেছে, এবং তাহার সহিত,—ইচ্ছাক্রমে হউক বা অনিচ্ছা-
হউক—আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে বিদ্যুৎ-তার-যোগে,
।দি চারিদিকে দ্রুত পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে তাহারা
তেছে,—স্বকীয় গ্রামের বাহিরেও ভারতবর্ষ আছে ; এমন কি,
তের বাহিরেও এশিয়া আছে।

আমি এ কথা বলিতেছিনা, ভারতের ইতরসাধারণের মনে,
ীয় একতার ভাব স্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তথাপি
ার বিশ্বাস, দেশের ভিতরে ভিতরে এই ভাবটি অন্তঃসলিলে
ন। যদি কোন দিন, সেই প্রচ্ছন্ন স্রোতের মুখে, একটি কূপ-
নের নলযন্ত্র মাটির মধ্যে নিহিত করা যায়, তাহা হইলে সেই
তের জল, মূল-প্রস্রবণ হইতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উপরে উঠে।
।াই হোক, এখানে একটি সুগঠিত জাতীয় দল প্রস্তুত হইয়াছে ;
ই জাতীয় দলের একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যানুক্রমণিকাও আছে ; তাহারা
চাহিতেছে—তাহারা বেশ জানে। অনেকে বিশ্বাস করিতে না
হিলেও একথা নিশ্চিত, তাহাদের প্রভাব কলিকাতা ও লণ্ডনে
শেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষভাগে, এই কংগ্রেস দলের বাগ্মীদের
কৃতা আমি শুনিয়াছিলাম। সেই সময়েই এই গ্রন্থ লিখিবার কল্পনা

আমার মনে প্রথম উদয় হয়। এই গ্রন্থখানি শুধু যে অ
পাঠের ফল, তাহা নহে ; পরন্তু, মূল-প্রস্রবণ হইতে,
সংগৃহীত তথ্য হইতে আমার মনে যে সকল সংস্কার উৎপন্ন
তাহারও ফল।

হাঁ, আমি সাহসপূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি, দেশীয়
মতামতের প্রতি আমি কর্ণপাত করিয়াছিলাম! অত্রত্য ইংরাজ
মতামত একটা বিশেষ রঙে রঞ্জিত। আমরা যে ভাবে বুঝি
সে ভাবে বুঝে না ; তাহারা অন্যরূপ বুঝে।

যেরূপ উদ্ধত অবজ্ঞার সহিত ইংরাজেরা "নেটিভের" ম
গ্রহণ করে, তাহা আমার জীবনে কখন দেখি নাই। আরাম-কো
সুখাসীন, সরকারী-কর্ম্মচারী একজন ইংরাজের নিকট যখন
"ন্যাসানাল কংগ্রেসের" কথা পড়িলাম, তখন,—আমার মনে প
তাঁহার নেত্রযুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল ; তাহার পর
মুদ্রিতলোচনে তিনি বলিলেন ; "কি ! তাহাদের এই সমস্ত পাগ
তুমি শুনিলে?" আমার সে সময়ে লজ্জায় মরিয়া যাওয়া উ
ছিল! শিষ্ট-সমাজে যদি কেহ কোন চাষা-লোকের গল্প করে, ত
সে, শ্রোতার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গল্প আরম্ভ করিয়া থাকে। স
কথা বলিতে কি, তাহাদের জল্পনা আমি যে ঔৎসুক্য-সহকারে শুনি
ছিলাম, তজ্জন্য—সেই ইংরাজের কথা শুনিয়া, আমার মুখ লজ্
রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। যদি আমি আর কিছুদিন এখা
থাকিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় আমিও, ত্রিশকোটি অনাহার-ি
লোকের পার্শ্ববর্ত্তী এই "জেণ্ট্‌লমেন"দের, "খাতির-নদারদ্" প্রশ
ঔদাসীন্যের অংশভাগী হইতাম......

টানা-পাখার নীচে, ঠাণ্ডা কাছারি-ঘরে বসিয়া, কাছারির ইংর
কর্ত্তাটি কথা গাঁথিয়া-গাঁথিয়া, বেশ ঘোরাল-রকমের বাক্যবিন্যাস কি

সকল শূন্য অঙ্কের ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিগণ, যাহারা, শুধু
কর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকট আনিতেছে, দুর্ভিক্ষ ও
বিষম উপদ্রবের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছে—
তাঁহার মর্ম্ম স্পর্শ করে না। তিনি কিছুমাত্র বিচলিত
ই সব কথা শুধু টুকিয়া রাখিতেছেন; তিনি বেশ প্রশান্ত-
র রিপোর্টে লিখিতেছেন;—"যেমন একদিকে, মালের
দ্ধি হইয়াছে, তেমনি অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের দারুণ প্রকোপ দেখা
। তাঁহার এই রিপোর্ট আবার গীতি-কাব্যের ভাব ধারণ
খন তিনি উহাতে কার্পাসের গুণ বর্ণনা করেন, ব্রিটানীয়
নর জয় ঘোষণা করেন, এবং সাক্ষাৎ বিধাতার বিধান বলিয়া
কী শান্তির" মহিমা কীর্ত্তন করেন......

ণ্ড, ভারতকে কি দান করিয়াছে—জাতীয় দলের লোকেরা
জানে এবং ভারতের নিকট ইংলণ্ড কি পাইয়াছে—তাহাও
বিলক্ষণ জানে। ইংলণ্ডের এই দানগুলি অঙ্গীকারের
র বদ্ধ; এই অঙ্গীকার বাক্যগুলি মধ্যে মধ্যে নবীকৃত ও
হইয়া থাকে; এবং বিদ্যালয়ের প্রত্যেক হিন্দুছাত্র এইগুলি
করে।

৩০ খৃষ্টাব্দে, উদার-নৈতিক মহানুভব ইংরাজেরা স্বকীয় উদার-
। খাতিরে, যুরোপীয় উন্নত শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতার কিয়দংশ
বাসীকে দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা মনে
াছিলেন, ভারত-বাসী তাহা অনায়াসে ও অবিলম্বে আত্মস্থ করিতে
ব। এই উদার কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া, ভারতীয় যুবকবৃন্দের
ার পূর্ব্বেই তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনের অনুকূল অভিপ্রায় প্রকাশ
। এক্ষণে সেই উদার-নীতি-বীজের ফল ফলিয়াছে। তাই,
নৈতিক দলের এত পক্ষপাতী।

তাই তাহারা উদার-নীতির দোহাই দিয়া ও উদার-
অনুসরণ করিয়া, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার দাবী করিয়া থা
এই প্রশ্নটি স্বভাবতই সকলের জিহ্বাগ্রে আসিয়া
এবার কি সমস্ত ভারত সমবেত হইয়া, সেই ১৮৫৮ খৃষ্টা
বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি করিবে? শিখ্ ও গুর্খা সৈন্য ইংরা
যে আবার উত্থান করিবে—ইহা আমার বিশ্বাস হয় না
এখনকার জাতীয় আন্দোলনের নেতা—তাহারা প্রায়ই উকি
কিংবা অধ্যাপক। ২০ বৎসর কাল হইতে, সমস্ত য়ুরোপ
করিতেছে, এবার কোন্ চাট্‌নি দিয়া ভারতকে উদরস্থ করা
রুসীয়া চাট্‌নি, না ইংরাজি চাট্‌নি? ভারত বেশ বুঝিয়াছে, এ
কেহ তাহাকে গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু অধুন
ভূখণ্ডের শেষপ্রান্তে ঝটিকা-গর্ভ এক খণ্ড মেঘ উঠিয়াছে যাহ
খৃষ্টাব্দে কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই,—সেটি জাপানী মেঘ। উহ
কোনো দিন, ভারতের উপর আসিয়া অশনি-নিনাদে ভাঙ্গিয়া প
ভবিষ্যৎবক্তারা ইহার উত্তর দিবেন। আপাততঃ দেখা যাই
জাপানী ষড়যন্ত্র, নিঃশব্দে অলক্ষিতভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়া
ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এই ক্ষুদ্র
জাতির বিজয় ঘোষণা মহা-আড়ম্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীন জাহাজের যাত্রী।

যে চীনেম্যানটি আমাকে ফুল উপহার দিয়াছিলেন তাঁর
ছু অনেকগুলি চীনভাষায় লিখিত বই ছিল। যেমন হ'য়ে
ন যেমন ফুল ভালবাসেন তেমনি বইও ভালবাসেন।
অতি যত্ন করে রেখেছেন। বইগুলির পাতার ভিতর
াড়ী দেওয়াছিল। আমিও অমনি রাখি। ওই খানেই ফুল
উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হয়।

পাতলা একপিট ছাপা কাগজে নির্ম্মিত এই চীনে বইগুলি
ামার ইচ্ছা হ'তে লাগল সে গুলি মাথায় রাখি, বুকে করি।
ঝিবার তো সাধ্য নাই! তবে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে ঐ
পুস্তকের মধ্যে একখানি চীন দেশীয় প্রবাদ এবং (Quotation)
উক্তি সম্বন্ধে পুস্তক ছিল। তাহার দু'একটির ভাব নীচে
করিলাম। বাঙ্গালা, সংস্কৃত বা ইংরাজী ভাষায় কতকটা ঐরূপ
। বচন জানা আছে বলিয়া, যেখানে সম্ভব তাহাও লিখিলাম।
বিনয় ও লজ্জাশীলতা স্ত্রীলোকের কণ্ঠভূষণস্বরূপ।" চীন দেশীয়
াককে যে ভাল করিয়া দেখিয়াছে সেই এ কথার তথ্য বুঝিতে
াবে! এমন স্বভাবসুলভ বিনয়নম্র রমণীজাতি পৃথিবীর আর
ায়ও নাই।

আর একটী প্রবাদের এইরূপ অর্থ,—"অসময়ে অতিথি আসিলে
াক্রর (তাতার) অপেক্ষাও কষ্টদায়ক হয়।" চীন দেশের লোক
টই অতিথি-পরায়ণ নহে; ভাই মরিলে ভাই কাঁদে না, অতি
ট আত্মীয়ের দুরবস্থায় অর্থসাহায্য করে না। লোকে লোকারণ্য
য়া যে দেশে জীবিকা অর্জ্জন অতি কষ্টসাধ্য, সে দেশে অতিথি-
ার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

"নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈল দানম্।" প্রদীপ নিবি
তাহাতে তৈল দিয়া কি হইবে? একথার মর্ম্মান্তিক ত
চীনেরাও বুঝিয়াছিল।

আর একটী প্রবাদে, মা ছেলেকে সদুপদেশ দিতেছে
ভাব, ঠিক নিম্নোক্ত সংস্কৃত শ্লোকটীর মত,—

"সুশীলোভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রী প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নগা যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমা যাতি সম্পদঃ॥"

বড়ই সারগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ নীতিকথা। পিতার
উঠিতে পাইলেন না বলিয়া অভিমানে যখন ধ্রুবের ঠোঁট ফুলি
তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সুচরিত্র হও, ধ
হও, সকল লোকের—সকল জীবের মঙ্গল সাধন কর, তাহা
জল যেমন সর্ব্বদা নিম্নগামী হয়, সকল সুখ-সম্পদও উপযুক্ত
তোমাতেই আসিবে।"

ব্যথিত-হৃদয়ের উক্তি আর একটী শ্লোকের ভাব কতকটা নিম্ন
শ্লোকের ন্যায়,—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।
কি যতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

কি আশ্চর্য্য! এই সকল নানাদেশের লোকের কার্য্যক
দেখিয়া আমার এতদিন মনে হইতেছিল যে, অবস্থাবিশেষে অ
যে কাজ করি, ইহারাও সকলে ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকে। (
দেখিলাম, লোকে হৃদয়ের ভাব ভাষায় ফুটাইতে গেলেও ঠিক এ
সুরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বাহির হয়।

আর একখানি পুস্তকে দেখিলাম, পুস্তক উৎসর্গ যাহাকে উৎসর্গ করা হইতেছে তাহার নামোল্লেখ লেখা আছে, "চির আরাধ্য—তোমাকে।" যেন গভীর াত অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হচ্চে—যে কারণেই হোক িলিবার যো নাই।

একখানি পুস্তক কোন চীনমহিলা রচিত। চীন-জাপান ্র প্রণয়ীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আক্ষেপ ক'রে লিখেছিলেন। বুক পাঠক নীল পেন্সিল দিয়ে তার অনেকগুলি ছত্রের নীচে ছেন দেখিলাম। একটী ছত্রের অর্থ সরল ভাষায় এইরূপ,—
প্রিয়জন! তোমার মধুর স্মৃতি এ জনমে ভুলিবার নয়।"
যেন আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের এই সরল উক্তিটীর মত,—

"তুমি যে দিয়েছ দেখা
পাষাণে তা আছে লেখা,
হৃদয় ভাঙ্গিলে সে তো মুছিবার নয়।"

থন সেই চীনেম্যানটীর নিকট এইসব পুস্তকসম্বন্ধে কথা কহিতে- ম, নীচেকার ডেকে একজন গরিব চীনেম্যান তখন অতি সুমধুর বাঁশী বাজাইতেছিল। সকলে তাকে ঘিরে বসেছে। স্ত্রীলো- । দূরে থেকে তন্ময় হ'য়ে শুনছেন। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁশীতে ার দিয়ে কত রকমেরই সুর বার কচ্ছিল। বাঁশীর স্বর যেন কাঁদ- স্বরের মত। আর এত সুস্পষ্ট, ঠিক যেন কে কার নাম ধ'রে চে। তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে আসছিল। আর সুদূর আকাশের প্রান্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন দেহ ছাড়া আত্মার মত জ্বলছিল।

এবার একটি বিপত্নীক চীনেম্যানের কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধ শেষ ব। হংকং হইতে যখন প্রথম জাহাজে উঠলেন তখনই তাঁহাকে ্ব আমার মনে হয়েছিল যে তাঁহাতে নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব আছে

অন্য সকলের মত নয়; বেশভূষায়—তাঁহার অবহে
শূণ্যময়।

এক দিনেই তাঁহার মনের ভাব ও জীবনের ইতিহা
তিনি একজন মধ্যবিত্ত অবস্থার সওদাগর। দেহ ক্ষীণ।
বৎসর মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। সর্ব্বদা লোকের জ
একা একধারে ব'সে থাকতেন। কাহারও সহিত মিশা নাই-
সহিত কথা নাই; কেবল অসীম সমুদ্র ও অনন্ত নাল আকা
চেয়ে সময় কাটাতেন; কেবল একটি পরিচিত সমবয়স্ক চী
সহিত কখন কখন মনের কথা কহিতেন মাত্র। সে ক
চোখের জল ছাড়া কান্নারই রূপান্তর।

আজ দুই বৎসর হলো তাঁর স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে। আঠা
একটিমাত্র শিশু কন্যা রেখে তিনি চ'লে গেছেন। মাতৃহীনা
তিনি মার নামেই ডাকেন। প্রথম প্রসবের পরই তাঁহার মৃত্
কত ডাক্তার দেখিয়েছিলেন, কিছু হয় নাই। তবু এখনও
বলেন—"যদি এ চিকিৎসা না ক'রে অন্য চিকিৎসা ক'রতাম
তিনি ভাল হতেন।"

জীবনে যেন বিষম বিপ্লব ঘ'টেছে—ইহজন্মের মত চারিদি
হ'য়ে গেছে। হাত থেকে রুমাল উড়ে গেলে কুড়াইয়া লইতে
বৃষ্টি পড়িলে যথাসময়ে সরিয়া বসিতেন না। খাবার ঘণ্টা পড়ি
খেতে যেতেন না। অন্তরে এমন দারুণ ব্যথা লেগেছে যে—সে
সে প্রসঙ্গ, একবার তুল্‌লে হয়—অমনি সবাকার সামনেই
মানুষের মত আকুল হ'য়ে কাঁদেন।

ঘড়ির চেনে হাতীর দাঁতে আঁকা একখানি ছোট রমণী মূর্ত্তি
বুকে ঝুলান। ছবির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ছোট ছোট কুন্দ ফুলের
আর তুষার-ধবল রংটি শ্বেত-করবী ও দ্রোণ পুষ্পের মত সাদা।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক

খেয়াল খাতা।

তুলনা।

আমরা চোখের সাম্নে যা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই তারই তুলনা করি। পূর্ণিমার চাঁদ আমরা প্রতিমাসেই দেখি, (রমণীকে 'পূর্ণচন্দ্র-নিভাননা' বলে থাকি। সেই রুক রংএর উপমা দিতে গেলে অমানিশার কথা উল্লেখ করি কাউকে কদাকার দেখলে তাকে 'বাঁদর-মুখো' 'ছুঁচো-মু(থাকি। আর মাষ্টারমশাইরা ছাত্রদের প্রায়ই 'গাধা' ব(করে থাকেন। আমরা কেন যে এরকম করি তা বুঝি(কুৎসীৎ মানুষ 'বাঁদরমুখো' হয় তা হ'লে সুশ্রী বাঁদর 'মা(হবে না কেন? সাধারণ (General) এর সঙ্গে বিশেষ (part .এর উপমা দিব, না বিশেষের সঙ্গে সাধারণের উপমা দিব। অ(নিশি একটী, পূর্ণিমার চাঁদও একটী; তাহাদের সঙ্গে এতগুলো ন তুলনা দিব কেন? আর সমস্ত 'বানর' 'ছুঁচোর' মুখের স(তোম । আমার মুখের তুলনা দিব কেন? কোন্‌টা সঙ্গত?

বিবিধ কবিতা।

হাস্যাস্পদ।

বিচারক পক্ষপাতী, মানী পরাধীন,
কৃপণ ঐশ্বর্য্যশালী, গৃহী ধনহীন
সুখী পরবশ, বৃদ্ধ নহে তীর্থাশ্রিত,
মূর্খ উচ্চকুল, রাজা কুমন্ত্রি-চালিত,
বেদান্তী সে দুরাচার, স্ত্রীর বশ নর,
ইহা হ'তে হাস্যাস্পদ কি আছে অপর ?

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ, পরবশোমানী, দরিদ্রোগৃহী,
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ, সুখী পরবশো, বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ,
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ, কুলভবো মূর্খঃ, পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ, কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে ?

লক্ষ্মীছাড়া।

নিত্যকরে তৃণচ্ছেদ, ভূমি পরে নখেতে লিখন,
হেলা পাদ প্রক্ষালনে, অযতনে দন্তের মার্জ্জন,
বদনের মলিনতা, রুক্ষ কেশ, নিদ্রাদি সন্ধ্যায়,
অত্যাহার, বিবস্ত্রশয়ন, হাস্য কথায় কথায়,
পিঁড়ার উপর বাদ্য, স্বদেহেও বাদ্যের তাড়ন,
ধনেশেও ছাড়ে লক্ষ্মী, হেন যদি তার আচরণ।

নিত্যংছেদস্তৃণানাং, ক্ষিতিনখলিখনং, পাদয়োরল্পপূজা,
দন্তানামল্পশৌচং, বদনমলিনতা, রুক্ষতামূর্দ্ধজানাং,
দ্বে সন্ধ্যে জাপি নিদ্রা, বিবসন শয়নং, গ্রাসহাতিরেকং,
সাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং, হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীং।

কাক কোকিল।

কাক কালো পিক কালো, দোঁহামাঝে কোথায় অ
বসন্ত সময় এলে কাক কাক, কোকিল কোকিল।

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কোভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্ত সময়ে প্রাপ্তে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

চোর না মানে ধর্ম্মের কাহিনী।

মৃণালের তন্তু দিয়া সর্প কি বাঁধিবে?
শিরীষকুসুমবৃন্তে হীরা কি বিঁধিবে?
মধুবিন্দু দিয়ে সিন্ধু করিবে মধুর?
সুকথায় গলাইবে চিত্ত অসাধুর?

ব্যালং বালমৃণাল তন্তুভিরসৌ রোদ্ধুং সমুজ্জৃম্ভতে
ভেত্তুং বজ্রমণিং শিরীষকুসুমপ্রান্তেন সন্নহ্যাতি
মাধুর্য্যং মধুবিন্দুনা রচয়িতুং ক্ষীরাম্বুধেরীহতে
নেতুং বাঞ্ছতি যঃ সতাং পথি খলান্ সূক্তৈঃ সুধাস্যান্দিভিঃ

মৌনই শোভন।

ভালই করেছ পিক চুপ করে রয়েছ আষাঢ়ে
মৌনই সেথায় শোভে ভেকেরা যেথায় ডাক ছাড়ে।

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে
দদ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনং।

দেব দুর্ব্বল ঘাতক।

অশ্ব নয়, গজ নয়, তারা বলবান্
কে কোথায় শুনিয়াছে ব্যাঘ্র বলিদান,
দেবী পূজা তরে নর ছাগ হন্তারক
জানাইত আছে দেব দুর্ব্বল-ঘাতক।

অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব নৈব চ।
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবো দুর্ব্বল ঘাতকঃ॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈয়াকরণ-বৈঠক।

সভাপতির বক্তৃতা।

"মঙ্গলাচরণ চাই সকল ক্রিয়ায় ;
মোদের জাতীয় এই প্রাচ্য প্রথা, ক্রমে
হইতেছে লোপ, প্রতীচীন সভ্যতায়।
স্বরবর্ণ লিখিবার পূর্ব্বে, পাঠশালে
সিদ্ধিরস্তু উচ্চারণ করিতে হইত ;
প্রথমে গণেশাঙ্কুর হইত লিখিতে
হলবর্ণ-হস্তলিপি-সাধন-সময়ে।
গণপতি সিদ্ধিদাতা লেখক প্রবীণ ;
তাঁহারে স্মরিয়া ছাত্রগণ পাঠশালে
ভূষাকালী তালপত্রে শরের কলমে
শিখিত লিখিতে ভাষা অতি অল্প ব্যয়ে।
অর্থনীতিবিশারদ পূর্ব্বপুরুষেরা
কিরূপ ছিলেন তা'র প্রকৃষ্ট প্রমাণ
পাইতেছি এইরূপে সকল বিষয়ে।
একখণ্ড চকমকি-প্রস্তরে তাঁহারা
অবলীলাক্রমে সপ্তপুরুষ ক্রমশঃ
কাটাইয়া গিয়াছেন—ক্লেশ পান নাই
অগ্নির অভাবে কভু ; এখন আমরা
তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থরাশি লয়ে
উড়াইয়া ফেলিতেছি সাগরের পারে
দীপকাঠে, তাম্রকূটবর্ত্তিকা-সেবনে !

(কতিপয় সভ্যের চুরট ত্যাগ

জ্বলেনা সে কাষ্ঠ ভাল, কত নষ্ট হয়
বর্ষার সময়ে, কিন্তু কভু শুনি নাই
চকমকি অগ্নিদানে হয়েছে বিমুখ।
লাল, পীত, নীল, কাল বিবিধ বর্ণের
বিবিধ প্রকার কালী, লেখনী, কাগজ
সাগর লঙ্ঘিয়া দেশ ফেলেছে ছাইয়া,
দেশের শুষিছে অর্থ ভাবিনা ত তাহা
বিলাতী বলিয়া বরং করিয়া বড়াই
ঔৎকর্ষের পরিচয় দিতে যাই মোরা।
মসৃণ কাগজ কিবা চাক্যচিক্যময়!
কেমন সুন্দর কালী!! অয়স লেখনী!!!
—কিন্তু জীর্ণ হয়ে পড়ে লেখনী সত্বর,
লেখা হ'তে কালী লোপ হয় অল্প দিনে,
কাগজও উইয়ের স্তূপে হয় পরিণত।
পূর্ব্বেকার মত কিন্তু পাইনা দেখিতে
সুন্দর হাতের লেখা; বুঝিতাম বায়
সার্থক হতেছে এবে, যদি হস্তলিপি
করিত উন্নতি লাভ সেই অনুপাতে।
অজস্র যেতেছে চলে, বিদেশে কেবল
অর্থরাশি, স্বদেশের দারিদ্র্য বাড়ায়ে।

(গুন্গুন-গুন্গুন)

দ্বিতীয় প্রস্তাব এবে করিতে সভায়
প্রথম বৈয়াকরণে করি অনুরোধ।"

(করতালি ধ্বনি—সভাপতির আসন গ্রহণ ও তদনন্তর প্রথম বৈয়াকরণের দ্বিতীয় প্রস্তাব হস্তে উত্থান।)

প্রথম বৈয়াকরণ বলিলেন :—

"সভাপতি মহাশয়, সভ্যভ্রাতাগণ,
দ্বিতীয় প্রস্তাব এই করি নিবেদন।
ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে ঙ, ঞ, ণ, ড়, ঢ়, য়,
এই গুলি একেবারে লোপ করা হোক।
দুইটি "ব"য়ের কোন প্রয়োজন নাই,
অতএব একটিকে দেন অব্যাহতি।
"জ" ও "য"র মধ্যে থাক একটি যে হয়।
তিন "শ"র দুই জন লউন বিদায়।
এইরূপে দশটি অক্ষর কমাইয়া
করুন সহজসাধ্য ভাষা আপনারা;
অদ্যকার এইমাত্র প্রস্তাব আমার।"

দ্বিতীয় বৈয়াকরণ বলিলেন :—

"কথিত প্রস্তাব আমি করি সমর্থন।
ঙ, ঞ, শ, ষ, ন, য, এ কয় অক্ষর
প্রাকৃত ভাষায় নাই জানেন সকলে,
পালিতেও নাই শ, ষ; বাঙ্গালায় এবে
অনুস্বর পুরাইবে "ঙ"য়ের অভাব
—যেমন বাঙ্গলা = বাংলা, কিঙ্কর = কিংকর;
করিবে অভাব পূর্ণ "ন"য়েতে "ঞ"য়ের,—
চঞ্চল = চন্‌চল যথা ঝঞ্ঝট = ঝন্‌ঝট;
সম্পূর্ণ সমর্থ "ন" লইতে "ণ"র ভার।

ড়, ঢ়, য়, কেবল ড, ঢ, য, এর বিকার
প্রভেদ ফুটুলিমাত্র—এতিন অক্ষর,
সংস্কৃতে পৃথক নাই লক্ষ্য করিবেন।
দুটি "ব" বাহুল্যমাত্র, কোন ক্ষতি নাই
একেরে উঠায়ে দিলে। "জ" ও "য"র মধ্যে
"য" রাখিতে হয় সুধু "য়"এর কারণ।
এক "স" পূরাবে আর দু"শ"র অভাব।
উপযুক্ত এ প্রস্তাব ; কিন্তু এ সভায়
পূর্ব্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যাহা
তাহাতে গৃহীত ইহা হইবে, এরূপ
আশা করিবার নাই ভরসা আমার।"

গাম্ভিক বলিলেন :—

"উষ্ণীষের ব্যবহার পুরাকালে ছিল,
এক্ষণে তাহার স্থান শ্যামলা পিরিলি
প্রভৃতি পাগড়িগুলি করে অধিকার।
ভবিষ্যতে টুপি, স্বীয় আধিপত্য, ক্রমে
বিস্তার করিয়া, ধ্বংস করিবে সমূলে
বিভিন্ন পাগড়িকুল। শত বর্ষ পরে,
লজেঞ্জিসে হরিলুট চলিবে যখন,
টুপিধারী হিন্দুগণে দেখিয়া, তখন,
পাগড়ি বা উষ্ণীষের কথা পুরাতন
কে স্মরণ করাইয়া দিবে সভ্যগণ,
"ঙ" যদি অন্তর্হিত হয় ভাষা হ'তে ?
অতীত ও অনাগত মধ্যে দাঁড়াইয়া
যতদিন রবে ভাষা ততদিন "ঙ"

জাতীয় পরিচ্ছদের নমুনা মাথায়
করিয়া করিবে পূর্ব্ব গৌরব প্রচার।
পুরাতন পরিচ্ছদগৌরবের লোপ
করিতে চাহি না আমি ওরে বধিয়া।
পৃষ্ঠেতে পালান "ঞ"র—সেও দেয় হায়,
এ জাতির প্রকৃতির পরিচয় সদা!
পালে পালে পুত্র-কন্যা-ভারে প্রপীড়িত
বাঙ্গালীজাতির কথা ঘোষিছে নীরবে!!
অসময়ে সংসারের ভার স্কন্ধে করি
নাই আর কোন জাতি, এ জাতি ব্যতীত,
দুর্ব্বল প্রকৃতি, হেন উদ্যমবিহীন!
জাতীয় প্রকৃতি নাহি হয় যতদিন
সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন—ততদিন ঞ
শতমুখে নিন্দাবাদ করুক মোদের।
"ড়, ঢ়, য়"—"ড, ঢ, য" এর বিকার কেবল—
যথার্থ একথা—ভেদ ফুটুলি সুধুই।
ফুটুলি ব্যতীত আর কি আছে এমন
জাতীয় সম্বল বল, সভ্য ভ্রাতাগণ?
তাহাও পশ্চাতে, নহে সম্মুখে কখন।
"ড-ঢ-য" হইতে যিনি পৃথক "ড়ঢ়য়ে"
করে দিয়াছেন, তিনি অতি বুদ্ধিমান—
দেখেছেন, বুঝেছেন, একান্নে থাকিয়া
বাড়িতেছে এ জাতির কলহ কেবল।
গৃহবিসম্বাদে তাই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া
পাছে নষ্ট হয় ভাষা ভাবিয়া যেজন

দিয়াছেন করিয়া পৃথক ওদের,
তাঁরে আমি দিই শত শত ধন্যবাদ।
দুটি "ব"র বটে কোন নাই প্রয়োজন,
তিন "শ" বলিছে কিন্তু—"শ' ষ' স' এখন—
তারপর হ, অর্থাৎ নানা অসুবিধা
পুনঃ পুনঃ সহ্য করে চল, হে সজ্জন,
যদ্যপি হইতে চাও সিদ্ধ মহাজন।
শুনিয়া ওদের মুখে এই উপদেশ
নাই কিছু মাত্র ইচ্ছা কোনই অক্ষরে
তুলে দিতে ভাষা হ'তে। তাই এ প্রস্তাব
গ্রহণ করিতে নাই আগ্রহ আমার।

াসক বলিলেন :—

"আমার একটি প্রশ্ন আছে এ প্রস্তাবে।
"ন" ও "ণ" এদের মধ্যে কোন্‌টি থাকিবে ?
সেইরূপ—"য" ও "জ"র কোন্‌টি চাহেন ?
তিনটি "শ"এর মধ্যে কোনটি রহিবে ?
পূর্ব্বাহ্ণে জিজ্ঞাসা করি' সংগ্রহ করেছি
সমস্ত সভ্যের যত মতামত আমি।
কারো চক্ষে "ন" লেগেছে বড়ই সুন্দর,
কেহ বা বলেন "ণ" অতি মনোহর ;
সেইরূপ—"জ" ও"য"য়ে হয়েছে দুদল।
তিন "শ" বেঁধেছে, তিন দলে সভ্যগণে,
নিজনিজ সৌন্দর্য্যেতে মোহিত করিয়া।
বেধেছে বিষম গোল কঠিন সঙ্কট।
এ গোল সহজে মিটে না দেখি উপায়।

যে যা'রে সুন্দর দেখে সেই তা'রে সেবে ;
সৌন্দর্য্য-নিরাকরণ করিতে কখন
পারে নাই কেহ কভু যুক্তি তর্ক দিয়া,
তখন কিরূপে আমি অন্যে অনুরোধ,
করি বল স্বীয় প্রিয়দর্শন ত্যজিয়া
অন্য বর্ণে দৃষ্টিপাত করিতে সহসা ?
পারি না করিতে যাহা নিজেই কখন
পরকে করিতে তাহা বলা অকারণ।
যে যা'র সৌন্দর্য্যে মজিয়াছে, সভ্যগণ,
সে তারে রাখিতে এবে করিবে যতন
প্রাণপণে। অতএব সভ্য বন্ধুগণ,
একমত হয়ে সবে এ প্রস্তাব এবে
প্রত্যাহার করে নিন—মম অনুরোধ !"

মন্ত্রসাধক বলিলেন :—

"সৃষ্টিতত্ত্বমূলে শব্দ—শব্দ হ'তে সব,
ইহা সনাতন গূঢ় বিবর্ত্তন-নীতি।
কণ্ঠতালু মূর্দ্ধা আদি ভিন্ন স্থান হ'তে
প্রতি অক্ষরের হয় ভিন্ন উচ্চারণ।
সেই উচ্চারণ, শব্দ কিম্বা সুর বল,
করে সংক্ষোভিত ব্যোম। সে সংক্ষোভে হয়
বিভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি,—তাই অক্ষরের
অভিধান বর্ণমালা। প্রতি বর্ণমূলে
সংখ্যা সদ্য বিরাজিত—নিষেধ এসব
যোগের রহস্য বলা। দৃষ্টি-প্রকরণ

চাহেন বুঝিতে যদি তবে যোগপথ
অনুসর' ধীরভাবে কিছুকাল ধরি।
তখন বুঝিতে আর রবে না সন্দেহ
কি মহান্ অত্যদ্ভুত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপার!
অতীন্দ্রিয় জগতের কি সূক্ষ্ম নিয়ম!!
সূক্ষ্ম হ'তে স্থূল সৃষ্টি হয় কি প্রকারে!!!
সংস্কৃত অক্ষরগুলি নহে কাল্পনিক।
এই বিশ্বে বর্ণন্যাস হ'তে পারে যত
তাহা সব সংস্কৃত-অক্ষরে নিহিত
আছে অতি সূক্ষ্মরূপে,—হয় বিকসিত
উচ্চারণে ক্রমান্বয়ে; তাই এই ভাষা
সম্পূর্ণ সুন্দর বলে বিদিত ধরায়।
প্রত্যেক বর্ণের সুর পৃথক্ পৃথক্।
সুর ঠিক হ'লে মন্ত্র হয় কার্য্যকরী
অন্যথায় বিঘ্ন হয় জানে যোগীগণ।
তাই তাঁরা বারম্বার প্রণবোচ্চারণ
স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে করেন নিষেধ।
কিন্তু হায় এবে দেখি যথায় তথায়
প্রণবের ছড়াছড়ি হতেছে ভাষায়!
বিষয়-কলুষচিত্তে, মলিন এ দেহে
প্রণব ধ্বনিত হয়ে, আনিছে সতত
রাশি রাশি বিঘ্ন, ধ্বংশ করিতে ভারতে।
সভ্যগণে তাই আমি করি অনুরোধ
বর্ণ-বিপর্য্যয় যেন না ঘটান কেহ।
করুন বরং সবে এরূপ প্রস্তাব,—

যাহাতে বর্ণগুলির ঠিক উচ্চারণ
প্রচলিত হয় শীঘ্র এ বঙ্গ ভাষায়।
মন্ত্রস্তোত্রগুলি ক্রমে হতেছে মুদ্রিত
দেশীয় ভাষায়, কিন্তু উচ্চারণ দোষে
হবেনা তাহাতে কিছু মাত্র ফলোদয়।
মাতৃভাষা আমাদের এখনও শিশু
করুক সে সংস্কৃতমাতৃস্তনপান।"

রসায়নরসিক বলিলেন ঃ—

"অতি ভয়ঙ্কর কথা "মাতৃস্তন্যপান"!
উক্ত কথা পোষকতা করিয়া আমরা
প্রসিদ্ধ পাশ্চত্য বুধসমাজে নিন্দিত
হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিনা পোষণ!
কে না জানে স্তন্যপানে দুগ্ধের সহিত
দেহে হয় নান' রোগ, পাপ, সংক্রামিত ?*
সংস্কৃতের স্তন্যপানে বহু অশ্লীলতা
ক্রমে হবে সংক্রামিত ভাষার শিরায়।
ভাষা হ'তে সঞ্চারিত হইয়া সে পাপ

* "Dr. Bronzet (Surl' Education Médicinale des infant: 165) has such a bad opinion of human mother, that he expr a wish for the state to interfere and prevent them from suc their children, lest they should communicate immorality disease ! A still more determined pessmist was the famous ch Van Helmont who thought life had been reduced to its pr shortness by our imborn propensities and proposed to subs bread boiled in bear and honey for milk, which latter he "brute's food." and Vide encyclo : Britannica.

জাতীয় চরিত্র ক্রমে করিবে নির্ব্বাণ
এখনো যা কিছু আছে ক্ষীণ তেজকণা।
হইবে ক্ষীণায়ু ভাষা, অল্পায়ু জাতির।
দুগ্ধপান ব্যবস্থার প্রস্তাব সহসা
কি সাহসে এ সভায় হ'ল উত্থাপিত
বুঝিতে পারি না আমি! "পশুর যে খাদ্য"
দিয়া তুলে তাহা মা'র মুখে, সভ্যগণ,
মাতৃভক্তি পরাকাষ্ঠা দেখাতে কি চা'ন?
অথবা কলির এই ধর্ম্ম অনুরূপ!
আমরা কলির চেলা—সে ধর্ম্ম এখন
করিব সকলে প্রাণ-পণে সংরক্ষণ!"
এত বলি রোষ ভরে সভাস্থল ত্যজি
রাজমার্গে দ্রুত বক্তা আসি উপস্থিত।
পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে এসে কতিপয়
ধরিয়া তাঁহারে ফিরাইল সভ্যাবলী।

তখন বেধেছে গোল সভায় বিষম;
ছাড়াইয়া ভদ্রতার সীমা এক কালে
উঠেছে সপ্তমস্বরে বহুকণ্ঠস্বর।
কারওবা মুখের শিরা উঠেছে ফুলিয়া;
কা'রও বা লোহিত নেত্র উঠেছে কপালে।
সে তুফান থামাইতে উঠিয়া তখন
সভাপতি মহাশয় বলিলেন যথা :—
"সভ্যগণ, ক্ষান্ত হ'ন। এ মহাযজ্ঞের
এখনও অনেক বাকী পূর্ণাহুতি দিতে।

অনুরোধ করি সবে, যেন আমাদের
যজ্ঞ পণ্ড নাহি হয় রাগ অভিমানে।
সমগ্র সভ্য জগৎ বিস্ফারিত নেত্রে
চেয়ে আছে সবিস্ময়ে এ সভার প্রতি
করিয়া স্মরণ ইহা, করুন সকলে
ধীরভাবে আলোচনা সকল বিষয়।
আমাদের অভিনয়, বৈদ্যুতিক তার
পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে
শিহরিয়া উঠি, ব্যক্ত করিছে নিমিষে।
হে রসিক মহাশয়, আপনি এক্ষণে
করুন আপন কার্য্য, ত্যজি অভিমান।
যজ্ঞোপকরণগুলি তন্ন তন্ন করে'
পরীক্ষা করিয়া ধীর, মতামত তব
নাহি প্রকাশিলে, কেমন এ যজ্ঞ মোরা
পারিব সাধিতে পূর্ণ যশের সহিত ?"

রাজনীতিজ্ঞ বলিলেন :—

"অনেকের ধারণা যে "সামর্থ্য সংখ্যায়,"
সেই হেতু এ প্রস্তাব নহে গ্রহণীয় !
সুধাই প্রত্যেক সভ্যে এ মহা সভায়
সপ্তকোটি জনসংখ্যা নয় কি মোদের ?

(সভাস্থলে চতুর্দ্দিক হ'তে "হুঁ।" "হুঁ।" ধ্বনি।)

কিন্তু ভূমণ্ডলে হেন আর কোন জাতি
নির্জ্জীব, দুর্ব্বল, ভণ্ড, পরশ্রীকাতর
পরাধীন গর্ব্বী আছে আমাদের মত ?

(সভা স্থলে "নাই নাই" শব্দ চতুর্দ্দিকে)
করে বৃদ্ধি দুর্ব্বলতাসংখ্যা কেনা জানে
একতা অভাবে নিত্য ? সংখ্যায় কেবল,
হয় নাই কোন জাতি কভু বলবান।
এক অশ্ব টেনে লয়ে যাইবে যে বেগে
রথখানি,—চারি অশ্ব চতুর্গুণ বেগে
টানিবে নিশ্চয় তাহা। কিন্তু একদিকে
না যোজিয়া চারি অশ্ব যোজি চারি দিকে
চালাইতে গেলে, রথ হইবে অচল।
সেইরূপ ব্যাকরণ রথখানি এবে
মোরা দশজনে যদি টানি প্রাণপণ
দশদিক হ'তে, তা'য় স্থাপিয়া ভাষায়
এগোবে না একপদ কোন দিকে কভু।
একত্বে প্রাধান্য হয়; দৃষ্টান্ত তাহার,—
ছাব্বিশ অক্ষরে ভাষা ইংরাজজাতির
—হইতে চলেছে আজি পৃথিবীর ভাষা ;
বর্ণমালা কিন্তু প্রায় দ্বিগুণ তাহার
তথাপি এ সংস্কৃত মৃত আমাদের।
তাই আমি সভ্যগণে বলি বারম্বার—
এ প্রস্তাব গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করুন—
হবে না কোনই ক্ষতি ভাষার তাহাতে
আমরা সকলে যদি হই একমত।"

ণী বলিলেন :—

"ব্যঞ্জনের এ প্রস্তাবে এখন আমার
মতামত দিতে কুণ্ঠা হতেছে বিষম।
কারণ, বাধিবে গোল শেষে নানারূপ
এ সভায় উক্ত মত হইলে গৃহীত।

কারণ দেখুন—

করিতে হইবে যবে সন্ধির বিষয়
আলোচনা, সভ্যগণ, দু'দিবস পরে
তখনি উঠিবে গোল এ'রূপে প্রথমে :—
'বর্গের পঞ্চম বর্ণ রহিলে পশ্চাতে
বর্গের প্রথমবর্ণস্থানে সে বর্গের
হইবে পঞ্চম বর্ণ এই সূত্র এক
ভাঙ্গিয়া করিতে হ'বে সূত্র সৃষ্টি তিন।
ঙ, ঞ, লোপ যদি করিয়া এক্ষণে
বসান তা'দের স্থলে "অনুস্বর-ন"য়ে।
বাক্+ময়=বাঙ্ময় আছে, হ'বে বাংময়।
"যাচ্+না=যাচঞা" যদি নাহি করে কেহ
হ'তে পারে এ জাতির অনেক উন্নতি।
"রাজ্+না"="রাজ্ঞী"র কিন্তু লাঞ্ছনা করিলে
রাজদ্রোহী বলে মোরা হইব গণিত।
কি হ'বে "বিজ্ঞে"র দশা ভাবি তারপর।
সেইরূপ "জ"-"ব"-লোপে, সন্ধির সময়
তৃতীয় বর্ণের হ'বে অভাব বর্গের
প্রথম বর্ণের স্থলে প্রয়োজন হ'লে।
"স-"লোপে "তৎ+কর"-আর-"তস্কর"-রবে না
"বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি" হবে না কখন ;
"প্রেয়সী"র অঙ্গচ্ছেদ করি পুনরায়
নব অঙ্গ-সংযোজিত করিতে সাহস
ক'জনের হবে আমি বলিতে পারি না,
স্বামীর সন্তোষ জন্য যদ্যপি "প্রেয়সী"
নিজে হ'তে অঙ্গত্যাগ না করেন সতী।

"শ" বিলোপে হরি+চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র এবে
অনায়াসে স্বর্গলাভ করিবেন সুখে।
"ষ"-"ড়" লোপে হ'বে ঘোর "ষাঁড়ে"র দুর্গতি
হিন্দু হয়ে সহ্য তাহা করিতে নারিব।
এবম্বিধ-সন্ধি-লিঙ্গ-প্রকৃতি-প্রত্যয়ে
বিষম বিভ্রাট বহ্নি-উঠিবে-জ্বলিয়া!
নির্ব্বাণ করিতে সাধ্য হবে না তখন
চারিদিকে প্রসর্পিনী-তীব্র-জ্বালামালা;—
এক যোগে যদি সিঞ্চে সমগ্র জগৎ
সাগরের বারি, কোটি কোটি দমকলে।
তাই আমি করিতেছি প্রস্তাব এখন
ব্যঞ্জনের আলোচনা থাকুক স্থগিত।
তদ্ধিত, কৃদন্ত, সন্ধি প্রভৃতির আগে
আলোচনা করি, শেষে দেখিব আমরা
ব্যঞ্জনের কোন্ বর্ণ থাকিবে কি যা'বে।"

ত্র বলিলেন :—

"শেষোক্ত প্রস্তাব আমি করি-সমর্থন।
অতি সমীচীন কথা। অপমান করি—
তাড়াইব আজি যারে, কালি যদি পুনঃ
আনিতে তাহারে হয় করিয়া সাধনা,—
সে বড় লজ্জার কথা। কি বলিবে লোকে
দেখিলে মোদের নিন্দনীয় ব্যবহার?
সারা ব্যাকরণ মোরা তন্ন তন্ন করে
নিরীক্ষণ করি, করিব সে নির্দ্ধারণ

কোন ব্যঞ্জনের আছে নাই বা কাহার
প্রয়োজন এভাষায় সভ্যভ্রাতাগণ।"

তখন সকল সভ্য একমত হয়ে
করিলেন গ্রাহ্য এই শেষোক্ত প্রস্তাব।
সভাপতি মহাশয়ে ধন্যবাদ দিয়া
সে দিনের সভা ভঙ্গ হ'ল তারপর।
যেমতি বিচার-প্রার্থী, অর্থী-প্রত্যর্থীর
আন্দোলিত হয় মন সন্দেহদোলায়
যতদিন অভিযোগ নিষ্পত্তি না হয়
তেমতি ব্যঞ্জনগুলি আপন আপন
ললাটে কি আছে লেখা ভাবিয়া সম্প্রতি
অতিশয় উৎকণ্ঠায় কাটাইছে কাল।

শ্রীসত্যেন্দ্র ম

চুট্‌কী।

১। পাঁপরভাজা।

রসাত্মক কাব্য (Satire) সাহিত্যফলারে পাঁপরভাজা। রাচক বটে, কিন্তু অধিক খাইলে পেট-গরম ও বদ-হজম হয়, ঘটে, সাধারণ খাদ্য আর ভাল লাগে না। আরও দেখুন, । অবস্থায় অখাদ্য, মুখে তুলিতে ইচ্ছা করে না, দাঁতে ; কিন্তু ঘিয়ে ভাজিয়া গরম-গরম পাতে দিলে তোফা র, খাইতে বড় আরাম। ব্যঙ্গবিদ্রূপ জিনিসটারও সামাজিক পারিবারিক কুৎসা, ব্যক্তিবিশেষের কুৎসিত চরিত্র ইত্যাদি পকরণ। সেই কাঁচা অবস্থায় ঐ সব কুৎসা শুনিলে ভদ্রলোকে াঙ্গুল দেন, শুনিতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে ; কিন্তু যখন ্য সিদ্ধহস্ত হালুইকরের আর্টরূপ ঘিয়ে ভাজিয়া সেই পরনিন্দারূপ মাল পাঠকের পাতে দেওয়া যায়, তখন সেটা বড় উপাদেয় ।

২। প্রকৃতিভেদে প্রহরণ।

নারীজাতি (অবশ্য ইতর শ্রেণীর কথা বলিতেছি) কলহকালে নখদন্তের সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁহারা নরখাদক, হিংস্রজীবে আয়ুধব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা বিবাহকালে বা অন্য অভিভাবকের মস্তক ভক্ষণ ও বিবাহের পরে জীবটির মস্তক চর্ব্বণ করেন। অতএব ইঁহারা যে নরখাদ আর দ্বিতীয় প্রমাণ আবশ্যক নাই।

বাঙ্গালীবাবুরা দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে বেশ পটু। ত উদ্রেক হইলে ইঁহারা ডান হাত তুলিয়া চড়টা-চাপড় (ডার্ব্বিণের শিষ্যগণ অবশ্য অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিবেন।) সাহেবেরা ঐরূপ স্থলে খামকা লাথী মারিয়া বসে, সবুট ল অনেক নেটিভের প্লীহা ফাটে। পশুদের চাঁটমারার মত ি ইঁহাদের স্বাভাবিক। হাত ও পায়ের ব্যবহারের এই তফাৎ মনুষ্যপ্রকৃতিক ও পশুপ্রকৃতিক (তা দ্বিপদই হউক আর হউক) প্রাণীর প্রভেদটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আবার আমাদের মাপ হাতে, সাহেবদের মাপ পায়ে (ফুট)। এখা মনুষ্যপ্রকৃতিক প্রাণী ও পশুপ্রকৃতিক প্রাণীর প্রভেদ দেখা যাই তবে এক ঘোড়া মাপিবার সময় সাহেবেরা হাতের মাপ ব (hand অবশ্য আমাদের হাত—cubit হইতে ভিন্নার্থে), তাহার একটু ভাবিলেই বুঝা যায়! সে সময়ে একটা নিকৃষ্ট প্রাণীর সমুখাসমুখি হইয়া তাঁহারা যে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত একথাট পড়িয়া যায়।

৩। পাকা আম ও কাব্য সমালোচনা।

না যায়, এক দেশের রাজা জানিতে চাহিয়াছিলেন 'আম
রকম ?' (সে দেশটা অবশ্য হনুমান্‌জির প্রসাদে বঞ্চিত।)
ন, 'মহারাজ, একসের গুড় আর একসের তেঁতুল যোগাড়
আমি আপনাকে আম খাওয়াইতেছি।' জিনিস দুইটি
মন্ত্রী নিজের লম্বা দাড়ীতে তেঁতুলগোলা ও গুড় বেশ
মহারাজকে চাটিতে বলিলেন। রাজা বুঝিলেন, আমের
ুর আর তাহার কতকটা আঁশ আছে !

সমালোচক এইভাবে কাব্যের উপাদান বিশ্লেষণ করেন।
সমালোচনায় (a curious blending of humane
hos) রসিকতা ও কারুণ্যরসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ বলিয়া
পরাকাষ্ঠা দেখান। জলজ্ঞান ও অম্লজ্ঞান চাখিয়া দেখিলে
র স্বাদুতা, স্নিগ্ধতা অনুভব করা যায় ?

৪। ঘোম্‌টা।

বঙ্গসুন্দরীগণের মাথায় ঘোম্‌টা দেখিলেই আমার ঘেরাটোপের কথ মনে পড়ে। অনুপ্রাসের খাতিরে নহে, প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয় মূল্যবান্‌ বাক্স, পেটরার রং পাছে উঠিয়া বা জ্বলিয়া বা ময়লা হই ধূলামাটী পড়ে, সেই জন্য সৌখিন লোকে বাক্স, পেটরা ঘে ঢাকিয়া রাখে। (অনেক সৌভাগ্যবতীকেও ক্যাশবাক্স বলিয় রূপসীদের চাঁদমুখ পাছে ময়লা হইয়া যায়, তাই ঘো মুখখানি সর্ব্বদা ঢাকিয়া ঘিরিয়া রাখিলে বেশ কচি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কিরূপ বুঝেন জানি না, তবে আম বিধাতা যদি চাঁদের উপর একটা চন্দ্রাতপ গড়িয়া দিতেন, চন্দ্রে কলঙ্কের দাগ পড়িত না।

৫। রেলেটিভ প্রোনাউন।

রেলগাড়ীতে বা থিয়েটারের গ্যালারীতে সময়ে সময়ে লোক দেখা যায়, তাহারা হাজার অনুরোধেও নিজের জায়গ একচুলও নড়িবে না, নিজের আসবাব পত্র এক ইঞ্চি সর নেহাত ধরিয়া বসিলে হয়ত নিজে একটু সরিয়া পেটরাটা রাখিয়া ভদ্রতা রক্ষা করে। ইহাদের ব্যবহার দেখিলে ইং রেলেটিভ প্রোনাউনএর কথা মনে পড়ে। রেলেটিভ প্রো জায়গাটা দখল করিয়া বসে, সেখান হইতে কোনও কারণে না। তবে যদি তাহার পূর্ব্বে একটা preposition বসাইবার হয়, তবে সেই জন্য একটু জায়গা ছাড়িয়া দিয়া একটু হ ঠিক্‌ যেন নিজের আসবাব রাখিবার জন্য একটু সরিয়া বসা।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যা

বন্দনা।

চির বন্দিতা অয়ি আনন্দময়ী
অন্নদায়িনী জননি,
অয়ি সুন্দর ধরণি'!

উজ্জ্বল রবি-আলোকে নিত্য ভূষিতা
স্নিগ্ধ ধবল-ইন্দুকিরণ-হসিতা
চারু বিচিত্র বরণি!
নমোনমঃ মম জননি!

তব শিরে হিমাচল বৃদ্ধতাপস
যুগযুগান্ত ধরিয়া
নীরব আশীষ বরষে।

সুনীল সিন্ধু ফেনিল উর্ম্মি তুলিয়া
ছুটে অনুখন তটবন্ধন ভুলিয়া
চরণে লুটিতে হরষে।

ওই নির্ম্মল নীল অসীম আকাশ
অনিমেষ আঁখি মেলিয়া
নিশিদিন আছে চাহিয়া।

সুরধুনী-তব করুণা অমিয়বাহিনী—
বহে অবিরল, কতনা পুণ্যকাহিনী
কল্লোল রবে গাহিয়া।

সদা গুঞ্জিত তব কুঞ্জে কুঞ্জে
কতনা মঞ্জুরাগিনী!
ঝিল্লিমুখরা রজনী;

বিহগবৃন্দ গাহে শত বনসভাতে
কুসুমপুঞ্জ ফুটে প্রতি নব প্রভাতে,
গন্ধামোদিত অবনী।
নমোনমঃ মম জননি!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

মহানাটক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দধিমুখের প্রবেশ।

দধিমুখ।— (প্রণাম করিয়া) সুগ্রীবের জয় হোক্!

শোনোগো সুগ্রীব! তব প্রেরিত বানর-
জানকীরে চারিদিকে
করি' অন্বেষণ,
বিন্ধ্য-পরবতে উঠি', উপভোগ করিবারে
গভীর অরণ্য-মাঝে
করিয়া গমন,
বনের দেবতাগণে আরাধিয়া, তাঁহাদের
প্রীতিদত্ত ফলগুলি
করিল ভক্ষণ॥

(হনুমানের আগমন-বার্ত্তা না জানিয়া সুগ্রীবের প্রতি রাম)

রাম।— এক মাস হল, হনু গিয়াছে লঙ্কায়,
এখনো সে প্রত্যাগত হল না হেথায়।
যদি না সে লঙ্কাধামে বদ্ধ হয়ে রয়,
দূতের বিলম্বে শুভ জানিবে নিশ্চয়॥

(দধিমুখ-প্রমুখাৎ হনুমানের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সুগ্রীব রামের প্র

গ্রীব।— আমাদের রাজাদেরি একমাত্র-ভোগ্য হেথা
আছে মধুবন;
সাধি' নিজ কার্য্য এবে বন ভাঙি' ভুঞ্জে সেথা
পবন-নন্দন॥

এইরূপ দুই জনে   পরস্পর হইতেছে
কথোপকথন
হেনকালে স্মিতমুখে   কিলকিল-রবে হনু
করে আগমন।

মরুত-চুম্বিত চারু   মনোহর লোমরাজি যার,
যে প্রধান সেনাপতি   সুগ্রীবের সৈন্যের মাঝার,

সেই হনুমান যবে   রাম-সন্নিধানে আসি
হল উপনীত,
বিরহী রামের চক্ষে   সাক্ষাৎ বসন্ত যেন
হল সমুদিত॥

রাম।— শোনো বলি হনুমান মরুত-নন্দন!

হনু।— কি আদেশ, কহ প্রভু, করিব পালন।

রাম।— দেখিয়াছ জানকীরে?—আছেন জীবিত?

জীবিত আছেন তিনি।

করেন কি শোক আমা তরে?

শোকেতে কাতর তিনি।

বিশীর্ণ কি বিচ্ছেদের তরে?

দেখিনু, বড়ই কৃশ।

কথা কিছু বলেন বিশেষ?

"হা! রাম—হা লক্ষ্মণ!"

পাঠাইলেন কোনো কি সন্দেশ?

পাঠাইলেন তিনি এই মনোহর চূড়ামণি, লহগো নরেশ!

(অভিজ্ঞান-চূড়ামণি রামের হস্তে অর্পণ)

মণিটি কণ্ঠেতে রাম   বহুক্ষণ করেন প্রয়োগ;
রাখি' বক্ষে, মহোল্লাসে,   প্রিয়াস্পর্শ করেন সম্ভোগ।
প্রেমভরে জিজ্ঞাসেন   বারম্বার সীতার কুশল;
অশ্রুপ্লুত স্থির-নেত্রে   দেখেন সে মণিটি কেবল।

হনু।— জানকীর গণ্ডস্থলে তিলক কাটিয়াছিলে
মনঃশিলা করিয়া ঘর্ষণ ;
তাঁর বক্ষস্পর্শ হেতু কাকেরে করিলে কাণা
—এ কথা কি আছয়ে স্মরণ ?

(রাম হনুমানকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে রামের প্রতি হনুমান)

হনু।— এখনো সে অম্বুনিধি করি নাই পান,
এখনো করিনি চূর্ণ লঙ্কাপুরীখান ;
আনি নাই রাবণের মুণ্ডগুলি, অথবা সীতায় ;
আমি শুধু বার্ত্তাহর —বার্ত্তা তাঁর আনিনু হেথায়।
আলিঙ্গন-পুরস্কার —তার যোগ্য নহিগো এখনি।
এই বাক্যে, হইলেন স্মিতানন রাম রঘুমণি॥

রাম।— হনুমান্ ! তুমি যখন লঙ্কাপুরী দগ্ধ করে' এসেছ, তখন তুমি কি না করেছ ?

হনু।— প্রতাপ-অনলে তব অগ্রেই সে লঙ্কা প্রভো
হয়েছে দহন ;
উপলক্ষ হয়ে শুধু আমি পরে করিয়াছি
বহ্নি অরপণ॥

রাম।— হনুমান ! তুমি যখন এই সমুদ্র লঙ্ঘন করেছ, তখন করেছ ?

হনু।— প্রতাপ-তপনে তব ওহে নাথ, অম্ভোনিধি
হইল শোষণ।
স্থল-পথে তাই দেব লঙ্কায় অশঙ্ক হয়ে
করিনু গমন।
রাবণ-নাগরীদের অশ্রুজলে সিন্ধু যদি
পরিপূর্ণ না হ'ত আবার,
তাহলে ত স্থল-পথে আসিতাম, উল্লম্ফনে
প্রয়োজন হত না আমার॥

(দুই জনে উপবেশন করিয়া)

রাম।— কোথা এবে তব সীতা ?

হনু।— রাবণ-রক্ষিত এক
কাননেতে বসতি তাঁহার।

রাম।— বল'—সে কিরূপ পথ ?

হনু।— সাগরে বেষ্টিত উহা
—দৈবযোগে হইয়াছি পার।

(বিহ্বল ও লজ্জাভয়ে সচকিত—কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পরে)

রাম।— সীতা কি বল্লেন ?

হনু।—তিনি এই কথা বল্লেন :—

রঘুনন্দন রাম   শ্রীরাম শ্রীরাম
ভরতাগ্রজ রাম   শ্রীরাম শ্রীরাম
রণ-কর্কশ রাম   শ্রীরাম শ্রীরাম
ভব-শরেণ্য রাম   শ্রীরাম শ্রীরাম !

(সীতা কিরূপ দেখিতে রামের প্রত্যয়ার্থ বর্ণনা করত)

তাঁর কাছে—ইন্দু যেন   বিলিপ্ত অঞ্জনে,
মৃগী-নেত্র সঙ্কুচিত   হেন লয় মনে।
রক্তিম পল্লব নব   যেন পরিম্লানা ;
সুবর্ণের আভা যেন   মনে হয় শ্যামা।
কোকিল-মধুর স্বর   তীব্র অতিশয়,
ময়ূরের পুচ্ছরাজি   তুচ্ছ বোধ হয়॥

বিরহে সীতার অঙ্গসৌষ্ঠব এখন কিরূপ বল দেখি হনুমান ?

হয়েছেন এত কৃশ   —প্রতিপদ-চন্দ্রকলা
স্থূল বলি হয় অনুমান ;
পাণ্ডুর-বরণ হেন   —মৃণালের পাণ্ডুকান্তি
তার কাছে হয় নীল জ্ঞান।
তম্বঙ্গী স্বভাবত ;—   বিচ্ছেদেতে বাড়িল ক্ষীণতা ;
প্রতিপদ-তিথি-দিনে   পাঠকের বিদ্যা হয় যথা।

রাম।— তুমি সমুদ্র কি করে' উত্তীর্ণ হলে ?

হনু।— শাখায়-শাখায়, পারে শাখা-মৃগ-করিতে গমন,
তোমারি প্রভাবে প্রভু করিনু এ সাগর লঙ্ঘন।
তব রাম-নাম জপি' পাপিষ্ঠ পামর যারা
তারাও যে ভবের জলধি হয় পার ;
এ অঙ্গুলী-মুদ্রা তব চির-অঙ্গ-সঙ্গী যার,
সাগর লঙ্ঘন করা বিচিত্র কি তার !

রাম।— দেবের অজেয় যেই মহাপুরী—খ্যাত লঙ্কা নামে,
কেমনে দহিলে তাহা সেই দশানন বিদ্যমানে ?

হনু।— সীতার নিঃশ্বাস, আর হে রাজন্ ! তব কোপানল
দহিল সে লঙ্কাপুরী আমি হ'নু নিমিত্ত কেবল।

রাম।— রাবণকে জয় করে' তার পর তুমি কি করলে ?

হনু।— বহুগ্রীব বহুভুজ, বিশ-হস্ত, বহুমুখ
—দীপ্তি পায় যাহে দংষ্ট্রা ঘোর
হেন রক্ষরাজে আমি দর্শন করিনু যেই
—বধিবারে ইচ্ছা হ'ল মোর।
তব কৃপা-বলে যার বুদ্ধির বিকাশ হয়
—কি আছে অসাধ্য কাজ
তার পক্ষে এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু করিলাম মনে, —প্রভুর কর্ত্তব্য কাজ
দাসের উচিত নয়,
তাই আমি ছাড়িনু রাবণে।

রাম।— সাধু কপিবর তুমি ! ধন্য তব বীর্য্য মোর কাছে ;
ধিক্ মোর বাহুবলে— রাবণ সে আজো বেঁচে আছে।
সীতার উদ্ধার কাজে আমি নিজে সমর্পিব প্রাণ,
লঙ্কার দহনে আমি তব কাছে ঋণী হনুমান।

হনু।— আমা-সম তব ভৃত্য হে রাঘব ! আছয়ে অনেক ;
এমন গুণের স্বামী তোমা-সম নাহি মিলে এক॥

বিজয়-দশমী তিথি, আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষ,
"দ্বিবিদ"-বানর আদি যূথনাথ কপি লক্ষ-লক্ষ
লইয়া আপন-সাথে —ব্যাপ্ত করি' দিগন্ত আকাশ,
চলিলেন রামচন্দ্র রাবণেরে করিতে বিনাশ।
উল্লম্ফে আবরি' নভ কিলকিলা-শব্দে দিক্
করিয়া ধ্বনিত,
ভাঙ্গিয়া কানন গিরি, সরবতঃ ধরণীরে
করিয়া কম্পিত,
সুগ্রীবের কপি-সৈন্য রামের প্রস্থান কালে
হয়ে হৃষ্টচিত,
লঙ্কাপুরী-অভিমুখে
হইল প্রস্থিত ॥

কমঠের পৃষ্ঠদেশ করিয়া নমিত,
অনন্তের দন্তাবলি করিয়া স্খলিত,
উৎকট বরাহ-দংষ্ট্রা করিয়া চালিত,
গজেন্দ্র-কুম্ভের মুক্তা করিয়া স্ফুরিত,
কুলগিরিদের সবে করিয়া টলিত,
চলিল রামের এই সৈন্য অগণিত ॥

অবনী মজ্জিত, গিরি বিচলিত,
বিক্ষুব্ধ সাগর;
কূর্ম্ম আকুঞ্চিত, অহিপতি ভীত,
ত্রস্ত বজ্রধর ॥
হেলায় করিলা জয় যে সব নৃপতিচয়
তাহারাও চকিত অন্তরে।
লঙ্কাপুরে বিভীষণ হেরি' সৈন্য-আগমন
বাঞ্ছা করে যেতে স্থানান্তরে ॥

(সমুদ্র তীরাবস্থিত রাম স্বগত)

সিন্ধু-পারে লঙ্কাপুরী, চতুর্দ্দিকে অভ্রভেদী
প্রাচীর বেষ্টিত।

সিংহবেষী মহাবল কুম্ভকর্ণ আদি বীর
যথা অধিষ্ঠিত।
শাক্তিক রাবণ সে যে, ভ্রাতা মোর শিশু অতি,
সখা মোর ক্ষুদ্র কপিগণ :—
এইরূপ ভাবি মনে রঘুকুল-সিংহ যুবা
কোদণ্ড করে নিরীক্ষণ ॥

সুগ্রীব :—(রামকে বিষণ্ণ দেখিয়া)

আজ্ঞা কর মোরে রাজা— রাজাদের কুলগুরু তুমি !
উৎপাটিয়া আনিব কি শঙ্কাহীন সেই লঙ্কাভূমি ?
গিরিতট চূর্ণ করি' বাঁধিব কি সেতু মোরা ?
—আটক হইবে তাহে সাগর তরঙ্গ।
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে করিবে চীৎকার ঘোর
মকর-কুম্ভীর আদি জলচর-সঙ্ঘ ॥
কি করিব বল দেব ? —সহসা সে লঙ্কাপুরী
করিব কি হেথা আনয়ন ?
অথবা সে জম্বুদ্বীপ আনিব হেথায়, কিম্বা
করিব কি সাগর শোষণ ?
হেথায় তুলিয়া আনি' ত্রিকুট, মন্দর, বিন্ধ্য
—পর্ব্বত সকল
নিঃক্ষেপিয়া, তাহে সেতু বাঁধিব কি ?—বিক্ষোভিয়া
সাগরের জল ॥

সমুদ্র-বন্ধনে রাম করি' অভিলাষ,
নানা ভাবে দৃষ্টি তাঁর হইল প্রকাশ :—
প্রণয়-উন্মুখ-দৃষ্টি কভু পড়ে সুগ্রীবের পরে ;
কভুবা নিরখে চাঁদে চিরবন্ধ ঈরিষার ভরে।
কভুবা দক্ষিণ দিক্ ক্রোধ-ভরে করেন দর্শন,
কভুবা উৎসাহ-ভরে নেহারেন নিজ শরাসন।
করুণ-নয়নে কভু নিরখেন সৌমিত্রি-আনন ॥

(অথ সমুদ্র-তীরে লঙ্কা বৃত্তান্ত)

বীরপুরী যেই লঙ্কা   তাহার হেরিয়া শঙ্কা
লঙ্কেশ রাবণ,
—বৃদ্ধ, ও তাপস, ভটে,   আনাইয়া সন্নিকটে
কহেন বচন :—

ধ্যান-জ্ঞান-পরায়ণ   মুনিগণ তোমরা সকলে,
দৈবের সূচনা কিছু   জানিতে পেরেছ ধ্যান-বলে ?
লেশমাত্র যদি কিছু   হয়ে থাকে হৃদয়ে স্ফুরিত,
বচনে ব্যক্ত করি   মোরে তাহা করহ বিদিত।

রাবণ-মাতা নিকষা বিভীষণকে বলিল, তুমি এই দুষ্ক্রিয়া হইতে রাবণকে বারণ কর। অনন্তর বিভীষণ মাতৃ-বাক্যানুসারে রাবণের পদে প্রণিপাত করিয়া রাবণকে বলিল ;—মহারাজ, আপনি এই রাক্ষস-কাল-রাত্রি সীতাকে পরিত্যাগ করুন।

একটি বানর বীর,   করিল এ লঙ্কা ছারখার,
কোন্ বুদ্ধিমান্ বল'   তার সনে যুঝিবে আবার ?
লঙ্কা দগ্ধ—বনভগ্ন   —লঙ্ঘন করিল সে যে
অপার সাগর !
এ সব করিল দূতে,   না জানি কি করিবেক
রাম অতঃপর ॥

ত্যজি' কোপ হে রাজন্   —কুল-কীর্ত্তি-বিনাশন,
কুল-কীর্ত্তি-বিবৰ্দ্ধন ভজ' সেইরামে।
বিবাদেতে দিয়া ক্ষান্তি,   রক্ষহ রাজ্যের শান্তি,
তুষ্ট কর দাশরথে মৈথিলী-প্রদানে ॥

যাহাদের নখায়ুধ   উচ্চ গিরি-শৃঙ্গের সমান
—যাবৎ না আসে তারা,   কর রামে মৈথিলী প্রদান।
রামের প্রেরিত বাণ   বজ্র-বায়ু-সম বেগবান,
যাবৎ না রক্ষোমুণ্ড   সেই বাণে হয় খান খান্
তাবৎ সে রাম-হস্তে   জানকীরে করহ প্রদান।

রাবণ, কি মহোদর, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ আর,
কে পারে আঁটিতে তাঁরে —শত-ইন্দ্র-প্রভাব যাঁহার॥
কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ, মহাপার্শ্ব, মহোদর,
নিকুম্ভ, কি কুম্ভ, অতিকায়,
তিষ্ঠিতে সমর্থ কেবা রাঘব-আয়ুধ-মুখে
হে রাজন্! কহ' তা' আমায়॥

কুম্ভকর্ণ-সুত।—স্ফটিক-শিখরী সেই কৈলাস পর্ব্বতে যিনি
সমূলে করিলা উৎপাটন,
যার লাগি বসুন্ধরা উঠিল চঞ্চল হয়ে
—হল পরে শিথিল-বন্ধন,
(তাইত শম্ভুর নৃত্যে আমূল কম্পিত গিরি)
—ইনি সেই লঙ্কেশ রাবণ।

রাবণ। —কত কত পূর্ব্ববীর আইল শ্রবণ-পথে
কিন্তু তারা কোথায় এখন?
তাহাদের অনুসৃত পন্থা অতিক্রম করি'
আছে জাগি' লঙ্কায় রাবণ।
সেই আমি লঙ্কা-বীর —দোর্দ্দণ্ড-পীড়নে যার,
ধাতুস্রব-রক্তচ্ছটা হয়ে নিষ্যন্দিত,
কৈলাস নামেতে খ্যাত শঙ্কর-গিরির বক্ষে
শঙ্কার অঙ্কুর সদা করে অঙ্কুরিত।
মাল্যকার বজ্রধর, প্রতীহার সহস্রকিরণ,
শশাঙ্ক সে ছত্রধর, সম্মার্জ্জক—বরুণ পবন,
পাচক সে হুতবহ, —মোর গৃহে অহরহ
সেবা-রত দেখনা কি সবে?
কেন তবে এত ভীতি কেন তবে কর স্তুতি
রক্ষোভক্ষ্য নর সে রাঘবে?

বিভীষণ।— নিজ পরাক্রমে রাম সুপ্রসিদ্ধ ভুবন-মাঝারে;
ভাগ্য-বিপর্য্যয় গণি —যদি রাজা না জান তাঁহারে

যাঁর একবাণে বিদ্ধ   সুবিশাল সপ্ত তাল
—স্থিত সারি-সারি ;
সেই সপ্ত রন্ধ্র দিয়া   সপ্তস্বরে যশ গায়
পবন তাঁহারি ॥
রজনীতে সমুদিত   চণ্ডরশ্মি ভানু ;
মেঘহীন নভস্তল   ধরে ইন্দ্রধনু।
হায় হায় ! এবে দেখি   তব প্রতি বিধি হল বাম ;
সীতারে ফিরায়ে দেও,   লঙ্কেশের মিত্র হোন্ রাম।
যাঁর এক কপি-শিশু,   হেলায় লঙ্ঘন করি'
দুর্লঙ্ঘ্য সাগর,
প্রবেশিল অনায়াসে   দেব-দৈত্য-দুর্ভেদ্য
লঙ্কার ভিতর ;
দূর করি' দিয়া যত বন-রক্ষিগণ,
সীতারে দর্শন করি', ভগ্ন করি' বন,
অক্ষে বধি,' লঙ্কা দহি' গেল নিজ স্থান,
মানুষ কেমনে বল' হবে সেই রাম ?
আসন্ন মরণ নাকি—   বিপরীত বুদ্ধি তব
হইল ঘটনা ;
আমি কহি হিত বাক্য,—   যাঁর মধ্যে মোরে তুমি
না কর গণনা ॥
রাবণের পদাঘাতে   প্রকৃতির বিপর্য্যয়
করিয়া দর্শন,
তখনি ত্যজিয়া তাঁরে   ক্রুদ্ধমনে রাম-স্থানে
গেলা বিভীষণ ॥

বিভীষণ। মণি রত্ন বিভূষণ দিব্য বস্ত্র সাথে,
সীতারে ফিরায়ে দেও তুমি রঘুনাথে।
তাহলে করিব বাস এই লঙ্কাপুরে,
নিরাপদ হবে লঙ্কা, শঙ্কা যাবে দূরে।

রাবণ।— জানি, আমি, সীতা তিনি জনক-নন্দিনী,
রাম যে মধুসূদন—তাও আমি জানি।
জানি আমি নর-হস্তে লভিব নিধন,
তবু না করিব আমি সীতা-সমর্পণ ॥

বিভীষণ।— শম্ভু-মৌলি-বিহারিণী স্বর্গ কল্লোলিনী-সম
দিগঙ্গন প্রক্ষালিত
যাঁর শুভ্র যশের ধারায়,
হায় হায়! সেই তুমি সীতা প্রাপ্তি-অভিলাষে
পুলস্ত্যকুলের চন্দ্র
কেন হও কলঙ্কের প্রায় ॥

শুভ অভিপ্রায় তাঁর নাহি করে রাবণ স্বীকার,
লঙ্কা সে কলঙ্কাঙ্কিতা হবে শীঘ্র—করিয়া বিচার.
ত্যজি' নিজ অগ্রজেরে, বিসর্জ্জিয়া স্বর্ণ-লঙ্কাধামে,
নগ্নবৎ বিভীষণ চলে শীঘ্র রাম-সন্নিধানে ॥
রক্ষকুল-ধূমকেতু, চারি মন্ত্রি লয়ে নিজ সাথে,
সাক্ষাৎ করিতে রামে চলিলেন গগনের পথে।
লঙ্কা-মহাতঙ্করূপে দেখা দিল যেন বিভীষণ,
শঙ্কায় আকুল চিত্ত যত সব লঙ্কাবাসি জন ॥
তপন-প্রতিম-তেজ বিভীষণ হলে উপস্থিত,
রাবণ ভাবিয়া, যত কপিকুল পলায় ত্বরিত।

রাবণ নহেন ইনি—ইনি বিভীষণ,
—হনুমান পরে ইহা করে নির্দ্ধারণ।
কেননা ভাবিল হনু—রামচন্দ্র-চরণযুগলে
আকৃষ্ট এ বিভীষণ—যথা, লুব্ধ ভ্রমর কমলে ॥

সুগ্রীব।—দ্বারে আসি উপস্থিত পঞ্চজন নিশাচর,
আকাশের পথে।
এসেছেন বিভীষণ—রাবণ-রাজার ভ্রাতা,
চারি মন্ত্রি সাথে।

অভয়-চরণে তব, তারা সবে যাচিছে শরণ,
না জানি কর্ত্তব্য মোরা—কি আদেশ—বলহ রাজন্॥

রাম।— (হনুমানের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করায়)

হনু।— রঘুনাথ! আছে সত্য　　লঙ্কেশের ভ্রাতা বিভীষণ,
নিদ্রা-সিন্ধু-তিমিঙ্গিল　　কুম্ভকর্ণের কনিষ্ঠ যে জন ;
—দাক্ষিণ্যাদি-গুণোপেত,　　নিজ পিতৃকুল-চেয়ে
সুবিশুদ্ধ-মন,
রক্ষ-পুরী-প্রতিষ্ঠিতা　　সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরে যিনি
করেন ধারণ।

স্বজনের পরে যার প্রীতি নাহি মনে,
পরজনে প্রীতি তার হইবে কেমনে ?
দূরস্থিত হইলেও এই বিভীষণ
জানিবে, সৌমিত্রে!—ইনি শঙ্কার কারণ॥

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ　　রাবণ-সদন হতে
কি হেতু হইল বহির্গত ?
সুগ্রীব, বালীর ভয়ে　　কি করিতে নাহি পারে ?
—বিভীষণে ভাবো তারি-মত।

গূঢ় অভিসন্ধি কোন　　আছে কি রাবণ অনুজের ?
কি করিতে পারি মোরা　　যদিই বা পাই তাহা টের।
শত্রু হইলেও জেনো　　—ইক্ষাকু-বংশের কোনো জন
শরণাগতের প্রতি　　শত্রুতা না করে কদাচন॥

সগর্ব্ব হুঙ্কারবতী কপি-সেনা হেরি' বিভীষণ,
হয়ে ভীত, সমুদ্যত　　প্রদর্শিতে দুর্ব্বার বিক্রম ;
কিন্তু হেরি' রামচন্দ্রে　　উঠিল অন্তরে তার
প্রমোদ-তরঙ্গ-মালা অতীব গম্ভীর ;
—হইল স্তম্ভিত-প্রায় ;　　বিক্রম হইল দূর,
না পারে চলিতে কিম্বা থাকিবারে স্থির॥

সুগ্রীবের শৌর্য্য, আর লক্ষ্মণের সেবা-ভক্তি
করি' নিরীক্ষণ,
বিভীষণ-চিত্ত যেন দোলা-সম দোলায়িত
হয় অনুক্ষণ॥

সগর্ব্ব হুঙ্কারবতী বানর-সেনার
প্রত্যেকেরে হেরি' সবিশেষ,
পুলস্ত্য-নন্দন সেই বিভীষণ বীর
সবিস্ময়ে করিল প্রবেশ।
সুগ্রীব-প্রমুখ যত মুখ্য কপিগণ,
পথমাঝে করে তাঁর স্তুতি, সম্বর্দ্ধন।
এইরূপে বিভীষণ আসি' রঘুনাথের নিকটে,
তাঁর পদে শির-হস্ত করে ন্যস্ত অতি অকপটে॥

বিভীষণ।—হে নৃপতি-শিরোমণি! কপি-পদ-ভরে
ফণি-পতি-ফণা যবে
হ'ল ভারাক্রান্ত,
তব যাত্রা-স্তুতি-লিপি জরঠ কমঠ-পৃষ্ঠে
উৎকীর্ণ করি' রাখে
বসাইয়া দন্ত॥

কোদণ্ড-মণ্ডল-হতে নিঃসৃত প্রচণ্ড তব বাণ
দশানন-বাহুদণ্ড নিশ্চয় করিবে খান খান।
আখণ্ডল-অরি সেই ইন্দ্রজিৎ—তার কণ্ঠচ্ছেদ
করিবে মহাস্ত্র তব চন্দ্রহাস—কে করে নিষেধ
অব্যর্থ-প্রতিজ্ঞ তুমি, খণ্ডন হবে না কোন-মতে
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা তব, —কহি শুন ওহে সীতাপতে
বিধাতা স্বয়ং যদি হ'ন তুলাধার,
বসুধা হয়েন যদি শূর্প-পাত্র তার,
ফণিপতি সূত্র হন্, রত্নাচল—ওজন-পাষাণ,
দামোদর-গদা যদি, হয় তুলাদণ্ডের সমান,
তবু না করিতে পারে, ও-তব গুণের পরিমাণ॥

তোমার সে বৈরিদের কোথা এবে কুতূহল
আমোদের কথা ?
কোথা গীতাদির কথা ? কোথা মত্ত-গজ-আদি
তুরঙ্গম-কথা ?
কোথা কোদণ্ডের কথা ? এক কথা এবে শুধু
পলায়ন-কথা !
শোনো ওগো রঘুনাথ ! স্বপ্নেও ভাবে না তারা
এবে অন্য কথা ॥

কুপিত না হও যদি অত্যুক্তি বচনে,
মিথ্যা বলি' যদি ইহা নাহি ভাব মনে,
তাহলে করিব তব গুণের কীর্ত্তন ;
—অদ্ভুত বর্ণনে ব্যগ্র কবির বচন।
তরুণ তপন-সম প্রতাপ তোমার
উত্তাপে শোষিল যত জলধি অপার।
শুধু শত্রু-পত্নীদের যুগল-নয়ন
পূরিত হইল জলে শোনো গো রাজন্।
শঙ্কর করিলা যবে "ত্রিপুর" দহন,
যুদ্ধ-রথ হ'ল তাঁর সমস্ত ভুবন।
সুমেরু হইল ধনু, গুণ—ফণিপতি,
স্মর—যোদ্ধা, স্বয়ং ব্রহ্মা হইলা সারথী।
হইলেন নারায়ণ ধনুকের বাণ ;
স্বর্ণলঙ্কা করে দগ্ধ একা হনুমান ॥

রাম।— ওহে রক্ষোরাজানুজ ! তোমার কুশল ?
বিভীষণ।— কুশল হেরিয়া তব চরণ-কমল।
রাম।— অত্র আগমনে তব কিবা অভিপ্রায় ?
বিভীষণ।— যাপিব জীবন মম ও-পদ-সেবায়।
রাম।— আজি লঙ্কাপতি তুমি—কহিনু তোমায় ॥

বিভীষণ-ভক্তি হেরি' রাম রঘুবর,
সুপ্রসন্ন হইলেন তাহার উপর।

রাজ্যে তাঁরে অভিষিক্ত করিবে লক্ষণ
—রঘুনাথ করিলেন ইহা নির্দ্ধারণ।
প্রসিদ্ধ কথাটি এই বল' কার্ নাহি আছে শ্রুত
—মহাত্মা জনেরা হ'ন শরণাগতের বশীভূত।
রঘুপতি রামচন্দ্র হয়ে তুষ্ট অতি,
ভক্তিনম্র নতশির বিভীষণ প্রতি,
লঙ্কাপুরী-আধিপত্য করিলেন দান,
বাহুই সে বচনের প্রতিভূ-সমান॥

কপিগণ।—সত্যপ্রতিজ্ঞ তিনি—আছে কথা ত্রিলোকে প্রচার,
সুগ্রীবে দিলেন রাজ্য—মোরা সবে সাক্ষী আছি তার॥

বিভীষণ-প্রতি দেখি' রামের এ আকস্মিক
প্রীতির সঞ্চার,
আনন্দ-বিস্ময়-ভরে কপিগণ স্তুতিগান
করে বারম্বার।
অতঃপর প্রাজ্ঞ হনু, বিভীষণ-গুণগ্রাম
বিধিমতে করিয়া কীর্ত্তন,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, আর জাম্বমান-সাথে তাঁর
ঘটাইল সৌহার্দ-বন্ধন।
করি' নিজ শিরশ্ছেদ যে বিভূতি করে লাভ
দশানন শঙ্কর-সদনে,
সেই সে বিভূতি লাভ করিলেন বিভীষণ
শুধুমাত্র রামের দর্শনে॥

রাম।—(সমুদ্রের প্রতি)
তুমি মোর কুল-গুরু, ভক্তি-কৃতাঞ্জলি শিরে
করিয়া ধারণ,
যাচি তোমা অম্বুনিধি, —আমা-তরে মার্গ তব
কর উন্মোচন।

তোমারি বধূ সে সীতা, হরিয়া লইল তারে
দুষ্টমতি দশানন ক্রুর,
বিনাশি' তাহারে যদি উদ্ধারিতে পারি সীতা
তবেই কলঙ্ক হবে দূর॥

(সমুদ্র পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় লক্ষণের প্রতি)

দৈন্য-পরাভব-যুত যাচঞা করিতে কভু
ইক্ষাকুরা হয়নি শিক্ষিত।
রঘুকুল-মাঝে কভু সেবকের বদ্ধাঞ্জলী
শিরোদেশে হয় নাই ধৃত।
সমস্ত করিনু আমি —তথাপি জলধি, মোর
অনুরোধ না করে পালন
পথ-উদ্ঘাটন-তরে তাই চাহে পাণি মোর
করিবারে কার্ম্মুক গ্রহণ॥

আন ধনু হে লক্ষণ—আন শর কালানল-সম,
সমুদ্র শুষিব আমি—পদব্রজে যাবে কপিগণ।

অম্বো নিধিরে আমি করিব পাংশুর নিধি
—জলেরে করিব স্থল —বজ্রতীব্র বাণে বিঁধি'।
করিব তাহারে ভস্ম —বিরচিব মরুভূমি,
মৃগতৃষ্ণা-পরিণত করিব আমি এখনি॥
ধনু হতে রঘুপতি ছাড়িলেন তীর,
দিক্ হল ধুমাচ্ছন্ন তপ্ত হল নীর।
আকুল হইয়া ভ্রমে' নক্র শত শত,
খুঁটিতে লাগিল জলে শঙ্খ, মণি যত।
জলদ-মলিন মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
সহসা আসিল সিন্ধু রামের সদন॥

সূর্য্য।— হে জলধি; কেন তুমি হয়েছ চঞ্চল?

সমুদ্র। রাম-শর-পাত-ভয়ে হয়েছি বিহ্বল।

সূর্য্য।— কেন গো কম্পিত তুমি—কিসে তব ভয়?
তোমার সন্তানগণ রাম-অনুচর :—
বদনে শশাঙ্ক তাঁর, লক্ষ্মী তাঁর ঘরে,
বচনে অমৃত তাঁর, কল্পতরু—করে,
শাণিত বাণেতে তাঁর হলাহল আছে,
সাহায্য পাইবে তুমি উঁহাদের কাছে ॥

সমুদ্র। (সানুনয়ে রামের প্রতি)
প্রলয় দহন-তীব্র অমিত যে তব বাণ-বল
কেমনে সহিব তাহা—আমি ক্ষুদ্র পরিমিত জল!
ত্যজ কোপ প্রভু ওগো! প্রস্তর আনুক কপিগণ,
আমা-পরে রচি' সেতু, সুখে তথা করুক গমন ॥
যাহা ছিল চিত্রকূট-পেটক-ভিতরে,
জানকী গলায় যাহা পরেন আদরে,
কৌশল্যা-শুক্তি-জাত সেই মুক্তাহার
শ্রীরাম-রতনে আমি করি নমস্কার।
অঞ্জনা-তনয়-আদি কপি-বীর যত,
উপাড়ি' উপাড়ি' আনে উত্তুঙ্গ পর্ব্বত।
আর যার মূল গেছে ভেদিয়া পাতাল
—এ হেন পর্ব্বত আনে অতীব বিশাল।
তার পর করে নল নিজ বাহুদিয়া
সেতু বন্ধ সিন্ধু-মাঝে সুদৃঢ় করিয়া ॥
সুগ্রীবের অগ্রগামী সৈন্য কপিগণ,
পৃথ্বীতল জলমগ্ন—করে নিরীক্ষণ;
পশ্চাদ্‌গামীর দল দেখে পঙ্কময়,
"হেথা সিন্ধুছিল"—পরে, অন্য সবে কয়।

সুগ্রীব। নিপুণ কপীন্দ্র যত শৈল যবে করে আনয়ন,
তোমার প্রসাদে রাম গিরিগুহাবাসী করিগণ

শুণ্ড ঊর্দ্ধে তুলি, পিয়ে   মন্দাকিনী-জল,
—সুর-করী-পেয় যাহা—অতি নিরমল।

জলে নিমগন হয়   যে সব প্রস্তর-রাশি
ক্ষণেকের মাঝে,
দুস্তর সাগরে তাহা   রক্ষ-ভীতি সেতু হয়ে
কেমনে বিরাজে ?
শৈল-গুণ নহে ইহা,   নহে ইহা জলনিধি-গুণ,
কপিদেরো গুণ নহে—হইক না যতই নিপুণ ;
ইথে প্রকটিত শুধু   তাঁরি সেই সহজ শকতি
সর্ব্ব-লোক পূজ্য যিনি—মহাবীর রাম দাশরথি।
দুর্জ্জনের সঙ্গ জেনো   সজ্জনের বহুবিধ
অনর্থের হেতু ;
রক্ষোরাজ হরে সীতা,   সিন্ধুরাজ হল বদ্ধ
—বাঁধা হয়ে সেতু॥

যে সব প্রস্তর-রাশি আনে কপিগণ,
করেন শ্রীরাম তাহে সেতু সংগঠন ;
—নিজ চিত্ত হইতেও উচ্চ তাহা হয় ;
—সুগ্রীবের সখ্য-চেয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয় ;
—লক্ষ্মণের ভক্তি চেয়ে   অধিক সংশ্লিষ্ট ;
সীতার চরিত্র-চেয়ে   অচল-প্রতিষ্ঠ ;
—রাবণের মোহ-চেয়ে   দীর্ঘ অতিশয়,
—রক্ষোধূম কেতুরূপে   সাগরে উদয়॥

(সমুদ্র বন্ধন দেখিয়া)

মহাসিন্ধু-মাঝে সেতু করিয়া বন্ধন,
তীক্ষ্ণশরে রক্ষোরাজে করিয়া নিধন,
সে তপস্বী রাম যদি, জানকীরে পারে উদ্ধারিতে,
মশা-গল-ছিদ্র দিয়া হস্তিযূথ পারিবে গলিতে।

প্রথমে হাসিয়াছিল রাবণ হরষে,
পরে, সেতু শেষ হলে, উদ্বেগের বশে
ছুটিল নির্ঝর-সম ঘর্ম্ম তার গায়,
পরে, ঝঞ্ঝাবাতাহত পর্ব্বতের প্রায়
সেই মহা পরাক্রান্ত নির্ভীক-পরাণ
রোষ-ভরে থরথর হ'ল কম্পমান॥
গুরুভার শৈল-সব আছে সেতুরূপে
—লঙ্কাপতি দশানন শুনি' লোকমুখে,
সমুদ্রের পরে ক্রুদ্ধ হইয়া বিষম
বলিতে লাগিল কত ভৎর্সনা বচন ;
অম্বুধি! জলধি! ওহে! কি কব অধিক,
বারিধি পয়োধি আদি তব নামে ধিক্!
ঘোর অনুরাগ-ভরে হইয়া উৎসুক,
গীত-শেষে, দশানন নিজ চারি মুখ,
মাধ্বী-মধু-মত্ত-বধূ-বিধুমুখ-পানে
ছিল ফিরাইয়া মুগ্ধ-স্থির দৃষ্টিদানে,
হেনকালে জানাইল আসি' দূতগণ
—সিন্ধুমাঝে সেতু রাম করেছে বন্ধন ;
অমনি সে দশানন অবশিষ্ট আর ছয় মুখে,
উদধি বারিধি আদি সম্বোধিয়া কহে কতরূপে
অগস্ত্য-কর্ত্তৃক তুমি হয়েছিলে পীত,
দেবাসুর মিলি' তোমা করিল মথিত,
ক্ষুদ্র'রাঘব তোমা করিল বন্ধন,
শাখামৃগগণ তোমা করিল লঙ্ঘন,
তবুও ঘোষিছে লোকে—হায় হায়—তোমার মহিমা'
জলধি পয়োধি আদি কত নামে—নাহি তার সীমা।
সাগর-বন্ধন-কথা দশানন শুনিয়া সহসা,
ভয়বশে দশমুখে একসঙ্গে করয়ে জিজ্ঞাসা :—

সত্য কি হইল, দূত!—বদ্ধ পয়োনিধি,
জলধি, উদধি, সিন্ধু, পাথোধি বারিধি?

ভয়ত্রস্ত সচকিত লঙ্কাপুরবাসী
এইরূপ পরস্পর কহিছে প্রকাশি:—
কপি-সৈন্য-রক্ষা-মণি পবন-আত্মজ
হেথায় উঠায়েছিল নিজ পুচ্ছধ্বজ;
কপীন্দ্র সুগ্রীব যদি করে আগমন,
নিশ্চয় আসিবে পুনঃ পবন-নন্দন।
অষ্টাদশ লক্ষ কোটি কপি সৈন্যগণ
করিতেছে সেতু-পথে হেথা আগমন।
যার কলকল শব্দে ত্রস্ত ত্রিভুবন
সেই মহা কপিসৈন্য করিয়া প্রেরণ,
ভগ্নারণ্য সুদুর্গম "সুবেল"-গিরিতে
শিবির স্থাপিলা রাম রাবণে নাশিতে।

শুক ও সারণ দুই　　রাবণ-প্রেরিত দূত
হয়ে সমাগত,
ধরিয়া কপির রূপ　　সৈন্য-সংখ্যা গণিবারে
হইলে উদ্যত,

বিভীষণ তাহাদের চিনিতে পারিয়া,
রাম-সন্নিধানে পৌঁছে আনিল বাঁধিয়া;
রাম কিন্তু তাহাদের দিয়াছেন ছাড়ি,
—সৈন্য দেখি' রামাজ্ঞায় আসিয়াছে ফিরি।

রণ।—　(রাবণের নিকট নিবেদন)
নভস্তলে, দিকে দিকে, সিন্ধু-সন্নিকটে,
কাননে, গহ্বরে, আর পর্ব্বতের তটে,
এমন নাহিক স্থান—ধরে তিল-কণা;
—কি করিয়া কপি-সৈন্য করিব গণনা?

আজ্ঞা-শুন, আমাদের আনিল বাঁধিয়া,
দিলেন ছাড়িয়া রাম সৈন্য দেখাইয়া ;
এখন কর্ত্তব্য যাহা করহ রাজন্,
কহিনু তোমার কাছে সব বিবরণ ॥
প্রাসাদ শিখরে উঠি' রাজা দশানন
জিজ্ঞাসেন—কপি-সৈন্য করিয়া দর্শন :-

রাবণ ।— এর মাঝে রাম কেবা—কহ-ত আমায় ;
রামেরে দেখায়ে দূত কহিল রাজায় :—

দূত ।— সুগ্রীবের অঙ্কে যাঁর মস্তক স্থাপন,
হনুমান-অঙ্কে যাঁর আছয়ে চরণ,
অঙ্গদের অঙ্কে যাঁর হস্ত বিদ্যমান,
স্বর্ণ-মৃগ-চর্ম্মে যিনি আছেন শয়ান,
অপাঙ্গে হেরিয়া লঙ্কা, তবানুজ-কথা
শুনিছেন যিনি প্রভো—সেই রাম হোথা ॥

রাবণ ।— যার বাহু, সুরপতি-রণকণ্ডু করিল হরণ,
ত্রিলোক-আক্রমী বীর আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ রাবণ
এবে শুনিতেছি কিনা—বদ্ধ হ'ল সেতু,
কপি-পরিবৃত লঙ্কা, মম নাশ-হেতু ।
হায় হায় ! বহুদিন থাকিলে জীবিত,
কি না দেখা যায়, আর, কি না হয় শ্রুত ॥

আশ্চর্য্য তাপস এই, গিরি-গুহাবাসী
কপিগণে জুটাইয়া সঙ্গে লয়ে আসি'
মম-হৃতা সীতারে সে আমার নিকট হতে
করিবে উদ্ধার ?
গজকুম্ভ-বিদারণ -সিংহ-দন্ত উপাড়িতে
স্পর্দ্ধা এ যে তার !
চন্দ্রসূর্য্য ইন্দ্র বায়ু যার পুরদ্বারে থাকি'
প্রসাদ যাচয়ে অনুক্ষণ

়াপুরী কিন —ঘোর-বিকম্পিত-ওষ্ঠ
কপি-সৈন্য করে আক্রমণ।
়কে তিরস্কার করিয়া রাবণ, দূতের দ্বারা রামের
নিকট এই পত্র পাঠাইতেছেন)

়বণ দশানন ইন্দ্রবজ্রভেদক্ষম,
ত্রিভুবন ব্যাপী যাঁর প্রতাপ-অনল,
লিখিছেন এই পত্র বনবাসী সেই রামে
—ঘোর দুঃখ-মোহে যেই বিকল বিহ্বল :—
সীতারে এনেছি সত্য ; উদ্ধারিবে তারে তুমি
সুগ্রীবের সৈন্য আনি মেলা ?
নির্ব্বোধ তাপস ওহে ! কেন কর মিছামিছি
আপনার প্রাণ নিয়ে খেলা ?
ইন্দ্র-আদি দেবগণ দ্রুত করে পলায়ন
যাঁরে হেরি' রণে,
সেই রাবণের সাথে যুঝিতে স্পর্দ্ধা তুই
করিস্ কেমনে ?
রে অজ্ঞ মূঢ় নর ! করিস্ না পদার্পণ
রাক্ষস-কবলে।
়া-আশা ত্যাগ করি' আপন ভবনে তুই
যারে শীঘ্র চলে' ॥
রে রে তাপস মূঢ় ! ক্ষুদ্র কপির দ্বারা
হয়ে প্রোৎসাহিত,
নিজ প্রিয়া জানকীরে উদ্ধারিতে, লঙ্কাপানে
হয়েছ ধাবিত ?
়কোন্ বুদ্ধিমান লোক নিজ শ্রেয় করিয়া চিন্তন
ফণি-ফণা-হতে রত্ন লইবারে করয়ে যতন ?
যে রাবণ নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন
মহাদেবে বিধিমতে করিলা অর্পণ ;

সমস্ত অমরবৃন্দ যার বশে রয়,
মায়ার নিধান যেই —সর্ব্ব-মায়াময়,
ভূজবলে কৈলাসে যে করে উত্তোলন,
যমদর্পহন্তা যেই,— সেই দশানন;
—তাহারে জিনিবে করি' সাগর-বন্ধন?
প্রলয় জলদ-সম যার ঘোর বিচিত্র গর্জ্জন,
—সেই বীর কুম্ভকর্ণ যাবৎ না করে আগমন,
রণসাধ ত্যাগ করি' ছাড়ি সীতার কামনা;
কুম্ভকর্ণ আসে যদি, তুমি আর কপি-সেনা,
প্রলয়-নিঃশ্বাসে তার যাইবে উড়িয়া,
পারিবে না দুরেতেও ক্ষণেক তিষ্ঠিয়া॥

বহুরূপী, সুচতুর বাক্য-অভিনয়ে,
—নিকুম্ভিল নামে রক্ষ, পত্রখানি লয়ে,
রঘুপতি-সন্নিধানে করিয়া গমন,
তাঁর হস্তে এই পত্র করিল অর্পণ॥

ইতি "সাগর-বন্ধন" নামক ষষ্ঠ অঙ্ক সমা

বঙ্গ-ভাষায় উত্তম ও মধ্যম পুরুষের সর্ব্বনাম।

উত্তম পুরুষের একবচনে "আমি" ও "মুই" এই দুইটি শব্দ প্রচলিত আছে। বহুবচন আমরা ও মোরা। অন্য বিভক্তির পূর্ব্বে ইহারা আমা ও মো আকার ধারণ করে। এতন্মধ্যে আমি শব্দটিই ভদ্র সমাজে প্রচলিত; অনেক অঞ্চলে ভদ্রলোকে মুই কথাটি মোটেই ব্যবহার করেন না। কিন্তু প্রাচীনকালে বোধহয় এরূপ ছিল না। চৈতন্য-সম্প্র... য়র গ্রন্থে 'মুই' 'মুঞি' আকারে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত দৃষ্ট হয়। ...ীন অন্যান্য গ্রন্থেও ইহা বিরল নহে।

প্রচলি... বাঙ্গালা-ব্যাকরণে "আমি" শব্দটি সম্ভ্রমার্থক, ও মুই তুচ্ছার্থক এ... রূপ বলা হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই মাত্র হইতে পারে যে, ...ধারণতঃ ...দ্রলোকে 'আমি' ও ছোটলোকে 'মুই' শব্দ অধিক ... নতুবা, আমি শব্দের সহিত কিছুমাত্র সম্ভ্রমের ভাব ... আর 'মুই' শব্দটি আত্মগৌরব প্রকাশের সময়ও ব্যবহৃত ...। বর্ত্তমানসময়ে এই দুইটি শব্দের প্রয়োগসম্বন্ধে এই ... চৈতন্য-চরিতামৃতগ্রন্থে দেখা যায়, দৈন্যপ্রকাশ স্থলে ... শব্দেরই বহুল প্রয়োগ; কথনও আমি শব্দ ব্যবহৃত ...াত্মগৌরব প্রকাশস্থলে 'আমি' শব্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত। ...ন বলিতেছেন,

...াজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
...জি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥"
...জি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
...র্ব্বভৌমের হৈল মহা-প্রসাদে বিশ্বাস॥"

তখনও এই কথায় দৈন্যের ভাব না থাকুক, কেবল আনন্দ ভিন্ন আত্ম-গৌরব বা অহঙ্কার প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে 'মোরে' 'মোর' প্রভৃতি পদ সকল অবস্থায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সময়েও 'মুই' শব্দটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেই প্রধানতঃ ব্যবহার করিত বলিয়া, বক্তার নিকৃষ্টতা প্রকাশার্থ উহা ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, তাহা বিবেচ্য। কবীন্দ্রকৃত মহাভারতে যখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

"দেখহ সাত্যকি মুঞি চক্র লইনু হাতে।
ভীষ্ম দ্রোণ কাটিয়া পাড়িমু রথ হৈতে॥"

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮৭ পৃঃ), তখন নিশ্চয়ই তাঁহার নিজ গৌরব প্রকাশ করা হইয়াছে।

কেবল উচ্চারণ-সাদৃশ্য দ্বারাই যদি শব্দের উৎপত্তি সন্দেহ-রূপে নির্ণীত হইত, তবে সহজেই বলা যাইত, সংস্কৃত 'অ ও প্রাকৃত 'অহম্মি' হইতে 'আমি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্ত নানাকারণে একথা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। (১) অন্যান্য প্র ত-আর্য্য ভাষাগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই গুজরাটী 'অমে', মারাঠী 'আহ্মী', (আম্হী), ও বহুবচনান্ত। অন্যান্য ভাষার কথা জানি না, হিন্দী 'হ একবচনও হয়। কিন্তু ইংরেজী you শব্দের ন্যায়, সর্ব্বদাই বহুবচন। কখনও 'হম্ বোলতে' না বলিয় বলা যায় না। ইহাতেই প্রকাশ পায় যে, বহুবচন 'হম্' একবচনে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একবচন শব্দ নাই। 'আমি' শব্দের অনুরূপ কোনও শব্দ এই একবচনে নাই। উক্ত বহুবচনান্ত শব্দগুলির মূল অনুস দেখিতে পাই, প্রাকৃত ভাষায় উত্তমপুরুষের প্রথমার বহুব শব্দ বহুল প্রচলিত। তবে কি 'আমি'ও এই 'অ

আসিয়াছে? (২) উড়িয়া ভাষায় প্রথমার একবচনেই 'অম্হে' (উচ্চারণ 'অম্ভে') শব্দ প্রচলিত। এখানে দেখি, বর্ণবিন্যাসে প্রাকৃত বহুবচনের আকার ঠিক রহিয়াছে। (৩) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, হস্তলিখিত প্রাচীন বাঙ্গলা পুস্তকে 'আমি', 'তুমি' শব্দদ্বয় 'আহ্মি' 'তুহ্মি' আকারে লিখিত দেখিয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠার টীকায় তিনি বলেন, "'আমি' স্থানে 'আহ্মি' ও 'তুমি' স্থানে 'তুহ্মি' পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন তাবত পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়। সঞ্জয়রচিত ভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলিতেও তাহাই দৃষ্ট হয়। শুধু বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের কাপিতে 'আমি' 'তুমি' রূপ পাইয়াছি।" ইহার অনেক দৃষ্টান্ত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ৮৬, ৮৭ ও ৯০ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে কেবল দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) বিরাট-পত্নী সুদেষ্ণা সৈরিন্ধ্রী-বেশ-ধারিণী দ্রৌপদীকে বলিতেছেন,

"কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তেন মত দেখি আহ্মি তোহ্মারে ধারণ।"

এ দৃষ্টান্তটি কবীন্দ্র কৃত মহাভারতের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের পুঁথি হইতে গৃহীত। (২) ৺ রাগলী মহাভারতে ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,

"সংসার উপাসন্ত সব খাইলা তুহ্মি।
তাহা হইতে বহু ভয়ঙ্কর বোলে আহ্মি।"

এই সকল দেখিয়া, প্রাকৃত বহুবচন 'অম্হে' হইতেই যে 'আমি' শব্দের উৎপত্তি, এই ধারণা অত্যন্ত দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে। বহুবচনের পদ এক বচনে ব্যবহৃত হইবে কেন? এরূপ সন্দেহ নিতান্ত ভিত্তিহীন। হিন্দী 'হম্', 'তুম্', ইংরেজী you এক বচনের অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। আর, উত্তমপুরুষে একবচনের অর্থে বহুবচনের প্রয়োগ সংস্কৃত ভাষায়ও বিরল নহে; গৌরব ও বিনয় এই দুইটি বিপরীত ভাব প্রকাশার্থই বহুবচন প্রযুক্ত হয়।

এখন প্রাকৃত 'অম্হে' শব্দের মূল অনুসন্ধান করা যাউক। কাহারও কাহারও মতে, প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ভারতীয় ভাষা মাত্রই, বিভক্তি ও অতি প্রচলিত শব্দগুলিকে স্ব স্ব প্রদেশের পূর্ব্বতন অনার্য্য ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সেই সকল অনার্য্য ভাষা কিরূপ ছিল এখন তাহা নির্ণয় করা অনেকস্থলে একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং তাহার সহিত মিলাইয়া এই মতটির পরীক্ষা করা যায় না। পক্ষান্তরে কোনও শব্দ বা বিভক্তির মূল, সংস্কৃতে আছে কি না তাহার অনুসন্ধান আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত। কিন্তু যাঁহারা উক্ত মতাবলম্বী তাঁহারা পণ্ডশ্রম মনে করিয়া এ অনুসন্ধানের আয়াসস্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। কেবল যে সকল শব্দের সংস্কৃত মূল বিনা অনুসন্ধানেই তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হয়, সেই সকল শব্দকেই তাঁহারা সংস্কৃত-মূলক বলিয়া গ্রহণ করেন। এই কারণে আমি উক্তমতটিকে ভাষা-তত্ত্বানুশীলনের অন্তরায় বলিয়া মনে করি। সংস্কৃত [illegible]মার বহুবচন 'বয়ম্' পদের সহিত প্রাকৃত 'অমহে' পদের কোনই সম্বন্ধ নাই দেখিয়াই কি বলিব, 'অম্হে' সংস্কৃতমূলক নহে? না, আর একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিব উহা সংস্কৃত-মূলকই বটে।

সংস্কৃতে, উত্তমপুরুষের বহুবচনে, প্রথমায় 'বয়ম্' হয় সত্য কিন্তু আর প্রায় সর্ব্বত্রই বহুবচনে রূপে, 'অস্ম' এই অংশ বিরাজমান। সমাসে বিভক্তি লোপ হইলে 'অস্মদ্'ও ঈয় প্রত্যয়যোগে 'অস্মদীয়' হয়; ২য়া বিভক্তিতে 'অস্মান্', ৩য়া 'অস্মাভি', ৪র্থী অস্মভ্যম্, ৫মী অস্মৎ, ৬ষ্ঠী 'অস্মাকম্', ৭মী 'অস্মাসু'। প্রাকৃতে এই 'অস্ম' অংশের স স্থানে হ-কারাদেশ হইয়া, ও উচ্চারণ সৌকার্য্যার্থ হ-কার ও ম-কার স্থান পরিবর্ত্তন করায় 'অম্হ' হইয়াছে। প্রাকৃত বহুবচনে সকল বিভক্তিতেই এই 'অম্হ' ভাগ দৃষ্ট হয়। প্রথমা ও ২য়া 'অম্হে', ৩য়া 'অম্হেহিং', ৪র্থী ও ৬ষ্ঠী 'অম্হাণং', ৫মী 'অম্হাহিংতো' বা 'অম্হাসুংতো'

৭মী 'অম্হেসু'। সংস্কৃত 'স্ম' ও 'ষ্ম' স্থানে 'ম্হ' হওয়ার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যথা—বিস্ময়=বিম্হঅ, গ্রীষ্ম=গিম্হ, উষ্ম=উম্হ। 'অম্হে' পদের এ-কার বোধহয় সর্ব্বনাম মাত্রেরই বহুবচনে প্রযুক্ত এ-কারের অনুকরণে গৃহীত হইয়াছে। 'আমি' পদের ই-কার ঐ-কারেরই রূপান্তরমাত্র। 'অম্হাণং', 'অম্হাহিংতো' প্রভৃতির 'অম্হা' ভাগ হইতেই বোধ হয় 'আমা' আসিয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করেন, 'অস্মি' হইতে 'আমি' আসিয়াছে। ক্রিয়াপদ 'অস্মি' হইতে সর্ব্বনাম 'আমি'র উৎপত্তি স্বীকার করার কোন কারণ দেখা যায় না। অব্যয় 'অস্মি'র ব্যবহার যে কখনও বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই। সুতরাং তাহা হইতেও 'আমি'র উৎপত্তি সম্ভবপর নহে।

'মুই' শব্দের অনুরূপ প্রথমান্ত পদ সংস্কৃতেত নাইই, বররুচিধৃত কয় প্রকার প্রাকৃতেও নাই। কিন্তু প্রথমা ভিন্ন সকল বিভক্তির এক বচনেই সংস্কৃতেও অস্মদ্ শব্দের রূপ ম-কার প্রধান। যথা—২য়া মাম্, মা; ৩য়া ময়া; ৪র্থী মহ্যম্, মে; ৫মী মৎ; ৬ষ্ঠী মম, মে; ৭মী ময়ি। সমাসেও একার্থে অস্মদ্ শব্দ স্থানে 'মৎ' আদেশ হয়, ঈয় প্রত্যয় যোগেও 'মদীয়' হয়। এই রূপগুলি সমস্তই, বিশেষতঃ ৩য়া, ৪র্থী, ৬ষ্ঠী ও ৭মীর 'ময়া', 'মে' ও 'ময়ি', বাঙ্গালা 'মুই' শব্দটার বড় বেশী নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় নাকি? প্রাকৃতের দিকে চাহিলেও দেখিব, বাঙ্গালার নিকটে ছাড়া দূরে যাইনা। ২য়া মং, মমং; ৩য়া মে, মমাই, মই, মত্র; ৪র্থী ও ৬ষ্ঠী মে, মম, মহ, মজ্ঝ; ৫মী মত্তো, মইত্তো, মমাদো, মমাদু, মমাহি; ৭মী মই, মত্র, মমস্মি। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয়, 'মুই' শব্দটি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অস্মদ্ শব্দের প্রথমেতর একবচনান্ত রূপগুলি হইতে গৃহীত।

হিন্দীসাহিত্য বাঙ্গালা সাহিত্য অপেক্ষা অনেক অধিক প্রাচীন।

তাহাতে এই পরিবর্ত্তনটি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। চাঁদ-কবি উত্তম পুরুষে প্রথমার একবচনে 'হৌঁ' ও 'হৌ' এই দ্বিবিধ রূপ ব্যবহার করিয়াছেন; উহাই পরে 'হুঁ' আকারে পরিণত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যের হিন্দীতে ইহাদের স্থান 'মৈঁ' শব্দ অধিকার করিয়াছে। চাঁদ-কবিও 'মৈঁ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সে অতীতকালের সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে,—যেখানে হিন্দী ভাষায় সর্ব্বদাই কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ হয়। যথা—"মৈঁ সুন্যৌ সাহি বিন আঁখি কীন" (আমি শুনিয়াছি সাহা তাহাকে চক্ষুশূন্য করিয়াছে)। বর্ত্তমান হিন্দীতে 'মৈঁ' প্রথমান্ত সুতরাং তাহাকে তৃতীয়ান্ত করিবার জন্য 'মৈঁ সুনা' না বলিয়া 'মৈঁনে সুনা' বলিতে হয়। মরাঠী ভাষায় মী শব্দটি প্রথমা ও তৃতীয়া উভয়েরই একবচনে প্রযুক্ত হয়। গুজরাটী ও পঞ্জাবী ভাষায়ও তৃতীয়ান্ত 'মৈঁ' পদ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বতন প্রথমান্তরূপের পরিত্যাগ ও পরে অন্যান্য বিভক্তির রূপ হইতে প্রথমার একটি নূতন রূপ গ্রহণে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই; বরং ইহাই স্বাভাবিক। কারণ, (ক) একমাত্র প্রথমা অপেক্ষা অপর সকল বিভক্তির সমবেত প্রয়োগস্থল অনেক অধিক হইবারই কথা; তাহার উপরে আবার, (খ) কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্য বহু প্রচলিত থাকায় প্রথমান্ত পদের ব্যবহার আরও অল্প হইয়াছিল, আরও বিশেষতঃ (গ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের কর্ত্তৃকারক অনেক সময়ে উহ্য থাকে; যেমন, উত্তমপুরুষে 'একথা কালি শুনিয়াছি,' 'কি হইয়াছে জানি না,' 'এ বিষয় ভাবিয়া দেখিব', ইত্যাদি; মধ্যমপুরুষে,—'কবে আসিয়াছ?' 'এ কাজটি অবশ্য করিবে, 'সেখানে যাওত তাহাকে আসিতে বলিও' ইত্যাদি। সুতরাং অল্পব্যবহৃত রূপটি, কালে একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং বহুব্যবহৃত রূপগুলির সদৃশ একটি রূপ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় দৃষ্টান্তে 'মুই' সংস্কৃত তৃতীয়ান্ত 'ময়া' প্রাকৃত 'মই' বা 'মএ' অপভ্রংশ প্রাকৃত মইঁ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হইতে পারে। এরূপ হওয়া অসম্ভবও নহে। কিন্তু আমার বোধ হয়, এতদূর নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; কারণ বাঙ্গালাভাষায় হিন্দীর ন্যায়, কর্ম্মণি প্রয়োগ দেখা যায় না। বীম্‌স্ সাহেব বাঙ্গালা 'মুই' ও উড়িয়া 'মু' শব্দের অন্যরূপ উৎপত্তি অনুমান করেন। তিনি বলেন, সংস্কৃত 'অহম্' হইতে প্রাকৃত 'অহমং' এবং তাহা হইতে অপভ্রংশ 'হমুঁ' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল; এই 'হমুঁ' শব্দের হ-কার লুপ্ত হইয়া, সম্ভবতঃ একসময় 'অমু' ও 'অমুই' রূপ উৎপন্ন হয়; পরে তাহা হইতে 'মু' ও 'মুই' পদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই হমু হইতেই হিন্দী 'হৌঁ' ও 'হুঁ' শব্দ আসিয়াছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আদ্যব্যঞ্জনলোপের দৃষ্টান্ত প্রাকৃত কি কোন প্রাচীন ভাষায়ই বিরল। এমন অবস্থায় বীম্‌স্ সাহেবের ব্যুৎপত্তি কতদূর সম্ভবপর তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। তবে তিনি যে বলেন, 'মুই' শব্দের ই-কার inorganic অর্থাৎ অতিরিক্ত সংযোজিতাঙ্গ, তাহা উড়িয়া ভাষার 'মু' এবং বাঙ্গালারও প্রথমেতর বিভক্তির 'মো' দেখিয়া, খুব সম্ভব বোধ হয়। প্রাচীন বাঙ্গালার 'মুঞি' রূপ দেখিয়া কিন্তু একথা সন্দেহজনক বোধ হয়।

আর একটি কথা বলিয়া উত্তমপুরুষের কথা শেষ করিব। কালিদাসকৃত 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের কলিকাতার সংস্করণে একস্থলে দেখিতে পাই, পুরূরবা বলিতেছেন,

"এ মঞি পুহবি ভবন্তে জই পিঅ পেক্খি হিঅ।"

অর্থাৎ আমি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া যদি প্রিয়াকে দেখিতে পাই! এখানে 'মঞি' শব্দের অর্থ 'আমি' (১মা) বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদি এই পাঠ ঠিক হয়, তবে বাঙ্গালা 'মুই' শব্দটির প্রাকৃত প্রথমান্ত এই 'মঞি' হইতে উৎপত্তি অসম্ভব নহে! কিন্তু এই সিদ্ধান্তে

কয়েকটি আপত্তি মনে হইতেছে। (১) এরূপ প্রয়োগ আর কোথাও দেখা যায় না, সুতরাং এই পাঠসম্বন্ধে সন্দেহ আসিতে পারে। (২) এই কথাটি রাজা পুরূরবা কর্ত্তৃক উর্ব্বশীবিরহে উন্মত্তাবস্থায় গীত সঙ্গীতের অন্তর্গত। উন্মত্তের ভাষা অনেকটা বাদ-সাদ দিয়া লইতে হয়; আর, কেবল এইস্থলে নহে, রাজার ঐ সময়ে গীত সমস্ত গানগুলিরই ভাষা মহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর সহিত তুলনায় নিতান্ত অশুদ্ধ প্রাকৃত। (৩) এস্থলে 'মএিও' শব্দটি ৩য়া বা ৭মী বিভক্ত্যন্ত ধরিয়াও, আমার বিবেচনায়, বেশ অর্থসঙ্গতি করা যাইতে পারে।

মধ্যমপুরুষের রূপগুলি—তুমি, তুই, তোমা-, তো-, তোমরা—উত্তমপুরুষেরই অনুরূপ। কিন্তু প্রয়োগে কিছু ভেদ আছে। তুই, তো-, প্রায় সর্ব্বদাই তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়; কেবল আত্যন্তিক প্রেম-ঘনিষ্ঠতা বা ক্ষোভপ্রকাশস্থলে কখনও কখনও তুচ্ছার্থ ভিন্নও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন, ব্রাহ্মসঙ্গীতে "মা তুই প্রেমে উন্মাদিনী," এবং "বিধিরে, তোর কি এই বিচার?" ইত্যাদি।

তুমি, তোমা, ব্যাকরণে সম্ভ্রমার্থক বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু ইহার প্রয়োগ বাস্তবিক সেইরূপ স্থলেই হইয়া থাকে, যেখানে সম্ভ্রম দেখাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, অথচ অবজ্ঞা প্রদর্শনও অভিপ্রেত নহে। এজন্য মান্য ব্যক্তিকে কোনও ভদ্রলোক 'তুমি' সম্বোধন করেন না। যদি বিশেষ বন্ধুতা বা বয়সের বেশী পার্থক্য না থাকে, তবে সমপদস্থ কি ন্যূনপদস্থ ভদ্রলোককেও 'তুমি' বলা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই সকল স্থলে আপনি শব্দ প্রযুক্ত হয়। সম্মান-পাত্রের মধ্যে কেবল মাতাকে অনেকে 'তুমি' সম্বোধন করেন, এবং দেবতার প্রতি 'তুমি' শব্দই ব্যবহৃত হয়। মাতাকে 'তুমি' ডাকা প্রণয়-ঘনিষ্ঠতার দ্যোতক। দেবতার প্রতি তুমি শব্দের প্রয়োগে সকল সময়ে প্রণয়-ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না। বোধ হয় ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই স্থিতিশীল

এজন্য তাহার মধ্যে প্রাচীন 'তুমি' শব্দের স্থান নূতন আমদানি 'আপনি' শব্দ অধিকার করিতে পারে নাই।

যে সকল যুক্তিবলে 'আমি' ও 'মুই' ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক উত্তম পুরুষের বহুবচন ও একবচনের রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, 'তুমি' ও 'তুই', এই দুইটি পদেও সেই সকল যুক্তি প্রযোজ্য। (১) হিন্দী তুম্, গুজরাটী তমে, মারাঠী তুম্হী, নেপালী তিমী বহুবচনান্ত পদ। হিন্দী 'তুম্' কখনও একার্থে প্রযুক্ত হইলেও বহুবচনান্ত ক্রিয়াপদের সহিতই অন্বিত হয়। (২) উড়িয়া 'তুম্হে' ঠিক বাঙ্গালা তুমির তুল্যার্থক, অথচ ইহার বানান প্রাকৃত মধ্যমপুরুষের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচন 'তুম্হে' পদের ন্যায়। (৩) প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে 'তুমি' কে 'তুহ্মি' লেখার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। (৪) 'আমি' পদের সহিত অনেক বিষয়ে মিল থাকায়, 'তুমি' পদের উৎপত্তিও 'আমি'র উৎপত্তির অনুরূপ হওয়াই সম্ভব। এই সকল কারণে প্রাকৃত প্রথমার একবচন 'তুমং' পদের সহিত 'তুমি'র সাদৃশ্য থাকিলেও বহুবচন 'তুম্হে' হইতেই ইহার উৎপত্তি অধিক সম্ভবপর। পক্ষান্তরে, একবচনে. হিন্দী তূ, তৈঁ, গুজরাটী তুঁ, মারাঠী তূঁ নেপালী ত, ইহাদের সর্ব্বত্রই ম-কারের অভাব, সুতরাং বাঙ্গালা 'তুই' ইহাদেরই সমস্থানীয়, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ, প্রাকৃত ১ বচন, ২য়া তুং, ৩য়া তই, তত্র, ৮র্থী ও ৬ষ্ঠী তুহ ও ৭মী তই, তত্র পদের সহিত 'তুই' পদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'তুই' পদের 'ই'কার বোধ হয় অধিকাঙ্গ বা পশ্চাৎ-সংযোজিতাঙ্গ; কারণ (১) আর কোনও ভাষায় এই 'ই'কার নাই; হিন্দী তৈঁ পদে ইহার আভাষ আছে মাত্র, (২) প্রথমার একবচন ভিন্ন বিভক্তির রূপ 'তো' ই-কার বর্জ্জিত। 'তোমা' এই রূপটি বোধ হয় প্রাকৃত তুমাহিংতো প্রভৃতি হইতে গৃহীত। আকারের সামীপ্য বশতঃ উ-কার স্থানে ও-কার হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যের

তুয়া (তুহ্মা) পদটি সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'তব', প্রাকৃত 'তুহ' হইতে উৎপন্ন।

সংস্কৃত বহুবচনের 'যুষ্ম' ভাগ স্থানে 'জুম্হ' না হইয়া 'তুম্হ' হইল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, বোধ হয় ইহা একবচনের প্রভাব ও অনুকরণের ফল।

সম্মানপ্রদর্শনস্থলে মধ্যমপুরুষের অর্থে 'আপনি' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সংস্কৃত 'ভবৎ' শব্দের ন্যায় ইহার ক্রিয়া প্রথমপুরুষীয় হইয়া থাকে। ইহা সংস্কৃত 'আত্মন্' প্রাকৃত 'অপ্পা,' 'অপ্পাণো' পদ হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে এই শব্দটির মধ্যমপুরুষের অর্থে কোথাও প্রয়োগ আছে কিনা সন্দেহ। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পাই নাই। আর নিম্নশ্রেণীর লোকে এখনও 'আপনি' শব্দটির ব্যবহার করে না, 'তুমি' বলে। সুতরাং আমার বোধ হয় শব্দটি অন্য ভাষা হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে সেই ভাষাটি হিন্দী অথবা উড়িয়া হইতে পারে, এবং উড়িয়ার মধ্য দিয়া মারাঠী ভাষার সহিতও এ বিষয়ের সম্বন্ধ থাকার সম্ভাবনা। শব্দটি হিন্দীতে আপ্, উড়িয়ায় "আপে" বা "আপণ," মারাঠী আপণ। ণ-কারের দিকে চাহিলে উড়িয়া ও মারাঠীর দিকেই ঝোঁক দিতে ইচ্ছা হয়। ই-কারটি কিন্তু বাঙ্গালায়ই আছে, এবং এ বিষয়ে 'তিনি' 'উনি' 'যিনি' প্রভৃতি সম্ভ্রমার্থক পদের সহিত আপনি শব্দের সাদৃশ্য আছে। এজন্য অনুমান হয়, ঐ সকল শব্দের ন্যায় আপনি শব্দের 'নি' ভাগ বহুবচনের চিহ্ন বা বহুবচন হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীপরেশনাথ সেন।

মাতৃপূজা।

যুগযুগান্তর ধরি' চক্রনেমি ক্রমে,
শত আবর্ত্তের মাঝে, জনমে জনমে,
জনপদে শৈলসিন্ধুসরিতকান্তারে
তোমারে পূজিয়াছিনু, কি কি উপচারে,
মনে নাহি, অয়ি দেবি, জননি আমার!
আজি এই উষালোক তরুণা ধরার
বৃদ্ধবট-গিরিশির, গলিত কাঞ্চনে,
সদ্যঃ পরিস্নাত, স্নিগ্ধ, কৌষেয় বসনে
ব্রাহ্মণ বটুর মত স্থির, অবিচল;
বাপীহ্রদসরসীর স্বচ্ছ নীলজল,
তরল আনন্দসম শ্যামা প্রকৃতির;
বিচিত্র কুসুমদাম, জগৎ-লক্ষ্মীর
পূর্ণসুধাপাত্রসম, ধীর সমীরণ
জননীপরশরূপে পশিছে মরম।
লতাকিশলয়গুলি, স্নিগ্ধ শ্যামল,
যেন তারা স্নাত পূত, পেয়ে শান্তি জল
তপস্বিনী ধরণীর কমণ্ডলু হ'তে।
সবি পরিপূর্ণ করি' নিখিল জগতে
বিরাজিছে শরতের শান্ত নভস্থল
ভিন্নাঞ্জনসমনীল অপার, অতল।
ওই অভ্রপোতগুলি দূরনীলিমায়
বালাতপে রক্তশির, আকাশ গঙ্গায়

যেন ঐরাবতশিশু—কুম্ভদেশ'পরে
সুন্দর সিন্দুর-রাগ, পূরব অম্বরে
উষার লাবণ্য হাসি, তরল লীলায়
স্রোতোমুখে ছুটিয়াছে দিগন্ত সীমায়।
বনান্ত প্লাবিয়া দূরে মধুর রাগিনী
বিহগের কলকণ্ঠে ; দিগন্ত রঙ্গিণী
বিলাসিনী দিগ্বধূরা, যেন গো উল্লাসে,
সমতান, মধুকণ্ঠে, কম্পিত উচ্ছ্বাসে,
গাহিতেছে, অয়ি মাতঃ, তোমার বোধন।
হেরি' তব পূজাতরে এত অয়োজন,
ধরণীতে, মহাকাশে, বিশ্বচরাচরে,
বড় সাধ, চিরারাধ্যে জেগেছে অন্তরে
ও রাঙ্গা চরণমূলে বসি' একবার
হেরি পূজাবিধি তব, পূজার সম্ভার।

শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত।

ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার।

(২)

মালাবার ধ্বংশ করিয়া,—দগ্ধ করিয়া,—আরববণিকদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ভাস্কো-ডা-গামা যখন লিস্‌বন নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন ভারতমহাসাগরে বাণিজ্য এবং কোচিনের কুঠী সংরক্ষণের নিমিত্ত তিনি ভিন্‌সেণ্টি সোদ্রিকে রাখিয়া গেলেন। সোদ্রি কিয়দ্দূর অবধি ডা-গামার অনুবর্ত্তী হইয়া বৈদেশিক বণিক্-কুলের বাণিজ্যতরণী লুণ্ঠন, নিমজ্জন ও দহনব্যপদেশে প্রত্যাগমন করিলেন; ডা-গামার ইহাই আদেশ ছিল।

গামার সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তনকালে একদিন প্রভাতে সোদ্রির সহিত কালিকাট নৌ-বহরের সাক্ষাৎ ঘটিল। সেনাপতি কোজাম্বর কালিকাটের অন্যতম নৌ-সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কুড়ি খানি বৃহৎ রণ-তরী হইতে কামান গর্জ্জিয়া ফিরিঙ্গি সোদ্রির অভিনন্দন করিল। সোদ্রিও হীনবল ছিলেন না; তাঁহারও জাহাজ হইতে একটী কামানের গোলা অব্যর্থ-সন্ধানে নিক্ষিপ্ত হইয়া কালিকাট সেনাপতির প্রধান জাহাজের গুণবৃক্ষ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল—জামোরিণের বিজয়-পতাকা, ভগ্ন গুণবৃক্ষসহ সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিয়া গেল। অদূরে খোজা কাসেম আরও কতকগুলি রণতরী লইয়া প্রস্তুত ছিলেন—সোদ্রি তাঁহাকেও আক্রমণ করিলেন। তখন কোজাম্বর ও কাসেমের সহিত পর্ত্তুগীজ-দিগের মহা সমর উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গিগণ অব্যর্থ-সন্ধান এবং তাঁহাদিগের রণতরীও কামানে, বারুদে সুসজ্জিত ছিল—জামোরিণের সেনাপতিদ্বয় রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

পলায়নপর কাশেমের একখানি জাহাজ পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ধৃত

হইল; বিজয়ী সোদ্রি সেই জাহাজ লুণ্ঠনপূর্ব্বক বহুমূল্য পণ্যসামগ্রী এবং কতকগুলি সুন্দরী কিশোরী সংগ্রহ করিয়া হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কয়েকজন সমৃদ্ধিশালী মুর-বণিকের স্ত্রীপুত্র-পরিবারও সেই জাহাজে ছিল, পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিল; মহম্মদের মণিমুক্তাখচিত একটী কনকমূর্ত্তি সোদ্রি, বিজয়গৌরবে লাভ করিয়া হৃষ্ট হইলেন। রণমত্ত পর্ত্তুগীজ-সেনাপতির রণপিপাসা তখনও তৃপ্ত হয় নাই; তিনি অবিলম্বে পলায়নমুখী বাণিজ্য তরণীগুলি আক্রমণ করিলেন। নিরুপায় মুরগণ ফিরিঙ্গির হস্ত হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সমুদ্র-গর্ভে ঝম্প প্রদান করিল। সেই সকল পরিত্যক্ত, শূন্য তরণী-সমূহ কালিকাটের সন্নিকটে টানিয়া আনিয়া ফিরিঙ্গি সোদ্রি প্রফুল্লচিত্তে তাহাদিগের অগ্নিসৎকার করিলেন। কুণ্ডলীকৃত ধুমরাশি বিপুল বিক্রমে শূন্যে উত্থিত হইয়া কালিকাট সিংহাসনতলে পর্ত্তুগীজ বিজয়কাহিনী বিজ্ঞাপিত করিল; বালুময় বেলাভূমে দাঁড়াইয়া ভীতি-বিহ্বল "নেটিভ"গণ দেখিতে লাগিল জলধিহৃদয় দাবানলে সমাচ্ছন্ন, প্রতি তরঙ্গের সঙ্গে যেন এক একটী অনল-শৈল কালিকাট দগ্ধ করিবার জন্য অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ ভাস্কো-ডা-গামা তখনও ভারতবর্ষের ছায়া পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি দলবলসহ কানানোরে সোদ্রির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন সোদ্রির নিকট রণবার্ত্তা শ্রবণে বিমুগ্ধ গামা কানানোর কুঠীর সুবন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। ডা-গামা বুঝিয়াছিলেন সুরক্ষিত দুর্গ-সংস্থাপন ভিন্ন ভারতবর্ষে পর্ত্তুগালের স্থান হইবে না। প্রকাশ্যে দুর্গনির্ম্মাণপ্রস্তাব অপ্রীতিকর হইবে মনে করিয়া নানা উপায়ে কানানোরাধিপতিকে বুঝাইয়া গামা অনেকগুলি কামান এবং তদুপযুক্ত গোলা, বারুদ কানানোর-কুঠিতে স্থাপন করিলেন—যুদ্ধোপকরণগুলি তখনকার মত ভূমিতলে প্রোথিত রহিল।

দুর্গ সুরক্ষিত করিতে হইলেই সুদৃঢ় প্রাচীর প্রয়োজন। কানানোরের কুঠীই তখন ফিরিঙ্গিদিগের দুর্গ। ভাস্কো-ডা-গামা কানানোরের অধিপতিকে কৌশলে সম্মত করাইয়া কুঠীর চতুর্দ্দিকে প্রাকার নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কানানোরের রাজা মনে করিলেন 'ইহাতে ক্ষতি কি? কুঠীতে যে সকল পর্ত্তুগীজ বণিক বাস করিবে তাহাদিগের আত্মরক্ষা এবং ধনসম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কুঠী প্রাচীর বেষ্টিত রাখা নিতান্তই প্রয়োজন; ইহাদিগের মনে কথনই কোন কু-অভিসন্ধি নাই—ইহারা যথন এই স্থানেই বাস করিবে তখন সকলেইত আমার-ই প্রজা'। অবিলম্বে কানানোর কুঠীর চতুর্দ্দিকে প্রস্তরময় সুদৃঢ় প্রাচীর মস্তক উত্তোলন করিল। প্রাচীর হইলেই আগম-নিগমের পথ প্রয়োজন; সুতরাং সেই প্রাচীরগাত্রে একটী সুবৃহৎ দৃঢ় সিংহদ্বার নির্ম্মিত হইল। ডা-গামা রাজাকে বুঝাইলেন উপদ্রবকারীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সিংহদ্বার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক। দ্বারের চাবি আমার নিকটেই থাকিবে, আমি প্রতি রাত্রে উহা বন্ধ করিব এবং প্রভাতে আবার খুলিয়া দিব!

ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে চিরদিন থাকিতে আসেন নাই; স্বদেশবাসী যাহারা ভারতবর্ষে থাকিল সেই সকল পর্ত্তুগীজদিগের জ যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করিয়া ১৫০২ সালের এক সুন্দর প্র্কা- ডা-গামা সত্য-সত্যই স্বদেশ যাত্রা করিলেন—সিংহদ্বার যাত্রা 'কুঠীয়াল'দিগের হস্তে রহিল। ভিন্‌সেন্টি সোড্রি কাপ্তানিও-ডা- প্রাপ্ত হইয়া ভারত-মাহাসাগরের কর্ত্তৃত্বভার (!) গ্রহণলেন। কাটরাজের যথাশক্তি অনিষ্ট করিবার এবং সুবিধরিণ, কালিকাটে মুর-জাহাজগুলি লুণ্ঠন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত কোচিনে অবস্থান অবতীর্ণ হইলেন। কস্মাৎ তথায় আসিয়া

অপমানিত, পীড়িত জামোরিণ সর্ব্বফিরিঙ্গির ভয়ে এতই ভীত

অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, কোচিনরাজ ত্রিমম্‌পুরা ফিরিঙ্গি বণিকদিগের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন। ইহা তাঁহার সহ্য হইল না; তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রকারেই হউক কোচিনরাজ্য হইতে চিরশত্রু ফিরিঙ্গিদিগকে বিতাড়িত করিতেই হইবে। অবসর বুঝিয়া আবার বণিকসম্প্রদায়ও জামোরিণকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল,—ফিরিঙ্গি বণিকদিগের অত্যাচার তাহাদিগকে উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিমম্‌পুরার সভাসদ্‌গণ, এই কাল সমর হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল—কিন্তু শরণাগত, আশ্রিত ফিরিঙ্গিদিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি জামোরিণের সহিত সমর শ্রেয়ঃজ্ঞান করিলেন।

ক্রুদ্ধ জামোরিণ ৫০,০০০ সহস্র সৈন্যসমভিব্যাহারে কোচিনের সন্নিকটবর্ত্তী রেপেলিমদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেই সময়, সোড্রিও কোচিনে উপস্থিত হইলেন; ফারনাণ্ডেজ, কোরিয়া প্রভৃতি পর্ত্তুগীজগণ তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ সহস্র অনুরোধ করা সত্ত্বেও সোড্রি আপনার রণতরী এবং সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিলেন। কেহ বলেন জামোরিণের ভয়ে এবং কেহ বলেন লোহিত-[illegible]গরে মুরবণিকদিগের বহুমূল্য পণ্যসম্ভারপূর্ণ তরণীসমূহ লুণ্ঠন করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইবার মানসেই সোড্রি কোচিনরাজের সহায়তায় [illegible]ইলেন না, এমন কি তাঁহার প্রবাসী স্বদেশবাসীদিগকেও [illegible]ন।

[illegible] সহিত ত্রিমম্‌পুরার ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। [illegible]ভে ত্রিমম্‌পুরার সৈন্যমধ্যে অনেকে জামোরিণের [illegible] হইয়া কোচিনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। [illegible] ইতালিয় ভারতবর্ষে আসিয়া কোচিনে [illegible]তেছিল; তাহারাও কোচিনরাজের পক্ষ

পরিত্যাগপূর্ব্বক জামোরিণের পক্ষ অবলম্বন করিল। ত্রিমম্পুরা পরাজিত হইয়া কোচিন পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী ভিপিনদ্বীপে পলায়ন করিলেন—পলায়নকালে শরণাগত ফিরিঙ্গিদিগকে বিস্মৃত হইলেন না। জামোরিণ কোচিন অধিকার করিলেন বটে—কিন্তু ভিপিনদ্বীপ করায়ত্ত করিতে পারিলেন না—কোচিনে কালিকাট বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল।

এদিকে লুব্ধ সোদ্রে স্বদেশবাসী এবং বন্ধু কোচিন-রাজের বিপদে তিলমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া লুণ্ঠনমানসে লোহিতসাগরে গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের চক্ষে এতটা সহ্য হইল না;—পথিমধ্যে ভীষণ ঝঞ্ঝায় তাঁহার জাহাজগুলি নিমগ্ন হইল, সোদ্রে এবং তাঁহার ভ্রাতা বিশাল তরঙ্গাঘাতে কোথায় ভাসিয়া গেলেন কেহ জানিল না!

পর্ত্তুগাল-রাজসিংহাসনে বসিয়া ডম ম্যানুয়েল দেখিলেন, যতদিন জামোরিণ মুরবণিকদিগকে সাহায্য করিবেন, ততদিন ভারতবর্ষে পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। জামোরিণকে পরাস্ত করিয়া দলিত করিতে না পারিলে ভাস্কো-ডা-গামার ব্যয়সাধ্য, আয়াসসাধ্য অভিযান অর্থহীন ও নিস্ফল হইয়া যাইবে, পর্ত্তুগালের সকল আশা-ভরসা বিফল হইবে। তাই তাঁহার আদেশে নয়খানি অতি বৃহৎ রণতরী সুসজ্জিত হইল। আফন্সো-ডা-আল্‌বুকার্ক ও তাঁহার ভাগিনেয় ফ্রান্সিস্‌কো-ডা-আল্‌বুকার্ক ছয়খানি জাহাজ লইয়া ভারতীয় পণ্যসংগ্রহে যাত্রা করিলেন এবং অবশিষ্ট তিনখানি জাহাজ লইয়া আণ্টোনিও-ডা-সাল্‌ধানা লোহিতসাগরে মক্কার বাণিজ্য-শাসনে অগ্রসর হইলেন।

যুদ্ধান্তে কোচিনে কতক সৈন্যসামন্ত রাখিয়া জামোরিণ, কালিকাটে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন—সৈন্যগণ নিশ্চিন্তমনে কোচিনে অবস্থান করিতেছিল। ফ্রান্সিস্‌কো-ডা-আল্‌বুকার্ক অকস্মাৎ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। জামোরিণের সৈন্যগণ ফিরিঙ্গির ভয়ে এতই ভীত

হইয়াছিল যে পুনরায় তাহাদিগের আগমনবার্ত্তা পাইবা মাত্রই কোচিন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

শরণাগতরক্ষক বলিয়া ফ্রান্সিস্‌কো, কোচিনরাজের যথেষ্ট সাধুবাদ করিলেন এবং ডম ম্যানুয়েলের নামে তাঁহাকে ১০,০০০ মুদ্রা (Ducat) উপঢৌকন প্রদান করিলেন। কোচিনরাজ বিনা আয়াসে স্বসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ত্রিমম্‌পুরা সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর বিদ্রোহী-শাসনের সময় আসিল। নিকটবর্ত্তী এক দ্বীপাধিপতি কোচিন-সিংহাসনচ্ছায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক জামোরিণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ফিরিঙ্গির কঠিন শাসন-দণ্ড প্রথমে তাঁহার শিরেই নিপতিত হইল। দ্বীপবাসীগণ শতে, সহস্রে হত হইয়া ফিরিঙ্গির শোণিত-তৃষা মিটাইতে লাগিল; গ্রাম, জনপদসমূহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া ফিরিঙ্গির বিক্রম ঘোষণা করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গির সুশাণিত কৃপাণ দ্বীপান্তরে রাজঅন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিল। রাজপুরী লুণ্ঠিত হইল, রাজরক্ত ভূমিপৃষ্ঠে অত্যাচারের চিত্র লিখিল, প্রাণহীন জনপদ শ্মশান-তুল্য হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে রেপেলিম ফিরিঙ্গির রণকোলাহলে শিহরিয়া উঠিল। সেই স্থানে একদিন জামোরিণের শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া রেপেলিম-অধিবাসীগণ দলে দলে নিহত হইতে লাগিল। রেপেলিম-রাজকুমার বীরোচিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন;—তাঁহার সৈন্যগণ শত্রুর কৃপাণে-কামানে, কেহবা সমুদ্রগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। সেই সমৃদ্ধিশালী জনপদ অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া শিকরশীতলসমীরস্পর্শে সাগরগর্ভে উড়িয়া গেল।

পর্ত্তুগীজদিগের সখ্যে ও বীরপনায় কোচিনরাজ পরম প্রীত হইয়াছিলেন; ফিরিঙ্গিরা যে তাহা বুঝিতে না পারিয়াছিল এমন নহে।

ভাস্কো-ডা-গামা একদিন যাহার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, আজ ফ্রান্সিস্‌কো-ডা-আল্‌বুকার্ক তাহারই পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিবার শুভমুহূর্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সময় বুঝিয়া একদিন ত্রিমম্‌পুরার নিকট প্রস্তাব করিলেন, কোচিনরক্ষার্থ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করা নিতান্ত প্রয়োজন; দুর্গ নির্ম্মিত হইলে রাজারই মঙ্গল, পর্ত্তুগীজ কুঠিয়াল দিগেরও যে সুবিধা না হয় তাহাও নহে! কিন্তু কোচিনরাজেরই পরম মঙ্গল; কারণ জামোরিণ যদি শত্রুতাবশে আবার কোনও দিন কোচিন আক্রমণ করেন তাহা হইলেও আর আশঙ্কার কোন কারণ থাকিবেনা। ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের ইহাই সনাতন রীতি— ইঁহারা নিজের জন্য রাজ্য জয় করেন না, রাজ্য শাসন করেন না— ইঁহাদিগের যত আত্মত্যাগ কেবল পরের জন্য! সাধ করিয়া পরের বোঝা বহিবার কেন যে এত আকাঙ্খা তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। বুদ্ধিমান্ কোচিনরাজও তাহা বুঝিতে হার মানিয়াছিলেন।

ত্রিমম্‌পুরা যাঁহাদিগের অনুগ্রহে নিজরাজ্য, সিংহাসন, এমন কি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না—প্রত্যাখ্যান করিবার ইচ্ছাও তাঁহার হইল না। এমন হিতৈষী বন্ধুর উপর কোন ক্রমেই তাঁহার অবিশ্বাসের কারণ ছিলনা। ত্রিমম্‌পুরা হৃষ্টচিত্তে দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি দিলেন এবং ব্যয়ভার সমস্তই বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন!

অবিলম্বে একটী উপযুক্ত উচ্চ স্থান ফিরিঙ্গিদিগের সহিত পরামর্শে মনোনীত হইল; রাজার আদেশে সহস্র ব্যক্তি দুর্গনির্ম্মাণের সাহায্য করিতে লাগিল, ফিরিঙ্গিগণও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করিলেন না। ফিরিঙ্গিদিগের উৎসাহে এবং একাগ্র চেষ্টায় ও সর্ব্ব-সাধারণের এবং রাজার সাহায্যে অল্পকালমধ্যেই ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজ-দিগের প্রথম শিলাদুর্গ নির্ম্মিত হইল। ভারতে পর্ত্তুগীজ অধিকার

প্রতিষ্ঠার সেই প্রথম সোপানকে ফিরিঙ্গিগণ আশায়, আনন্দে, উদ্বেলিত-হৃদয়ে দর্শন করিতে লাগিল। ভারত-মহাসাগরের সুনীল সফেন তরঙ্গভঙ্গে স্নুয়মান হইয়া সেই নবীন শিলাদুর্গ, শক্তি ও দার্ঢ্যের, বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার অনলমুর্ত্তিসদৃশ ইমানুয়েলের পবিত্রনাম গ্রহণ করিয়া "ম্যানুয়েল" আখ্যায় পরিচিত হইল!

রেপেলিম অথবা এচ্ছপল্লিদ্বীপের অংশবিশেষ ধ্বংশ করিয়াও ফিরিঙ্গিগণ শান্তি লাভ করিতে পারিল না, অল্পকালমধ্যেই তাহারা রেপেলিম-রাজকুমারের অন্যান্য নগর, গ্রাম প্রভৃতি আক্রমণ করিয়া শতসহস্র নিরপরাধ নাগরিকদিগকে নৃশংসরূপে নিহত করিল। এই সংবাদ যখন নেয়ারদিগের নিকট পৌঁছিল তখন ৬০০০ সহস্র নেয়ার জীবনপণ করিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। নেয়ারজাতি সমরে দুদ্ধর্ষ; তাহারা অমিতবিক্রমে ফিরিঙ্গিদিগের সম্মুখীন হইল—সমরপটু সুদৃঢ় করে তীক্ষ্ণধার খরবাণ লইয়া নেয়ারগণ স্বদেশ ও স্বজনদিগের জন্য অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল।* ফিরিঙ্গি

---

* ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্র মহাশয় "ফিরিঙ্গি বণিক" প্রবন্ধের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—"ফিরিঙ্গি বণিকের সেনাবল অধিক ছিলনা; পাকিও অনন্যোপায় হইয়া নায়ার-বংশীয় সিপাহীগণকে পল্টনভুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সূত্রে ফিরিঙ্গির বাহুবলের সহিত ভারত-বাসীর বাহুবল সংযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের পরাজয় সাধনে অগ্রসর হইল। ভারত-বর্ষের যে জাতি স্বদেশের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে ফিরিঙ্গির পল্টন ভুক্ত হয়, তাহারা নায়ার নামে অদ্যাপি সর্ব্বত্র সুপরিচিত।" নায়ারগণ স্বজন-স্বদেশদ্রোহী হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। কোচিনের ফিরিঙ্গিবণিকের যুদ্ধবর্ণনায় একজন বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—The report of this attack soon spread, and the whole country rose in arms to expel the invaders, *while above 6,000 Nairs hastened to the assistantce of this country men.* These attacked the Portuguese with so much fury that they forced them to retreat and drove them back to the river, ...in this retreat *Durtate Pacheco* had a narrow escape of being cut off, and would probably have them taken, or killed, had not Albuquerque gone to his aid."

বণিক বুঝিল এদেশেও যোদ্ধা আছে, এখানেও বিক্রম আছে—এ দ্বীপেও রণকৌশল আছে। তাহারা অধিকক্ষণ টিকিতে পারিলনা—নেয়ারদিগের আক্রমণে পশ্চাৎপদ হইয়া নিকটবর্ত্তী নদীর আশ্রয় গ্রহণ করিল, অবশেষে কোনক্রমে কোচিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জীবন রক্ষা করিল! যদি আল্‌বুকার্ক সময়মত সাহায্য করিতে না পারিতেন তাহা হইলে হয়ত সকলেই নিহত হইতেন।

সেদিনের মত পর্ত্তুগীজগণ হটিয়া গেল বটে কিন্তু পরদিন রাত্রে পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধের পর ফিরিঙ্গিগণ অনেকগুলি গ্রাম দগ্ধ করিয়া অতি প্রত্যূষে কাম্বালাম্‌দ্বীপে উপনীত হইল। কাম্বালামে ৭০০ অধিবাসীর তপ্ত শোণিতে সাগরসলিল রঞ্জিত হইয়া উঠিল—ফিরিঙ্গিগণ তখন উন্মত্ত, একান্ত শোণিত-লোলুপ, জামোরিণের শত্রুতাসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ! কাম্বালাম ভস্ম করিয়া তাহারা উন্মুক্ত শোণিতসিক্ত কৃপাণ করে জামোরিণের রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাহা-কিছু সম্মুখে দেখিতে লাগিল তাহাই নিঃশেষে ধ্বংশ করিতে লাগিল।

সম্মুখসমরে অকৃতকার্য্য হইয়া জামোরিণ মুরবণিকদিগের সহিত কৌশলের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন ফিরিঙ্গিরা নানাপ্রকার মসল্লা লইবার মানসেই ভারতে আসিয়াছে যদি ওই সকল সামগ্রী না পায় তাহা হইলে আপনা হইতেই মালাবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এদিকে জামোরিণ তৎকর্ত্তব্যবিধানে চেষ্টিত হইলেন কিন্তু কৌশলী আল্‌বুকার্ক, কুইলনের রাজমহিষীর রাজ্য হইতে দুইখানি জাহাজপূর্ণ মসল্লা সংগ্রহ করিয়া জাহাজ বোঝাই করিতে লাগিলেন। রাজমহিষীর সচিববৃন্দ তাঁহাকে নানাপ্রকারে সম্মানিত ও তুষ্ট করিতে লাগিল, অবশেষে কুইলনে একটী ফিরিঙ্গি কুঠী নির্ম্মাণেরও আদেশ প্রদান করিল। কুইলনে মুর অথবা অন্য

কোন বৈদেশিক বণিক ছিলনা বলিয়াই আলবুকার্কের সর্ব্ববিষয়ে এত সুযোগ ঘটিয়াছিল।

কুইলনরাজ্য হইতে ফিরিঙ্গিদিগকে বিদূরিত করিবার মানসে জামোরিণ কুইলনরাজমহিষীকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইলনা। রাণী উত্তর দিলেন 'ফিরিঙ্গি আমার দেশে আসিয়া কোন অত্যাচার করে নাই,—আমার কোন প্রজাকেও নিগৃহীত করে নাই, সুতরাং তাহাদিগের সহিত কেন শত্রুতা করিব।' যাহাহউক, অবশেষে আলবুকার্কের সহিত জামোরিণের একটী সন্ধি হইয়াছিল বটে কিন্তু ফিরিঙ্গিদিগের অন্যায় আচরণে সে সন্ধি অচিরেই ভঙ্গ হইয়াছিল।

সাগরাম্বরা সুদূর ভারতবর্ষ—একদিন যাহার অন্বেষণে বাহির হইতে কত বীরহৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, পর্ত্তুগাল তথায় ধীরে ধীরে আধিপত্য লাভ করিতে লাগিল। আফন্সো ডা-আলবুকার্ক এবং তাঁহার ভাগিনেয় ভারতবর্ষের উপকূলে পর্ত্তুগীজ প্রাধান্য সংরক্ষণের ও বিস্তারের সম্পূর্ণ আয়োজন করিলেন। এদিকে এণ্টনিও-সালধানা আফ্রিকার পূর্ব্বসীমা লুণ্ঠন ও দহনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া লোহিত-সাগরে মুসলমানদিগের সহিত মিসরের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিন্ন করিবার পথ সুপরিষ্কৃত করিলেন। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ক্ষমতাশালী ভূস্বামীদিগের সহিত আলবুকার্কের যে সন্ধি হইল তাহাতে সেণ্ট-টমাস খ্রীষ্টানদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত সুবিধা-সুযোগগুলি সমস্তই স্থির থাকিল। কুইলনে দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিধিব্যবস্থার উপর তদ্দেশবাসী খ্রীষ্টান-দিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিল; কোচিনের শিলাদুর্গ ফিরিঙ্গিদিগের বিজয় ঘোষণা করিয়া সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিল। ইতিপূর্ব্বে ডা-গামার শিষ্য সোদ্রিও মালাবার উপকূলে লুণ্ঠনাদি করিয়া পর্ত্তুগালের বাণিজ্যতরণী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

আফন্সো-ডা-আল্‌বুকার্ক বোধ হয়, আরও অধিকদিন ভারতবর্ষে থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার ভাগিনেয়ের সহিত বিবাদ হওয়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদিন ভাস্কো-ডা-গামা ভারত হইতে লিসবনে উপনীত হইয়া যেরূপ খ্যাতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, আল্‌বুকার্কও সেইরূপ সম্মানিত হইলেন। পাঁচমণ ছোট মুক্তা, অর্দ্ধমণ বড় মুক্তা, এক খণ্ড বৃহৎ হীরক, এবং একটী পারসীক ও অপরটী আরব এই দুই অশ্ব এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন লইয়া যখন আল্‌বুকার্ক লিস্‌বন নগরে উপস্থিত হইলেন তখন চতুর্দ্দিকে উল্লাসের কোলাহল সমুত্থিত হইল।

ফিরিঙ্গিদিগের অত্যাচার জামোরিণ বিস্মৃত হইলেন না। আফন্সোর ভারত পরিত্যাগের পরই তিনি মালাবারের অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়া কোচিনের ফিরিঙ্গিদিগকে দূর করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ২৮০ খানি রণতরী অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইল; ৩৮২টী কামান এবং সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে জামোরিণ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ফিরিঙ্গি দুরাত্তি পার্টেকো কোচিনরাজের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। ফিরিঙ্গি ও দেশীয় সর্ব্বসমেত তাঁহার সৈন্য সংখ্যা ৫০০শত মাত্র ছিল।

সেই পাঁচমাসব্যাপী প্রাণপণ যুদ্ধের দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করিব না। জামোরিণ পিত্তলের রাশি রাশি কামান প্রস্তুত করাইলেন, কিন্তু ফিরিঙ্গির যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। ফিরিঙ্গি বণিকের প্রতিষ্ঠা ভারতের অদৃষ্টলিপিতে অনলাক্ষরে লিখিত ছিল তাই মালাবারের সম্মিলিত রাজন্যশক্তিও ফিরিঙ্গি-বিক্রমের নিকট পরাজয় মানিলেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ, উদ্যম সমস্তই বৃথা হইল। শত্রুমধ্যে দুই একজন স্বজনদ্রোহী খলস্বভাব দুরাত্মাকে অর্থে বশ করিয়া শত্রুর আহার্য্য, পেয় প্রভৃতির সহিত তীব্র গরল মিশ্রণের চেষ্টাও অবশেষে

নিষ্ফল হইয়া গেল। পুনঃপুনঃ পরাস্ত হইয়া জামোরিণের সৈন্যদল হটিয়া গেল। শেষে ১৯০০০ সহস্র সৈন্যের জীবনপণে জামোরিণ কোচিন-রাজের নিকট সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন।

লিসবন সিংহাসনে বসিয়া পর্ত্তুগালাধীপ দেখিলেন, একজন ভারতীয় নৃপতির সহিত আর একজন ভারতীয় নৃপতির যুদ্ধ বাধাইয়া দিতে পারিলে ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় এবং একদল য়ুরোপীয় সৈন্য সংগঠন করিয়া তাহাদিগের অনুকরণে য়ুরোপীয় সেনাপতির নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সৈনিকদিগকে শিক্ষা দিতে পারিলে ভারতে ফিরিঙ্গির শক্তি চিরপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে, অজেয় হইতে পারে। তাই নরপতি ম্যানুয়েল অবিলম্বে ১৩ খানি অতি বৃহৎ রণতরীসহ ১২০০ শত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। লোপো-সোয়ারেজ এই সৈনিকসম্প্রদায়ের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

যে বন্দরেই আরববণিকদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি দেখিতে লাগিলেন, সোয়ারেজ ভারতে আসিয়া সেই বন্দরই একেবারে ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। যে সকল ফিরিঙ্গি বণিক পূর্ব্ব হইতেই কালিকাটে বন্দী ছিল এবং যে দুইজন মিলানিজ সম্প্রতি জামোরিণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সোয়ারেজ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। জামোরিণ সোয়ারেজের প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে কিন্তু শরণাগত মিলানিজদ্বয়কে ফিরিঙ্গিকবলে ধরিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন না।

এই প্রত্যাখ্যানে ফিরিঙ্গি সোয়ারেজের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; অনতিকালমধ্যে তিনি কালিকাটের উপর অনলবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কালিকাটের ধ্বংশকার্য্য দুই দিন ধরিয়া চলিল। কালিকাট ধ্বংশ করিয়া ফিরিঙ্গি সেনাপতি নিরপরাধ ক্রাঙ্গানোরের

উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি ক্রাঙ্গানোর এবং তাহার বন্দরস্থিত সমুদয় বাণিজ্যতরণী ভস্মসাৎ হইয়া গেল—ইহুদী এবং মুরদিগের উপাসনা-মন্দির পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইল।

বুদ্ধিমান ঐশ্বর্য্যশালী আরববণিকসম্প্রদায় তখন বেশ বুঝিতে পারিল, যে ভারতবর্ষ আর তাহাদিগকে স্থান দিতে পারেনা—ভারত উপকূলের শক্তিশালী রাজন্যবর্গও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে নিতান্ত অক্ষম। তাই একদিন আপন আপন ধনরত্নাদি জাহাজে তুলিয়া তাহারা আরব ও মিসরে যাত্রা করিল। সোয়ারেজের শ্যেনদৃষ্টি পলায়নপর মুরদিগের উপর নিপতিত হইবা মাত্র তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ১৭ খানি বানিজ্যতরণী লুণ্ঠিত করিলেন—২০০০ সহস্র হতভাগ্য মুর বণিক নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়া সমুদ্রের শীতলগর্ভে স্থানলাভ করিল! চতুর্দ্দিক চিতাধুমে সমাচ্ছন্ন করিয়া লোপো-সোয়ারেজ সগৌরবে লিস্‌বনে ফিরিয়া গেলেন!

অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া, অনেক প্রাণ বলি দিয়া, বহু অর্থ নষ্ট করিয়া, শেষে মহা সমৃদ্ধিশালিনী কালিকাটনগরীর চিতাভস্মের উপর দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু জামোরিণ এতদিনে বুঝিতে পারিলেন, আরব বণিকদিগের প্ররোচনায় ফিরিঙ্গিবণিকের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সমরক্রীড়ায় কি ফললাভ করিয়াছিলেন। সোয়ারেজ কর্তৃক সঙ্গতিশালী মুরগণ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, আর সেই সঙ্গে জামোরিণের সকল আশা, সকল ভরসা ভারতসাগরের চঞ্চল তরঙ্গমালার মত ভাসিয়া ভাসিয়া অসীমে মিলাইয়া গেল—তিনি যে তাহাদিগেরই সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আশার সুবর্ণ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—তিনি যে তাহাদিগেরই সাহায্যে, তাহাদিগেরই অর্থে সমুদ্রতীরে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন—তাহাদিগেরই বাণিজ্য-গৌরবে স্বয়ং গৌরবান্বিত

হইয়া "সামুরি" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন! এতদিনে মালাবারতীরে আরব বাণিজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কনক-সিংহাসন ফিরিঙ্গির বিজয়বিক্রমে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল! কেবল শোকসন্তপ্ত বিনষ্টগৌরব, হৃতসর্ব্বস্ব মালাবারের হা-হা-রোদনধ্বনি বারিধির অনন্ততরঙ্গভঙ্গরব সঙ্গে মিলিত হইয়া ফিরিঙ্গির অত্যাচারকাহিনী জাগ্রত রাখিল আর ফেনাময় বেলাভূমি সেই সকল নিষ্পিষ্ট নিহত ভারতবাসীর তপ্ত শোণিতে রঞ্জিত হইয়া ফিরিঙ্গির ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিল—

"Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel."

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

যে সময় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মন্তব্যপাঠে দেশময় একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে যে লর্ড কর্জ্জন ছলে বলে কৌশলে উচ্চ শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিতে উদ্যত, সেই সময়ে বঙ্গবাণীর প্রিয়সন্তান শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎপ্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন যে আমাদের এখন কর্ত্তব্য দেশের শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া। তাহাতে যে শুধু আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দোষ নিষ্কৃত হইবে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে কখনই প্রকৃত শিক্ষার ফল ফলিবেনা। বিদেশী ও বিধর্ম্মী ও বিজেতা জাতির নিকট আমাদের জাতীয় প্রকৃতির

অনুকূল শিক্ষা আমরা কখনই আশা করিতে পারিনা। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনে দেশীয় সভ্য (Fellow) সংখ্যার সঙ্কোচ হওয়াতে এই আশা আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরে যখন পাঠশালার নিম্নশ্রেণীতে পঠিতব্য পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনও তিনি সেই কথাটা তুলিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে সরকার বাহাদুরের এই সকল নূতন নূতন প্রস্তাব হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের শিক্ষার ভার আমরা নিজে না গ্রহণ করিলে আর নিস্তার নাই। আবার যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠে, তখনও তিনি সেই এক কথা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আজ স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বঙ্গের উভয় খণ্ডেই ছোটলাটবাহাদুর যে ভাবে ছাত্র ও শিক্ষক নির্য্যাতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দরুণ, জাতীয় শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া উচিত, এই কথাটা নূতন করিয়া উঠিয়াছে।

চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন,—'পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পর হস্তগতং ধনম্। কার্য্যকালে ন সা বিদ্যা কার্য্যকালে ন তদ্ধনম্॥' আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিদ্যা পুস্তকস্থা ত বটেই, আবার পরহস্তগতাও।

পরের প্রসাদে বিদ্যালাভ করা অগৌরবের বিষয় বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহা অনিবার্য্য। ইংরেজের নিকট বা ইউরোপের নিকট আর আমরা বিদ্যা চাহিনা, একথা বলিবার সময় আজও আসে নাই। 'স্বদেশী' সাজিব বলিয়া ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের

অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহিনা, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে আমাদের নিতান্ত মতিভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে। যে জাপানের উদীয়মান প্রতিভা দেখিয়া আমরা আবার প্রাচ্যভূমির বিজয় ঘোষণা করিতেছি, সেই জাপান আজও শত শত নরশকে জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে। বাণিজ্যদ্রব্যের আদান প্রদান বন্ধ করিয়া যদি দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, অন্ততঃ দেশের টাকা দেশেই থাকে, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবেনা। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের বাণিজ্য কি তাই বলিয়া বন্ধ করিতে হইবে? আমাদের শাস্ত্রে আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্রও অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট) মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার পর আর কাহাকেও মিথিলা যাইতে হয় নাই, খাস বাঙ্গলাতেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, সর্ব্বকালেই প্রয়োজন হইলে বিদেশীর নিকট, এমন কি শত্রুর নিকটও. বিদ্যাগ্রহণ করার নজীর আছে। ইউরোপের কাছে, ইংরেজের কাছে, এখনও আমাদের অনেক শিখিবার আছে, যখন আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারগ হইব, তখন স্বচ্ছন্দে শিক্ষাবিষয়ে ইংরেজের সংস্পর্শ ছাড়িতে পারি। আজকাল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক পরিচালিত শুদ্ধ বাঙ্গালী অধ্যাপকমণ্ডিত কলেজের অভাব নাই, তথাপি ছাত্রগণ সরকারী বা মিশনরি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে উৎসুক, ইহার কারণ কি? ইংরেজের কাছে ইংরেজী জ্ঞানবিজ্ঞান ভালরূপ শিক্ষা হইবে এই জন্যইত তাহারা তথায় যায়, স্বজাতির উপর অশ্রদ্ধা বা বিজেতাজাতির উপর অন্ধ অনুরাগবশতঃ তাহারা কি এই পথ অবলম্বন করে? অতএব এভাবে প্রশ্নটি আলোচনা করিতে

হইলে এদেশে উচ্চশিক্ষার ভার এদেশীয় লোকের লওয়ার সময় এখনও আসে নাই।

আর এক কথা। যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাটা নূতন করিয়া উঠিয়াছে, সেদিক হইতে প্রশ্নটির বিচার করিতে হইলে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপেক্ষাও অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য আছে। এখন আমাদের সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থ একটী কাজে লাগাইতে হইবে—কাপড়ের কল ও তাঁত সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক সূতা প্রস্তুতের বন্দোবস্ত ও কাপাসের চাষ। এই বিষয়ে আমাদিগকে ভিন্নদেশীয়দিগের যেরূপ মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয় এমন আর কিছুতেই নহে। একেবারে সব কাজে হাত দিলে চলিবেনা, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইবে! ইংরাজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে—Rome was not built in a day. আমাদের দেশটাকে আমাদের মত করিয়া ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে সময় লাগিবে। শনৈঃ পন্থাঃ। ফরাসী বিপ্লবে বার মাসের নাম পর্য্যন্ত বদলান হইয়াছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ঢালিয়া সাজার সময় এক্ষণে আসে নাই। একেবারে সবদিক্ দেখিতে গেলে কোন দিক্ই হইবেনা। ইহাকেই ইংরাজীতে বলে too many irons on the fire। তবে অবশ্য দাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কাহারো হাত নাই। যদি কোন বাঙ্গালী কার্ণেজী কাপড়ের কলের জন্য অর্থব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যেই অজস্র টাকা ঢালেন তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারি না। ভাবিবার প্রধান বিষয়, টাকা (the Sinews of war)। এক্ষেত্রে নাকি সে ভাবনা নাই। অনেক বিদ্যোৎসাহী স্বজাত্যনুরাগী ধনকুবের এই সাধু উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিতেছি।

কিন্তু এ প্রশ্নের আর একটা দিক্ আছে; ছাত্রগণ স্বদেশী

আন্দোলনে অথবা তথাকথিত রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিলে যদি তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষ এইভাবে নির্য্যাতন করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা কি আমাদের পুত্র, জামাতা, ভ্রাতা, ভাগিনেয়দিগকে কর্ত্তৃপক্ষের ভয়ে দেশহিতকর অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে বলিব, না তাহাদিগকে পড়াশুনায় জলাঞ্জলি দিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণমন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত করিব? যাঁহার কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোধ বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বা মনুষ্যত্ব আছে, তিনি অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তরে, মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, বরং আমাদের বালক বা যুবকগণ যাবজ্জীবন মূর্খ হইয়া থাকে তাহাও ভাল, তবু তাহাদিগকে দেশের কায হইতে ফিরাইব না। এই সকল নির্য্যাতন আরম্ভ হইতেই দেশের আপামরসাধারণ সেই উত্তরই দিয়াছে। এখন, দেশের ও সমাজের যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে যে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইতে না দিয়া ইহাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাহারই ফল এই প্রস্তাব। তবে, এখনও পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমাদিগের জাতক্রোধ হইবার সময় আসে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এই ছাত্রনির্যাতনব্যাপারে কোনও রূপ সহায়তা করেন নাই। ভবিষ্যতে করিতে পারেন এই আশঙ্কা। সে আশঙ্কা অমূলক কি সমূলক বলা যায় না। সরকারবাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়কে যাহা করিতে অনুরোধ করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই যে করিবেন তাহা এখনও ঠিক বুঝা যায় না। এখন পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরের আজ্ঞাধীন সভ্যগণ ও দেশীয় সভ্যগণের মধ্যে বলপরাক্ষার কোনও সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অতএব বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিরূপ হওয়া একটু যেন অবিবেচনার কার্য্য হইতেছে! তাহার পর, আসল কথা, আমাদের স্বাধীন শিক্ষাগারে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি

শিক্ষা দেওয়া হইবে, ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে, অন্ততঃ এইরূপ যে হইবেনা তাহার কোনও guarantee নাই, ইত্যাদি অপবাদ দিয়া যদি কর্তৃপক্ষ আমাদের সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতেছি তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি ? যখন বেসরকারী বিদ্যালয়ের উপরও কর্ত্তারা চোখ রাঙ্গাইতেছেন, তখন এ ক্ষেত্রেই বা আমাদের ভরসা কি ? স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই কি আমরা নিষ্কণ্টক হইব ?

যাহাহউক, যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করাই স্থিরসঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ আদর্শে তাহা গঠিত হইবে এপ্রশ্নের বিচার আবশ্যক। ছাত্রগণের বোধ হয় ধারণা, যেমনটি ছিল, ইহাও ঠিক তেমনটি হইবে। সেখানেও সেই এফ্‌এ, বিএ, এম্‌এ, সেই খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া, উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া সেই 'রমাকান্তকামার।' আমরা এইরূপ বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির পক্ষপাতী নহি। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক প্রতিরূপ আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করিলেই যে ছাত্রদিগের অনিষ্টের সদ্য সদ্য প্রতীকার হইবে এমনও নহে, কেননা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রভৃতি বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর তুল্যমূল্য হইতে পারে না। তাহাতে দেশের ও সমাজের কোনও চিরস্থায়ী লাভ নাই। যদি এই সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হয়, তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উচিত। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত ত্রুটি আছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলির সংশোধন করিতে হইবে। নিম্নে আমাদের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলাম। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য হইলে সুফলও

প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হইবে না। চাই কি, এ পথে গেলে কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের এই উদ্যমে বাধা দিবেন না। আজকাল রাজায় প্রজায় যেরূপ সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একথাটাও ভাবিবার বিষয়।

আমাদের প্রথম কথা, সুধীসমাজের মতঃ—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা দেওয়া ও মৌলিক গবেষণার সহায়তা করা; ইহা অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য, যাহাকে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিলে উচ্চশিক্ষার আদর্শ খর্ব্ব হইয়া পড়ে; বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণশিক্ষাগার নহে; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত স্বরূপ না জানাতেই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার দুর্দ্দশা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধঃপতন ঘটিয়াছে। অতএব, আমরা বিবেচনা করি, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অন্যরূপ হওয়া উচিত; সাধারণের উপকারার্থ জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার করা, শিক্ষার্থী মাত্রেরই জ্ঞানতৃষ্ণা প্রশমিত করা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও প্রকৃত কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। ইহা Research Institute হইবে না, অক্‌সফোর্ড কেমব্রিজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ডিগ্রী দিবে না। University Extension নামক অধিষ্ঠান ও Mechanic's Institute প্রভৃতি বিদ্যামন্দিরের ন্যায় কার্য্য করিবে। কোনও বিদ্যার্থী এখানে বঞ্চিত হইবে না; যাহার প্রতিভা নাই, সে উচ্চ শিক্ষার অধিকারী নহে বলিয়া বিতাড়িত হইবে না। যাহার যেমন শক্তি সে ততখানি বিদ্যা শিখিবে। এখানে সুধু কেতাবীবিদ্যা শিখান হইবে না, কার্য্যকরীবিদ্যা শিখাইবারও বিশিষ্ট আয়োজন থাকিবে। শিক্ষাদান ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে, পরীক্ষাগ্রহণ একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র হইবে। সম্ভব হইলে, প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুসারে এই শিক্ষা অবৈতনিক হইবে। এরূপ একটি শিক্ষাগার আমাদের দেশে নাই। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ই সাক্ষাৎভাবে উচ্চ শিক্ষার, এবং পরোক্ষ-

ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের ভার লইয়া আসিতে ছিলেন, তাহাতে কোনও উদ্দেশ্যই প্রকৃতরূপে সিদ্ধ হইতে ছিলনা। হাল আইনে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য (উচ্চশিক্ষাদান) অনুসারেই পরিচালিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এ অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারউদ্দেশ্যে একটি নূতন শিক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। অতএব আমাদের এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার ভাবিফলও বিবেচনা করা উচিত; শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সহিত জনসাধারণের যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান জন্মিয়াছে, ইহার প্রভাবে তাহা দূরীভূত হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় কথা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধরিয়া বলিয়া দেওয়া আছে যে, ইংরাজীভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে ও জ্ঞানপরীক্ষা করা হইবে। ছাত্রগণকে বিদেশী ভাষায় অবলালাক্রমে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। যাহারা ভবিষ্যতে সরকারী কার্য্য করিবে বা এমন ব্যবসায় (যথা ওকালতী) অবলম্বন করিবে, যাহাতে সাহেবদের সঙ্গে সর্ব্বদা মাথামাথি করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে এইরূপ পাকা ইংরাজীজ্ঞান দরকার বটে। কিন্তু ইংরেজের অধিকারে বাস করিতে হইলেই যে ইংরাজীতে মনের ভাব অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে হইবে, নতুবা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হইতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজা Second language স্বরূপ পঠিত হইবে, শিক্ষকগণ ইংরাজীভাষায় সুপাণ্ডিত হইবেন, কিন্তু শিক্ষা ও পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন থাকিবে। বহুকাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রচলনের প্রকৃত স্থান এই

বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকাতে মুখস্থ বিদ্যার অবাধ প্রচলন ঘটিয়াছে এবং শিক্ষার সবিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ উন্নতি-লাভ করে নাই, বলিয়া লর্ড কর্জ্জন আক্ষেপ করিতেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত অস্বাভাবিক ব্যবস্থাই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। এই বাধা দূরীভূত হইলে ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অনেক অধিক শিখিতে পারিবে। এবং ইহাতে জাতীয়তার বন্ধনও দৃঢ় হইবে। ইতিহাস, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা ত মাতৃভাষার সাহায্যে হইবেই, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও মাতৃভাষায় হইবে। ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই। ইংরেজ যে প্রণালীতে ফরাসী, জার্ম্মান, বা ল্যাটিন গ্রীক পড়েন, আমরাও সেই ভাবে ইংরাজী পড়িব। বর্ত্তমান প্রণালীর বিড়ম্বনা—বাঙ্গালী শিক্ষক বাঙ্গালী ছাত্রকে বুঝাইতেছেন বিদেশী ভাষায়, পরের শিল পরের নোড়া দিয়া ঘরের ছেলের দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিতেছেন। শিক্ষক বিশদরূপে বুঝাইলেও তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইতেছে।

এদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রচলন সময়ে অবশ্য অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্থির হইয়াছিল, এদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান চলিবেনা, ইংরাজীর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। তখন দেশের ও দেশভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল তাহাতে এই ব্যবস্থা বোধ হয় অন্যায় হয় নাই। কিন্তু এখন বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, শব্দসম্পদ্‌ ও ভাবপ্রকাশের শক্তি অনেক বাড়িয়াছে। এখন দেশভাষার সাহায্যে মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাদান অনায়াসেই চলিতে পারে। উপযুক্ত এদেশীয় শিক্ষকেরও অভাব নাই। তখন-কার দিনে সাহেব শিক্ষক ভিন্ন গত্যন্তর ছিলনা, কাজেই ইংরাজীর

আমাদের তৃতীয় কথা, রাজপুরুষগণ নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি নানাসম্প্রদায় থাকিলেও হিন্দু-ধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি সার্ব্বভৌমিক ভাবে শিখান বোধ হয় অসম্ভব হইবেনা। মনস্বিনী আনিবেসাণ্ট বেণারস হিন্দু কলেজে এরূপ সার্ব্বভৌম হিন্দু-ধর্ম্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের একটা দোষ আছে তাহাও বলিয়া রাখি। আজকাল জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার জন্য কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান, কি বাঙ্গলাভাষী কি হিন্দী কি উর্দ্দু ভাষী কি উড়িয়া ভাষী সমস্ত বাঙ্গালীকে এক করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তবে সেই ভয়ে ধর্ম্মভেদ ও ভাষাভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বজাতির একীকরণমানসে এখনকার মত ধর্ম্মহীন শিক্ষা ও বিদেশীভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় কি? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও ভাষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিলে বোধ হয় এই আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। যাহা হউক, এই বৈষম্যের সমীকরণের ভার বিজ্ঞ নেতাদিগের উপর দিয়া আমরা অবসর গ্রহণ করিলাম। ভরসা করি, উদ্যোগিগণ সত্বর একটা খসড়া খাড়া করিয়া সমালোচনার জন্য শিক্ষিতসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবেন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃণালিনী-চরিত্র।

মৃণালিনী চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে ইনি প্রেমাস্পদের প্রতি অভিমানশূন্যা। নগেন্দ্রনাথের পরম গুণবতী ভার্য্যা "সূর্য্যমুখী"ও অভিমানিনী ছিলেন, কিন্তু মৃণালিনী-চরিত্রে আমরা অভিমানের লেশমাত্র দেখিতে পাই না। এই কারণে, মৃণালিনী-চরিত্র সূর্য্যমুখীচরিত্র হইতেও মহত্তর। যদি প্রেমাস্পদের প্রতি অভিমানই জন্মিল তবে প্রেমের স্বর্গীয় ভাব রহিল কোথা? সর্ব্বস্ব দিয়া যাহাকে ভালবাসিলাম তাহার উপর আর অভিমান চলে না। সাধকহৃদয়ের প্রেমই আদর্শ প্রেম, সেই আদর্শ প্রেমের আলোকে আমরা মৃণালিনীচরিত্র উদ্ভাসিত দেখিতে পাই কিন্তু সূর্য্যমুখীচরিত্রে আমরা প্রেমের সেই সাধকভাব দেখিতে পাই না, এই কারণে মৃণালিনীচরিত্র আমরা আদর্শ চরিত্র বলিয়া পূজা করিতে পারি, মৃণালিনীকে আমরা দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, কিন্তু সূর্য্যমুখীকে অসামান্যা পতিব্রতা রমণী ভিন্ন উচ্চতর আখ্যায় বিভূষিত করিতে পারি না।

চরিত্রের বিশেষত্ব অভিমানশূন্যতা।

মৃণালিনী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরম ধনশালী এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা ছিলেন, আপন চরিত্রগুণে তিনি কৈশোরে মথুরারাজ কন্যার সখিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একদিন রাজকন্যা সমভিব্যাহারে তিনি যমুনায় জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রবল ঝটিকায় তরণী জলমগ্ন হইল—মৃণালিনী তরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন—তরঙ্গরাশি হইতে অজ্ঞানাবস্থায় তিনি এক রাজপুত্র কর্ত্তৃক উত্তোলিত হয়েন। যিনি মৃণালিনীর উদ্ধার সাধন করেন তিনিই মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র।

পূর্ব্ব কাহিনী।

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে রক্ষা করিয়া আপন বাসস্থানে লইয়া গেলেন,—তিন দিবস ঝড়বৃষ্টি থামিল না—সেই তিন দিবস যুবক-যুবতী একত্র বাস করিলেন—একত্র বাস হইতে উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলেন—"শুধু কুলপরিচয় নহে—উভয়ের অন্তঃকরণেরও পরিচয় পাইলেন"।

তখন মৃণালিনীর বয়স পনর বৎসর মাত্র—সেই পনের বৎসর বয়সে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের চরণতলে আত্মসমর্পণ করিলেন—হেমচন্দ্রকে দেবতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিবসে দুর্যোগের উপশম হইলে হেমচন্দ্র মৃণালিনীর সহিত যথাবিধি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলেন—পরিণয়কার্য্য সমাধা হইলে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন—হেমচন্দ্রও মৃণালিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

মথুরা হইতে মগধ এক মাসের পথ; যখন মগধরাজ্য যবনাধিকৃত হইল, তখন মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র মৃণালিনীর আশায় মথুরায় অবস্থান করিতেছিলেন। স্বদেশহিতৈষী ও হেমচন্দ্রের পরম শুভাধ্যায়ী মাধবাচার্য্য দেখিলেন, হেমচন্দ্র মৃণালিনীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেছেন। যবনাধিকার ভারতবর্ষে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল—মাধবাচার্য্য ব্যথিত হইলেন। কিরূপে যবনহস্ত হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন হইবে ভাবিয়া তিনি ব্যাকুল হইলেন; হেমচন্দ্র একাকী এ দেবতার কার্য্যসাধনে সমর্থ, কিন্তু এ দেবতার কার্য্যে মৃণালিনী প্রবল অন্তরায়। মাধবাচার্য্য চিন্তানিবিষ্ট হইলেন, স্থির করিলেন, মৃণালিনীকে হেমচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি কৌশলে মৃণালিনীকে হস্তগত করিলেন এবং লক্ষ্মণাবতীনিবাসী এক শিষ্যগৃহে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যে শিষ্যগৃহে মৃণালিনী অবস্থান করিতেছিলেন তাঁহার নাম হৃষীকেশ শর্ম্মা—হৃষীকেশের কন্যা মণিমালিনী মৃণালিনীর গুণে মুগ্ধ

হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। মণিমালিনী ও মৃণালিনীর মধ্যে এতদূর প্রণয় জন্মিয়াছিল যে উভয়ে একত্র আহার বিহার ও শয়ন করিতেন। একদিন কক্ষ-প্রাচীরে সখীদ্বয় আলেখ্য লিখিতে লিখিতে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এমন সময়ে সহসা এক ভিখারিণীর কোমল কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি উভয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ভিখারিণী অপূর্ব্ব গীত গাহিল—মৃণালিনী উন্মনা হইয়া উঠিল—তিনি সেই সঙ্গীতের মধ্যে যেন তাঁহার প্রিয়তমের করুণ প্রেমের আহ্বান শুনিতে পাইলেন। দীর্ঘ আলাপের পর ভিখারিণী গিরিজায়া আবার গাহিল—

হিয়া পর রোপন্থ পঙ্কজ কৈন্থ যতন ভারি।
সহি পঙ্কজ কাঁহা মোর, কাঁহা মৃণাল হামারি॥

তখন সন্দেহ প্রতীতিতে পরিণত হইল, প্রতীতিমাত্রে মৃণালিনী সস্নেহে গিরিজায়াকে কহিলেন—"মৃণাল কোথায়? আমি সন্ধান

আবেগময়ী মৃণালিনী।

বলিয়া দিতে পারি তাহা মনে রাখিতে পারিবে"? গিরিজায়া সম্মতি প্রকাশ করিলে মৃণালিনী আত্মপ্রকাশ করিলেন, অবশেষে বিদায় লইবার কালে তিনি ভিখারিণীর কাণে কাণে কহিলেন—"আমার ধৈর্য্য হইতেছেনা, কালি পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না। তোমার বণিক যদি আসেন আজই রাত্রে তুমি সঙ্গে আনিও"। একদিন মৃণালিনীকে লক্ষ্য করিয়া মাধবাচার্য্য কহিয়াছিলেন—"তোমার প্রণয়-মন্ত্রে হেমচন্দ্র কাপুরুষ হইয়া রহিয়াছেন তাঁহার সে ভাব দূর করা কি উচিত নহে?" মৃণালিনী তদুত্তরে তাঁহারই উপযুক্ত ভাষায় কহিয়াছিলেন—"আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয় তবে তিনি কদাচ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।" কিন্তু আজ মৃণালিনীর

পারিবেন না? ইহাই কি মৃণালিনীর সদ্বুদ্ধি? তাহা হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের আবেগের সহিত বিবেক কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? প্রিয়তমের অদর্শনে হৃদয় ব্যাকুল, এতদবস্থায় মাধবাচার্য্যের উপদেশ যদি মৃণালিনী বিস্মৃত হইয়া থাকেন সে জন্য আমাদের সহানুভূতি হইতে তিনি বিচ্যুত হইবেন না। প্রতিভাশালী লেখক এই স্থলে মৃণালিনী-চরিত্র পাঠক-বর্গের বড়ই হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। রমণীহৃদয়ের এই স্বাভাবিক অথচ সুন্দর ভাবটি মানুষ্য মাত্রেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে। মৃণালিনী প্রথমেই যদি চিত্তের আবেগ দমন করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাঁহার চরিত্র আমরা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইতাম না।

মৃণালিনী জ্ঞানময়ী।

যে পুনঃ পুনঃ চিত্তের আবেগ দমন করিতে পারিলনা সে দুর্ব্বলচিত্ত, কিন্তু মৃণালিনী দুর্ব্বলচিত্তা নহেন; এ বিষয়ে কঠোরতর পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নবদ্বীপে রত্নময়ীর কুটীরে অবস্থানকালে কুলটাপবাদে লাঞ্ছিতা মৃণালিনী, নয়নপ্রান্তবর্ত্তী আহত এবং রক্তাক্তকলেবর হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংমিশ্রণে মৃণালিনীচরিত্র অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। মৃণালিনী আবেগময়ী, কিন্তু তিনি উন্মাদিনী নহেন—তিনি প্রেমময়ী রমণী অথচ জ্ঞানময়ী—জ্ঞান ও প্রেমের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আমরা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত অল্প চরিত্রেই দেখিতে পাই। মৃণালিনীগ্রন্থের মনোরমাচরিত্র আলোচনা করিলে আমরা তাঁহার দুইটী বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাই, একটি প্রতিভাময়ী অপরটি প্রেমময়ী কিন্তু সে চরিত্রে প্রতিভা প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন—সে চরিত্রে প্রতিভা ও প্রেমের মিলন ঘটে নাই। সূর্য্যমুখী অথবা ভ্রমর চরিত্রেও জ্ঞান এবং প্রেমের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই—উভয় চরিত্রেই প্রেম, জ্ঞানের অল্পতায় ন্যূনাধিক

মৃণালিনী হেমচন্দ্রের তত্ত্ব পাইয়া তাঁহার দর্শনলালসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এদিকে হেমচন্দ্র গিরিজায়াপ্রমুখাৎ মৃণালিনীর সন্ধান পাইয়াও প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইলেন না—তিনি মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই মাধবাচার্য্যের আদেশানুক্রমে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশান্বিত হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া মৃণালিনী গিরিজায়ার দর্শন পাইলেন, কিন্তু হেমচন্দ্রের অদর্শনে যেন "সহস্র আশাপ্রদীপ সহসা নির্ব্বাপিত হইল"। যাহাহউক, নবদ্বীপযাত্রাকালে হেমচন্দ্র, মৃণালিনীর চিত্তের স্থৈর্য্যবিধানার্থ যে পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা পাঠান্তে মৃণালিনী সহজেই আশ্বস্ত হইলেন এবং নৈরাশ্যকে হৃদয় হইতে একেবারে দূর করিয়া দিলেন। এই স্থলে মৃণালিনীচরিত্রের মহত্ত্ব এক স্তর জাগিয়া উঠিল, তাঁহার আত্মদমনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তকাল পরে গিরিজায়াকে বিদায় দিয়া মৃণালিনী যেমন গৃহমধ্যবর্ত্তিনী হইবেন, অমনি এক নূতন বিপদে তিনি আক্রান্তা হইলেন। মণিমালিনীর দুষ্ক্রিয়াসক্ত সহোদর ব্যোমকেশ কর্ত্তৃক তিনি হৃষীকেশ সমীপে অভিসারিকা রূপে অভিযুক্তা হইলেন। হৃষীকেশ, পুত্রপ্রমুখাৎ মৃণালিনী সম্বন্ধে এবম্বিধ অভিযোগ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি মৃণালিনীকে নির্দ্দয়রূপে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরপরাধিনী মৃণালিনী হৃষীকেশের তীব্র তিরস্কার নীরবে সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি হৃষীকেশকে মুখরার ন্যায় উত্তর করিতে লাগিলেন। একদিন, হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়া হতাদর করিলে মৃণালিনীর মুখ হইতে বাক্যমাত্র স্ফুরিত হয় নাই, কিন্তু আজ মৃণালিনী মুখরা, মান্যে পিতৃতুল্য হৃষীকেশের মুখের উপর সেই মৃণালিনী আজ স্পষ্ট কহিলেন—'আমার

আত্মসম্মান রক্ষা-তৎপরা মৃণালিনী।

ভা; অগ্রহায়ণ,

কুলটাবৃত্তি যে ব.

মহত্ত্ব আরও একস্তর .

রৌদ্র।

গ্রন্থে আর দ্বিতীয় বার দেখিবার

দেবী আত্মসম্মানরক্ষার্থ ব্যোমকেশকে

হয়েন নাই, কিন্তু এই আদর্শ রমণী হেমচ...

রক্ষার্থ কতটুকু প্রয়াস পাইয়াছিলেন আপনারা তাহ।..

পাইবেন।

হৃষীকেশ, বিচার ও বিবেক শূন্য হইয়া মৃণালিনীকে আ... করিলেন—"আজই আমার গৃহ হইতে দূর হও।" কিন্তু এ আ... শ্রবণে মৃণালিণী কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। সমগ্র পৃথিবী সেই মুহূর্ত্তে মৃণালিনীর দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল ছিলনা তথাপি তাঁহা অবিচলিত রহিল। নিষ্কলঙ্কচরিত্রা সেই হেতু নির্ভিকহৃদয়া হৃষীকেশের গৃহত্যাগে প্রস্তুত হইলেন। আত্মসম্মানরক্ষাত হেতু আশ্রয়হীনা হইলেও আশঙ্কাশূন্যা মৃণালিনী হৃষীকে... ত্তরে কহিলেন—"যে আজ্ঞা, আমি সখী মণিমালি... বিদায় লইয়া আজই দূর হইতেছি।" মণি... মৃণালিনীকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁত... করিয়া মৃণালিনী পরগৃহবাসদুঃখ f... আজ সহসা হৃষীকেশের গৃহত্যাগের... অনেকখানি বেদনা জাগিয়া উ... রোদন করিবেন, অশ্রুপ্লুত নয়নে... করিবেন, এই সাধ মৃণালিনীর... হৃষীকেশ অভাগিনীর সাধ পূর্ণ ক...

কশ দ্বিতীয়বার

মৃণালিনী আত্মসম্বরণ

াহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

করিলে প্রথমে তিনি

তেজ তাঁহার হৃদয় হইতে

কেশকে দগ্ধ করিয়াছিল, মৃণালিনী

-দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে

হৃষীকেশ মৃণালিনীর প্রতি পুনরায় সেই

কঠোর শেলসম বাক্য প্রয়োগ করিলে

লিনী নীরবে তাহা সহ্য করিলেন, কেবল চক্ষের জলে তাঁহার

য়ের দারুণ আঘাত ব্যক্ত হইল। প্রথমে রোষবাক্যে মৃণালিনী যে

সম্মানরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন এক্ষণে নীরব অশ্রুপাতে তিনি

ক্ষা করিলেন। কবি কৌশলে মৃণালিনী-চরিত্রের স্বাভাবিকতা

উভয়ই ফুটাইয়া তুলিলেন। প্রতিপালক হৃষীকেশ সহস্র

াগ করিলেও তিনি সম্মানার্হ, সেইজন্য মৃণালিনী অন্তরের

গোপন করিয়া প্রণামান্তর হৃষীকেশের নিকট হইতে

াঁহার আত্মসম্মানরক্ষায় চেষ্টা, তাঁহার ধৈর্য্য ও

বয়োধিক্যের প্রতি ভক্তিপরায়ণতা এই স্থলে

াছে।

য় লইয়া, মৃণালিনী "পর্ব্বত সানুবাহী

।" বাহিরে গিরিজায়া অপেক্ষা

সহিত মিলিত হইলেন এবং

াহত হইলেও স্থির করিলেন

মৃণালিনী গিরিজায়া সমভি-

ব্যাহারে নবদ্বীপে উপনীত হইলেন। তরী সংলগ্ন হইলে গিরিজায়া মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—আজিকার দিন কাটিল।" কিন্তু মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না, বীচিবিক্ষোভিত গঙ্গাহৃদয় তুল্য তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিতেছিল। গিরিজায়া পুনরপি কহিলেন—"কালিকার দিনও কাটিবে, পরদিনও কাটিবে কেন কাটিবে না?" সংসারে মায়ার বন্ধন যাহার অল্প, যে কাহাকেও সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে নাই তাহার পক্ষে এরূপ উক্তি সম্ভবে, কিন্তু এরূপ উক্তি মৃণালিনীর পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কুলনারী শ্রেষ্ঠীকন্যা রাজপুত্রবধূ মৃণালিনী আজি আশ্রয়হীনা, কুলটাপবাদে হৃষীকেশের গৃহ হইতে তিনি বহিষ্কৃতা আর গিরিজায়া ভিখারিণী, তাহার "সর্ব্বত্র সমান", দিগ্বিজয়কে সে ভালবাসিত কিন্তু মৃণালিনীর মত বিনা দাবীতে সে তাহার হৃদয়ের এতটুকু অংশ তাহাকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলনা, এরূপ অবস্থায় গিরিজায়ায় পক্ষে যে উক্তি সম্ভবে মৃণালিনীর পক্ষে যে তাহা অসম্ভব একথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মৃণালিনী গিরিজায়ার উক্তিতে পুনরায় নিরুত্তর রহিলেন, কেবল এক দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার অন্তস্তল হইতে বিনির্গত হইয়া সেই সন্ধ্যার তিমির রাশিকে যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল।

নবদ্বীপে মৃণালিনী ও গিরিজায়া।

মৃণালিনী ও তৎসহচরী গিরিজায়া, নবদ্বীপে এক পাটনীর গৃহে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তথায় গিরিজায়া একরূপ সুখে কালাতিপাত করিতেছিল, পাটনীপুত্রী রত্নময়ীর সরস সখিত্বটুকু সে পরম তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছিল, কিন্তু মৃণালিনী রত্নময়ীর সখিত্বে আপ্যায়িত হইলেও পরম অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তথায় হেমচন্দ্রের দর্শনলালসায় ব্যাকুলিত চিত্তে তিনি অবস্থান করিতে-

রত্নময়ীর কুটীরে।

ছিলেন, লাঞ্ছনার তীব্র কশাঘাত হেমচন্দ্রের সাক্ষাতে বিস্মৃত হইবেন, এই আশায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সর্ব্বোপরি বিরহ কাতরতায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের জন্য এ কাতরতা পরম স্বাভাবিক, সহস্র কর্ত্তব্য মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া হেমচন্দ্র মৃণালিনাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তবে নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য স্বামীসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আপন্না মৃণালিনী যে কাতর হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

রত্নময়ীর কুটীরে একদিন প্রভাতকালে মৃণালিনী বেদনাপীড়িত হৃদয়ে গিরিজায়ার সহিত হেমচন্দ্রের আলাপে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন সময়ে রত্নময়ী সহসা শশব্যস্তে সম্বাদ দিল—"এক আশ্চর্য্য পুরুষ সন্নিকটস্থ বটবৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছেন।" মৃণালিনী গিরিজায়া সমভিব্যাহারে কুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে "সাগর একেবারে উথলিয়া উঠিল"—মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে দেখিলেন।

প্রিয় দর্শনে।

যখন হেমচন্দ্র-দর্শন-লালসায় চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, জীবনের একমাত্র সম্বল, সুখের একমাত্র আধার হেমচন্দ্রকে মৃণালিনী সহসা সেই সময়ে দর্শন করিলেন। কিন্তু মৃণালিনী অসামান্যা রমণী, মৃণালিনী চিত্ত-জয় করিলেন, তৃষ্ণার বারিধারা তিনি অবাধে পরিহার করিলেন, তিনি হেমচন্দ্রকে দর্শন দিলেন না। পূর্ব্ব রজনীতে শান্তশীল ও তদনুচরবর্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হেমচন্দ্র আহত হইয়াছিলেন সেই হেতু অঙ্গ ও বসনাদি রক্তাক্ত হইয়াছিল, মৃণালিনী সেই রক্তচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া উন্মাদিনীবৎ হেমচন্দ্রের অন্তরালে অনুবর্ত্তী হইলেন। কতযুগের পর বিপন্ন ও আহত হেমচন্দ্রের দর্শন পাইয়াও মৃণালিনী আত্মপ্রকাশ করিলেন না। আত্মপ্রকাশ করিলে হেমচন্দ্র সত্যচ্যুত ও ধর্ম্মচ্যুত

হইতেন, মৃণালিনী কিছুতেই আপনাকে সেই ধর্ম্মচ্যুতির কারণভাগিনী করিতে পারিলেন না। মৃণালিনী যথার্থ সহধর্ম্মিণী।

মৃণালিনী গিরিজায়া সমভিব্যাহারে অলক্ষিতে হেমচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়া হেমচন্দ্রের গৃহমধ্যবর্ত্তিনী অপূর্ব্ব মনোরমা মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন।

মনোরমা সাক্ষাতে।

দর্শন মাত্রে মৃণালিনী কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত ও সন্দিগ্ধ হইলেন। হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে উপনীত হইলে মনোরমা যেরূপ আচরণ প্রদর্শন করিলেন তাহা নিতান্তই আত্মীয়ের পক্ষে সম্ভবে। মনোরমার কার্য্যকলাপে মৃণালিনীর হৃদয়স্থ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল—মৃণালিনী ভাবিলেন, "একি হেমচন্দ্রের মনোরমা ?" মুহূর্ত্তের জন্য মৃণালিনী এরূপ ভাবিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য সন্দেহমেঘে মৃণালিনীর নির্ম্মল হৃদয় আচ্ছন্ন হইল—মুহূর্ত্তের জন্য আমরা দেখিলাম, মৃণালিনী, সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর একই আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আমরা মৃণালিনীকে সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর হইতে অনেক উচ্চতর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম—দেখিলাম স্বর্গীয় লাবণ্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ; তখন সেই স্বর্ণসিংহাসন হইতে স্বর্গীয় ভাষায় তিনি কহিলেন—"মনোরমা যেই হউক—হেমচন্দ্র আমারই।" মনোরমা আমার প্রাণাধিক হেমচন্দ্রের হৃদয়েশ্বরী হউক আর নাই হউক—হেমচন্দ্র আমারই, আমি হেমচন্দ্রের দাসী, হেমচন্দ্র আমার প্রভু, তিনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, তিনি যদি আমায় পায়ে ঠেলেন তবু তিনি আমারই। মৃণালিনীর প্রেম কত উচ্চ আদর্শের তাহার পরিচয় আমরা এখানে প্রথম পাইলাম। ইহার উজ্জ্বলতর প্রমাণ ভবিষ্যতে উল্লিখিত হইবে। মৃণালিনী মনোরমার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হওয়া দূরে থাকুক তিনি বিপদকালে হেমচন্দ্রের সেবা করিলেন বলিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হইলেন এবং তাঁহাকে "চিরায়ুষ্মতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ

করিলেন। মৃণালিনী সামান্যা রমণী হইলে আশীর্ব্বচন দূরে থাকুক মনোরমার প্রতি অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিতেন।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল, পল্লীর পথে লোক সমাগম হইতে লাগিল, মৃণালিনী আর বাহিরে থাকিতে পারিলেন না, তিনি কুটীরে ফিরিলেন। হেমচন্দ্র কেমন থাকেন সে সম্বাদ লইয়া গিরিজায়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে।

বিবিধ সম্বাদ ও সিদ্ধান্ত সমেত গিরিজায়া মৃণালিনী সমীপে উপস্থিত হইয়া সকল কথা ব্যক্ত করিল। মৃণালিনী স্থিরচিত্তে সকলই শুনিলেন —গিরিজায়ার দুর্ব্বুদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হইলেন; কিন্তু সে মৃণালিনীর মথুরা যাত্রা ও বিবাহবার্ত্তা রটাইয়া যে প্রমাদ ঘটাইয়া আসিয়াছিল তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার না করিয়া ধীরভাবে তৎপ্রতীকারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এই ধৈর্য্যশীলতা মৃণালিনী-চরিত্রের অলঙ্কারস্বরূপ।

উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভাশায় মৃণালিনী সকল কথা সংক্ষেপে পত্রনিবদ্ধ করিয়া হেমচন্দ্র সমীপে প্রেরণ করিলেন।

মৃণালিনীর পত্র ও হেমচন্দ্র।

সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে 'পত্রবাহিকা গিরিজায়ার সহিত হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। তখন হেমচন্দ্রের অবস্থা শোচনীয়। কুলটাপবাদে মৃণালিনী হৃষীকেশ কর্ত্তৃক যে গৃহবহিষ্কৃতা হইয়াছিলেন সে সম্বাদ তঁাহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। শ্রুতিমাত্রে তিনি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বিশ্বাসমাত্রে তাঁহার হৃদয়ে রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। কোন কোন মনুষ্যের চিত্তের সহিত শুষ্কতৃণাদির তুলনা করা যাইতে পারে; তৃণাদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শমাত্রে যেমন জ্বলিয়া উঠে, তেমনি কাহারও কাহারও চিত্ত কোন প্রকার অপ্রীতিকর সম্বাদের শ্রুতিমাত্র একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠে। তদবস্থায় তাঁহারা একেবারে বিবেচনা ও বিচারশূন্য হইয়া পড়েন, এবং অপ্রীতিকর

সম্বাদের সত্যানুসন্ধানে সহজেই যত্নহীন হন। হেমচন্দ্র এবম্বিধ প্রকৃতির মনুষ্য, তিনি সহজেই ধৈর্য্যহীন ও ক্রোধপরবশ, মৃণালিনীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। মৃণালিনীর পত্র হেমচন্দ্রের করতলগত হইলে, তিনি রোষ-প্রযুক্ত তাহা শতছিন্ন করিয়া বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, মৃণালিনীর অপঠিত পত্র হেমচন্দ্রের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। মৃণালিনী, গিরিজায়াপ্রমুখাৎ যখন শুনিলেন হেমচন্দ্র কুলটার পত্রবোধে তাঁহার পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহার দূতিকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন তখন তাঁহার শোকের অবধি রহিল না—তাঁহার শোক রোদনেরও অতীত হইল—তিনি মুহ্যমানা হইয়া রহিলেন।

প্রেমাস্পদ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা মৃণালিনী।

কতক্ষণ পরে, গিরিজায়ার কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদনাপ্লুত করুণ সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। গিরিজায়া অদূরস্থ সরোবর সোপানে উপবিষ্ট হইয়া নৈশ নিস্তব্ধতা মধ্যে মৃণালিনীর হৃদয়ের সহিত আপন হৃদয় মিলাইয়া গাহিতে ছিল।

পরাণ না গেলো?
যোদিন পেখণু সই যমুনাকি তীরে—
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে—
ওহিপর পিয়সই কাহে কালোনীরে—
জীবন না গেলো?
ফিরি ঘর আইনু না কহিনু বোলি—
তিতায়িনু আঁখিনীরে আপনা আঁচলি—
রোই রোই পিয় সই কাহেলো পরাণী—
তখনই না গেলো?

"দূরশ্রুত বীণাধ্বনিবৎ" সে সঙ্গীত মৃণালিনীর মর্ম্মে প্রবেশ করিল—প্রবেশ মাত্র মৃণালিনীর যেন চৈতন্যোদয় হইল—সহসা লয়হীন হৃদয়-যন্ত্র যেন লয়যুক্ত হইল—তখন সেই হৃদয়-যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোকগীতি

উচ্ছ্বসিয়া উঠিতে লাগিল। মৃণালিনী নিঃশব্দে সঙ্গীতকারিণীর নিকটবর্ত্তিনী হইলেন—হেমচন্দ্র মৃণালিনীর কোমল হৃদয়ে যে দারুণ আঘাত দিয়াছিলেন তাহার বেদনায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন, জীবনে তিনি মমতাহীন হইলেন—মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় বোধ হইতে লাগিল। যিনি হেমচন্দ্রের জন্য কুলত্যাগিনী, বিনাপরাধে কুলটাবোধে হেমচন্দ্র যখন তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, তখন নারী-জীবনে আর প্রয়োজন কি? সর্ব্বস্ব দিয়াও যখন ভালবাসার বস্তুকে পাইলেন না, তখন মৃণালিনী স্থির করিলেন, মৃত্যুদ্বারা তিনি সেই ভালবাসার বস্তু লাভ করিবেন। মৃণালিনী সাধ করিয়া তরী ডুবাইতে চাহেন। কাণ্ডারী যদি তরণীর অঙ্গে পদার্পণ না করিলেন তখন প্রেমিকমাত্রে সাধ করিয়া সে তরণী জলমগ্ন করিবে; কিন্তু সাধ করিয়া যে তরী ডুবায় সে নিশ্চয়ই জলের মধ্যে রত্ন দেখিয়া থাকিবে, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুদ্বারা ভালবাসার বস্তু লাভ করিতে চাহে। জীবনভার বহন করিতে পারিলাম না বলিয়া যে সে ভার ত্যাগ করে নিশ্চয়ই সে দুর্ব্বলচিত্ত কিন্তু জীবনের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়া যে জীবন ত্যাগ করিতে চাহে তাহাকে দুর্ব্বলচিত্ত বলিতে পারা যায় না। তোমার নিমিত্ত হৃদয়ের শোণিত নির্ম্মিত কুসুম ভরিয়া যে ডালি সাজাইলাম সে ডালি যদি তুমি গ্রহণ না করিলে তবে সে ডালি কেন আমি গঙ্গার জলতরঙ্গে ভাসাইয়া দিব না?

ধৈর্য্য ও বিবেক-শালিনী মৃণালিনী।

মৃণালিনী স্থির করিলেন, তিনি জীবন-বিসর্জ্জন দিবেন—যাহাতে হেমচন্দ্রের প্রয়োজন নাই তাহা রাখিয়া কাজ কি? মৃণালিনী ভাবিলেন—জীবন, যৌবন সকলই হেমচন্দ্রে নিমিত্ত—যদি হেমচন্দ্র তাহা কলঙ্কিত মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে সকলই বিসর্জ্জন দিতে হইবে—কিন্তু বিসর্জ্জন দিবার পূর্ব্বে একথা একবার হেমচন্দ্রের নিজমুখ হইতে শুনিতে হইবে। ধৈর্য্য ও বিবেক-

শালিনী মৃণালিনী এইরূপ স্থির করিয়া গিরিজায়াকে কহিলেন—"গিরিজায়া তোমাকে আবার হেমচন্দ্রসমীপে যাইতে হইবে।"

গিরিজায়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আবার সে পাষণ্ডের নিকট যাইব কেন?" মৃণালিনী ব্যথিত হইলেন, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—"পাষণ্ড বলিও না," দার্শনিক পণ্ডিতের মত কহিলেন, "হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া থাকিবেন—এ জগতে অভ্রান্ত কে?" এজগতে সকলেই ভ্রান্ত, পশুপতি ও হেমচন্দ্র, হৃষীকেশ ও মাধবাচার্য্য, মনোরমা ও গিরিজায়া সকলেই ভ্রান্ত,—বিচিত্র এই, মৃণালিনী একাকিনী অভ্রান্ত, এই জন্য—"এ জগতে অভ্রান্ত কে"—এ কথা মৃণালিনীরই মুখে মধুর শুনাইতেছে। গিরিজায়া মৃণালিনীর বচনে এরূপ মুগ্ধ হইল যে, যে হেমচন্দ্র তাহাকে তিরস্কৃত ও অপমানিত করিয়াছিল এবং তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহারই সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল—"আমি মৃণালিনীর দাসী, মৃণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আপনি মৃণালিনীর ত্যাজ্য নহেন * * * মৃণালিনী আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে আসিয়াছেন, আপনি আসুন।" ইতিপূর্ব্বেই মৃণালিনীর পূর্ব্বচরিত্র স্মরণ করিয়া হেমচন্দ্রহৃদয়ে অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি গিরিজায়ার উক্তিতে অপ্রতিভ হইয়া তাহার অনুগামী হইলেন। হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর সাক্ষাৎ হইল—সাক্ষাৎমাত্রে প্রেমের প্লাবনে মৃণালিনীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, প্রেমাশ্রু তাঁহার নয়নযুগল হইতে ধারায় বিগলিত হইতে লাগিল। আর বিদায়ের কথা উত্থাপন করা হইল না—হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে কত কষ্ট দিয়াছিলেন হেমচন্দ্রের দর্শনমাত্রে তিনি সে সকলই ভুলিলেন। আনন্দে অবসন্ন শরীরে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের পদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। এই

মৃণালিনীর প্রেম-বিহ্বলতা।

অভিমানশূন্যতা ও প্রেমবিহ্বলতায় মৃণালিনী কত সুন্দর দেখাইতেছেন? শিশিরসিক্ত সেফালীপুষ্পের ন্যায় মৃণালিনী হেমচন্দ্রের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, হেমচন্দ্র দুর্ব্বলচিত্ত হইলেও পরম প্রণয়শালী ব্যক্তি, তিনি সস্নেহে মৃণালিনীর হস্তধারণ করিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিলেন। মৃণালিনীর অতীত পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিয়া হেমচন্দ্র সম্প্রতি মৃণালিনীর চরিত্র সম্বন্ধে কতকটা সন্দেহশূন্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সন্দেহ পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। এক্ষণে সোপানোপরি উপবিষ্ট হইয়া তিনি সহজেই হৃষীকেশকর্ত্তৃক মৃণালিনীর গৃহবহিষ্কৃতির কারণ জানিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বিচারক হেমচন্দ্রের নিকট সত্যবাদিনী মৃণালিনী কিছুই গোপন করিলেন না, তিনি স্পষ্ট কহিলেন—"হৃষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।" হেমচন্দ্র অযোগ্য বিচারক,—মৃণালিনীর বাক্য শ্রবণমাত্র তিনি ধৈর্য্য হারাইয়া ক্ষিপ্তের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃণালিনীকে পাপীয়সা সম্বোধন করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। হেমচন্দ্র, পদদলিতা লতার ন্যায় মৃণালিনীকে সরোবরসোপানে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, কিন্তু তথাপি মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রতি রুষ্ট হইলেন না—তথাপি এতটুকু অভিমান তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল না। তাঁহার অপরিমিত প্রেমের বিনিময়ে, হেমচন্দ্র ভ্রান্ত হইয়া, নির্দ্দয়রূপে যে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিলেন সেজন্য মনেও তিনি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইলেন না। কঠোর হইতে কঠোরতর পরীক্ষায় মৃণালিনী উত্তীর্ণ হইলেন—প্রেম, ধৈর্য্য ও অভিমানশূন্যতার পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করিলেন। হেমচন্দ্র আত্মমুখে মৃণালিনীকে পাপীয়সী সম্বোধন করিয়া ত্যাগ করিয়া গেলে, গিরিজায়া

হেমচন্দ্র অযোগ্য বিচারক।

প্রেমের উজ্জ্বলতম আদর্শ ও একাগ্রতা।

মনে করিল, হেমচন্দ্রের সহিত মৃণালিনীর সম্বন্ধ চিরবিচ্ছিন্ন হইল। কিন্তু ভিখারিণী, মৃণালিনীর প্রেমসাগরের তল কোথায় পাইবে? মৃণালিনী কহিলেন—“আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী”। একদিন হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গিরিজায়া কহিয়াছিল—“মৃণালিনী দূরে থাক্ তুমি আমারও যোগ্য নও”। সে কথার সত্যতা আজ আমরা উপলব্ধি করিতেছি। “আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম—আজিও তাঁহার দাসী,” একথা কত সুন্দর! মহা-সমৃদ্ধিশালী মথুরানগরীতে সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা ও শান্তিমধ্যে লতাকুঞ্জস্থ তৃণাস্তরণে অথবা প্রস্তরবেদিকায় মৃণালিনী সমভিব্যাহারে উপবেশন করিয়া হেমচন্দ্র যখন সহস্রমুখে আপনার অপরিমিত প্রেম ব্যক্ত করিতেন তখন মৃণালিনী আপনাকে হেমচন্দ্রের দাসী মনে করিয়া যেমন সুখী হইতেন, আজ এই স্বজনহীন প্রদেশে হেমচন্দ্রকর্ত্তৃক কুলটাবোধে পরিত্যক্তা হইয়াও তিনি আপনাকে হেমচন্দ্রের দাসী মনে করিয়া তেমনই সুখী হইলেন। ইহাই প্রেমের উজ্জ্বলতম আদর্শ এবং ইহাই প্রেমের একাগ্রতা।

গিরিজায়া মৃণালিনীর উক্তিতে রাগ প্রকাশ করিলে, মৃণালিনী কহিলেন—“গিরিজায়া, যদি হেমচন্দ্র তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন তুমি স্থানান্তরে তাঁর নিন্দা করিও।” মৃণালিনী স্বামীনিন্দা শুনিতে যেমন অশক্ত, তেমনি গিরিজায়াকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেও তিনি অসম্মত। তিনি কহিলেন—“হেমচন্দ্র আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।” গিরিজায়ার রমণীহৃদয়, কহিল—“কি দোষে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার করিলেন।” তদুত্তরে দেবীহৃদয় মৃণালিনী কহিলেন,—“সে আমারই দোষ—আমি গুছাইয়া সকল কথা বলিতে পারি নাই, কি বলিতে কি বলিলাম।”

গিরিজায়া বিস্মিতা হইল, কহিল—“ঠাকুরাইন্! এ সংসারে

আপনিই সুখী, কেন না আপনি রাগ করেন না।" মৃণালিনী কহিলেন —"আমিই সুখী, কেন না হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।" এই একটি কথায় মৃণালিনীর প্রেমের গভীরতা প্রতিভাশালী লেখক যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন অন্য লেখক সহস্র কথাতেও তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। মৃণালিনী হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তাঁহার স্কন্ধে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া রোদন করিয়াছেন, এই কথা স্মরণ করিয়া তিনি সহস্র দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। এই দুঃখময় জগতে সহস্র দুঃখ উপেক্ষা করিয়া মৃণালিনী যখন কহিলেন "আমিই সুখী", তখন প্রশংসমান নেত্রে আমরা তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম, তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, মৃণালিনী যথার্থই সুখী; জীবনের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে মরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আজ সফলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি মৃত্যুর কথা মুখে আনিলেন না। হেমচন্দ্রের স্কন্ধে শির রাখিয়া মৃণালিনী নবীন বল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রেমের নবীন শক্তিতে তিনি সবল, নৈরাশ্য জয় করিয়া জীবনের কঠোরতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

নৈরাশ্য জয়।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মৃণালিনী তাঁহার প্রণয় ও ধৈর্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। হেমচন্দ্র ঘটনাচক্রে মৃণালিনীচরিত্রসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন এবং আত্মব্যবহারে অনুতপ্ত হইয়া মৃণালিনীকে গ্রহণ করিলেন। তখন হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অগ্নিপরীক্ষিতা সীতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, এবং অশোকবনাগতা সীতার ন্যায় মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন।

আমরা মৃণালিনীর জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে তচ্চরিত্রের সার সংকলন করিয়া আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। মৃণালিনী আদর্শ রমণী—আদর্শ চরিত্রের লক্ষণ এই

যে, ইহা পাঠকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিবে—ইহা লোকশিক্ষার উপযোগী হইবে, এবং ইহা পূজা ও অনুকরণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রত্যেক আদর্শ চরিত্রে অন্ততঃ একটি মানসিক সুবৃত্তির পূর্ণবিকাশ দেখাইতে হইবে। কবি মৃণালিনীচরিত্রে প্রেমরূপ মনোবৃত্তির পূর্ণবিকাশ দেখাইয়াছেন। ধৈর্য্য ও অভিমান শূন্যতা এবং বিশ্বাস, প্রেমের অবলম্বনস্বরূপ, সেইজন্য কবি সতর্কতার সহিত এ সকল মনোবৃত্তিরও বিকাশ মৃণালিনীচরিত্রে সূচিত করিয়াছেন। রমণীচরিত্রে উল্লিখিত মনোবৃত্তির বিকাশই প্রকৃষ্ট জ্ঞানের লক্ষণস্বরূপ, এই জন্য মৃণালিনীকে আমরা জ্ঞানময়ী কহিয়াছি ; তিনি জ্ঞানময়ী অথচ তিনি প্রেমময়ী অর্থাৎ তিনি স্বামীগতপ্রাণা—এই জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে মৃণালিনীচরিত্র গঠিত হইয়াছে। সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরচরিত্রে প্রেম কতকটা অবলম্বনশূন্য—এইজন্য এতদুভয় ক্ষেত্রে প্রেমলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা।

আদর্শচরিত্রের লক্ষণ।

সূর্য্যমুখী ও ভ্রমরের কথা স্বতন্ত্র, প্রফুল্লও হিন্দুরমণী কর্ত্তৃক আদর্শরূপে গৃহীত হইবেন না। প্রফুল্লচরিত্র নিষ্কলঙ্ক, ইনি "স্বপত্নী জনে প্রিয়সখীবৃত্তি" অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং নিষ্কাম ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণেও যাহা অর্পণ করি[illegible]। বর্গেও নাই তাহা স্বামীতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকের [illegible]রীরিক দেবতা[illegible] রমণীগণ তাঁহার পক্ষে অন্য দেবতা নাই, ইহাই তাঁহার সকল শিক্ষার সার শিক্ষা। প্রকৃতি প্রদত্ত এই শিক্ষায় যিনি মহিমান্বিতা হইয়াছেন, তিনি সকলের ভক্তিভাজনীয়া, এবং তিনি লোকশিক্ষার উপযোগিনী, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও হিন্দুরমণীগণ প্রফুল্লচরিত্র আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহার কারণ এই, প্রফুল্লচরিত্র স্থলবিশেষে হিন্দু

প্রফুল্ল।

রমণীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে অক্ষম। প্রফুল্লর মল্লযুদ্ধশিক্ষাদি হিন্দুরমণীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে কখনই পারগ হইবে না। হিন্দু রমণীর হৃদয় এরূপ ভাবে গঠিত ও তাঁহাদের আচার ব্যবহার এরূপ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত, যে তাঁহাদের পক্ষে প্রফুল্ল-চরিত্র আদর্শরূপে গ্রহণ একপ্রকার অসম্ভব। সীতা ও সাবিত্রী যাঁহাদের আদর্শ, প্রফুল্ল তাঁহাদের আদর্শ হইতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রলিখিত কল্যাণী ও শান্তিচরিত্র এস্থলে উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। শান্তিচরিত্র প্রফুল্লচরিত্র সদৃশ কিছু পরুষ-ভাবাপন্ন হইলেও ইহা যে অতি উৎকৃষ্ট চরিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রফুল্ল

কল্যাণী ও শান্তি।

যে কারণে, সেই কারণে শান্তিদেবীও হিন্দু-রমণী কর্ত্তৃক আদর্শরূপে গৃহীত হইবেন না। কিন্তু কল্যাণীর কল্যাণময়ী প্রতিমা, হিন্দুর গৃহে গৃহে আদর্শ-প্রতিমা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। অগ্নি-বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় কল্যাণী ও শান্তি চরিত্র ভাস্বর, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একে আত্ম-বিসর্জ্জন দ্বারা ও অন্যে আত্মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা স্বামীকে মহিমান্বিত করিয়াছেন। আলস্যের দিন অতীত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, জাগ্রত ভাবে কার্য্য করিবার সময় সমুপস্থিত, দেশের জন্য অনেককে জীবন উৎসর্গ করিতেই হইবে এরূপ সময়ে জীবানন্দ ও মহেন্দ্রনাথের চরিত্র মাহাত্ম্যে হিন্দুপুরুষ ক অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, কল্যাণী ও শান্তির আদর্শে হিন্দুর ক আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠা শিখিতে হইবে!

কিন্তু পরিতাপের এই, আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা গৃহের ও সমাজের মুখে জ্বলতাসাধন দূরে থাকুক রমণীগণ দুরন্ত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সময়ে গৃহ ও সমাজের মুখে কলঙ্ক লেপিয়া থাকেন। অনেক সময়ে রমণীর অভিমান, আত্মসর্ব্বনাশ ও গৃহ-

অশান্তির মূলে নিহিত থাকে। যাঁহারা সহজেই অভিমানিনী, স্বামীর এতটুকু লাঞ্ছনাতে যাঁহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহারা মৃণালিনীচরিত্র আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ উপকৃত হইবেন। অভিমানশূন্যতা আদর্শ প্রেমের একটি লক্ষণ। এই অভিমান-শূন্যতা আমরা মৃণালিনীচরিত্রে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্য করিয়াছি। আদর্শ প্রেমের আর একটি লক্ষণ ধৈর্য্যশীলতা। ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে হেমচন্দ্র বিচারশূন্য হইতেন, কিন্তু ধৈর্য্যশালিনী সকল অবস্থাতেই বিচার দ্বারা প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন, অবিজ্ঞের মত প্রশ্নের একদিক দেখিয়া তিনি নিরস্ত থাকিতেন না। বিনাদোষে তিনি হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক তিরস্কৃতা ও পরিত্যক্তা হইলে কহিয়াছিলেন—"সে আমারই দোষ, আমি গুছাইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিতে পারি নাই।" ললাটস্পর্শে বেদনানুভূত হইলে তিনি কহিলেন—বোধ হয় আমি আপনি পড়িয়া গিয়া থাকিব। কথা এই, মৃণালিনী বিচার-শালিনী অথচ প্রণয়-শালিনী ; প্রণয়-শালিনী বলিয়া তিনি প্রেমাস্পদের কোন অপরাধই দেখিতে পাইতেন না।

বিচারশালিনী মৃণালিনী।

প্রত্যুত, মৃণালিনীর প্রেম অনণ্যসাধারণ—সেই আম্রফল ও বৃশ্চিক-দংশনের ইতিহাস স্মরণ করিলেই মৃণালিনীপ্রেমের অসাধারণত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। সাধক ঈশ্বরারাধনায় সর্ব্ববিধ শারীরিক কষ্টকে অক্লেশে যেমন উপেক্ষা করেন, সেইরূপ স্বামী-আরাধনায় মৃণালিনী সর্ব্ববিধ ক্লেশকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন। পিতৃগৃহে, লক্ষ্মণাবতীনিবাসী হৃষীকেশ শর্ম্মার আশ্রয়ে, কিম্বা নবদ্বীপপ্রান্তবাসিনী রত্নময়ীর কুটীরে সর্ব্বত্র মৃণালিনী হেমচন্দ্রের চিন্তাতেই বিভোর থাকিতেন। "বর্ষাকালের পদ্মের মত", "অশোক-ফুলের স্তবকের মত" মৃণালিনী হেমচন্দ্র-বিরহে

মৃণালিনীর প্রেম।

পরগৃহে বাস করিতেন। বিরহ-রজনী প্রভাত হইলে যেদিন মৃণালিনী হেমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ পাইলেন, সেদিন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। যাহাহউক, প্রিয়বিরহে কাতর ও উদ্দেশ্যহীন, প্রিয়তম সাক্ষাতে আনন্দ বিহ্বলতা পরম বিস্ময়কর ব্যাপার নহে এবং ইহা স্বর্গীয় প্রেমের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণস্বরূপ কদাচ গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু প্রেমাস্পদের সহস্র লাঞ্ছনা ও অত্যাচার যিনি নীরবে সহ্য করিতে পারেন, যিনি স্বামীর সহস্র হতাদর বিস্মৃত হইয়া এতটুকু আদর স্মরণপূর্ব্বক অনন্ত সুখ লাভ করেন তাঁহার প্রণয় যে এ-জগতের নহে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। স্বামীকর্ত্তৃক নিগৃহীতা ও পরিত্যক্তা হইয়া যিনি কহিয়াছিলেন, আমি কালিও হেমচন্দ্রের দাসী ছিলাম আজিও তাঁহার দাসী, তিনি স্বর্গীয়া রমণী। স্বামী অত্যাজ্য, তিনি নরকের কীট হইলেও অত্যাজ্য, একথা সূর্য্যমুখী অথবা ভ্রমর ভাবিতে পারেন নাই, কল্যাণী অথবা শান্তি একথা ভাবিবার অবসর পান নাই, মৃণালিনী একাকিনী একথা ভাবিয়াছিলেন। স্বামীর অপরাধ শুধু যে বিস্মরণীয় এমত নহে, তাহা আশ্রাব্য ও অনালোচ্য—সূর্য্যমুখী স্বামীর অপরাধ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, ভ্রমর স্বামীর অপরাধ শ্রবণ ও আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন অন্তর মধ্যে তাহা পোষণ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী বিশ্বাস।

লোকাপবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে অবিশ্বাসিনী মনে করিয়াছিলেন ইহার কারণ এই, হেমচন্দ্র সহজেই ধৈর্য্যহীন। ধৈর্য্যহীনতা হইতে বিচারশূন্যতা এবং বিচারশূন্যতা হইতে ভ্রান্তি জন্মে; ভ্রান্তি প্রণয়সূর্য্য আচ্ছাদন করে, প্রণয়সূর্য্য আচ্ছাদিত হইলে প্রেমাস্পদের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহ ভ্রান্তিমূলক, ওথেলো অনর্থক ডেস্‌ডেমনাকে

সন্দেহ করিয়াছিল। শেকস্পীয়র জলন্ত ভাষায় সেই ভ্রান্তিমূলক সন্দেহের যে হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন মানবসমাজ চিরদিন তাহা পাঠ করিয়া এই মহৎ শিক্ষা লাভ করিবে যে—প্রেমাস্পদের প্রতি কদাচ সন্দিগ্ধ হইও না—প্রেমাস্পদের প্রতি সন্দেহের যদি কোন কারণ উপস্থিত হয় তাহা উপেক্ষা কর। মৃণালিনী প্রে-াস্পদের প্রতি সন্দেহের কারণ উপস্থিতি মাত্রে উপেক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু হেমচন্দ্র তাহা পারেন নাই।

অভিমানশূন্যতা, ধৈর্য্য, বিশ্বাস ও প্রেম মৃণালিনীচরিত্রের প্রধান অলঙ্কার—এই সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া তাঁহার চরিত্র পুষ্পভারাক্রান্তা ব্রততীতুল্য বিনম্র ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার এই বিনম্রভাবে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। মণিমালিনী ও গিরিজায়া তাঁহার চরি- এতাধিক মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তাঁহার জন্য একে পিতৃবিরুদ্ধাচা উপর অন্যে দেশত্যাগিনী হইয়াছিলেন। স্ত্রীচরিত্রানভিজ্ঞ মাধবাচ শেষে মৃণালিনীচরিত্রে সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সু চরিত্র সকল

স্নেহপরায়ণা মৃণালিনী।

মৃণালিনীকে স্নেহ করিতে বদিত আছেন! তেমনি সকলকে ত্র স্নহ কু সতর্কহীনতার পিতামাতার আমরা মৃণালিনীচরিত্র হইতে হেমচন্দ্রের জন্য দেশত্যাগিনী হইয়া রিব। মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে পূর্ব্বক ব্যথিত হইতেন। তিনি মণি বর্ষীয়া যুবতী নারী পিতামাতার যবনযুদ্ধের অবসানে আসামপ্রদে জপুত্রকে যেরূপ ঘটনাধীনে আত্ম- হইলে মৃণালিনী মণিমালিনীকে শ যুগের কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমান করিয়া তাঁহার সখিত্ব উপভোগ্য হইবে না। হেমচন্দ্রকে আত্ম- মৃণালিনী সবিশেষ স্নেহ করিতেন। য় প্রত্য মন করিলেন এবং পিতা-

মৃণালিনী যেমনি স্নেহপরায়ণা। কন্যা বয়স্থা হইয়াছিল—পিতা যে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমা বিতে লাগিলেন—বৌদ্ধ মধ্যে একটি

সুখের দিনে তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। সুখের দিনে তিনি গিরিজায়ার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া তদ্‌সমীপে আত্মকাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন ও তাহার সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। পাটনীপুত্রী রত্নময়ীকেও তিনি সুখের দিনে বিস্মৃত হয়েন নাই; সম্পদের দিনে তিনি মণিমালিনীর স্বামীকে রাজবাটীর পৌরহিত্যপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে উপকৃত করিয়াছিলেন।

মৃণালিনী কৃতজ্ঞহৃদয়া।

উল্লিখিত প্রধান গুণ ব্যতীত মৃণালিনী অন্যান্য গুণেরও অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার নির্ভিকতা প্রশংসনীয়,—ভয়ে তিনি কখনও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। ইহার প্রমাণ অনেকস্থল হইতে সংগ্রহ করিতে

মৃণালিনীর নির্ভিকতা।

পারা। হৃষীকেশ ও ব্যোমকেশ উভয়েই মৃণালিনীকে শঙ্কটাপন্ন লন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তিনি ভীতির লক্ষণ প্রকাশ করেন ন্সম্মানরক্ষার্থ কখন কখন রমণীকে প্রচুর সাহসের য়, এরূপ ক্ষেত্রে মৃণালিনী সাহসের পরিচয় দিতে কদাচ ন না।

নিরতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল—তাঁহার শ্রুতি, ৭ পরিচয় আমরা উল্লেখ করিতেছি। শ শর্ম্মার গৃহে মৃণালিনী ও মণি যখন আলেখ্য লিখিতেছিলেন, ঙ্গীতধ্বনি প্রথমে মৃণালিনীর কর্ণ অশ্বারোহণে নক্ষত্রবেগে হেমচন্দ্র ালিনী দৃষ্টিমাত্রে তাঁহাকে চিনিতে ার্শেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন

একটি লক্ষণ—রজনীচরিত্র স্মরণ করিলে একথা স্পষ্টতররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইংরাজিতে Scott লিখিত Maid of Neidpath নামে একটি সুন্দর কবিতা আছে তাহাতেও একথা স্পষ্টরূপে বুঝান আছে।

মৃণালিনীর আর একটি গুণ, তিনি কলাকুশলী—পূর্ব্বকালে ধনী, দরিদ্র সকল গৃহেই রমণীগণ কলাকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেন।

কলাকুশলী মৃণালিনী।

কক্ষপ্রাচীরে, গৃহপ্রাঙ্গণে, শয্যারচনে ও রন্ধনশালায় তাঁহাদের কলাশিক্ষার সুনিপুণ পরিচয় পাওয়া যাইত। বেণীবন্ধনে, মাল্যগ্রন্থনে, প্রসাধন ক্রিয়ায়, নৃত্যগীতে ও আলেখ্যনির্ম্মাণে তাঁহাদের কলাকৌশল প্রকটিত হইত। মৃণালিনী ধনীর কন্যা, তিনিও কয়েকটি কলাশিক্ষা করিয়াছিলেন—তিনি মালা গাঁথিতে, চিত্র আঁকিতে ও কাপড়ের উপর ফুল তুলিতে জানিতেন।

লেখকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ সতর্কতার সহিত তাঁহার চরিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালাভাষার সেবকমাত্রেই বিদিত আছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অসতর্কতা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার সতর্কহীনতার দুইটী দৃষ্টান্ত আমরা মৃণালিনীচরিত্র হইতে উল্লেখ করিব। মৃণালিনী হেমচন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী নারী পিতামাতার অগোচরে এরূপ রূপগুণসম্পন্ন রাজপুত্রকে যেরূপ ঘটনাধীনে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা অতীত যুগের কথা দূরে থাকুক বর্ত্তমান যুগেও সম্ভবাতীত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। হেমচন্দ্রকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মৃণালিনী পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পিতা-মাতার আদর পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন! কন্যা বয়স্থা হইয়াছিল—পিতা কন্যার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—বৌদ্ধ মধ্যে একটি

সুপাত্র মিলিল, বিবাহের দিন স্থির হইল, কিন্তু মৃণালিনী জ্বর করিয়া সে পাত্র তাড়াইলেন। আবার সম্বন্ধ আসিলে মৃণালিনী আবার জ্বর করিয়া বসিলেন। যাহাহউক, এ সকল কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু তিনি সম্বন্ধের ভয়ে যে কথন কথন এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া মগধে হেমচন্দ্রের নিকট পলাইতেন, একথাটা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। একটি অল্লাধিক পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে পরিচারকমাত্র সমভিব্যাহারে এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া পিত্রালয় হইতে প্রিয়সন্নিধানে পলায়ন ও পিত্রালয়ে পুনঃপ্রতিগমন কতদূর স্বাভাবিক ও সম্ভবপর আমরা নির্দ্ধারিত করিতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসতর্কতার ফলে মৃণালিনীচরিত্রে ক্ষণেকের জন্য আমাদিগকে শ্রদ্ধাহীন হইতে হয়। দ্বিতীয় কথা এই, মৃণালিনী পিতার বিরূদ্ধচারিণী, পিতার অমতে পিতার বিরক্তিভাজনের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া পিতৃচরণে তিনি অপরাধিনী হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় যতক্ষণ না তিনি পিতৃক্ষমা লাভ করিতেছেন, অন্ততঃ পিতৃক্ষমা লাভের জন্য আকিঞ্চন প্রকাশ করিতেছেন, ততক্ষণ আমরাও তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছি না। মৃণালিনী, অনন্ত প্রেম ও অসীম ধৈর্য্যের পুরস্কারস্বরূপ হেমচন্দ্রের ভালবাসা পুনর্লাভ করিয়াছিলেন এবং মহিষীরূপে তিনি হেমচন্দ্রের পুরী আলোকিত করিয়াছিলেন। রাজমহিষী হইয়া মৃণালিনী, রত্নময়ী প্রভৃতি সকলকেই স্মরণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পীড়িতহৃদয় পিতামাতাকে কি একবারও মনে পড়ে নাই? মৃণালিনীর সমগ্র চরিত্র আলোচনা করিলে আমাদের বোধ হয় যে, ইহা লেখকের সতর্কহীনতার আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

শেষ কথা—মৃণালিনী সহিত হেমচন্দ্রের বিবাহ ও হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার পুষ্পবাটিকার নির্লজ্জ ও গোপন সাক্ষাতাদি অনেকে আপত্তিকর মনে করিতে পারেন—কিন্তু তৎকালিক সামাজিক অবস্থা

যদি সকলে স্মরণ রাখেন তাহা হইলে কিছুতেই সেরূপ মনে হইবে না।

তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা ও মৃণালিনীর চরিত্র।

হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী যে কালের চরিত্র সে কালে বর্ত্তমান যুগের কঠোর অবরোধ-প্রথা সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রমণী-জাতিকে মুক্ত আকাশটুকু দেখিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করে নাই! অনেকের বিশ্বাস, পাঠানাধিকার হইতে হিন্দুসমাজে অবরোধপ্রথা প্রবেশলাভ করিয়াছে। এ বিশ্বাসের মূলে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। হেমচন্দ্র ও মৃণালিনী যে যুগের চিত্র, সে যুগে ভারতবর্ষে পাঠান সাম্রাজ্যের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। পাঠান সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুর অন্তঃপুর ও বহির্জগতের মধ্যে যে আকাশস্পর্শী প্রাকার ধীরে ধীরে শির তুলিয়াছিল তাহা লঙ্ঘন করিয়া এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হিন্দু রমণীর ভাগ্যে বহির্জগতের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু মহম্মদীয় সাম্রাজ্যের সূত্রপাতকালে হিন্দুরমণীর অবস্থা বিভিন্ন ছিল। বাল্য-বিবাহ যে তৎকালে প্রচলিত ছিল এমন নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতা কন্যার জন্য পাত্র মনস্থ করিতেন, কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা আপন পাত্র আপনি মনন করিয়া লইতেন। এতদ্ভিন্ন, আজই রমণীহৃদয়ের স্বাধীনতা নির্দ্দয়রূপে অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু সে যুগে সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

শ্রীপ্রমথনাথ সেন।

দিদি-হারা।

বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,—
মাগো আমার শোলক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই ?

পুকুর ধারে লেবুর তলে, থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা একলা জেগে রই—
মাগো আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?
সেদিন হ'তে কেন মা আর দিদিরে নাহি ডাকো ;—
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?

খাবার খেতে আসি যখন দিদি বলে ডাকি তখন
ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসেনাকো—
আমি ডাকি তুমি কেন মা চুপ্‌টি করে থাকো ?
বলমা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে'
কাল যে আমার নতুন ঘ'রে পুঁতুল বিয়ে হবে।

দিদির মতন ফাঁকি দিয়ে আমিও যদি লুকাই গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে ?
আমিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে !
ভুঁইচাপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল—
মাড়াস্‌ নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল।

ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুল্‌বুলিটি লুকিয়ে থাকে
উড়িয়ে তুমি দিওনা মা ছিঁড়তে গিয়ে ফল—
দিদি এসে শুন্‌বে যখন, বল্‌বে কি মা বল্‌।
বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময় মাগো আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

লেবুর তলে পুকুর পাড়ে ঝিঁঝি ডাকে ঝোপে ঝাড়ে
ফুলের গন্ধে ঘুম আসেনা, তাইতে জেগে রই
রাত্রি হল, মাগো আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী।

ঘরের কথা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজা গেলে রাজা হয়, বড়বাবু গেলে কি আর বড়বাবু হয় না? শিয়ালদহ আফিষেও বড়বাবু হইয়াছে; ইহাঁরও আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, উমেদার জুটিয়াছে; যে সকল দাদা, জ্যাঠা, খুড়ো, পিশে, শালাপো এতদিন অজ্ঞাতবাসে ছিল তাহারা সকলেই প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহাদের "অতি আপনার অমুকের" যে এত গুণ ছিল তাহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া হায় হায় করিতেছে। নূতন বড়বাবু ক্রমে ক্রমে গুটি আষ্টেক পুরাতন কেরাণীকে সরাইয়া ভায়রা-ভাই, শালাপোদিগকে তাহাদের কার্য্যে বসাইয়াছেন। এখন একটী পরমাত্মীয়ের কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন ও ক্ষুণ্ণ হইয়া আছেন। নুতন বড়বাবুর এক সময় "এক জায়গায়" যাওয়া-আসা ছিল; পরমাত্মীয় যুবকটী "সেই জায়গার" বোনপো, মাইনর স্কুলের থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত বরাবর বেতন দিয়াছে—সেই "এক জায়গা" আমাদের বাবুর নুতন পদোন্নতির সংবাদ পাইবামাত্র তাহাকে ডাকাইয়া বোনপোটীকে হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছে ও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে যেন বাছাকে এমন একটী কর্ম্ম দেওয়া হয় যাহাতে পরিশ্রম কম ও দু'পয়সা ভাল রকম উপরি আছে। রাজচন্দ্রের ন্যায্য মত যা কিছু উপরি ছিল, আফিষের লোকে কল্পনায় তাহার উপর চুরি চড়াইয়া অন্ততঃ দশগুণ অধিক আয় আন্দাজ করিত। নূতন বড়বাবুরও তাহাই বিশ্বাস, এজন্য রাজুর কাজটী হলেই "সেই জায়গার" বোনপোর সুবিধা হয় মনে করিতেন। অবশ্য বোনপোবাবু রাজুর পরিশ্রমের সহস্রাংশের একাংশও করিতে পারিবেন না ইহা তিনি

জানিতেন কিন্তু "কাম আপসে চল্‌তা হ্যায়" ন্যায়-শাস্ত্রের এই সূত্রে মেশোমহাশয়ের বিশেষ আস্থা ছিল। বোনপোবাবুটী একটু মোলায়েম ধাতের ছোকরা, শরীরখানি কতক ননীর পুতুল গোছ। করুণা-নিধান ন্যায়বান পুলিশ-ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ চাচার হুকুমে এই কলিকাতা সহরের একজন রাজপুত্র, ছেলেটীর বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত মাসে মাসে বরাবর পনের টাকা ক'রে খোরাকী যোগাইয়াছিলেন, গরবিণী গর্ভধারিণী তাই বাছাকে একটু রাজারাজড়াই তরিবতে প্রতিপালন করেন।

শৈশবে দুধের পরিবর্ত্তে রাবড়ী খাওয়ান হয়; লিভারও হয়, কিন্তু কুলীনপুত্র বলিয়াই সে সাধারণতঃ শিবের অসাধ্য রোগ হইতেও বাছা মুক্তি পায়। শরীরে এত অধিক পরিমাণ পারদ ছিল, যে বোধ হয়, বাছার অঙ্গে একখানি কাচ বসাইয়া দিলে তাহাতে অনায়াসে মুখ দেখা যাইতে পারিত। এবং সেইজন্য রসকেশর চক্ষু, কর্ণ, নাশা ত্বক প্রভৃতি ফুটিয়া এত ঘন ঘন উকি মারিত যে প্রসূতিকে একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বারমেসে বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বদা কোলে কোলে থাকায় আঁধার-ঘরের-মাণিক সাত বৎসর বয়সেও হাঁটিতে গেলে ধুপ ধুপ করিয়া পড়িয়া যাইত; বাছার কটিদেশ হইতে দেহের উর্দ্ধার্দ্ধ, নিম্নার্দ্ধ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও ভারি ছিল এবং মস্তকটী তাহার পরিবর্ত্তে তাহার পিতামহের স্কন্ধে স্থাপিত হইলে একটু বড় দেখাইত বটে কিন্তু বেশী বেমানান হইত না। দশ বৎসর বয়স পয্যন্ত বাছাকে লোকে কুমার বলিয়া সম্বোধন করিত ও সিংহ উপাধিতে ভূষিত করিত কিন্তু তার পরেই উপপিতা রাজামশাই এ চাকরীতে জবাব দিয়া অন্যত্র ভর্ত্তি হইলেন এবং পটুয়াখালির গুরুগোবিন্দ সাহা মহাশয় পাটের কাজে কিছু ঠাট বাড়াইয়া এবং কলিকাতায় একটু মানসম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য দোলনচাঁপার স্কন্ধে নির্ভর করিলেন।

প্রসূতি, পুত্রকে যাদুধন বলিয়া ডাকিত, তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা কেহ বা যাদুবাবু কেহ বা ধনবাবু বলিয়া আদর করিত কিন্তু রাজপুত্র জনকের ইচ্ছাযোজিত বদন-ব্যথাকারী নামের অনুকরণে এবং তাঁহার একজন কবিগোছের সহচরের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে ধনবাবুর সামাজিক নামকরণ হয়, রাসভেন্দ্র কুমার। নয়বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কুমার পিতার পদবী বহন করে, পরে ফরিদপুরের এক আড়তদার মহাশয় শ্রীমন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত হইলে তিনি জমীদারী ক্রয়ের সঙ্গে যখন নিজে পতিতপাবন সর্ব্বজনতারণ "রায়" উপাধি গ্রহণ করেন তখন ঐ অক্ষরদ্বয় কুমারের লাঙ্গুলেও লাগাইয়া দেন। কিন্তু এখানেও যাদুধনের সংস্কারের শেষ হয় নাই; তাহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সকালে, প্রসূতি সাত-আনির ঘোষালবাবুদের ব্রহ্মত্রভুক্ত হইল ও "সেজো-মহাশয়" নিজে দাঁড়াইয়া মহাসমারোহে শ্রীমানের যজ্ঞোপবীত দেওয়াইয়া দেন; এবং নূতন খরিদা বাটীর কওলাতে ব্রহ্মত্রভুক্তা প্রসূতির নামও দেবীপদবীতে ভূষিতা হয়। সুতরাং সেই অবধি আমাদের শ্যামী-ধোপানীর বোন-ঝি ভূতি, শ্রীমতী দোলন চাঁপাদেবী ও তাঁহার পিণ্ডাধিকারী, কুমার রাসভেন্দ্র কুমার ঘোষাল নামে পরিচিত হইয়াছেন। মেজো-ঘোষালমহাশয় শ্রীচরণ ধরিয়া বারম্বার অনুরোধ করাতেও দোলনচাঁপা পুত্রকে কুমার পদবী বর্জ্জিত করিতে স্বীকৃতা হন নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এখন এই দোলনচাঁপার সৃষ্টিধরের চিন্তায় নূতন বড়বাবু কিছু বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং রাজচন্দ্রকেই দোলনের মনোরঞ্জনের পথের কণ্টক মনে করিয়া তাহার উপর কর্ত্তার নজরটা একটু তিক্ত রকম দাঁড়াইল। চাটুজ্যের ঈর্ষা-ঘৃণা-প্রণোদিত সতেজ চক্ষে

রাজুবাবুকে বিশেষ কৃপার চক্ষে দেখিতেন ; তাহার কার্য্যসম্বন্ধে দক্ষতা, পটুতা, পরিশ্রম, অনুরাগাদি গুণ প্রথমাবধি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পক্ষপাতী হইয়াছিলেন ; যাঁহার হৃদয়ে রাজচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্রিম সততা ও নির্ম্মল চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল সেই ম্যাজ সাহেব কোন নূতন লাইনের কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিবার জন্য শিয়ালদহ আফিষ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। অবশ্য ম্যাজসাহেব শিয়ালদহ ত্যাগের সময় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নূতন সাহেবকে রাজুবাবুর গুণাবলির কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহার উপর একটু সুদৃষ্টি রাখিতে ও বিশ্বাস্য কার্য্য প্রভৃতির ভার তাহারই প্রতি অর্পণ করিতে ভাল করিয়া অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন বটে, আফিষের মধ্যে রাজুর যে গুটিকয়েক হিংস্রক শত্রু আছে একথাও তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু নূতন সাহেবটী একে বর্ণশঙ্কর তায় পাঁচপুরুষে ভঙ্গ। তাঁর অধস্তন চারিপুরুষের মধ্যে কি পিতৃকুল কি মাতৃকুল কেহ কখনও চট্টগ্রামের সীমার বাহিরে সমুদ্রজলের কিরূপ বর্ণ তাহা দেখেন নাই। কেহ কেহ বলে যে, এই ব্যারেগাসাহেবের পিতা একবার (Undertaker) সমাধি-সহকার-কার্য্যে কিছু ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ছোট ব্যারেগার পক্ষী-বিপণি-রক্ষাকারিণী মাতৃস্বসার অষ্টাবক্র স্বাক্ষরটী দেড়শত টাকার একখানি চেকের উপর অবিকল নকল করেন। রাজপুরুষেরা বিলি·ব্যারেগার এই অদ্ভুত চিত্রচাতুর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে ট্রেজরির ব্যয়ে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের লবণাম্বুবাহী স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবনের জন্য প্রেরণ করেন ; তথায় তিনি কয়েকটী সংসারত্যাগী ভারত সন্তানকে রাজভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিকর সুরা প্রস্তুতের কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এবং দুই তিনটী মান্দ্রাজ

স্থাপনের চেষ্টা দেখেন, এই সকল বিস্তার বলে তিনি আণ্ডামানে আমরণ বিনা রাজকরে বসবাস করিবার সনন্দ পাইয়াছেন।

বৎসর দুই-তিন হইল, উদ্যমশীল বিলি-ব্যারেগা একদিন কতকগুলি বংশদণ্ডের দ্বারা একরূপ নূতন জলযান নির্ম্মাণ করিয়া উত্তর বা দক্ষিণ কোন একটা মেরু আবিষ্কারের জন্য শুভযাত্রা করেন কিন্তু দিন ক্ষণ না দেখিয়া অমাবস্যার রাত্রে যাত্রা করায় পথিমধ্যে একটা বাধা পড়ে; গবর্ণমেণ্টের ডাক-বাহী বাষ্পীয় পোতের নাবিকগণ কোকাদ্বীপের আলোক-ঘরের (Light House) নিকট ঐ অপূর্ব্ব যান দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ বিলিকে আপনাদের জাহাজে তুলিয়া লইয়া আণ্ডামানের ধন আণ্ডামানে ফিরাইয়া আনেন।

তদবধি তথাকার কমিশনার সাহেব, বিলি-ব্যারেগার চরণে প্রেমের লৌহ নিগড় পরাইয়া দিয়া তাঁহাকে (Permanent knight of the chain gang) শৃঙ্খল-সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী-বীর উপাধিতে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন। আণ্ডামানের পোর্টব্লেয়ার নামক বন্দী-নিবাসের একটী স্থানের নাম এবার্ডিন, ব্যারেগার খাস-মহল সেই খানেই; তিনি বৎসরে তথা হইতে পুত্রকে কুশল লেখেন; পুত্র—আমাদের জো ব্যারেগা—খাম গুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া পত্র-শির লিখিত "এবার্ডিন" কথাটী বন্ধু বান্ধবকে. দেখান ও বলেন "Guo writes from' ome" বন্ধুরা মনে করেন পত্রগুলি স্কটলণ্ডের এবার্ডিন হইতে লেখা।

জো-ব্যারেগা কলিকাতার ফ্রি-স্কুলে বাল্যলীলা সমাপণ করিয়া ইষ্টারন-বেঙ্গল-রেলওয়ের কাঁচড়াপাড়ার কারখানার পোর্টার রূপে নিযুক্ত হন। ঐ কার্য্যে জোর পূর্ব্বে বহুদিন হইতে একজন কাফ্রি "সাহেব" নিয়োজিত ছিল। একবার কাঁচড়াপাড়ায় রেলের সাহেবেরা নববর্ষ উপলক্ষে একটা খুব জমকাল রকম পার্টী দিয়াছিলেন, সুধার ভাণ্ডার কাফ্রিসাহেবের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল, পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ

আস্বাদ করিতে করিতে ভাণ্ডারী, মরাল গ্রীবা ভঙ্গ করিয়া উত্তপ্ত শোণিত পান করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজেরা পুরাতন গ্রীক ও রোমক বীর ও পণ্ডিতগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শনার্থ আপনাদের আদরের কুকুরকুলকে ও আফ্রিকাবাসী দাসগণকে সেই দেবোপম মনস্বীগণের অমর নামগুলিতে ভূষিত করেন।

কোন দাসকুলের বংশধর বলিয়া আমাদের কথিত এই কাফ্রি পোর্টাটীর নাম ছিল সিজার। কাফ্রি সিজার মদিরামোহে মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনাকে সেই পৌরাণিক রোমের জগজ্জয়ী সিজার মনে করিল এবং সমগ্র বৃটনবাসীকে ধ্বংস করিবার মানসে দীর্ঘ-ফলক ছুরিকা হস্তে আরক্ত লোচনে বহির্গত হইল; ভোজ-বিরাজি সাহেবগণ তাহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছিলেন; কিন্তু প্রমোদসঙ্গিনী প্রমদাচয় মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম করায় পবিত্র নাগর ধর্ম্মপালনের জন্য কঠোরকরে কোমলাগণের তুষারাঙ্গ আবরণে ব্যাপৃত হইল; ভোজ বা নৃত্যগৃহে নিজ বনিতার হস্তধারণ সভ্যতাবিরোধী ব্যবহার সুতরাং পরস্পরে পরস্পরের শঙ্কাকুলা সুধাবিহ্বলা কামিনীগণকে ধীরবক্ষে রক্ষা করিয়া তাম্বুর অন্তরালে তামসী তরুতলে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে খৃষ্ট-কালের কৃষ্ণ-সিজার ছুরিকা আস্ফালন করিয়া শার্দ্দুল-লম্ফে রেল-পথের-তার-বেষ্টন উল্লঙ্ঘন করিল, এমনসময় ষ্টেসনের দিক হইতে এক খানি পাইলট এঞ্জিন রাক্ষস-অক্ষিদ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া জলন্ত ধুম্র ফুৎকার করিতে করিতে বজ্রবেগে আসিতে লাগিল। সুরাসাহসোন্মত্ত সিজার বৃটিশদৈত্যবোধে হুহুঙ্কার গর্জ্জনে মুষ্টিদ্বয়ে ছুরিকা আবদ্ধ করিয়া এঞ্জিনের স্ফীত বক্ষের উপর লাফাইয়া পড়িল ও যাহা হইবার তাহা হইল। শিয়ালদহের ডাক্তারসাহেব "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" করিলেন; পিচ্-কৃষ্ণ-সিজারের কর্দ্দম-শোণিত-সিক্ত দেহপিণ্ড তাঁহার তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রে পরীক্ষীত হইয়া দরিদ্র

শ্মশানে সমাধিত হইল। ডাক্তারসাহেব কৃষ্ণচর্ম্মের মধ্যে শ্বেত দেহাভ্যন্তরসুলভ সমস্ত উপাদানই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া পাইয়াছিলেন ; এ রহস্যটী সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয় নাই বটে কিন্তু সাংঘাতিক দুর্ঘটনাটীর যথার্থ ইতিহাস ব্যতীত আর অনেক কাহিনীই ভিন্ন ভিন্ন পত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র এই দুর্ঘটনা উপলক্ষে একটী হাস্যোদ্দীপক চিত্র দিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ রসিক সাহিত্যের অবতারণা করেন এবং প্রকারান্তরে রেল বিস্তারের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কি ভয়ানক ক্ষতি হইতেছে, দাশুরায়ের পাঁচালী, কামিনীকুমার, রসমঞ্জরী প্রভৃতি পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোক ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া তাহা সুন্দর, অবোধগম্যরূপে অপ্রাঞ্জল ভাষায় দেখাইয়া পাঠকগণকে স্ব-ধর্ম্মরক্ষার জন্য মার্কণ্ডেয় মার্কুলি ও সনাতন সালসা সেবনের ব্যবস্থা দেন।

একটী উদ্যমশীল রঙ্গ-সম্প্রদায় ঐ ঘটনাটীকে নাট্যগৌরবে মণ্ডিত বোধে রেলে-রক্ত নাম দিয়া একজন রাজ-কবির দ্বারা একখানা প্রহসন রচনা করান ও আপনাদের নাট্য-পীঠে "ভালনবমী" নামক ভক্তি-রসোদ্দীপক নাটকের জয়-ডঙ্ক-নাদী অভিনয়ের পর উহা প্রায় পনের ষোল জন সর্ব্বসাধারণকে মোহিত, প্রহসিত করিয়া প্রদর্শিত করেন। এই প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া "বঙ্গ বক" লিখিয়াছিলেন যে ; "এতদিন পরে বাঙ্গলাভাষায় আমরা একখানি যথার্থ নাটক দেখিলাম। এই কুৎসা-কলঙ্ক-কালিমা-কুজ্ঝটিকার কোকনদময় দুর্দ্দিনে, এই ধর্ম্মনাশ, ভাষাহ্রাস, বিজাতীয় ভাব, ইংরাজি চাস, গ্যালারি ঠাস, "পিটে" পাশ প্রভৃতির প্রচেতাপূর্ণ কালে দেখিলাম একখানি নাটক। রেলে-রক্ত" যথার্থ ভক্তের আদরের ধন ; প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া শূন্য উদর, বিবেক-বিমুক্ত দর্শক সমূহ উচ্চরবে হাস্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু আমাদের ন্যায় পূর্ণ-গর্ভ নিরেট সাধুজন মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদিয়াছেন।

"তাল-নবমী" নাটকের তালে তালে আমরা যেমন অশ্রুজল ফেলিয়াছি, "রেলে-রক্তের" প্রতি উক্তিতে যখন অপরে হাসিয়াছে তখনই অমরা রোদন করিয়াছি।"

"কি জানি কি দৈব বিড়ম্বনা! যেখানে অপরে হাসে আমরা সেইখানেই রোদন করি; বোধ হয় ইহা আমাদের পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল,—সহ্য হয়না আমাদের অপরের হাসি। এই রঙ্গালয়ে দৃশ্যপটের ছটায় দর্শকগণকে প্রতারিত করা হয় না, পরিচ্ছদের ঘটায় সাধারণের মন ভুলান হয় না, আলোকমালার উজ্জ্বলে লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া দেওয়া হয় না, আসনের উৎকৃষ্টতায় কাহাকেও চাতুরী জালে ফেলা হয় না, এখানে বাহ্যাড়ম্বরের লেশ মাত্র নাই, ইংরাজী বিদ্যার বিজাতীয় ছায়াও এস্থান স্পর্শ করে নাই। এখানে পাইবেন কেবল—নাটক ও অভিনয়। বিকট, উৎকট নাটক আর প্রলয়কালীন বিশ্ববিলয় অভিনয়, "বঙ্গ-বকের" প্রত্যেক পাঠককে আমরা একবার "রেলে-রক্তের" অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি। এই রঙ্গ-ভূমির বিশেষ সুবিধা যে, প্রত্যেক দর্শক এক এক খানি নিজস্ব বেঞ্চে বসিয়া জলজ-বায়ু সেবন করিয়া নিদ্রা যাইতে যাইতে অভিনয় দেখিতে পারেন; সম্মুখের কেদারা কয়খানি সর্ব্বদা আত্মীয়লোকের দ্বারা অধিকৃত থাকায় তাঁহাদের অনুরোধ করিলেই মস্তক নীচু করিবেন, আর কোন দৃষ্টি ব্যবধানের আশঙ্কা থাকিবেনা। পরিশেষে বক্তব্য যে, ম্যানেজার মহাশয় আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গিয়া পান তামাকাদি দিয়া যথার্থ হিন্দুমতে ভদ্রতা রক্ষা করিয়াছেন, সেইখানে কবির সহিত আমাদের পরিচয় হইল; তাঁহার লেখনীতে সুবর্ণ বর্ষণ হউক, মস্যাধারে হীরকের শিলাপাত হউক, কাগজে মণিমুক্তার ঝঞ্ঝাবাত হউক, আর তাঁহার কল্পনায় বজ্রাঘাত হউক।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ভিক্ষা।

বহুদিন পরে এসেছি গো মাতা
তোমার চরণমূলে,
আদরের ভাষা, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।
জননীর স্নেহ, মায়ের প্রসাদ
মাতৃআহ্বানবাণী,
কেমন মধুর কেমন কোমল
কত কাল নাহি জানি ;
স্নেহের পরশ কেমন সরস
গিয়াছি সবাই ভুলে,
আদরের ভাষা, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।

ভীষণ কুহক গভীর স্বপন
করেছিল জ্ঞানহারা
তোমার ক্রোড়েতে দেয়নি ফিরিতে
এতদিন মাগো তারা।
মাতার আশীষে, সব গেছে টুটে
ভেঙ্গেছে মোহের ঘোর,
পেরেছি চিনিতে তোমায় জননী,
মোদের এ ঘর-দোর।

তাই আজ মোরা এসেছি সবাই
তোমার চরণমূলে,
আদরের ভাষা, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।

দাওমা বসন, দাওমা ভূষণ
দাওমা উত্তরীয়।
দাওমা সজ্জা, দাওমা শয্যা
সন্তানে তব প্রিয়।
দাওমা অন্ন দাওমা পণ্য
দাওমা হৃদয়ে বল।
তোমার কাননে, তোমার ভুবনে,
দাওমা ফুল ও ফল।
মায়ের করুণা, মায়ের এ দান
লইব মাথায় তুলে।
শিখাব সবায় তোমারি সন্তান
এ কথা কেহ না ভুলে
আশীষ বরষি, চুম্বন দিয়ে
কোলে লও মাগো তুলে।

উদ্বোধন।

এতদিন পরে, জননীরে যবে, আজকে পড়েছে মনে,
মায়ের সন্তান, কেউ কোথা আর, থাকিস্‌নে নিরজনে ;
সবে মিলে তোরা কর্ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসারে বোধন,
দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশ, মলিনতা দূর কর প্রাণপণে ;
সন্তান হয়ে, মিছে কাজ লয়ে, থাকিস্‌নে নিরজনে।

ওই শোন্ ওই মায়ের অভাব
বস্ত্র নাহিক ঘরে,
অন্ন বিহনে শীর্ণ যে তনু
রত্ন হরেছে পরে ;
কোটী পুত্র তোরা আছিস, সবাই পেয়েছিস নব প্রাণ,
এখন সকলে বলরে তোরা, কি করিবি মা'কে দান !
কি দিয়ে তাঁহার করিবি সজ্জা,
কেমনে হরিবি দীনতা লজ্জা,
সব ত দি'ছিস পরকরতলে,—কেমনে রাখিবি মান ?
এখন সকলে বলরে তোরা, কি করিবি মা'কে দান ?

বিদেশী বণিক শতবর্ষ ধরে,
যে ধন লয়েছে হরে,
পারিবি কি তাহা কাড়িয়া আনিতে, পারিবি কি দিতে প্রাণ ?
পারিবি কি তোরা প্রতিশোধ নিতে মায়ের এ অপমান ?
সবে মিলে তবে কর্ আয়োজন,
মাতৃপূজার বসারে বোধন,
একপ্রাণ হয়ে, মনে বল নিয়ে, হ'রে সব আগুয়ান ;
হাসিমুখে তোরা অকাতরে কর্ লক্ষটী শির দান !

থাকুক্ শিয়রে শাণিত কৃপাণ
লক্ষ ঝঞ্ঝাবাত,
মরণের ভয়, শত বিভীষিকা
করিস্‌নে দৃকপাত।
নবীন সাহসে হাতে তুলে ধর, মাতৃজয়নিশান ;
বিশ্বসমাজে পরিচয় দেরে, তোরা কা'র সন্তান।

ওই দেখ ওই জননী তোদের
কাতর মলিন ক্ষীণা,
দ্বারে দ্বারে ফেরে ভিখারিণী প্রায়
অন্নবস্ত্রহীনা,
শতকোটী তোরা পুত্র যে তাঁর পেয়েছিস নব প্রাণ !
আর কেন বল নিরবে শুনিবি মাতৃদৈন্যগান !

সমসাময়িক ভারত।

(ফরাসী পর্য্যটক এর্নেষ্ট পিরিউ-প্রণীত)

আর্থিক অবস্থা।

১

ার্থিক অবস্থার প্রশ্নটি দুইভাবে আলোচিত হইতে ...ারে ;—এক, ইংরাজের দিক্ দিয়া, আর এক, ভারতবাসীর দিক্ দিয়া। প্রথম স্থলে,—ইংরাজের ব্যবসায়-বাণিজ্য হইতে খরচ খর্চ্চা বাদে যে মোট লাভ হয়, তাহার হিসাবাদি হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যায়। যদি সরকারী তথ্য-বিবরণীতে কার্পাসের জয়ঘোষণা করা হয়, যদি কোম্পানিদিগের "শেয়ার"—খাল-কর্ত্তনের শেয়ার—এই সকল শেয়ারের মূল্য বিলাতের "ষ্টক্-একসচেঞ্জে" চড়িয়া যায়, যদি ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতের দুঃখদৈন্য সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য না করে, তাহলেই জানিবে ভারত সুখী, ভারত সমৃদ্ধ, ভারত সৌভাগ্যশালী! ইহারই জন্য ভারতকে ইংরাজ শাসন-প্রণালীর শতমুখে প্রশংসা করিতে হইবে! যে "ব্রিটানিকী শান্তি" স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত মহা-সমারোহে বিজয়-পথে চলিয়াছেন,—হে হিন্দু মুসলমান!—তোমাদে উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহার সেই চরণ-তলে নিঃক্ষেপ কর!...কিন্তু সমস্যার আর-একটা দিক্ আছে ; রাজপুরুষদিগের—ধনপ[illegible] —ইঙ্গ-ভারত-রাজ্যের অথবা বিলাত-রাজধানীর ইংরাজ ব[illegible] গণ্ডির বাহিরে যে ত্রিশকোটি ভারতবাসী ক্ষুধার জ্বালা[illegible] তাহাদের ভুলিলে চলিবে না।

ছবির একদিকে দেখ :—একটা বৃহৎ উৎসব [illegible]
তুলার বস্তার মধ্যে, বাইবেল-গ্রন্থরাশির মধ্যে

মধ্যে, স্ফীতোদর "বজেটের" মধ্যে, উন্মত্তভাবে নৃত্য ক
অন্যদিকে ঃ—কত অসংখ্য গৃহস্থ—শীর্ণ, নগ্ন, দুর্ভিক্ষপীড়িত
গুলা পীতবর্ণ দীর্ঘ মনুষ্য-কঙ্কাল দুর্ব্বল পায়ের উ
দিয়া, ধৈর্য্য-সহকারে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে...আশ্চর্য
ছবির দুইটা দিক্ই সত্য। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের যে সব
সুখবাদীর উজ্জ্বলতম বর্ণে রঞ্জিত, প্রকৃতপক্ষে তাহাই
অধিক মর্ম্মস্পৃক্। কেননা, কে বলিতে পারে—কত আ
মূল্যে—কত দুঃখ কষ্টের মূল্যে, এই ইউরোপীয় প্রণালীর চা
মহার্ঘ আড়ম্বর-সকল অর্জ্জিত হইয়াছে। "শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য, রেল্-পথ নির্ম্মাণের জন্য, সৈন্যসামন্ত রক্ষণের জন্য, আমাদের অত্যন্ত ব্যয় হয়—ভয়ঙ্কর ব্যয় হয়!" ইহাই কর-দাতা প্রজাগণের অভিযোগ; কিন্তু এই অভিযোগ-বাণীর প্রতিধ্বনি নাই! যাঁহাদের উপর শাসনের ভার, তাঁহারা এই কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের ধ্রুব বিশ্বাস, প্রজার আবাস-কুটিরের কোন গুপ্ত কোণে, এখনও কিছু অর্থ সঞ্চিত আছে;—কেননা, রমণীরা হাতে ও পায়ে চিরদিন গহনা পরিয়া থাকে। তবে আর কি!—ইস্ক্রুর আর এক প্যাঁচ্ ঘুরাইয়া দেও—ইহার বিরুদ্ধে দুঃখবাদীরাও ন কথা বলিতে পারিবে না।

যাহারা গোড়াতেই দেশীয়দিগের ন্যায্য অধিকারের প্রতিবাদ করে,
নিকট ইঙ্গ-ভারতীয় রাজ্যপদ্ধতি একেবারে আদর্শস্থানীয়।
যতটা স্তুতিবর্ষণ হয়, ততটা স্তুতিবর্ষণ মানবীয় আর কোন
য় কিনা সন্দেহ। এই বহু প্রশংসিত কৃতিত্ব সম্বন্ধে
জই এক একবার বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁহারা
একটা উচ্চ ধরণের রাজ্যতন্ত্র ফাঁদিয়া বসিয়াছেন
বা আপনাতে আপনি বিস্মিত। কিন্তু সে

যাহাই হোক্, আসলে তাঁহারা কাজের লোক ;—সকলের আগে নিজের স্বার্থটি তাঁহারা দেখেন। এইরূপ উচ্চ রাজনীতির দোহাই দিয়া, একটা উচ্চ "বুলি" আওড়াইয়া, কিরূপে তাহা হইতেও নিজের একটু সুবিধা করিতে পারেন তাহাই তাঁহাদের চেষ্টা। নবাগত পর্য্যটক-দিগের মনে—সমস্ত জগতের মনে, তাঁহারা এইরূপ একটা সংস্কার জন্মাইয়া দিতে চাহেন যে, এরূপ ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—ইহার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় নাই। আমি বলি, একথা মিথ্যা নহে ;—এ শুধু নেত্রবিড়ম্বনা নহে : উপনিবেশরাজ্যস্থাপনের অর্থ যদি ধন শোষণ হয় (আমার বোধ হয়, অনেক ইংরাজও ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে পরাঙ্মুখ নহেন) তাহা হইলে বলিতে হইবে—এই ভারতীয় উপনিবেশ-রাজ্য,—একটা অদ্ভুত ব্যাপার ;—কৃতিত্বের একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। কিন্তু যদি উপনিবেশ-রাজ্যস্থাপনের আর কোন অর্থ হয় (যেমন মনে কর, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে উদার-নৈতিকেরা যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহা ইংরাজ জাতির অব্যক্ত বুঝাবুঝির ফলে রহিত হইয়া যায়) যদি সভ্যতা বিস্তার করা—দেশীয়দের হিতের জন্যই দেশ-শাসন করা উহার অর্থ হয়—উহার উদ্দেশ্য হয়,—তাহা হইলে আমি একটা ইংরাজি শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলিতে চাহি—উহা সম্পূর্ণ "ফেলিয়োর" ;—অর্থাৎ উহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। তা ছাড়া, এই কেজো ইংরাজ-জাতিকে এই বলিয়াও ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে যে উহাদের ভবিষৎ-দৃষ্টি নাই। কাল কি খাইব সে দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, উহারা আনাড়ির মত—"উড়ন-চণ্ডির" মত, অপব্যায়ের পথে চলিয়াছে ;—মূলধন ও সুদ উভয়ই একসঙ্গে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। উহাদের বিশ্বাস—পৃথিবী বিপুলা ; ভারত-শোষণ শেষ হইয়া গেলে, আরো অনেক অকর্ষিত-পূর্ব্ব নব-নব রাজ্য আছে যেখানে গিয়া আবার উহারা এই শোষণকার্য্য আরম্ভ

করিতে পারিবে।—ইহা একপ্রকার অস্থিরবাস উড়ন্ত পঙ্গপালের দেশ-উজাড়-কারী উড্ডয়ন-উৎপাৎ!

ভারত-পর্য্যটকদের মধ্যেও অনেকে, এই শোষণকার্য্যের অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে, সাজসজ্জার চাকচিক্যে, বাহ্য জাঁকজমকে, এবং এই "পিউরিটান" জলদস্যুদিগের ভদ্রব্যবহারে ভুলিয়া যান। বাহিরের ঠাটটি বেশ জমকালো;—বেশ সুশৃঙ্খল; শাসনযন্ত্রটি বেশ সুব্যবস্থিত—তবে কিনা, সুব্যবস্থিত একটু বেশি মাত্রায়। যে সময়ে ইংরাজ, ভারতের জয়সাধনে নিযুক্ত ছিল,—সে সময় আর এখন নাই। সুতরাং, যে কায়দাদুরস্ত, দস্তানা-পরা, "জেণ্টেলমেনগণ," শিষ্টাচারের একটা আবরণ রাখিয়া, দেশীয় ধন-প্রস্রবণের মুখগুলি গোপনে গোপনে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিয়া, সেই ধন ছলক্রমে আত্মসাৎ করিতেছেন—এক্ষণে সেই জেণ্টেলমেনদিগকে পূর্ব্বতন ভারতলুণ্ঠনকারী রাজ্যকর্ত্তাদিগের উত্তরাধিকারী বলিয়া চেনা দুষ্কর!...ইংরাজ শাসনাধীনে, আর্থিক হিসাবে ভারতের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। কতকগুলি বৃহৎ ব্যাপার তাহার মূলীভূত কারণ;—যথা, সুয়েজের খাল-পথ উদ্‌ঘাটন, সমুদ্র পথে বাষ্পীয় জাহাজের গতিবিধি, ও রেল-পথের সৃষ্টি; তা ছাড়া, জলসেকের জন্য ভারতে খালাদি খনন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দি হইল, এই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; অর্দ্ধ শতাব্দিপূর্ব্বে ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্যের গঠনকার্য্য শেষ হইয়া যায়, কেবল তখনও ব্রহ্মদেশটি উহাতে সংযোজিত হয় নাই।

বিজয়ের কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, এই বিশাল রাজ্য হইতে আর্থিক লভ্য নিষ্কর্ষণের (exploitation) চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইংরাজ-মূলধন চারিদিক্ হইতে আসিয়া পড়িল। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার সুব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিল এবং এই উদ্দেশেই রেল-পথের সূত্রপাৎ হইল। ২০ বৎসর পূর্ব্বে

M de Lanessan, ভবিষ্যদ্‌বাণীচ্ছলে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, এইবার চিরকালের মত দুর্ভিক্ষ-যুগের অবসান হইল। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন—আমি ভবিষ্যদ্ বক্তা হইতে চাহি না! Darmesteter বলেন ঃ—কোথাও যাইতে হইলে মোগল-সম্রাটের যে স্থলে তিন মাস লাগিত, সেই স্থলে এখন তিন দিন লাগে। এ কথা খুবই ঠিক্। Darmesteter লিখিয়াছেন,—তিনি ভারতে তিন্‌টি আশ্চর্য্য জিনিস দেখিয়াছেন,—রেল্‌-পথ, একটি চিত্ত বিমোহন যুবা পুরুষ, ইত্যাদি; এবং উহার প্রত্যেকটিতেই তিনি বিস্ময়-মুগ্ধ। আমি বলি, আর একটা কথা তিনি বলিতে ভুলিয়াছেন, সেটি এই ঃ—"বম্বের লাট রের সঙ্গে আমি খানা খাইয়াছি, ডেপুটি কমিশনারদিগের সহিত খানা খাইয়াছি এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছি।"

সর্ব্বপ্রথমে, কতকগুলি রেল-পথ স্থাপনের ভার, (বাণিজ্যিক ও সামরিক সুবিধার জন্য) কোন-কোন অসরকারী কোম্পানীর হস্তে অর্পিত হয়; উহা সরকারের আয়ত্তাধীন থাকিবে এবং সরকারই উহার প্রতিভূ থাকিবেন,—এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। সরকার প্রতিভূ না হইলে, মূলধন আইসে না। কিন্তু শীঘ্রই বুঝা গেল, এইরূপ প্রতিভূ-পদ্ধতিতে সরকারের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। সরকার, সুদের জন্য দায়ী—এই মনে করিয়া, কোম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্ত থাকে ও কোন প্রকার অপব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড-লরেন্‌স্ সরকারী ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে কতকগুলি রেল-পথ স্থাপন করিয়া লাভের উদ্দেশে উহা খাটাইতে লাগিলেন। এই অতীব প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য রেল-জাল, দশ হাজার মাইল পর্য্যন্ত [illegible] হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, ইহার দরুণ সরকারী বজেটের [illegible] বেশি চাপ পড়িল। অনেক সপ্তাহ ধরিয়া আমি এ[illegible] ভ্রমণ করিয়াছি; ভ্রমণ করিবার সময়

আমার এই আসনটুকুর জন্য, হিন্দু রায়তের গাঁট্ হইতে অন্ততঃ কতক "পাই" খরচ হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা কি চাহে এইসব রেল-পথ রহিত হইয়া যায়?—তাহা মনেও করিও না। শ্রেণীবদ্ধ-হস্তী-বাহনের স্থান রেল-গাড়ী অধিকার করিয়াছে—ইহার জন্য দুঃখ করা নিষ্ফল।

দেশের শিক্ষিত লোকেরা মনে করে, আর্থিক লভ্য হউক না হউক, এইরূপ দ্রুত-গতিবিধির সুবিধা হইতে, একটা খুব বড় উপকার হইয়াছে। এরূপ সুবিধা না থাকিলে, কোন প্রকার রাজ-নৈতিক কিংবা সামাজিক পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার দ্বারা দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতেছে না। তবে, রেল থাকাতে এই টুকু উপকার হইয়াছে, কোন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে খাদ্য-সামগ্রী সহজে ও সত্বর প্রেরিত হইতে পারে। অন্যান্য দেশের ন্যায়, এই বিস্তীর্ণ ভূমির এক প্রান্তর হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাও এখন সহজসাধ্য হইয়াছে। যাত্রামুখে এই রেল-গাড়ি, কতশত কৃত্রিম ও স্বাভাবিক বাধার বেড়া ভাঙ্গিয়া—কত কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিয়া অপ্রতিহত বেগে চলিয়াছে! উহা যেমন একদিকে, দূর-প্রদেশগুলিকে—বিভিন্ন জাতিদিগকে পরস্পরের নিকটে আনিয়াছে, তেমনি আবার, গাড়ির একই কাম্‌রার মধ্যে, বিভিন্ন বর্ণের লোকদিগকেও পরস্পরের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য করিয়াছে। জয় হোক্ তবে রেল-গাড়ির!—সেই একতার পথোদ্‌ঘাটক রেল-গাড়ি—যাহা মাদ্রাজের লোককে, লাহোরের লোককে, সভাসমিতিতে—কংগ্রেসে আনিয়া একত্র সমবেত করিতেছে এবং ভারতের ভবিষ্য মহাজাতির সংগঠনে কতকটা সহায়তা

নও, দেশীয়দিগের মুখপাত্রগণ এই রেল-পথ-স্থাপনের প্রতিবাদ করেন?

দেশীয়দিগের কথাগুলি খুব ঠিক্ না হইলে, একজন ইংরাজ রাজপুরুষ* কখনই তাহাদিগের সহিত সায় দিয়া এই সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করিতেন না। প্রথমে দেখ, রেল-হইতে যে লাভ হয় তাহার প্রায় অধিকাংশই ইংরাজ-ধনপতিদিগের হস্তে যায়। রেল-সংক্রান্ত মূল-উপকরণগুলি ইংরাজের খনি হইতে উৎপন্ন এবং তাহাদের কামার-কারখানা হইতেই সে সমস্ত প্রস্তুত হইয়া আইসে। এঞ্জিন্, গাড়ি, রেল, লোহার কড়ি—সমস্তই ইংলণ্ড হইতে আইসে এবং ইংরাজ কল্-মিস্ত্রীর দ্বারাই যথাস্থানে স্থাপিত হয়। রেলের এই সব কাজকর্ম্ম ইংরাজ-জাত-ভাইদিগের জন্যই সংরক্ষিত। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সাইগনে এইরূপ একটা গল্প শুনিয়াছিলাম ;—সেখানে, কোন সংকল্পিত রেল-লাইনের নক্সা, যে মুহূর্ত্তে কাগজে উঠে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই, সেই লাইনের মনোনীত ষ্টেশান-মাষ্টারগণ তাহাদের উর্দ্দি পোষাক পাইয়া থাকে এবং স্বকীয়-পদের নির্দ্দিষ্ট বেতনও সম্ভোগ করে। গল্প হইলেও ইহার মূলে কতকটা সত্য আছে...সাইগন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া যাক ; সেখানে রেল-পথ স্থাপনের সূত্রপাত হইতেই যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদের কথা ধরা যাউক...কর্ম্মকর্ত্তা ও কর্ম্মচারীগণ মোটা মোটা বেতন ভোগ করে ; সরকারি বজেটে যে টাকার অপ্রতুল হয় তাহা বজেট-হিসাবে গোঁজামিল দিয়া কোন প্রকারে সারিয়া লওয়া হয়। এ প্রক্রিয়াটি অতি চমৎকার। জাতভাইদিগকে কাজকর্ম্ম দিবার এই যে পদ্ধতি, ইহার আর তুলনা নাই। যাঁহারা এই পদ্ধতির প্রবর্ত্তক ও প্রতিভূ তাঁহাদিগকে ইহার জন্য বিলক্ষণ প্রশংসা করিতে হয়। টাকার কোন ঝুঁকি নাই, প্রভূত লাভের বিলক্ষণ প্রলোভন আছে,—এইরূপ স্থলে, লণ্ডন-বাজারে এই সকল রেলওএ-শেয়ারের মূল্য যে চড়িবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

* New India—Cotton.

কিন্তু এই ছবিটিতে একটি ছায়ার দিক্ আছে, এই ছায়াটি ক্রমশই বাড়িতেছে—এমন কি, বিশেষ ভাবনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।... রেলের মূল-উপকরণগুলি একেবারে লণ্ডন হইতে প্রস্তুত করিয়া আনা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই;—ইহা প্রায় অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান অবস্থায়, (একথা সমস্ত উপনিবেশ-রাজ্য সম্বন্ধেই খাটে)—দেশের লোক লভ্যের অংশ হইতে একেবারেই বঞ্চিত। তবে, একথা স্বীকার করিতে হইবে,—ভারতের স্বাভাবিক ভীরুতা, সাহসহীনতা ও কুসংস্কার প্রযুক্তই, ইংরাজেরা যদৃচ্ছাক্রমে অর্থশোষণ করিয়া নিজের উদরপূর্ত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহাই হউক, এক্ষণে ভারতের সমস্ত উদ্যম-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের;—ইংরাজের ধনে পরিপোষিত, ইংরাজের হস্তে পরিচালিত। ইংলণ্ড যাহা যোগাইতে পারে না, কেবল তাহাই ইংলণ্ড ভারতের নিকট চাহিয়া থাকে;—অর্থাৎ কুলি ও মজুর-মিস্ত্রি। আমার মনে হয়,—আসলে রাজনীতিসম্মত কাজ হইত (ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত থাকা যদি রাজনীতির কাজ হয়) যদি ইংলণ্ড এই সকল লাভজনক অনুষ্ঠানে ভারতকে স্বকীয় অংশভাগী করিয়া লইতেন। এস্থলে মানবহিতৈষিতার কথা আসিতেছে না,—এইরূপ করিলে অন্ততঃ ইঙ্গ-ভারতীয় সাম্রাজ্য আরো দৃঢ়পত্তন ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে আমি শুধু এই কথা বলিতেছি। বিদেশী ভারত-পর্য্যটকগণ ভারতে যে অর্থ ব্যয় করে, অথবা ভারতীয় পণ্য হইতে যে লাভ হয়, আসলে তাহা দেশীয়দিগের হস্তে যায় না,—উহা ইংরাজ-ধনপতিদিগের হস্তে—এঞ্জিনিয়ারদের হস্তে—য়ুরোপীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের হস্তে আসিয়া পৌছে। কেরাণীরা যে অল্প বেতন পায়, দৈনিক হিসাবে প্রত্যেক কুলিকে যে দুই আনা দিতে হয়, শুধু তাহাই এই নিয়মে ব্যতিক্রমস্থল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যদি ভাবিয়া দেখা যা পণ্যাদিবহনেরযে সকল প্রাচীন পন্থা ছিল, সেগুলি নব-প্রবর্ত্তি

প্রচলনে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই রেল-স্থাপন কার্য্যটি এমন একটি অর্থ-শোষণের ব্যাপার—যাহা হইতে পূর্ব্বেকার ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হয় না। একথা আমি জানি—ভারতই এক মাত্র দেশ নহে যেখানে রেল-পথাদি বিদেশীয় মূলধনে—বিদেশীয় উপকরণে নির্ম্মিত। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের কথা—অমুক অমুক য়ুরোপীয় জাতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতই একমাত্র দেশ (হিন্দ-চীনেও শীঘ্রই এইরূপ হইবে) যেখানে এই কার্য্য-সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম্মচারীই বিদেশী। ইহার সমস্ত লভ্য—বেতনের আকারে, বিদেশীয়দিগের "পকেটেই" যায়। ভারতের বিভিন্ন জাতি, প্রায় উহার কিছুই পায় না। স্বকীয় লভ্যাংশ হইতে যুক্ত-রাজ্যের লোকেরা সরকারী রেল ক্রয় করিয়া লইয়াছে। ভারত-বাসীগণ সরকারী রেল কবে ক্রয় করিবে ?

এখনও আমার সব কথা শেষ হয় নাই। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরকারী তহবিল হইতেই—প্রজাবর্গের অর্থ হইতেই—গোড়ায় রেল-স্থাপনের (সমস্ত না হউক অংশতঃ) ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার, রেল-কার্য্যের লভ্যাংশ ও প্রতিভূ-স্বীকৃত সুদ—এই উভয়ের মধ্যে হিসাব করিয়া যে ক্ষতি দাঁড়াইয়াছে, সেই ক্ষতির অঙ্কও সেই প্রাথমিক ব্যয়ের হিসাবে সংযোজিত হইয়াছে। আর এক কথা,—শুধু দেশীয় মালের ভাড়ার দ্বারা ও দেশীয় আরোহীদিগের টিকিট-মূল্যে দ্বারাই রেলের লভ্য পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে, দুই দি দিয়া, দেশীয়দিগের অর্থব্যয় করিতে হয়। তাহার পরিবর্ত্তে উহ পায় কি ?...ভারত কেবল খরচই করে—পায় না কিছু ;—ইহা ভারতের আরও দুর্ভাগ্য ..প্রতিভূর দায়িত্বাধীন উচ্চহারের সুদ অ পাইবে ভাবিয়া কোম্পানীরা বেশ নিশ্চিন্ত ;—সুতরাং তাহ খরচ-কমাইবার ব্যক্তিগত চেষ্টা ও যত্ন কিছু মাত্র থাকে

কটন্ বলেন ;—"ভারত যেরূপ দরিদ্র তাহাতে এরূপ ব্যয়সাধ্য রেল-প্রণালীর ও খাল-প্রণালীর ব্যয় নির্ব্বাহ করা ভারতের পক্ষে সুকঠিন। তাই ভারত, ইংলণ্ডের নিকট টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়। এই ঋণ ক্রমশই জমিয়া যাইতেছে ; এবং ঘটনাচক্রে ও দুর্ভাগ্যক্রমে সুদের হারও বাড়িয়া যাইতেছে"। আরও তিনি বলেন ;—রেল-স্থাপন-কার্য্য—ব্যবসার হিসাবে সফল হওয়া দূরে থাক, প্রত্যুত ইহার দরুণ, ভারতের উপর ৪৭,০০০০০০ পৌণ্ড ঋণ চাপিয়া গিয়াছে। হরেশ বেল (Horace Bell) তাঁহার (Railway Policy in India) গ্রন্থে বলেন, টাকার ঘাটতিই এই নিষ্ফলতার হেতু। তিনি বলেন ;—"টাকার ঘাটতির দরুণই প্রতিভূ-রক্ষিত ও অর্থসাহায্যগ্রাহী কোম্পানিদিগের সংগৃহীত মূল-ধনের সুদস্বরূপ—ভারত হইতে প্রভূত অর্থ ইংলণ্ডে পাঠাইতে হয়।" তিনি প্রতিভূ রক্ষিত ও অর্থসাহায্যগ্রাহী কোম্পানীদিগের অসংযত অপব্যয়ের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। উহা হইতেই ভারত-বজেটের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কিন্তু কে বলিতে পারে, ভারতের এই অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে, কত দিক্ দিয়া, আরো কত অপ্রত্যাশিত খরচ হইয়া যায়। ভারতের এই ঐন্দ্রজালিক থলেটি, আপন ইচ্ছামত কখন পূর্ণ হয়, কখন শূন্য হয়—তাহাতে কাহার কোন প্রতিবাদ নাই, কোন বাদবিসম্বাদ নাই। কারণ, থলিয়া-মুখের রসিটি যাহাদের হাতে আছে, খরচের ভার, তাহাদের হাতে নাই।

হরেশ-বেল্-প্রণীত গ্রন্থের উপসংহার হইতে অনেক কথার আভাস ...ত পাওয়া যায়। তিনি বলেন ইংরাজ কারখানাওয়ালা ও ইংরাজ ...জপুরুষগণ ভারতের যেন একটি "সংরক্ষিত মৃগয়া-ভূমি"। উহারা ...ন নূতন রেল-পথ ক্রমাগত নির্ম্মাণ করিতে চাহে ; কেননা ...দের মালাদি বহনের পক্ষে ইহা বড়ই সুবিধাজনক ; কিন্তু তাহাতে ...শের আসলে কোন লভ্য নাই। এইরূপে, যে রেল-পথের দ্বারা

দেশের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবার কথা, আসলে তাহার দ্বারাই উন্নতির বাধা হইতেছে। রেল-জালে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। সম্মুখে ইংরাজ কারখানাওয়ালা গট্ হইয়া বসিয়া আছেন। এই দ্রুতগতি ও দূরস্পর্শী পন্থাগুলির প্রভাবে ভারতের দূরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত—সমস্তই ইংরাজি পণ্যদ্রব্যে প্লাবিত এবং সেই সকল দ্রব্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় ব্যবসাগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হায়! এই লজ্জা-আবরণহীন স্বার্থ-সর্ব্বস্ব কেজো যুগে, দুর্ব্বলজাতি হওয়া বড়ই বিপদজনক! এই সকল লভ্যজনক অনুষ্ঠান হইতে, ভারতের হিত হওয়া দূরে থাকুক—প্রত্যুত অনিষ্টই হইতেছে;—ভারত নির্দ্দয়রূপে লুণ্ঠিত ও শোষিত হইতেছে। যদি কল্পনা কর,—এই প্রত্যেক রেল-লাইনরূপ শোষণ-চোংএর মুখ, প্রত্যেক স্বর্ণ-খনির মধ্যে—প্রত্যেক আয়ের ঘরে বসান হইয়াছে, তাহা হইলে কতকটা অনুমান করিতে পারিবে, এই অতিপ্রশংসিত * লোহজাল হইতে, ভারতের কিরূপ লাভ হইতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* আমাদের কবি তাই বলিয়াছেন :—

"পর-হাতে দিয়ে, ধন-রত্ন সুখে,

বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।"—অনুবাদক।

রমণীর স্বদেশব্রত।

গত ৩০শে আশ্বিন তারিখে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মুল মন্ত্র 'স্বদেশ সেবা' আর তাহার অভূতপূর্ব্বত্ব—'কার্য্যতৎপরতা,' সকলেই কিছু করিতে ব্যস্ত। দাসদাসী পরিবেষ্টিত ধনী, সুখশয্যা ছাড়িয়া দেশের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন—মাতার কোল ছাড়িয়া শিশু তাহাতে যোগ দিতেছে। দরিদ্র আসিয়া তাহার যথাসামর্থ্য জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান করিয়া প্রসন্নমুখে গৃহে ফিরিতেছে। সকলে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সভা-সমিতি করিয়া বক্তৃতা, গান, উপদেশ দ্বারা সাধারণকে এই স্বদেশব্রতে দীক্ষিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমাদের দীর্ঘ ঘুমের পর এই নবজাগরণ, আমাদের দেহে নবশক্তি আনয়ন করিয়াছে। এক কথায়, কোন-না-কোন-রূপে সকলে মাতৃসেবা করিতেছেন। দীর্ঘ-অন্ধতায় আমরা মায়ের যে দুর্দ্দশা করিয়াছি আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে লালায়িত। আজ শুধু স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা লইয়া লোকে বসিয়া নাই, সকলেই কাজ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু এই যে সব কাজের উল্লেখ করা গেল তাহা অবশ্য পুরুষেরাই করিতেছেন—আর রমণীগণ কি করিতেছেন? বিলাতী বস্ত্র পরিহার করিয়া পুরুষের সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিক কি আর কিছু করিবার নাই? তাঁহাদের রাজ্য অন্তঃপুরে, গৃহধর্ম্মে কি তাহাদের কিছু করিবার নাই? আছে, এবং জানি যে অনেকে তাহা করিতেছেন। অন্তঃপুরের সংবাদ বাহিরে আসেনা আর না আসাই ভাল। রমণী নীরবেই আপনার কার্য্য করিবেন কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ নিয়ম। অরক্ষণীয়া কন্যার অকালেও বিবাহের বিধি আছে। ছেলেদের পাঠে মনোনিবেশ করা উচিত—

এবিষয়ে কাহারো মতদ্বৈধ না থাকিলেও দেশের এই বিশেষ মুহূর্ত্তে যে সে নিয়ম অকাট্য নয় তাহাতেও সকলে একমত। সেই নিয়মে, রমণীর অন্তঃপুরে কি ঘটিতেছে তাহাও আজ প্রকাশ্যে আলোচনা করা যাইতে পারে। কারণ, তাহা জানিলে অন্য রমণীগণও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

বিলাতী বস্ত্র যথাসাধ্য বর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কয়েকটী রমণী ৩০শে আশ্বিন হইতে আরও ২।১টী বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী শিল্পের সহিত জড়িত। যাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা প্রতিদিন চরকায় কিছু পরিমাণে সুতা কাটিয়া, আগামী পূজার আগে, অন্ততঃ একখানি সাড়ীর পরিমাণ সুতা কাটিয়া, তাহার দ্বারা সাড়ী তৈয়ারি করাইয়া সেই সাড়ী পরিয়া দেবতা প্রণামে যাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।—এই সাড়ী যে তাঁহাদের অঙ্গকে গৌরবান্বিত করিবে, এই মোটা কাপড়ের মূল্য যে অনেক চেলি, বারাণসী অপেক্ষা অধিক তাহা কি বলিতে হইবে? ভগিনীগণ! তোমরা সকলে কি এই অপরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া পতিপুত্রের চক্ষু সার্থক করিবে না?

আর কয়েক জন রমণী একটী ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার নাম "মায়ের কৌটা" রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে করিবার আর কিছু নাই, কেবল অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ। তাঁহারা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে জননী জন্মভূমির উদ্দেশে একটী মৃৎ-পাত্র বা যে কোন পাত্র স্থাপন করিয়া প্রতিদিন তাহাতে অন্ততঃ পক্ষে একমুষ্টি চাউল রাখিয়া দিবেন। এটী এমনই সহজ যে কাহারও পক্ষে এ ব্রত গ্রহণ করিতে বাধা হইবে না। ঘরে ঘরে সকলে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ইহাতে যে শুধু দেশের জন্য দান করা হইবে তাহা নহে—ইহাতে রমণীর আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য—সন্তান শিক্ষার সহায়তা করিবে। মাতা যদি তাঁহার শিশুসন্তানকে শিক্ষা দেন

যে, প্রভাতে সর্ব্বপ্রথমে দেবতাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে এই জন্মভূমির উদ্দেশে রক্ষিত পাত্রে একমুঠা চাউল অর্পণ করিয়া তবে অন্য কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তাহার মনে ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তি উভয় বীজই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর আমাদের দেশে এই শিক্ষা বিশেষরূপে হওয়া আবশ্যক। অপর দেশে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম ও স্বদেশভক্তিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে যে শুধু তাহা হয় না তাহা নহে, বরং তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বদেশভক্ত পরিবারে জন্মিয়া শিশু যদি মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-প্রীতি পান করে, আপনার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে জননী জন্মভূমিকে চেনে, আপনার ভাইবোনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাইবোনকে ভালবাসিতে শেখে তবে সে কখন স্বদেশকে বিস্মৃত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট হাজার শিক্ষার জাঁতায় পিষিয়া—শিশুদের ব্ল্যাকি, লংম্যান ও ম্যাক্‌মিলিয়ানের হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স্কগণকে Lee Warner পড়াইয়াও তাহাদের হৃদয় হইতে স্বদেশপ্রেম দূর করিতে পারিবেন না। আজ যে বহু পুণ্যের ফলে এই স্বদেশপ্রীতির বন্যা আমাদের উপস্থিত শুষ্ক হৃদয়কে ভাসাইয়া সবল করিয়া যাইতেছে, এ দৈব ঘটনা। এ সব সময় ঘটে না। কিন্তু তটিনী তাহার কোলের জমিটী চিরকালই শ্যামল রাখে। বাল্যশিক্ষার ফলও জীবনকে চিরকাল পরিচালিত করে। মাতা যদি শিশুর মনে এ বীজের অঙ্কুর স্থাপন করেন আর গৃহে যদি তাহা পোষিত হয় তবে সহস্র প্রতিকূল অবস্থাতেও তাহার মন বিচলিত হইবে না, বরঞ্চ বাধার আঘাতে তাহাকে নূতন শক্তিশালী করিবে। সেই জন্যই বলিতেছি, এ শিক্ষা আমাদের ঘরে হওয়া উচিত, আর এই "মায়ের কৌটা" ব্রত গ্রহণে তাহার সহায়তা হইবে। জ্ঞানোদয় হইবার পূর্ব্বেই শিশু এই পারিবারিক অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল তাঁহারা প্রত্যেক বালক-বালিকার দ্বারা একমুঠা চাউল

দেওয়াইতে পারেন। যাঁহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে তাঁহারা স্বজনগণের মধ্যে পালা করিয়া তাহা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা দ্বারা পুরস্কার ও শাসনের বিধিও করা যাইতে পারে। ছেলেমেয়ে কোন ভাল কাজ করিলে মা-বাপ যদি তাহাকে কিছু অর্থ পুরস্কার দেন আর সেই পুরস্কার বা তাহার অংশ হইতে কিছু এই পাত্রে অর্পণ করিতে শিক্ষা দেন তবে দেশের সেবা করিয়া আমরা নিজেই যে কৃতার্থ হই তাহা সহজে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। ছেলে কোন মন্দ কাজ করিলে, তাহার একটা শাস্তি হইবে, সেদিন সে মায়ের কৌটায় কিছু দিতে পারিবে না। পশ্চিমের কোনো একটা মফঃস্বল-সহরে আমাদের এই প্রস্তাবমত অনুষ্ঠানের কিরূপ সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত একটী পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন।

"এখানে অনেক বাঙ্গালী মেয়ে আছেন। আমাদের মনে হইল ইহাদের সঙ্গে দেখা শুনা কথাবার্ত্তা হইলে শুভ ফল হইতে পারে। অনেকেই স্বদেশব্রতগ্রহণ করিতে পারেন।——ব-দিদির সহিত এখানকার অনেকেরই আলাপ পরিচয় আছে। আমাদের অনুরোধে তিনি নিজে পাড়ায় পাড়ায় গিয়া অনেককে তাঁহার বাড়ীতে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। সে দিন বিকাল বেলায় আমরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইলাম। তাঁহার বাটী গিয়া দেখিলাম, তাঁহার ঘরের আয়তন যত তাহার চেয়ে নিমন্ত্রণ অনেক বেশি হইয়া পড়িয়াছে তবু এই অসুবিধা সত্বেও ব-দিদির উৎসাহে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিলাম। বলা বাহুল্য আমরা আসিতে না আসিতে গান গাইতে অনুরুদ্ধ হইলাম; পুরুষের মজলিসে চাপান আছে, গম্ভীর আলোচনা আছে, চুটকী গল্প আছে, গান তাহার আনুষঙ্গিক একটী আমোদ মাত্র। কিন্তু এরূপ মেয়ে-মজলিসে গান আমোদনামের বাচ্য নহে। ইহা প্রীতিমিলনের সর্ব্ব প্রধান উপায়

ও অঙ্গ। শুনিলাম প্রধানতঃ এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে এত মেয়ের সমাগম। প্রথম গান হইল "বন্দে মাতরং" এবং এই গান হইতেই স্বদেশী বিষয়ে কথা পাড়িবার সূত্রপাত হইল। দেশের মঙ্গলের জন্য পুরুষেরা যে দিকে অগ্রসর হইয়াছেন আমাদেরও সেই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত,—সংক্ষেপে আমরা এই বিষয়টী তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম। ইহাতে তাঁহারা সকলেঃ প্রায় এক বাক্যে বলিলেন, 'এতে কি আমাদের কারও অমত হতে পারে, আমাদের পুরুষরা যা করছেন আমাদেরও তাই করা চাই।'

সত্যই সকলে কার্য্যত তাহা করেন। বিলাতি লবন, বিলাতি চিনি খান না, বিলাতি শাড়ী পরেন না কিন্তু অনেকে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝেন না, বাবুরা যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করিয়া চলেন মাত্র। সেখানেই তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেখিলাম। "একজন আর একজনের একটি জামার লেস দেখিয়া দরদাম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, জানিয়া কি ফল? আপনিত আর এ কিনতে পারছেন না, এ বিলাতী,—বাবু (তাঁর স্বামী) যে স্বদেশী হয়েছেন, তিনি কি আপনাকে আনতে দেবেন?"

উত্তর হইল, বাবুকে জানাইবনা, আমার ছেলেকে বলিব চুপি চুপি আনাইবে।"

আমরা তখন বিদেশী দ্রব্য না কিনিবার শুভ ফল কি, তাহাতে দেশের কিরূপ মঙ্গল হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম।—বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্তা রমণী লেস ক্রয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। খুব উৎসাহের স্রোত বহিলে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মায়ের কাজ করা সকলেরি কর্ত্তব্য। তখন এই গানটী গাওয়া হইল।

কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে কি পুলকে প্রাণ ছায়।
ফুটিল যে আজি অন্ধ নয়ন সমুখে নেহারি কায়॥ ইত্যাদি—

ইহার পর শ্রীমতী ল— একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

আমাদের ব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় কোন্ জিনিস কোথায় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তাহাই লেখা লইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর, রবি বাবুর একটী জাতীয় সঙ্গীত হইল। তাহার পর, মহিলারা স্বদেশব্রত গ্রহণ করিলেন। আমরা আগে হইতেই কতকগুলি টুকরা কাগজে "মায়ের কৌটা" লিখিয়া সেই কাগজগুলি স্থানীয় নির্ম্মিত একটী সুন্দর ছোট টুকরীতে করিয়া আনিয়াছিলাম। টুকরীটী তাঁহাদের নিকট ধরিয়া বলিলাম, 'সাধারণতঃ লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফুল, আতর দিয়া আদর করে, আজ আমরা আপনাদের সম্মানার্থে এই প্রতিজ্ঞাপত্র উপহার ধরিতেছি। যিনি আজ হইতে স্বদেশব্রত গ্রহণ করিবেন, তিনি একখানি কাগজ তুলিয়া লউন। এই কাগজখানি তিনি বাড়ী গিয়া একটি পাত্রে তুলিয়া রাখিবেন সে পাত্রটিকে মায়ের কৌটা নাম দিবেন প্রতিদিন ভাঁড়ার দিবার সময় সেই পাত্রে একটী-দুইটী পয়সা বা দু এক মুষ্টি চাল রাখিয়া দিবেন এবং এইরূপে সঞ্চিত দান ১লা বৈশাখে বা বিজয়াদশমীর দিন বা মাসে মাসে জননী জন্মভূমির পূজায় জন্য দান করিবেন, আর প্রতি ব্রতধারিণীর আরও একটী মহিলাকে এই ব্রতধারণ করাইতে হইবে।'

কাগজ সকলেই উঠাইয়া লইলেন, কেহ কেহ আমার কথা শুনিতে পান নাই, তাঁহাদিগকে আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। অ—বাবুর মা তখনি সে টুকরীতে একটী টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভাণ্ডার ত অনেক পরে সংগ্রহ হইবে, আজ এই যে শুভ মুহূর্ত্তের, শুভ সম্মিলন, এই আনন্দের দিনে কি কিছু দানসংগ্রহ করিলে ভাল হয় না? পারিবারিক মায়ের কৌটা আমরা গৃহে গিয়া স্থাপন করিব। এই টুকরীটী, যাহা হইতে আমরা স্বদেশব্রত গ্রহণ করিলাম, এই সহরের মায়ের কৌটা হউক। যাঁহাদের কাছে টাকা

ব-দিদির বিশেষ বন্ধুরা তাঁহার নিকট হইতে ধার করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ত্রিশ টাকা টুকরীতে জমা হইল। ব্রত গ্রহণের পর আরও দুই একটী গান হইল। অবশেষে ক—বাবুর দুই কন্যা, যোগীন বাবুর ভারতবর্ষের মানচিত্র অভিনয় করিয়া মুখস্থ পাঠ করিলেন। বড় ভগিনী হইলেন গুরু, ছোট শিষ্য। গুরু, শিষ্যকে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাইয়া তাহার কীর্ত্তিস্থলগুলির নির্দ্দেশ করিয়া ভারতের গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন—সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হইল, আমরা আশাতীত আনন্দ লইয়া গৃহাগমন করিলাম। শুনিলাম কেবল আমরা নহি, সকল মহিলাই আমাদের মত আনন্দলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট সভার গল্প শুনিয়া যাঁহারা আসিতে পারেন নাই তাঁহারা খুব আপশোষ করিতেছেন। কিন্তু এখানেই ইহার শেষ হইল না। সেদিন যে রমণীগণ সঙ্গে টাকা না থাকায় টাকা দিতে পারেন নাই তাঁহারা টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপ ৬।৭ দিনে আর কিছু অর্থ অযাচিত ভাবে সংগৃহীত হইল। তাহার দ্বারা দুটী তাঁত কেনা হইয়াছে। এখান হইতে দুইজন ভদ্র যুবক কলিকাতায় তাঁত শিক্ষা করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, এখানে একটী তাঁতশিক্ষালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় তাঁতি, জোলাদের এই তাঁতে শিক্ষা দিবেন। আর শিল্পসমিতির সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ লোক দ্বারা গৃহে গৃহে মাসান্তে লোক পাঠাইয়া মায়ের কৌটার সঞ্চয় আদায় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই মাসিক সংগ্রহে শিল্পবিদ্যালয়ের কতকটা খরচ চলিবে।”

আমাদের ইচ্ছা বঙ্গের ঘরে ঘরে এই ব্রত গ্রহীত হউক। শুনা যায় অতীতকালে ভারত মহিলাগণ, নিজ অলঙ্কার মোচন করিয়া দেশের কার্য্যে সমর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গরমণীর নাম ব্রতপালনের জন্য বিখ্যাত। আজ যদি তাঁহারা এই কষ্টশূন্য ব্রতপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হ’ন, জননী

জন্মভূমির পূজার জন্য এই যৎসামান্য দানে কুণ্ঠিত হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের লজ্জার সীমাপরিসীমা থাকিবে না। তাহা হইলে জননীর অভিশাপে আমাদের দেশ চির অভিশপ্ত হইয়া থাকিবে।

রমণীগণ ঘরে ঘরে যদি এই মায়ের কৌটা স্থাপন করেন, তবে দ্রৌপদীর হাঁড়ি যেমন কখনও শূন্য হইত না, একটী শাকান্ন হইতে সহস্র লোককে খাওয়াইতে পারিতেন, তেমনি আমাদের গৃহলক্ষ্মীর একমুঠা চাউলে দেশের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে। যুবকগণ! তোমাদের সাহায্য ভিন্ন কোন কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। তোমরা ঘরে ঘরে যাইয়া মাতৃগণকে ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া মায়ের কৌটা প্রতিষ্ঠা করিয়া আইস।

এই সঞ্চয়, স্থানীয় শিল্পোন্নতির সাহায্যার্থ কিংবা তাহার সুবিধা না থাকিলে জাতীয় ধন-ভাণ্ডারে অথবা মহিলা শিল্পসমিতিতে পাঠান যাইতে পারে। জাতীয় ধন-ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য সকলে অবগত আছেন, মহিলা শিল্পসমিতির উদ্দেশ্য বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

মহানাটক।

সপ্তম অঙ্ক।

রাম।—(সুগ্রীবের প্রতি)

লঙ্কাগমনের যোগ্য, সুবিদ্বান্, রাজবংশধর,
হেন বীর মহাবল আছে কেবা কহ কপীশ্বর।

সুগ্রীব। রাজকুল-সমুৎপন্ন নাহি কোন ভূপতি বা শূর ;
রাজপুত্রগুণযুক্ত মোর ভ্রাতুষ্পুত্র সুচতুর॥

সাগর লঙ্ঘন করি, সেনা করি' সন্নিবেশ,
বসি' রাম সুবেলাদ্রি-পাশে,
ইন্দ্র-পৌত্র অঙ্গদেরে দৌত্যকার্য্য আদেশিয়া
পাঠাইলা রাবণ-সকাশে॥

অঙ্গদ সে প্রথমেই প্রবেশিয়া পুরী
জলদ-গম্ভীর-ঘোষে পদাঘাত করি'
ভাঙ্গিল সে অভ্রভেদী রাবণ-প্রাসাদ ;
শুনি' অকস্মাৎ এই ভীষণ নিনাদ,
দশগ্রীব উদ্গ্রীব ভয়ে সচকিত,
বাহিরিয়া দ্বারে আসি' কহিল কিঞ্চিৎ।
দূত সে অঙ্গদ, তারে করি' সম্বোধন
জিজ্ঞাসয়ে তার কাছে সব বিবরণ॥

অঙ্গদ। বল্‌রে রাক্ষস তোরা সবে,
যে রক্ষের নাম দশানন,
রাঘবের সীতা রত্ন হরি'
কোথা সে করিল পলায়ন ?

ত্রৈলোক্য-দহন-কারী শরাগ্র-শিখার-মত
করাল যে রাম
—সেই উগ্র দাবানলে রাবণ হইবে দগ্ধ
পতঙ্গ-সমান॥

রাক্ষসগণ। যেও না, দাঁড়াও হেথা,—যাও তুমি পুরীর বাহিরে,
ক্ষণেক অপেক্ষা কর　যাবৎ না আসি আমি ফিরে
লয়ে রাবণের আজ্ঞা;　পাবে যেতে হইলে আদেশ।

অঙ্গদ। কোথায় যাইতে পাব?

রাক্ষসগণ।　যেথায় আছেন লঙ্কেশ;
—যার ভুজ-পরাক্রমে　ত্রিভুবন ভয়ে সচকিত;
কে রক্ষিবে,—মৃগ-সম　সিংহ-অঙ্কে হলে নিপতিত।

(রক্ষকুল-ধূমকেতু অঙ্গদ সগর্ব্বে রাবণের-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে পর)

রাবণ। কে তুমি?

অঙ্গদ। বালীর-পুত্র—রঘুপতি শ্রীরামের দূত।

রাবণ। কেবা বালী কহ কপি—কেবা সেই রাম রঘুসুত?

অঙ্গদ। বালীকে চেননা তুমি?　এ বিস্মৃতি তব সমুচিত;
—পুচ্ছ-প্রান্তে হয়ে বদ্ধ　ছিলে তুমি তখন মূর্চ্ছিত।
কেমনে ভুলিলে রামে?—সূর্প-নখা তোমার ভগিনী,
—তার নাসাচ্ছেদে, তব　দর্প চূর্ণ করিলেন যিনি।

রাবণ। কে তুই?—কাহার পুত্র?—দূতরূপে কে পাঠালে তোরে?
দেবের বিজয়ী আমি—　তৃণজ্ঞান করিস্ আমারে?

অঙ্গদ। পৌলস্ত্যনন্দন! আমি　পুত্র তার—যে তব বিজেতা;
"সুবল"-পর্ব্বত হতে　— রামদূত আসিয়াছে হেথা।
এ দুয়ের এক—মূঢ়!—　কর্‌রে এখন;
—হয় সীতা-ত্যাগ, নয়　প্রাণ বিসর্জ্জন॥
এক শরে সপ্ততাল　ভেদিল যে জন,
প্রসিদ্ধ সে হরধনু　করিল ভঞ্জন,
মোর পিতা বালীরে যে　করিলা বিনাশ
ওহে রক্ষপতি! জেনো　তাঁরি আমি দাস;
যাঁর পাদপদ্ম-চ্যুত　পরাগে নির্ম্মাণ
অঙ্গদ-ভূষণ মোর;　—সেই নামে নাম॥

রাবণ। কোথায় থাকে সে রাম ? যমালয়-সমর-অঙ্গনে
মৃত্যু যাচে সে দুর্ম্মতি নিজ দারা পুনরুদ্ধারণে ?
বহ্নি-ত্রস্ত, ইন্দ্র-দর্প সর্পহন্তা গরুড়ের প্রায়
দারাসক্ত সেই রাম —বনবাসী, সুগ্রীব-সহায়—
আমার সে শরাঘাতে হত হবে কহিনু তোমায়॥

রাবণ। কে রাম ?

অঙ্গদ। —পরশুরামে জিনিল যে বীর।

রাবণ। কেবা সে পরশুরাম ?

অঙ্গদ। ক্ষত্রিয়-রুধির
লিখিল যাঁহার সেই জেতৃখ্যাতি-পত্র ;
কেনা জানে তাঁর কথা— বিদিত সর্ব্বত্র।
সেই সে পরশুরাম— কার্ত্তবীর্য্য-নৃপাদি যে নাশে।

রাবণ। কেবা সেই কার্ত্তবীর্য্য ?

অঙ্গদ। যাহা হতে ক্রূর কারাবাসে
ছিলে বদ্ধ বহুদিন ;—তাহা কি স্মরণে নাহি আসে ?

রাবণ। অরণ্য-পতির পুত্র ! কে তুমি, কহিছ এই মত ?
জান নাকি, ইন্দ্র-আদি মম গৃহে দাসত্বে নিরত ?
কি করিবে সেই রাম—কপীন্দ্র শিশুগণ
যাহার সহায় ;
—সিন্ধু লঙ্ঘি' আসে যদি মম দর্পানলে হবে
পতঙ্গের প্রায়।

অঙ্গদ। শুনেছি রাবণ ওরে ! আছে ভবে অনেক রাবণ,
জানি, এক রাবণেরে কার্ত্তবীর্য্য করিল দলন ;
আরো এক রাবণেরে বলি-নৃপতির শত দাসী
গিলিল অন্নের মত নর্ত্তন-কৌতুক পরকাশি' ;
অপর রাবণ এক মোর পিতৃকক্ষ হতে
পড়িল গলিয়া ;
এ সব রাবণ-মাঝে কে তুই আমায় বল্
নিশ্চয় করিয়া।

রাবণ। ওরে রে বানর শিশু! বড় হৃষ্ট পুষ্ট দেখি
তোরে ঘেরে আমার সম্মুখে!
কর্ণ তোর কলুষিত রোমাবলী-আবরণে;
শুনিস্‌নি তাই কারো মুখে
—আমা-সম তুল্য বল নাহি কেহ দেব-মাঝে;
শত্রুগণে জিনিয়া সংগ্রামে,
স্ববল রক্ষণ করি' পরবল করি নাশ,
খ্যাত আমি রাবণের নামে।

অঙ্গদ। স্ব-কক্ষে লইয়া তোরে —কপিবংশচূড়ামণি
বালি নামে বলী,
সপ্তসিন্ধুতীর ভ্রমি', সন্ধ্যা ধ্যান অর্চ্চনাদি
করিল সকলি।
কক্ষেতে লইয়া তোরে না পারিল লজ্জাবশে
কপি-মাঝে করিতে প্রবেশ;
তাই ছাড়ি দিয়া, তোরে পাঠাইলা নিজ পুরী;
—বৃথা গর্ব্ব ত্যজহ লঙ্কেশ!

রাবণ। যার বলে উৎপাটিত উত্তুঙ্গ কৈলাস-গিরি
—এই মোর সেই বাহুদ্বয়;
এই সেই দশমুখ —দশদিকে যাহা খ্যাত,
—সেই বীর্য্য মহিমা অক্ষয়।
একে-ত তাপস রিপু, কুপিত সে হইয়াছে তায়,
তাহে পুন কপি দূত,—শোচনীয় দশা অতিশয়!

অঙ্গদ। প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড যার দক্ষ-বীর-বিনাশ ক্রিয়ায়,
সেই কার্ত্তবীর্য্য-বাহু সহস্র, যে ছেদিল হেলায়,
—সেই সে পরশুরাম; তার গর্ব্ব খর্ব্বিল যে রাম
সে রামের দূত আমি —কুমার অঙ্গদ মোর নাম।

রাবণ। ভ্রাতা মোর কুম্ভকর্ণ— সমস্ত অরাতিদের
কালান্তক যম;

মেঘনাদ পুত্র মোর— হাসিমুখে বাসবে যে
করিল বন্ধন ;
খড়্গ মোর "চন্দ্রহাস" ; সহায় যাহার রণে
শূর রক্ষগণ,
আমি সেই দেব-শত্রু, ত্রিভুবন জয়ী রাজা
প্রখ্যাত রাবণ।

অঙ্গদ। ওরেরে রাবণ শোন্! কার্ত্তবীর্য্য করে খর্ব্ব
তোর অহঙ্কার ;
সেই কার্ত্তবীর্য্য-বাহু ছেদিল পরশুরাম
হানিয়া কুঠার ;

সে পরশুরাম-জেতা যাবৎ না রাম
করেন ক্ষেপণ তাঁর কালান্তক বাণ,
তাবৎ সীতারে তুই করি সমর্পণ
সন্তান সন্ততি নিজ করহ রক্ষণ।

রাবণ। কি করিল রাম তোর ?
অঙ্গদ। অরাতি বিজয়।
রাবণ। কে সেই অরাতি তার ?
অঙ্গদ। বালী মহাশয়।
রাবণ। কেবা সেই ক্ষুদ্র বালী ?
অঙ্গদ। নাহি চেনো তাঁয় ?
রাবণ। শাখামৃগে চেনে কেবা ?
অঙ্গদ। কি বিস্মৃতি হায়!
—পর্য্যঙ্কে বাঁধে'যে তোমা লেজের আগায়।

রাবণ। সেই তোর পিতা বালি বীর মাঝে গণিত কি হয় ?
—সে-ত বস্তুদের পতি, আর তুই শিশু বৈত নয়।
কি অলৌকিক কাজ করিল সে রাম
গাহিস্ যাহার যশ তুই অবিরাম।

অঙ্গদ । সেই তব ভগিনীর নাসার বসায়
পঙ্কিল যাঁহার খড়্গ চিনিস্ না ওঁয় ?
দূষণ-ত্রিশিরাদির শিরোরক্তে যাহার কৃপাণ
পরে হয় প্রক্ষালিত—ওরে রক্ষ !—তিনি সেই রাম।
বন্ধন করিয়া তোরে, চতুঃ সিন্ধু করায়ে ভ্রমণ
সন্ধ্যা-অর্চ্চনাদি যিনি সমস্ত করেন সমাপন,
—কেমনে ভুলিলি সেই বালি-রাজে, নিলর্জ্জ রাবণ ?

রাবণ । রে নির্ল্লজ্জ কপি-শিশু ! যে রাম পিতারে তোর
বিনাদোষে করিল নিধন,
দ্বেষহীন দাসবৎ ভ্রমিয়া তাহার কাজে
কেমনেরে করিস্ গর্জ্জন ?
একদা পিতারে যার প্রসন্ন হইয়া আমি
মৈত্রী মোর করিলাম দান,
তার পুত্র-পরে এবে সমুচিত দণ্ড বল্
কি করিয়া করিব বিধান ?

অঙ্গদ । সুনীতির শুভ্র পন্থ ধরে যেইজন
নিয়ত করয়ে সেবা তারে সাধুগণ।
সুহৃৎ হয়েও যদি দুরাচারী হয়,
সাধুজন-ত্যাজ্য সেই জানিবে নিশ্চয়।
তবানুজ তাই তোমা করিয়া বর্জ্জন
রক্ষ-অরি শ্রীরামের লয়েছে শরণ।
শোনো তবে দশানন আমি রাম-দূত,
শুনিবারে বার্ত্তা এই হওহে প্রস্তুত।
খরদূষণাদি-রক্ষ-রক্ত করি' পান
হইয়াছে পিপাসিত যে রামের বাণ
—তব শির-বিনিসৃত শোনিতের ধার
নির্ব্বাণ করিবে এবে সেই তৃষা তার ॥

রাবণ। করাল সে মৃত্যু, যার পদানত ভৃত্যের সমান,
যার অগ্রে দিবাকর মন্দ মন্দ করে তাপ দান,
অষ্ট লোকপাল যার পদরেণু করয়ে বহন,
বিশ্বত্রাস "চন্দ্রহাস" খড়্গ যার করিয়া দর্শন
সুর-নাগ বধূদের ভয়ে হয় সদ্য গর্ভপাত,
নির্লজ্জ তাপস দুই কপিদলে আনি নিজ সাথ
অজেয় সে রাবণের কনক-লঙ্কায়
কেন আসি উপনীত হইল বৃথায় ?

অঙ্গদ। রক্ষ-কুল সমুৎপন্ন লঙ্কাপতি ওরে দশানন !
যুগল ধনুক যবে ধরিবেন রাম ও লক্ষ্মণ
—যে ধনুক সূর্য্যাতুল্য অতি-উচ্চ মহাতেজোময়—
সেই ধনুর্ব্বাণাঘাতে শীঘ্র তব সৈন্য সমুদয়
গৃধ্রভুক্ত শ্ব-ভক্ষিত কাক-ক্ষত হইবে নিশ্চয়।

রাবণ। কটুবাক্য বলিলেও নৃপ-বধ্য নহে দূত কভু ;
যথাদিষ্টবাদী দূত কহে—যা' আদেশ করে প্রভু।
দূত-পরে হলে কোপ শাস্ত্রের বিধান এইরূপ ;—
কোন অঙ্গচ্ছেদ করি' তারে শুধু করিবে বিরূপ।

অঙ্গদ। পরস্ত্রী হরণ কালে ধরমশীলতা তব
কোথা ছিল ওহে দশানন ?
"দূতেরে বধিতে নাই" এই ধর্ম্ম-জ্ঞান তব
সহসা যে হইল স্ফুরণ !

রাবণ। স্তাবক কপিরা যদি সাগরের বক্ষ-পরে
সেতু এক করিল নির্ম্মাণ
—আশ্চর্য্য কিবা তাহে ? পিপীলিকা রচে নাকি
বল্মীক পর্ব্বত-সমান ?
লঙ্কা দগ্ধ করে যদি —সে প্রভাব অনলের,
কি শকতি ধরে হনুমান ?
কি শৌর্য্য আশ্চর্য্য প্রকটিল বাহুবলে
সেই ব্যক্তি যার নাম রাম ?

(অপিচ)। শৈলময় সেতু দিয়া　　ক্ষুদ্র সিন্ধু হয়ে পার
কেন এত গর্ব্ব করে নর ও বানর ?
দশানন-বাহুরূপ　　সীমাহীন সুদুস্তর
আছে আরো বিংশতি সাগর ॥

অঙ্গদ। রাবণ শোন্‌রে তুই !　　শম্ভু-শৈল উত্তোলিয়া
হয়েছিস্ প্রখ্যাত-কীরতি ;
রাম-সনে এবে তুই　　যুঝিতে করিস্ ইচ্ছা
—ইহা তোর অনুচিত অতি।
শ্রীরাম থাকুন দূরে　　লক্ষ্মণেরো ধনুকের
রেখামাত্র না পারিবি করিতে লঙ্ঘন ;
রামের যে চর "হনু"　　—সেই ত লঙ্ঘিল সিন্ধু,
আর তোর লঙ্কাপুরী করিল দহন ॥

রাবণ। নিরস্ত হ'লি না যেরে　　শুনিয়াও আমার বিক্রম,
বাহুল্য আলাপে আর　　কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন,
কথা কাটাকাটি করে' নাহি আর ফল,
কি করিতে চাহে তোর রঘুডিম্ব—বল্।

অঙ্গদ। আদেশিলা রঘুনাথ　　এই কথা বলিতে তোমায়
"অজ্ঞানে বা মদভরে　　হরিল যে গোপনে সীতায়,
এখনি কবে সে যেন　　অবিলম্বে তাঁহারে মোচন ;
নতুবা লক্ষ্মণ তার　　দশমুণ্ড করিয়া ছেদন,
উচ্ছলিত-রক্তচ্ছত্রে　　দিগন্ত করি' আচ্ছাদন,
কৃতান্ত-ভবনে তারে　　পুত্রসহ করিবে প্রেরণ ॥"

কুমার লক্ষ্মণ তোমাকে এইরূপ বলেছেন—
সীতারে মোচন কর,　　শ্রীরামের পাদপদ্ম
করহ ভজন ;
চির-রাজ্য কর ভোগ,　　যজ্ঞ-অংশ ভাগী হোক্
যত দেবগণ ;
অক্ষত থাকুক লঙ্কা ;　　কিন্তু যদি মোর কথা
না কর শ্রবণ

পাবে ফল সমুচিত ;— সুগ্রীবের চড়্‌ কিলে
হইবে নিধন।

সুগ্রীব তোমাকে এই কথা বলেছেন :—

বলবীর্য্যে যে পুরুষ অতীব গর্ব্বিত
—লঙ্কেশ, সে রামে তুমি দেখনি নিশ্চিত।
বালির নিধন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
আত্ম-অভিমান তব কর বিসর্জ্জন।
সীতা সমর্পণ করি' রাখ রক্ষকুল,
—আর তব ইন্দ্রাধিক ঐশ্বর্য্য অতুল।
তাই বলি, দশানন! শোন কথা সার
রামের দাসত্ব তুমি করহ স্বীকার।

আর প্রধান সেনাপতিগণ এইরূপ আদেশ করেছেন :—

রে পশু রাক্ষসাধম! শীঘ্রই হইবি তুই
মগ্ন শোকার্ণবে;
তুই কি জানিস্ নারে সমাগত হেথা তোর
শত্রুগণ সবে।

কার্ম্মুক ধারণ করি' লক্ষ্মণ ও রাম
আর তাহে জুড়ি' তীক্ষ্ণ সমুজ্জ্বল বাণ,
সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপে —জানিবি নিশ্চিত—
তব পুর দ্বারে আসি' দোঁহে উপস্থিত॥

তুই পতুবন্ধু বলে' অপৃষ্ট হয়েও আমি তোকে এই কথা বল্‌ছি :—

শোন্‌রে রাবণ তুই সর্ব্ব লোক-সুবিদিত
নৃপতি প্রখ্যাত রাম-নামে,
তোরে বধিবার তরে স্বসৈন্যে সাগর বাঁধি
উপনীত তব সন্নিধানে;
পাঠালেন মোরে তিনি; সীতা সমর্পিয়া রামে
চরণ বন্দন কর তাঁর;

তাহা হলে চিরকাল   পারিবি করিতে ভোগ
অকণ্টকে রাজ্য আপনার ॥

রাবণ। চন্দ্রহাস খড়্গ দিয়া   নিজ দশ কণ্ঠ আমি
ছেদিবারে হইলে প্রবৃত্ত,
আ-স্কন্ধ কণ্ঠকাণ্ড   -মহাবন ছিন্ন হয়ে
ভূমে হ'ল তখনি পতিত ;
সেই ছিন্ন শিরোমাঝে   ছিলনা— জানিবে তুমি—
একটি বদন
যাহা গদগদ-ভাষী,   বিকৃত-ভ্রূ, কিম্বা যাহা
সজল-নয়ন ;
তার সাক্ষী ভগবান্   মহাদেব ত্রিপুরারী
শিব পঞ্চানন।

অঙ্গদ। তব দশমুণ্ড লয়ে   দশানন, ক্রীড়া তুমি
কোরো নাকো আর ;
শিব-সম রাম জেনো   না দিবেন ফিরাইয়া
মস্তক তোমার।
কৈলাস-তুলনা ছাড়ি'   —সমুদ্র-সেতুর পরে
দেও মন আজ ;
মম পিতৃ-বিক্রমের   কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে তুমি
কর যে বিরাজ
—বলি তোমা হিত কথা ;—   রঘুবধূ জনক-নন্দিনী
তাঁরে তুমি রাম-হস্তে   সমর্পণ করহ এখনি ॥

রাবণ। তব-পিতৃ বিক্রমের   করিছ তুমি যে এবে
বৃথা আস্ফালন।
তব উপযুক্ত বটে   সে ক্ষত্র-ডিম্বের হেন
চরিত্র কীর্ত্তন ;
ধনুর্ভঙ্গ-আদি কথা   গাইছ যে তুমি বারম্বার,
তাহে তার যশোবৃদ্ধি   নাহি হয়—করিলে বিচার।

অঙ্গদ। ভাঙ্গিলেন হর-ধনু ;

রাবণ।   —"ঘুণ্-ধরা" হইবে নিশ্চয়।

অঙ্গদ। বধিলেন তাড়কারে ;

রাবণ। সে রমণী বৃদ্ধা অতিশয়।

অঙ্গদ। বধিলেন খরাদিরে ;

রাবণ। তাহারা ত অর্ব্বাচীন অতি।

অঙ্গদ। ভেদিলেন সপ্ততাল ;

রাবণ। তাল-তরু সে-ত তৃণজাতি।

অঙ্গদ। তাঁর হস্তে বালী হত ;

রাবণ। —কপি বই আর কিছু নন্।

অঙ্গদ। বাঁধিলেন অম্বুনিধি॥

নিরুত্তর হইল রাবণ॥

(রাবণকে নিরুত্তর দেখিয়া তাঁহার আচ্ছাদনার্থ প্রহস্ত)

প্রহস্ত। (সভাসদ্‌গণের প্রতি)

ওহে ব্রহ্মা ! শোনো বলি, ইহা নহে বেদপাঠের সময় ;
নিঃশব্দে বহির্দ্দেশে কর অবস্থান।
জড়মতি বৃহস্পতি ! বহু বাক্য করিও না ব্যয়,
এ নহে ইন্দ্রের সভা—থাকে যেন জ্ঞান।
হে নারদ ! যাও তুমি বীণাবাদ্য করগে শ্রবণ ;
হে তুম্বুর ! স্তুতিপাঠে নাহি আর কাজ।
শূল সম বিঁধিয়াছে সীতার সে নিঠুর বচন
লঙ্কেশের বপু তাই সুস্থ নহে আজ॥

(লঙ্কেশ্বর সুস্থ নহেন—এই কথা ঢাকিবার জন্য পুনর্ব্বার)

রাবণ-প্রতাপ ভানু সহিতে অক্ষম
—করিতেছে নিরন্তর পার্শ্ব-আবর্ত্তন ;
পশ্চিম জলধি-পারে হয়ে অস্তমিত
পূর্ব্ব-পারে পুনর্ব্বার হয় সমুদিত।
আছেন শয়ান হরি সাগরের জলে,
বসতি করেন শিব গিয়া হিমাচলে।
আর সুরশ্রেষ্ঠ-ধাতা চতুর্ম্মুখ প্রভু
আছেন ধরিয়া পদ্ম—না ছাড়েন কভু॥

অঙ্গদ। ওরে রক্ষোরাজ শীঘ্র　　দেরে তুই ছাড়িয়া সীতায়,
পৌরুষ-প্রাগল্‌ভ্য কেন　　প্রকটিত করিস্‌ বৃথায়?
সম্মুখে দেখিস্‌ না কি　　কপিপতি সুগ্রীব-সেনায়
—দোর্দ্দণ্ড-বিক্রম যার　　উচ্চকণ্ঠে কিন্নরেরা গায়?
ওরে অকিঞ্চন মূঢ়! শ্রীরাম কি নর?
রম্ভা কি সে এই-নারী? যে-সে যোদ্ধা স্মর?
গঙ্গা সে কি নদী, আর ঐরাবত হাতী?
উচ্চৈঃশ্রবা-অশ্ব সে কি এই অশ্বজাতি?
ত্রিলোক-প্রথিত-বীর্য্য যেই হনুমান
সামান্য বানর বলি' তারে কর জ্ঞান?

রাবণ। জানা গেছে—সে রামের বুদ্ধি চতুরতা
—তোমা-সম দূত যবে পাঠাইলা হেথা।
দূত-যোগ্য গুণ তব কিবা আছে শুনি,
তোরে ত অরণ্য-চর কপি-মধ্যে গণি।

অঙ্গদ। সন্ধি হোক্, যুদ্ধ হোক্　　—আমি দূত হেথায় থাকিতে
—ক্ষত বা অক্ষত হ'স্—　　ক্ষিতি-পৃষ্ঠে হইবে লুটিতে॥

রাবণ। "বড় দুষ্ট এই কপি,　　ধর্ তোরা ইহারে এখনি"
আদেশিলে দশানন　　রাক্ষসেরা ধরিল তখনি।
রক্ষোবৃন্দে নিক্ষেপিয়া,　　ভাঙ্গি' সৌধ পদাঘাত-বলে,
উঠিল অঙ্গদ বীর　　এক লম্ফে গগন-মণ্ডলে॥

(রামের সমীপে উপস্থিত হইয়া)

অঙ্গদ। তব ভুজানল-মাঝে　　মৃত্যুকামী পতঙ্গ সমান
দর্পভরে দশানন　　হিতবাক্যে নাহি দেয় কান।
শ্রীচরণে, রঘুবীর!　　তাই আমি করি নিবেদন
সৈন্য-চক্র লয়ে রণে　　মুণ্ড তার করহ ছেদন॥

ইতি দূতাঙ্গদ নামক সপ্তম অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌচালন বিদ্যা।

ইউরোপ যে আজ এত উন্নত ও ক্ষমতাশালী তার অন্যতম কারণ জাহাজ পরিচালন-জ্ঞানের সম্যক উন্নতি। সমুদ্র পার হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়াই তাঁহাদের এত জ্ঞান উপার্জ্জন ব্যবসার উন্নতি ও ক্ষমতা বিস্তার। সেই জাহাজ পরিচালন বিদ্যা সম্বন্ধেই দুই একটী কথা এই প্রবন্ধে বলিব। যে দিন দেখিলাম, জমী অদৃশ্য হইলেও জাহাজ আপনার পথ ঠিক রাখিয়া কি দিন, কি রাত্রি চলিতে লাগিল সেই দিনই আমার মনে এ প্রশ্ন প্রথম উঠিয়াছিল। কাপ্তেন প্রভৃতি জাহাজের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া ও জাহাজের সব কল কারখানার ও যন্ত্রতন্ত্রের ব্যবস্থা দেখিয়া, ও পুস্তক পড়িয়া এ সম্বন্ধে যাহা শিখিয়াছি তাহাই বলিতেছি।

প্রথম অবস্থায় মানুষ, বৃক্ষাদি কোন হাল্কা দ্রব্য ভাসাইয়া, দাঁড় বহিয়া বা লগী ঠেলিয়া নদী পার হইত। ক্রমে পাল-তোলা নৌকাই তাহার জলযান হইল। এখন সেই স্থানে কলের জাহাজ আবিস্কৃত হওয়াতে স্রোত ও হাওয়ার গতির উপর বড় একটা নির্ভর করিতে হয় না। ইচ্ছামত গন্তব্য স্থানে সহজেই যাতায়াত করা যায়।

খ্রীষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ইউরোপের লোক, "আসিয়া" আদি দেশ সম্বন্ধে বড় একটা সঠিক খবর জানিতেন না। আরব প্রভৃতি যে সকল জাতি আসিয়ার দ্রব্যাদি লইয়া ইউরোপে ব্যবসা করিতেন তাহাদের নিকট হইতেই যা'কিছু সামান্য খবর ইউরোপবাসীরা পাইতেন মাত্র, তার অনেকই অতিরঞ্জিত ও অলীক।

সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব এসিয়াতেই হইয়াছিল। মানবের প্রথম উৎপত্তিই সেখানে। সেখান হইতেই আর্য্য-জাতি চারিদিকে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মেরই সেখানে প্রথম আবির্ভাব, সভ্যতার প্রথম বিকাশও সেখান হইতেই হয়! এ সকল তথ্য নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পুরাণ ভাল ইতিহাস নাই বলিয়া জানা যায় না যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব ভারতেই হইয়াছিল কি না। তবে দেখা যায় যে, পারস্য ফিনিসিয় বোধলন প্রভৃতি জাতির নিকট হইতেই ইউরোপে প্রথম সভ্যতা পৌঁছায়। শুনা যায়, ইজিপ্ট এ হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। গ্রীকজাতি হইতে রোমান এবং তাহাদের হইতে স্পেন্, পর্ত্তুগ্যাল্, ফরাসী, জার্ম্মানী, ইংরেজ ইত্যাদি জাতি ক্রমে সভ্যতা পাইয়াছেন। অর্থাৎ মোটামুটি মনে হয়, যেন সভ্যতা ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া পূর্ব্ব হইতে ক্রমে পশ্চিমে হাঁটিয়া গিয়াছে। যখন ইউরোপের সঙ্গে প্রথম সুদূর এসিয়ার পরিচয় হয় তখন ইউরোপে স্পেন ও পর্ত্তুগ্যালই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তারের ইচ্ছার সঙ্গে জলপথে সুদূর এসিয়াতে আসিবার পথ অন্বেষণ আরম্ভ হয়। কতক লোক উত্তর-মেরু-পথ দিয়া ঘুরিয়া আসিবার রাস্তা আবিষ্কার করিতে গিয়া তুষারে মারা গেলেন। পৃথিবী গোল এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কলম্বস্ পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া ভারতে পৌঁছিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন—ভারতে আসিতে পারিলেন না। পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডাগামা কেপ্-অফ-গুড্‌হোপ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন। ও সেই সময় হইতেই স্পেন্ ও পর্ত্তুগ্যাল্‌এর সুদূর আসিয়ার সহিত ব্যাবসাবাণিজ্য জলপথেই চলিতে লাগিল। ক্রমে ওলন্দাজ আসিলেন। তারপর ফরাসী। তারপর ইংরাজ জাতি আসিয়া, ক্রমে সুয়েজপ্রণালীর পথ গমনোপযোগী হইলে এখন "আসিয়া" সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন ইউরোপের সঙ্গে আসিয়ার খুবই নিকট সম্বন্ধ, ভোক্তা ও ভোজ্য বস্তুর যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আফরিকা আমেরিকা প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের মত সমস্ত আসিয়াই ইউরোপিয়নদের মধ্যে একরূপ ভাগাভাগী হইয়া গিয়াছে। এখন সমুদ্রযাত্রা সম্পূর্ণ নিরাপদ। মানুষ বাড়িতে থাকিলে যেরূপ কোনও কিছুরই অভাব হয়না—জাহাজে থাকিবার কালেও সেইরূপ যাবতীয় আবশ্যকীয় সুখ-সম্ভোগ তাহার করতলগত থাকে।

পূর্ব্বকালে গ্রহনক্ষত্রাদির স্থান ও গতিবিধি দেখিয়াই সমুদ্রে দিক নির্ণয় ও গন্তব্য পথ নিরূপণ হইত। পরে "কম্পাস" নামক দিক্-নির্ণয় যন্ত্রের আবিষ্কারের সহিত সে কাজ আরও সহজসাধ্য হইল; দিকমণ্ডল কুজ্ঝটিকাপূর্ণ বা আকাশ মেঘাবৃত হইলে আর অনন্যোপায় হইতে হয় না। জাহাজ যে দিকেই ফিরুক কম্পাসএর কাঁটা সর্ব্বদাই উত্তর-দক্ষিণ ফিরিয়া থাকিবে।

জাহাজ প্রতি মুহূর্ত্তে যে স্থানে আছে সে স্থানের লেটিটিউড্ ও লনডিটিটিউড্ কত তাহা কতকগুলি যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। তাহা জানা যাইলেই চার্ট বা জলের মানচিত্র মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কোনও স্থানে যাইতে হইলে কোন মুখে জাহাজ চালাইতে হইবে বা নিকটে কোনও স্থানে চড়া বা নিমজ্জিত পাহাড় আদি বপদসঙ্কুল স্থান আছে কি না।

সেক্‌স্টাণ্ট নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যে সূর্য্য প্রভৃতি, গ্রহনক্ষত্রগণের কত ডিক্রি উচ্চে আছে তাহা অর্থাৎ অলটিটিউড্ নিরূপিত হয়। দিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই কোনের পরিমাণ নিরূপণ করিলে দেখা যাইবে যে, সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময়েই কোন্ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট, এবং বেলা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বাপেক্ষা বড়—অর্থাৎ যেমন চলিত ভাষায় বলা হয়—"সূর্য্য মাথার

উপর থাকে।" সুতরাং, এর মধ্যে যে দিকের কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইল সেই দিকটিই সেই স্থানের মেরিডিয়ান্ অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণের দিক। এবং ঠিক কয়টার সময়ে সূর্য্য এ স্থানের উপর দিয়া পরিভ্রমণ করিলেন, ক্রনমিটার নামক ঘড়িতে সেই সময়টি দেখিয়া রাখিলে গ্রীনউইচ্এর মধ্যাহ্ন হইতে এই সময়টির কত তফাৎ হইল তাহা জানা যায়। এইরূপে সেই স্থানটি গ্রীনউইচ্এর সঙ্গে তুলনায় কত ডিগ্রী লনজিটিউডে আছে তাহা জানা গেল। অলটিটিউড্ ঠিক হইলে, তাহা হইতে অতি অল্প আয়াসেই হিসাব করা যায়, সে স্থানের লেটিটিউড্ কত। কেন না বিষুবরেখা হইতে সূর্য্যকে দেখিলে অলটিটিউড্ যত হইবে অন্য স্থান হইতে দেখিলে তত হইবে না; হিসাব মত হয় কম নয় বেশী হইবে।

লেটিটিউড্ ও লনজিটিউড্ ঠিক হইলেই সে স্থানটি মানচিত্রে অনায়াসেই নির্দ্দেশ করা যায়। সুতরাং গন্তব্য পথ ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান-অস্থানেরও খবর জাহাজেই পাওয়া যায়। হিসাব এত সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে যে, এইরূপ হিসাবে যে স্থানে জাহাজ আছে বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহা খুব ঠিক, এক মাইলেরও ভুল হয় না।

যদিও লেটিটিউড্ ও লনজিটিউড্ এই দুইটি জানাই প্রধান, এ দুটি ছাড়া অন্যান্য সকল আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার উপায় আছে। এমনি সুন্দর হিসাব, এমনি সুন্দর কল কৌশল! জলের স্রোত কোন দিকে ও তার কত বেগ তাহা জানিবার উপায় আছে। জাহাজ কত বেগে চলিতেছে জানিবার জন্য লগ্ নামক একরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তাহা আর কিছুই নহে, কেবল ইস্কুরূবের শীর তোলার মত বড় করে শীর তোলা একটি যন্ত্র জাহাজের পিছনস্থ একটি ঘড়ি হইতে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে জলে ফেলা। যখন জাহাজ চলে তখন সেইটি ঘুরিতে থাকে এবং ঘড়ির

কাঁটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। জাহাজ জোরে চলিলে বেশী ঘুরে ও আস্তে চলিলে কম ঘুরে। এই ঘুরা দেখিলে জাহাজ কত বেগে চলিতেছে তাহা নিরূপিত হয়।

শুধু ইহা নহে—হাওয়া কোন দিকে চলিতেছে ও কত বেগে চলিতেছে তাহার অবধি হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং, সকল সংবাদই আয়ত্বের ভিতর। সকল দিক দেখিয়া বুঝিয়া চলা যায়, তবে আর ভাবনা কি! শতসহস্র যাত্রী লইয়া তাই সেই প্রকাণ্ড জাহাজখানি অতি বিশাল সমুদ্রে একজনার আজ্ঞায় খেলনার মত চলে।

জাহাজের এঞ্জিনে বাষ্পের চাপ কত তাহা হইতে বুঝা যায় স্ক্রু টি কত বেগে ঘুরিতেছে ও তাহাতে জাহাজের কত গতি হওয়া উচিত। যতটা হওয়া উচিত আর যতটা হইতেছে এই প্রভেদটি জলের ও হাওয়ার গতিবশত ঘটিতেছে।

তবে এত সত্ত্বেও সময়ে সময়ে বিপদ ঘটে। শুধু ঝড়, তুফানে ভয় নাই—যদি নিকটে চড়া বা পাহাড় না থাকে, কিম্বা বাতাস ঘূর্ণী না হয়। টাইফুন্ জাহাজ সহজে ডুবেনা—যদি চড়ায় লাগিয়া কাত বা ফুটা হইয়া না যায়, কিম্বা ঘূর্ণী বাতাসে উল্টাইয়া না যায়। অনেক সময়ে জলের আলোড়নে সাফ্ট বা "স্ক্রু" ঘুরিবার ডাণ্ডিটি ভাঙ্গিয়া যায়। ভাঙ্গিয়া গেলে আর মেরামত হওয়া সহজ নহে। তখন জাহাজ সামলান দায়—হাওয়া ও স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া বিপদ ঘটিতে পারে। সময়ে সময়ে ঘূর্ণী বাতাসের সময় জলস্তম্ভ (water spout) দেখা দেয়, সে আরও ভয়ানক। এক মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িলে আর রক্ষা নাই। তখন যদি ভাঙ্গিয়াও যায় ত সে আলোড়নেও জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয়। তবে জলস্তম্ভ আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় বলিয়া সময় থাকিতে দূর হইতে কামানের গুলি মারিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

দক্ষিণ-প্রশান্তসাগরে জলস্তম্ভ প্রায়ই দেখা যায়। চীনসমুদ্রেও কখন কখন হইয়া থাকে। চীনসমুদ্রে নিমজ্জিত পাহাড় ও চড়া বিস্তর, তাই এত ভয়ের কারণ। এবং শীতের প্রারম্ভে মৌসুম পরিবর্ত্তনের সময় অতিশয় ভীষণ ও তুফানময় হয়। আমি না জানিয়া ঠিক এই সময়েই গিয়াছিলাম। তাই চীনসমুদ্রে এত উপদ্রব সহিতে হইয়াছিল।

অনেক সময়ে দুর্য্যোগে জাহাজ পথ ঠিক রাখিতে না পারিয়া পথভ্রষ্ট হয়। সময়ে সময়ে জাহাজে বাজ পড়িয়া কম্পাস খারাপ হইয়া যায়। এ সময়ে আকাশও কুজ্মটিকায় আচ্ছন্ন থাকাতে যদি জাহাজের পথ ঠিক করিবার কোনও উপায় না থাকে তবে Lost reconning অর্থাৎ হারান-হিসাব নামক এক প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা জাহাজ বাঁচান যাইতে পারে। সেস্থানের জলের গভীরতা কত, নিচে কিরূপ মাটিই বা পাওয়া যায়—কিরূপ বালি, কিরূপ পাথর খণ্ড, কিরূপ জলজ প্রাণী ও উৎভিদ ইত্যাদি আছে ঠিক করিয়া কতক পরিমাণে স্থাননির্দ্দেশ করা যায়। চার্টে এসকলেরই বিশেষ বিবরণ আছে।

জাহাজ নির্দ্দিষ্ট দিবসে বন্দরে না আসিলে তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে তারের খবর লওয়া হয়। অন্য জাহাজ কেউ কোথা সে জাহাজকে পথে দেখেছে কিনা জানা হয়। সমুদ্রমাঝে অপর জাহাজ দেখিলে সকল জাহাজই সে জাহাজের নাম, ধাম ও পথে কোনও গোলমাল আছে কিনা ইতিবৃত্তান্ত খবর লইতে বাধ্য; ও সেই খবর, পরবর্ত্তী বন্দরে পৌঁছাইলেই তথায় জানাইতে বাধ্য। অপর কোনও জাহাজ পথে বিপন্ন হইলে যথাসাধ্য তার সাহায্য করিতে বাধ্য। জাহাজ চালাইবার আইনের এই বাঁধা নিয়ম। এরূপ না হইলে চলিবে কেন। অমন অকূলে ও অসহায় অবস্থায় যদি পরস্পরের সাহায্য না করা যায় তো কি করে চল্‌বে।

ইহা ছাড়া আর একটি বিপদ, জাহাজে আগুন লাগা। আগুনই লাগুক আর জাহাজ ভাঙুক বা ডুবুক—সকল বিপদের সময়েই কার্য্য করিবার নিয়ম বাঁধা আছে। যুদ্ধের সময় সৈন্যরা যেমন সুনিয়মে পরিচালিত হয়—জাহাজেও সেইরূপ কড়া নিয়ম। তাহার অন্যথা হইবার যো নাই। এরূপ না হইলে চলিবে কেন? সকলেই প্রাণ বাঁচাতে গোলমাল করিলে বিপদ! উদ্ধারের চেষ্টা কি করে হবে। তাই জাহাজের কর্ম্মচারীরা হাজার বিপদই হোক, কে কোথায় দাঁড়াইয়া কার্য্য করিবে, তা নির্দ্ধারিত আছে। অভ্যস্ত রাখিবার জন্য জাহাজ যখন বন্দরে আসে, সেই সব কার্য্যগুলি অভ্যাস (drill) করা হয়। অর্থাৎ ঠিক যেন আগুন লাগিল, কি ঠিক যেন জাহাজ ভাঙ্গিল —কে কি করিবে কর, অমনি তাহারা সেই সব কার্য্য অভিনয় করিতে থাকে।

ক্যাসাবিয়ান্কার বিবরণ সকলেই অবগত আছেন। নাইলের যুদ্ধে—লা-ওরিয়েণ্ট নামক জাহাজে এক নির্দ্দিষ্ট স্থান রক্ষা করিবার বা পাহারা দিবার ভার পাইয়া সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ বালক জাহাজে আগুন লাগিলেও আপনার স্থান ছাড়িল না। যখন থেকে পড়েছি তখন থেকে আমার সে সুন্দর কবিতাটি মুখস্থ আছে। পাঠ্যাবস্থায় কত ভাল লাগিত, এখন আরও ভাল লাগে।

চারি দিকে যখন আগুন লেগেছে আর সে আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে—কষ্টে আর থাকা যায় না, তবুও বালক অবিচলিত—

'অগ্নি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া তার শিখাগুলি যেন ধ্বজার মত হেলিয়া দুলিয়া এই কর্ত্তব্যপরায়ণ নির্ভিক বালকের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল।'

বিপদ হইলে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য জাহাজে ছোট ছোট বোটগুলি রাখা হয় সেই গুলিতে, পলাইবার সময় প্রথম যাত্রীরা

যাইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী এক একজন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে এক একখানি বোটে করিয়া যাইবে—ভাণ্ডারী তাহাদের আহার্য্য যথাসময়ে উঠাইয়া দিবে। অন্য সকল কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবে। অমুক এঞ্জিন ঘরে থাকিবে, অমুক জাহাজের হালের তত্ত্বাবধান করিবে, অমুক চিঠিপত্র সামলাইবে ইত্যাদি। প্রথম স্ত্রীলোক ও ছেলেদের যেতে দেওয়া হয়। পরে, প্রথম শ্রেণী হইতে আরম্ভ করে পুরুষদের। কর্ম্মচারীরা শেষে যাইবেন। কাপ্তেনবেচারা সকলের শেষে। তিনি যেমন জাহাজের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা, তাহার ঘাড়েই তেমনি বেশী ঝক্কি; বাড়ির কর্ত্তার মত যদিও প্রথমেই তাঁহার পাতে মাছের মুড়া পড়ে বটে, কিন্তু সংসারের সকল ভারও তাঁকেই সইতে হয়।

এই সকল বাঁধা নিয়ম জাহাজেই লেখা আঁটা আছে। চীন-সমুদ্রে যখন বড় তুফান হচ্ছিল আমি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি দেখে নিলাম, পালাবার সময় ডাক্তার কখন পালায়। দেখলাম যাত্রীদের পরেই ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের আগে। সংবাদটি পড়ে তবুও কতক আশ্বস্ত হইলাম।

বার্কেনহেড নামক একখানি জাহাজ বিস্তর যাত্রী লইয়া দক্ষিণআফ্রিকার তুফানময় সমুদ্রকুল দিয়া যাইবার সময় নিমজ্জিত একটি পাহাড়ে আঘাত লাগিয়া ফুটা হইয়া গেল। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও জাহাজ বাঁচান অসম্ভব জানিয়া Life boatএ করিয়া যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাবার ব্যবস্থা হইলে সকল কাজই অতি সুনিয়মে চলিতে লাগিল। কর্ম্মচারীরা সমানে স্বস্ব স্থানে দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে নিজ নিজ কাজ করিতে লাগিলেন। প্রথমে স্ত্রীলোক ও বালকদের পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সৌভাগ্যবশতঃ জমী নিকটেই ছিল। জাহাজ হইতে যাত্রী লইয়া কিনারায় রাখিয়া নৌকাগুলি আবার অন্য যাত্রী লইতে ফিরিয়া আসিতে

লাগিল। সব যাত্রী পার হইবার পূর্ব্বেই জাহাজ ডুবিয়া গেল। যাঁহারা তখনও রহিল—কাপ্তেনের আজ্ঞানুসারে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবার মত দাঁড়াইয়া—যাহাদের প্রাণ বাঁচিয়াছে, তাহাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে সুনিয়মে স্থির থাকিয়া অতলজলে ডুবিয়া গেলেন।

একবারও একটু গোলমাল হইল না। সুনিয়মের ও সুঅভ্যাসের এমনই বিচিত্র মহিমা। আমি এক জনার বাড়ীতে এই সম্বন্ধে এক খানি ছবি দেখিয়াছিলাম। যদিও অবশ্য কপোলকল্পিত চিত্র বটে কিন্তু এমন সুন্দররূপে চিত্রিত যে, মনে হয়, চোখের সামনে সে সব ঘটনা ঠিক যেন ঘটিয়া গেল।

অগ্নি-উৎপাৎ বা অন্য কোনও বিপদ ঘটিলেই প্রথমে নিশান উড়াইয়া বা রঙ্গিন বাতি জ্বালিয়া ও এলার্ম বাজাইয়া সকলকে সংবাদ দিয়া সাবধান করা হয়। কর্ম্মচারীরা নিমেষের মধ্যে যার যেখানে গন্তব্য সে সেখানে গিয়া দাঁড়ায়। নিকটে জমী বা অন্য কোনও জাহাজ থাকিলে সিটি দিয়া তাহাকে সাহায্যের জন্য সংবাদ দেওয়া হয়। যদি এত দূরে থাকে যে সিটি শুনা যায় না তাহা হইলে কামান আওয়াজ করিয়া জানান হয়। সে জাহাজ যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বাধ্য—না করিলে Navigation আইনে বিষম দণ্ডনীয়।

জাহাজের যদি কোনও খবর পাওয়া না যায় ত কিছুদিন বাদে Searching vessel খুঁজিবার জন্য পাঠান হয়। অনেক সময়ে অনেক জাহাজ পথভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় অনেক দিন বাদে আবার আপনিই ফিরিয়া আসে!

পথে জাহাজ ডুবিলে যদি তাহা তোলা না যায় ত সে জাহাজে ঠেকিয়া পাছে অন্য জাহাজ বিপদগ্রস্ত হয় এই ভয়ে ডিনামাইট বারুদ দিয়া সে জাহাজ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

জাহাজ হইতে কোনও লোক পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ একটি পিপের মত হালকা বড় দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হয়—তার দুই উদ্দেশ্য। প্রথম, সে বিপন্ন লোকটি উহাই ধরিয়া খানিকক্ষণ প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে ; দ্বিতীয়, তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। তারপর লাইফ্ বোট্ করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া আনে।

জাহাজ বিপন্ন হইলে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যে Life boat আছে—তার মধ্যে অনেক গুলি এত বড় যে ৫০ জনার ঠাঁই হয়। এরূপ ১০।১২ খানি বোট সচরাচর থাকে। খুব ঝড়তুফানের সময় Life boatএ যতগুলির প্রাণ বাঁচাইবার স্থান আছে স্থধু ততগুলি মাত্র যাত্রী লইতে পারে আর পারেনা। তা ছাড়া কত বড় গোল গোল বয়া আছে তাহার উপর চড়িয়া অনায়াসে ভাসা যায়। ইহা ব্যতিত প্রতি লোকের কামরায় বিছানার পাশে কর্ক নির্ম্মিত ভাসিবার যন্ত্র আছে, হঠাৎ ডুবিলে সেইগুলি বুকে পড়িয়া অনায়াসে সাঁতার দেওয়া যায়। বিপদ কখন হয় তা'ত জানা নাই—তাই সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য ঠিক ঠিক সাজান আছে।

সকল বিপদসঙ্কুল স্থানেই প্রথম সাবধান হইবার জন্য, হয় আলোক-স্তম্ভ নয় আলোক জাহাজ আছে। তাদের উজ্জ্বল আলো গুলি সুদুর অবধি যায়। অন্য আলো হইতে পৃথক জানাইবার জন্য সেগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে, একবার জ্বলে একবার নিভে। ঘুরিবার বেগ দেখিয়া কোনটি কোথাকার সে খবর ঠিক করা যায়। নির্জ্জন বিপদ-সঙ্কুল স্থানে ঐ সকল আলো জ্বলিতে দেখিলে এক অপার আনন্দ ও মনে ভয় হয় তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না! যেন পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়া আলো পথিককে ঘাড় নাড়িয়া পথ দেখাইতেছে। যেমন মরুভূমে পান্থপাদপ আপনিই পথিককে জল জোগায় সেইরূপ এখানেও

এই ত গেল আজকালকার জাহাজের ব্যবস্থা। পুরাকালে জাহাজের কিরূপ অবস্থা ছিল ও ক্রমে ক্রমে কিরূপেই বা উন্নতি হইয়াছে তাহারও অনেক খবর পাওয়া যায়। শ্রীমন্তসওদাগরের সময় সমুদ্রগামী জাহাজ কিরূপ ছিল যদিও বিশেষ জানা নাই, কিন্তু মনে হয়, অনেকটা মহাজনী নৌকার মতই ছিল; কেবল সমুদ্রযাত্রীর উপযোগী করিবার জন্য সামনে ও পিছনে চেপ্টা ধরণের ও গলুই উচু। পুরাণ চাইনিজ জান্‌কও অনেকটা এইরূপ। ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকদের জাহাজ এবং নরওয়ে দেশে সমুদ্র দস্যুদের ও কলম্বসের সময়কার জাহাজ সবই দাঁড়-বওয়া পাল-তোলা ছিল। এমন কি নেলসনের শেষ যুদ্ধ ট্রাফালগার জলযুদ্ধে কলের জাহাজের ব্যবহার ছিল না। এখনকার রণতরী সব কলে চলে। বিগত রুষ-জাপান যুদ্ধে তাদের পরিচালনার কৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছে। রুষ-জাপান যুদ্ধের সময় যখন চীন সমুদ্রে ছিলাম—সকলের মুখেই অনবরত সেই যুদ্ধের কথা শুনিতাম। আর জাহাজেও নানা রকম সচিত্র খবরের কাগজ লওয়া হইত। তাতে যুদ্ধের নানা প্রকার চিত্র দেখিয়া বিস্ময়ের আর অবধি থাকিত না। তার একখানিতে রণতরীর আভ্যন্তরিক সব কলকব্জা ও ভিতর-কার বন্দোবস্ত চিত্রিত ছিল। দেখে যে কত শিক্ষাই, কি অপার আনন্দ হলো বলা যায় না। স্তরে স্তরে কত তলাই সাজান। প্রতি তলায় কত রকম সুব্যবস্থায় কামরা গুলি নির্ম্মিত। মাস্তুলের আধপথে watch tower—যুদ্ধাধ্যক্ষদের যুদ্ধস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার উচ্চ স্থান। সেখান হইতে সূর্য্যরশ্মির মত প্রখরতেজ বৈদ্যুতিক আলো চারি দিকে ঘুরিতেছে—তাতে রাত্রিকালে দিনের মত দেখা যায়। সেইখান হইতে তারসংযোগে নিম্নে ও সম্মুখের কামান-দাগিবার-ঘরে ঠিক কোন দিকে কামান দাগিতে হইবে সে বিষয়ের খবরাখবর চলে। নিম্নকার সকলের মধ্যস্থিত

কলে উঠে নাবে। সবই কলে পরিচালিত হয়—মানুষ কেবল কল চালায় মাত্র। সর্ব্বের সামনে ও পিছনে জলের ভিতরকার কামরা হইতে টরপেডো ছোঁড়া হয়। সেগুলি অতি ভয়ানক যন্ত্র। বন্দুকের গুলিতে একেবারে একজন দুজন জখম হয়—বম্বসেলে শতলোক এক সঙ্গে আহত হয়—কিন্তু এই এক টরপেডোতে জাহাজ জখম হইয়া সহস্র সহস্র লোক জলমগ্ন হয়। তার আকৃতি ঠিক একখানি মোটা ফাঁপা সাবলের মত। তার ভিতরে বারুদ ভরা। পিছনে একটি "স্ক্রু" আছে—দম দিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে ছাড়িয়া দিলে জলের ভিতর দিয়া যথাস্থানে গিয়া আপনিই শত্রুর জাহাজের তলায় ফাটিয়া বিষম জখম করে। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির ত অন্ত নাই। এই বিপদের প্রতিকার করিবার জন্য জাহাজের চারিদিকে মাছ ধরিবার জালের মত টর্পেডো ধরিবারও জাল আছে। তাহাতে জাহাজের নিকটে আসিয়া বিপদ ঘটাইবার পূর্ব্বেই—সে বিষম যন্ত্রটিকে ধরিয়া লওয়া যায়। আরও যে কত রকমের রণশাস্ত্রে মানববুদ্ধি ও বিদ্যার পরিচয় পাইলাম তা বলা যায় না। জাপানীরা বড়ই ফন্দিবাজ—ছোট ছোট অলীক রণতরি তৈয়ার করিয়া তাহার মাস্তুলে আলো জ্বালিয়া ছাড়িয়া দেয়—আর শত্রুপক্ষ তাই দেখিয়া যথার্থ জাপানী যুদ্ধজাহাজ মনে করিয়া—কামান ও টরপেডো দাগে, তাতে অনর্থক তাদের গুলিবারুদের অপচয় হয়। ও শত্রুর বলক্ষয় করা হয়।

নিচের তলায় মাঝখানকার ঘরে আহত সৈন্যদের চিকিৎসার ও শুশ্রূষার স্থান। নিজেরও ওই পেসা বলিয়া আমার সকলের চেয়ে ওই স্থানটি দেখিতে ভাল লাগিল। গোলাগুলির দ্বারা নানা স্থানে আহত, অচৈতন্য ও মুমূর্ষু সৈন্যগণ অবলীলাক্রমে সুদক্ষ বাহকের দ্বারা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার্থে নীত হইতেছে। সুব্যবস্থায় সকল কার্য্য যেমন সুচারুরূপে চলে, এমন দারুণ গোলমালেও সেখানে সব কার্য্যগুলি যেন আপনা আপনি কলের মত চলিতেছে।

সেখানি প্রায়ই দেখিতাম, একদিন সেই ছবির বইখানি হাতে করিয়া আহারান্তে ঠেস দিয়া বসিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে তন্দ্রা আসিতেছিল। আর ছবির টরপেডোর ডগটি আমার বুকের দিকে ফিরিয়া থাকায় একটু ভয়ও হইতেছিল। এমন সময় অপর ঘরে আমার চাকরটি জুতা ঝাড়িয়া অন্য জুতা মেজেতে আচড়াচ্ছিল। সেই শব্দে তন্দ্রা অবস্থা থেকে চমকে উঠলাম, মনে হলো যেন সেই ছবির টর্পেডোটি সশব্দে ফাটিয়া গেল। সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপুনী সহজে কি থামে।

সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সময়ে জাপানীরা যে দিন রাত্রিকালে অলক্ষিতে হঠাৎ পোর্ট আর্থারের বহির্দ্দেশে অবস্থিত "ভাইরো" নামক যুদ্ধ জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে জখম করে, সেই ছবিখানি ও জলমগ্ন বিপন্ন সৈনিকদের দেখিয়া মনে কি কষ্ট হলো তা বুঝান যায় না। যেন তাদের আত্মীয় লোকের কান্নার স্বর তখনকার জোর হওয়া আমার কানে বহিয়া আনিতে লাগিল। জাপানের জয় শুনে আহ্লাদ হয় বটে। কিন্তু এই সব কথা ভাবিলে যুদ্ধের কথায় আর প্রবৃত্তি হয় না। অনেক দিন আগে, একজন কোন পুস্তক হতে উদ্ধৃত করে এই শ্লোকটি বলেছিলেন শুনেছিলাম, সেইটি আমার মনে হইল—

"আশ্রয় তরণী তুমি বিপত্তি সাগর মাঝ
কে বাঁচায় দীনহীনে তুমি বিনে রাজ রাজ।"

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

স্বদেশের প্রতি।

হে মোর স্বদেশ!
খুলিয়া দিয়াছ আজ আমাদের কল্যাণসম্পদ ;
তোমার কুটিরদ্বারে হেরিতেছি জ্যোতির্ম্ময় রথ ;
মিলিয়াছে বহুযাত্রী আত্মবলে পুষ্ট বলীয়ান্,
সুখের হিতের শত উপায়নে পরিপূর্ণ-প্রাণ ;
তাঁদের নিশ্বাসে আজ

দিগন্তে উড়িয়া গেছে
বাঙ্গালীর ধূলিময় বহুজীর্ণ বেশ !
নমি তোমা, হে বরেণ্য, হে মোর স্বদেশ !

যুগান্ত পবনে
দিগন্তে করাল মেঘ বিস্তারিছে অন্ধকার ছায়া ;
সংখ্যাতীত প্রেতযোনি প্রসারিছে শত ভাঁতি মায়া ;
চমকে দামিনীদীপ্তি, শিহরিছে হৃদয় তরাসে
উলঙ্গ কৃপাণ লয়ে ছিন্নমস্তা নাচিছে আকাশে ;
এ দুর্দ্দিনে হে স্বদেশ !

মঙ্গল ইঙ্গিতে তব,
যুগান্তের ভস্ম হ'তে কুটিরে অঙ্গনে,
হোমাগ্নি উঠেছে জ্বলি যুগান্ত পবনে !

আজ বাঙ্গালার
সাতকোটি হৃদয়ের স্নেহ প্রেম শতাব্দী-সঞ্চিত,
এক ধ্রুব কেন্দ্রমুখে ছুটিতেছে ক্ষুব্ধ তরঙ্গিত ;—
প্রতি বঙ্গগৃহে বসি' অপ্রমত্ত নরনারীগণ,
হইতেছে আত্মদীপ, আত্মাশ্রয়ী, অনন্যশরণ ;—
ঘাতকের কর হ'তে
স্খলিত হয়েছে যেই
শতঘৃণ্যতম স্বার্থে শাণিত কুঠার,
দেবতানির্ম্মাল্য তাহা আজ বাঙ্গালার !

জাগরণ গান
ফেণহাস্যে উঠিতেছে কোটিমুখে প্রশান্ত সাগরে,
সদ্যোজাগরণরক্ত এসিয়ার নয়নের'পরে
ভাসিতেছে লক্ষ-আশা, কল্যাণের অগণিত ব্রত
দীপ্তিমান হইতেছে লুপ্তপ্রায় শতমুক্তি পথ ;
দূর পূর্ব্বাকাশতীরে
উষালোকে ধীরে ধীরে
খুলিয়াছে জীবনের আদর্শ মহান্,
তাই আজ কোটিকণ্ঠে জাগরণ গান !

ওগো পৌরজন !
ভয়নাই—ভয়নাই—বিধাতার দুর্জ্জেয় বিধানে,
ভেঙ্গেছে মোদের ঘুম, দৈব-বাণী জাগিয়াছে প্রাণে ;
আজি হ'তে যার যাহা মুষ্টিমেয় রয়েছে সম্বল,
সবনিয়ে প্রাণপণে জননীরে দাও দুর্ব্বাজল ;
প্রাণদীপে আজি হ'তে

রাখ উজলিয়া সবে
চির সৌম্য জননীর গৃহের প্রাঙ্গণ,
ভয় নাই—ভয় নাই—ওগো পৌরজন!

আসিয়াছে বল;
পূর্ব্বাকাশ রশ্মিপথে এ উষায় দেবকন্যাগণ,
চকিতে মোদের নেত্রে লেপিয়াছে নির্ম্মল অঞ্জন;
আজ হেরিতেছি তাই—চারিদিকে, অন্তরে বাহিরে,
রাজার প্রাসাদশিরে দরিদ্রের বিজন কুটিরে,
অন্নপূর্ণা জননীর

অভয় মঙ্গলরাশি
ধনধান্যে পরিপূর্ণ—প্রাঙ্গণ শ্যামল;
প্রাণে প্রাণে তাই এত আসিয়াছে বল!

জননী আমার!
তব শিবতরা মূর্ত্তি প্রাণে প্রাণে উঠিয়াছে জাগি;
কাঁদিছে কাঁদিছে আজি পুত্রকন্যা তব স্তন্য লাগি;
তোমারি কুটির দ্বারে ফিরিয়াছে সন্তান সকল,
হে মোর তাপসী দেবি! বিছাইয়া শ্যামল অঞ্চল
মোদের লইয়া বুকে

প্রাণের ধমনী শত
পূর্ণ কর, পুষ্ট কর দিয়ে স্তন্যধার;
হে অভয়া, হে শঙ্করি! জননী আমার!
আজি হ'তে প্রাণপদ্ম তব পদে দিনু পুষ্পাঞ্জলি;
তুমিই জননী ধাত্রী কাম্যপথে তুমিই সকলি।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

পূর্ব্ববঙ্গে, এই বাকলা প্রদেশ অবস্থিত। এককালে দ্বাদশ ভৌমিকদিগের অন্যতম প্রবলপ্রতাপ মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ, রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজন্যবর্গ এই বাকলার অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে বিশাল রাজ্যস্থাপন করিয়া, অতুল গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন। এখন আর সে রাজত্ব নাই, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ কালস্রোতের মহা ভীষণ আবর্ত্তে ধীরে ধীরে বিলীন হইতেছে।

বাকলা।

এখন যাহা আছে, তাহা অনন্ত কালসাগরের হৃদয়স্থ একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ মাত্র। বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, বাকলার অধিকাংশ স্থান লইয়া সৃষ্ট হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্যজাতির ধারাবাহিক কোন জাতীয় ইতিহাস নাই, তাই আজ এই ভারতের যে সমস্ত আর্য্যকীর্ত্তি পুরাণাদিতে যতটুকু দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই অসম্বদ্ধ, এবং বর্ত্তমান পণ্ডিত সমাজে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যক্ত; তাই বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ-আলোচনাসম্বন্ধে তাদৃশ যত্নবান্ নহেন।

প্রকৃত পক্ষে, বিশেষ গবেষণা করিলে আমাদের পুরাণে, লুপ্ত ইতিহাসের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

যতগুলি পুরাণ আছে তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্ব্বপ্রধান। কিন্তু রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে তৎকালীন ভারতের অনেক নূতন তত্ত্ব ও ইতিহাস বিশদ্‌রূপে দেখিতে পাই। আমাদের এই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে প্রাচীন তত্ত্বসম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় কিনা তাহা আলোচনা

করা যাক্। গদাপর্ব্বে ভগবান্ বলরামের তীর্থযাত্রার কথা লিখিত আছে। পুরাণ, বলরামকে মদ্যপায়ী এবং ক্রোধী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; মদোন্মত্তাবস্থায় তিনি জনৈক মুনির শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাকে ভারতের সর্ব্বতীর্থ ভ্রমণ করিতে হয় এবং পরিশেষে গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক্ যে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম কোথায়। আমরা মানচিত্রে দেখিতে পাই যে, গঙ্গা নিম্নবঙ্গমধ্যে প্রবাহিতা হইয়া শতমুখী নাম লইয়া সাগরে প্রবেশ করিয়াছেন; বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানের নাম শতমুখী তাহার নিম্নভূমী অধিকাংশ সুন্দরবনের অন্তর্গত।

বাখরগঞ্জের দক্ষিণ ও পূর্ব্বসীমায় এখনও নিবিড় অরণ্য বর্ত্তমান। তথায় নদী এবং শাখানদী অসংখ্য; এই সমস্ত নদী গঙ্গাস্রোত হইতে উদ্ভূত। আমাদের এই দেশের নদীগুলিকে প্রচলিত ভাষায় প্রায় "গাঙ্" বলা হয়; "গাঙ্" গঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। দক্ষিণ সাহবাজপুর, হাতিয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপসমূহ গঙ্গা গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

গঙ্গাসাগরসঙ্গম যে ভারতবর্ষের একটি প্রধান তীর্থ, তাহার আর সন্দেহ নাই; এবং এ তীর্থস্থানটী যে জলময় তাহাও নিঃসন্দেহ। সম্ভবতঃ ভগবান হলায়ুধ প্রাচীন বাকলার পূর্ব্ব-দক্ষিণসীমায় গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিয়াছিলেন।*

এই সম্বন্ধে আরও একটি কথা আছে। রামায়ণে দেখিতে পাই, যে ভগবতী গঙ্গাদেবী সাগরসঙ্গমে আসিয়া পাতাল প্রবেশ করিয়া-

---

* বর্ত্তমানে কিন্তু গঙ্গাসাগরতীর্থ ২৪ পরগণায়। যে স্থানের কথা আমরা লিখিতেছি, তাহা এখনও গভীর অরণ্যাণীতে পরিপূর্ণ; কিন্তু তথায় যে পুরাকালে জনপদ ছিল, তাহার বহু চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

ছিলেন। বাথরগঞ্জের দক্ষিণসীমাস্থিত বর্ত্তমান বঙ্গসাগরের একস্থান অতলস্পর্শ।* ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে যে গঙ্গা এই স্থানেই পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে স্থানের নাম এবং অবস্থার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই; তথাপি পুরাণ-বর্ণিত স্থানবিশেষ এবং নদী কতকটা ঠিক আছে বলিয়া বোধ হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, গঙ্গার পাতালপ্রবেশস্থানই শাস্ত্রোক্ত গঙ্গাসাগরতীর্থ; বর্ত্তমান সময়ে ঐস্থান বাথরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ পুরাকালে ইহাই সাগরসঙ্গমতীর্থ বলিয়া খ্যাত ছিল। পরিশেষে নৈসর্গিক কারণে স্থানবিপর্য্যয় হওয়াও অসম্ভব নহে।

মহাভারতের স্থানে স্থানে আমরা "বঙ্গরাজ" এবং "বঙ্গদেশের" উল্লেখ দেখিতে পাই; তন্মধ্যে সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয়পর্ব্বাধ্যায়ে বঙ্গদেশের বর্ণনা অধিকভাবে আছে। রাজসূয়যজ্ঞকালে পাণ্ডবগণ যে যে স্থান জয় করিয়াছিলেন, সকল স্থানেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যম-পাণ্ডব মহাবীর ভীমসেন, মগধজয়ান্তে তৎপূর্ব্বেস্থিত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজন্যবর্গ এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণকে পরাজিত করিয়া করগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সভাপর্ব্বের সেই শ্লোক কয়েকটি উদ্ধৃত করিলাম।

"উজোবল বৃতোবীরা বুজৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ! বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা॥
সুহ্মানামাধিপঞ্চৈব যেচ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগনাংশ্চৈব বিজিগ্যেভরতর্ষভঃ॥

* ইংরেজিতে ইহাকে Swatch of No Ground বলে।

এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসুতেভ্য উপাদায় লৌহিত্য মগমদ্বলী॥
সসর্ব্বান্ ম্লেচ্ছনৃপতিন্ সাগরানুপবাসিনঃ।
করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানিচ॥”

(অনুবাদ)

এই দুই পরাক্রান্ত রাজাদের (পৌণ্ড্রাধিপতি ও কৌশিকী কচ্ছনিবাসী রাজা) সংগ্রামে বিজিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন; এবং মহীপতি, সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত কর্ব্বটাধিপতি, সুমনাধিপতি নরপালকে জয় করিয়া সমুদয় ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিলেন। মহাবল পবননন্দন এইরূপে বহুদেশ বিজয় ও সর্ব্বত্র হইতে ধন সংগ্রহ করিয়া সাগরতীরবাসী (জলপ্রধান দেশবাসী) সমস্ত ম্লেচ্ছরাজগণকে পরাজয় করিয়া নানাবিধ ধন, রত্ন এবং কর সংগ্রহ করিয়া লৌহিত্য দেশে (ব্রহ্মপুত্রনদসমীপবর্ত্তী দেশ) উপস্থিত হইলেন।

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে সমুদ্রের তীরবর্ত্তীস্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল। বাকলার দক্ষিণসীমায় যে সমুদ্র আছে, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনেক স্থান জনমানবশূন্য অরণ্যানীতে পরিপূর্ণ হইলেও পুরাকালে যে সেই সমস্ত স্থানে লোকের বসতি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাক্, যে এই স্থানে ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল কিনা। সংস্কৃত অভিধানে আমরা দেখিতে পাই ম্লেচ্ছশব্দের অর্থ, যবন, কিরাত, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি; এবং যাহারা অপভাষী, পাপরত এবং সর্ব্বধর্ম্মরহিত, ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন তাহাদেরও ম্লেচ্ছ বুঝায়। আবার ম্লেচ্ছদেশ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ আভিধানিক ভরত বলিয়াছেন।

“চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থানাং যস্মিন দেশে ন বিদ্যতে

যে দেশে চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই, অধিবাসীগণ শিষ্টাচাররহিত এবং অসংস্কৃতভাষী অর্থাৎ অপভাষা ব্যবহার করে তাহাই ম্লেচ্ছদেশ।

এসিয়াটিক সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী-সম্পাদক বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গলার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তী যে সুন্দরবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তৎকালে এবং তৎপূর্ব্বেও তথায় নীচ জাতীয় লোকের বসতি ছিল; তাহাদের লোকে "চণ্ড-ভণ্ড" বলিত। প্রতাপবাবু, এই চণ্ডভণ্ডদের মলঙ্গী, অর্থাৎ যাহারা লবণের জ্বাল দেয় তাহাদের বুঝায় এরূপ বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এমন অনেক লোকের মলঙ্গীপদবী দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে কেহ হিন্দু কেহ মুসলমান। পুরাকালে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ লবণের জ্বাল দিত বলিয়া তাহারা এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই মলঙ্গীউপাধিধারী হিন্দুদিগের মধ্যে সকলেই চণ্ডাল, অথবা বর্ত্তমানকালের নমস্শূদ্র জাতীয়। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি তখন মুসলমান বলিয়া কোন জাতি এদেশে ছিল না। আমরা এই চণ্ড-ভণ্ডজাতির উল্লেখ আরও পাইয়াছি।* বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণসেনের অন্যতম পুত্র মহারাজা কেশবসেন প্রদত্ত এক

---

* There lived in this part of Bengal (Backergunge), a semi barbarous tribe, named Chanda-Bhanda, very similar to the Molongis or Salt Manufactures of the present day. Their condition was little better than slaves. In a Copper Plate Inscreption, found in Lot No 55, of Hodge's Map near Buckergunge, Madhab, evidently a brother to Keshub Sen, of the Sen Rajas of Bengal, made a grant of some villages to a Bramhin. With the villages, the king conferred on the receipient the right of punishing and employing the Chanda-Bhanda, a tribe that inhabited the place. This tribe, I belive, gave the name of the unculivated portion of the Delta, which they occupied.

Asiatic Society's Journal.
Paper on Sunderban by
PRATAP CHANDRA GHOSH.

তাম্রলিপিতে এই চণ্ড-ভণ্ডের যথোপযুক্ত শাসনের কথা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই তাম্রশাসনের কথা পরে বলিতেছি।

চণ্ড-ভণ্ড জাতি যে অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ছিল, তাহার কতক আভাষ এই তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহারা যথেচ্ছাচারী এবং দেবতা-ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিল; তাই রাজা ইহাদের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া ইহাদের শাসনের ব্যবস্থা ব্রহ্মোত্তর-গৃহীতাকেই প্রদান করিয়াছিলেন।

এখন মহাভারত বর্ণিত ম্লেচ্ছ, তাম্রশাসন লিখিত "চণ্ড-ভণ্ড" এবং মলঙ্গী উপাধিধারী "চণ্ডাল" একজাতীয় কিনা, তাহা আলোচনা করা যাক্। অভিধানকার ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ "কিরাত এবং শবর" বলিয়াছেন। মহাকবি বাণভট্টপ্রণীত কাদম্বরী গ্রন্থে চণ্ডাল অর্থে শবর ব্যবহৃত দেখিয়াছি। ইহা দ্বারা অবশ্যই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শবর-ব্যবসা, চণ্ডালগণের জাতীয় উপজীবিকা। মাংস-আহার এবং মদ্যপান হেতু, তাহাদের মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই উত্তেজিত; সুতরাং সামান্য কারণে বিচলিত হইলেই তাহাদের ক্রোধের অবধি থাকে না; এই জন্যই সম্ভবতঃ তাহাদের নাম চণ্ডাল (চণ্ড্ + অল্) অর্থাৎ ক্রোধী হইয়া থাকিবে। ইহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, শিষ্টতা প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের যাহা অকরণীয়, চণ্ডালগণের তাহাই কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য।

এই সমস্ত জাতি যে ভদ্রসমাজ হইতে অন্য স্থানে বাস করিত তাহা মহাভারত এবং তাম্রশাসন হইতেই বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে তাহারা বাস করিত; এবং আবশ্যকমত তত্তীর-ব্যাপী সৈকতে এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যাধ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। আবার কখন কখনও

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া দস্যুতাও করিত। বর্ত্তমান সময়ের চণ্ডালগণের মধ্যে কেহ কেহ সুসভ্য হইয়া থাকিলেও একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলে তাহাদের চরিত্র এবং আচারব্যবহারসম্বন্ধে অনেকটা পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়েও অনেকে, উদ্ধত, ক্রিয়াকাণ্ডবর্জ্জিত দুশ্চরিত্র এবং ধর্ম্মাচরণরহিত। এই জন্য, বোধ হয় যে, পুরাণবর্ণিত ম্লেচ্ছ, তাম্রশাসনলিখিত চণ্ড-ভণ্ড এবং বর্ত্তমান চণ্ডাল একই জাতি, তবে ব্যবসাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হইবার সম্ভাবনা।

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের দক্ষিণসীমাব্যাপী বঙ্গসাগরতীরে যে সুন্দরবন পরিলক্ষিত হয় পুরাকালে ঐ স্থানেই ম্লেচ্ছগণের বসতি ছিল। এই সুন্দরবন সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পরে বলিতেছি।

মহাভারতোক্ত এক "তাম্রলিপ্তি" ব্যতীত আর কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া এখন দুরূহ। হয়ত বহুপূর্ব্ব হইতেই অনেক স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে, আবার অনেক স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যাওয়াও একান্ত সম্ভব। কেননা ভূমিবৃদ্ধি এবং ভূমি-ক্ষয় সমুদ্রের এ উভয় শক্তিই বর্ত্তমান আছে।

তাম্রলিপ্তি (অধুনা তমলুকের) নিকট হইতে সমুদ্র এখন অনেক দূরে গমন করিয়াছে। মহাভারতের সময়, তমলুকের পার্শ্বেই সাগর ভীমরবে গর্জ্জন করিয়া সফেণতরঙ্গরাশি তদুপকূলে প্রতিহত করিত।

ভগবান পরশুরাম মাতৃহত্যাপাপক্ষালনার্থ, ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা পুরাণে দেখিতে পাই। অশোকাষ্টমী তিথিতে যে স্থানে সকলে তীর্থস্নান করেন প্রাচীন বাক্‌লার সীমা তাহা হইতেও পূর্ব্বদিকে ছিল।

পূতসলিলা জাহ্নবী এবং দেব-নদ ব্রহ্মপুত্র এখনও অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

প্রথিতনামা চীন পরিব্রাজকের* "ভারত ভ্রমণে" আমরা বাক্‌লার উল্লেখ দেখিতে পাই। তখন বাক্‌লা একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। উক্ত মহাত্মা পরিব্রাজক প্রায় দশ বৎসর কাল এই দেশে ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ৬৩৬ হইতে ৬৪৬ অব্দ অবধি ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। হুয়েনসান † বাক্‌লায় আসেন নাই। তৎকালে বাক্‌লার পশ্চিমভাগে উত্তালতরঙ্গময়ী সুগন্ধা নদী প্রবাহিতা ছিল। পরিব্রাজকমহাশয় উপযুক্ত নৌ-যানে জলপথে কামরূপ গিয়াছিলেন বলিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু সুগন্ধা, ঘাঘর, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বাহিয়া কামরূপে গিয়াছিলেন, না অন্য কোন পথে গিয়াছিলেন তাহা কিছুই জানা যায় নাই; তৎকালে বাঙ্গালা দেশের নদীসমূহে বিলক্ষণ দস্যু-ভীতি ছিল। দেশী, বিদেশী দস্যু তখন বিনা বাধায় লুণ্ঠনাদি করিত; কেহ কেহ বলেন যে হুয়েনসানের বাক্‌লায় না আসিবার তাহাই একটি কারণ; কেননা তিনি একবার দস্যুহস্তে বিলক্ষণ-বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাক্‌লার প্রাচীনতত্ত্বসম্বন্ধে আরও একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত "ইণ্ডো এরিয়ান" নামক ইংরেজী গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, বিগত ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইদিলপুর পরগণার রাজ লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই ইদিলপুর বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের মধ্যে একটি বিখ্যাত পরগণা; এবং তথায় বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থের বাস আছে।

এই তাম্রলিপি এখনও বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে বর্ত্তমান আছে; এই তাম্রশাসন দেবনাগর অক্ষরে উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

* Early Travels in India.   † Elphenstone's History of India.

এই তাম্রলিপির উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্মোপরি দশহস্ত বিশিষ্ট এক দেবমূর্ত্তি! ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল, ইহা মহাদেবের মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* এই মূর্ত্তির নীচে ভগবান সবিতৃদেবের স্তুতিবাচক একটি কবিতা এবং ভগবান চন্দ্রদেবের স্তুতিবাচক কয়েকটি শ্লোক। কেননা রাজা কেশবসেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশেই উৎপন্ন। প্রথমে বিজয়সেন নামা রাজার কথা লেখা আছে। তিনি তৎকালীন সমস্ত রাজাপেক্ষা বলবীর্য্যে শ্রেষ্ঠ। তৎপুত্র বল্লালসেন যাঁহার শুভ্র যশে দিঙ্‌মণ্ডল বিভাষিত। তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন। ইনি যেমন ধার্ম্মিক, তেমন বীর ছিলেন; তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক স্থানে বিজয়স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছেন। ইনি জগন্নাথতীর্থে, গদাপানি এবং মুষলধর বিগ্রহের সম্মুখে, কাশীধামের নিম্নে প্রবাহিতা গঙ্গার সঙ্গে যে স্থানে অসি এবং বরুণা মিশ্রিত হইয়াছেন, সেই পরম পবিত্র শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ধামে (কাশী) এবং ত্রিবেণীর তীরে (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সম্মিলনস্থান) অনেকগুলি দেবভবন এবং চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন. এই ত্রিবেণীতে পদ্মযোনি (ব্রহ্মা সর্ব্ব প্রথমে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই নরপতি লক্ষ্মণসেন স্বীয় ধর্ম্মপত্নী মহারাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভে কেশবসেন নামক এক পুত্র লাভ করেন। এই কেশবসেন গজপতি, অশ্বপতি এবং নরপতিগণের উপর স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন। সেই মহারাজ কেশবসেন, তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে বনমালী শর্ম্মার পুত্র ঈশ্বর দেবশর্ম্মাকে বাগুতি† (Bagutte) এবং বেতগাতা (Bettagutta) নামক গ্রামদ্বয় ব্রহ্মত্তর দান করিলে তিনি চণ্ডভণ্ডদিগকে শাসন করিয়া

---

* See Indo-Aryans, vol. II. Page 236

† বাঘাদি নামে একগ্রাম ইদিলপুরে আছে সম্ভবতঃ ইহাই বাগুতি, কিন্তু বেতগাতার কোন সন্ধান পাইলাম না।

এই ব্রহ্মত্তর ভোগ করিবেন। এখন প্রকৃত তাম্রশাসনের লিপির সঙ্গে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দ্বৈধ দেখা যায়; তিনি যে অনুবাদ দিয়াছেন, তাহাতে বাগুতি ও বেতগাতা গ্রাম মূল তাম্রশাসনে লতা এবং টগড়াঘাট বলিয়া উল্লিখিত আছে। আমরা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি উদ্ধৃত করিলাম।

১। বন্দেহর বিন্দ বন বান্ধবমন্ধকার কারা নিবদ্ধ
ভুবনত্রয়মুদ্ধরন্তং।
পর্য্যায় বিস্তৃত সিতাসিত পক্ষযুগ্মমুদ্যন্তমদ্ভুত খগং
নিগম ক্রমস্থ ॥

২। পর্য্যন্ত স্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বপ্নিমুত্রীভবন্
মুক্তাকুঙ্মলমাঙ্কিমম্বর নদীবন্ধ্যা বনন্ধং লক্তঃ।
উদ্ভিন্ন স্মিতমঞ্জরীঃ পরিচিতা দিকামিনীং কল্পয়ন্
প্রত্যুম্মীলতু পুষ্পশায়ক যশোজন্মাস্তরশ্চন্দ্রমা ॥

৩। এতস্মাৎ ক্ষিতিভার নিঃসহ শিরোদর্ব্বীকর গ্রামণী
বিক্রমোৎসব দান দীক্ষিত ভুজাস্তে ভূভূজো জজ্ঞিরে।
যেষাম প্রতিমল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত
ব্যাখ্যানন্দ বিনিন্দ্য সান্দ্র পুলকৈর্ব্যাপ্ত সদস্যৈর্দিশঃ ॥

৪। অবাতর দথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং
সুধাকিরণশেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদঙ্ঘ্রি নখধোর নিস্ফুরিত মৌল যস্মাভুজাং
দশাস্ত নতি বিভ্রমং (অস্পষ্টং)

৫। নীলাম্ভোরুহ সোদরোপি দল যন্মর্মাণি কাদম্বিনী
কান্তোপি জ্বলয়ন্ মনাংসি মধুপ স্নিগ্ধোপিতষন্তয়ং।
নির্নিক্তাঞ্জন সন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্র ক্লমং বৈরিণাং
যস্তাশেষ জনাদ্ভুতায় সমরে কৌশেয়কঃ খেলতি ॥

৬। ভাস্বন্নিস্ত্রিংশ নিত্রা বিরহ বিলসিতৈর্ব্বৈরি ভুপাল বংশ্যা-
স্থুচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাবধিভুবমখিলাং শাসতোযস্য রাজ্ঞ
আসীত্তেজো জিগীষা সহ দিবস করে নৈব দোষস্থলাভু-
স্তৈস্ত্রে রাশীবিষালামঞ্জনিদিগধিপৈরেব সীম্নোর্বিবাদঃ॥

৭। খেলৎখড়্গা লতাপ মার্জ্জন হৃত প্রত্যর্থি দর্প জ্বর
স্তস্মাদ প্রতিমল্ল কীর্ত্তির ভবদ্বল্লাল সেনোনৃপঃ
যস্যাযোধন সীম্নি শোণিত সবিন্দুঃ সঞ্চারা যাংহৃতাঃ
সংসক্ত দ্বিপদন্ত দণ্ড শিবিকা মারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ॥

৮। শ্রীকান্তোপিন মায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপ্য ক্ষত্রং
বক্তুং নেতা পটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্ত দোষগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপিন জিহ্মগৈঃ পরিবৃত স্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভুত
স্তস্মাল্লক্ষ্মণ সেন ভুপতি রভূদ্ভূলোক কল্পদ্রুমঃ॥

৯। প্রত্যূষে নিগড় স্বরৈ নিয়মিত প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপান মুক্ত করভ প্রোদ্দোল ঘণ্টারবৈঃ।
সায়ংবেশ বিলাসিনী জনরণন্মঞ্জীর মঞ্জু স্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনাবন্ধ্যং ত্রিসন্ধ্যাংলতঃ॥

১০। নূনং জন্মশতেষু ভুমিপতি না সন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূ বৈধব্য কৃত্যব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ॥

১১। নগগন তল এব শীত রশ্মির্
কনক ভূধর এব কল্পশাখী।
নবিবুধপুর এব দেব রাজ্যো

১২। বাহূ বারণ হস্ত কান্ত সদৃশৌ বক্ষঃ শিলা সংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজল প্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈ তাং সমরাঙ্গণে প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কোজানাতি কুতঃ কুতোন বহুধাচক্রেঽনুরূপোরিপুঃ॥

১৩। বেলায়াং দক্ষিণাব্ধে মুষলধর গদাপাণি সংবাস বেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসি বরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎ সঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজ পূতে
যেনো চৈচর্যজ্ঞ যূপৌ সহ সমরজয়স্তম্ভমালাস্থধায়ি॥

১৪। যাং নির্ম্মায় পবিত্র পাণির ভবদ্বেধা সতীনাং শিখা
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈর্ব্বিশ্বং যযালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীভূর্রপি বাঞ্ছিতা নিবিদধে যস্যা সপত্নৌ মহা-
রাজ্ঞীশ্রীবসুদেবিকাস্য মহিষী সাভূত্রিবর্গোচিতা॥

১৫। এতাভ্যাং শশিশেখর গিরিজাভ্যা মিবরভূব শক্তিধরঃ
শ্রীকেশবসেন দেবোঽপ্রতিম ভূপাল মুকুটমণিঃ॥

১৬। দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্য দ্বিজানাংপরঃ
পাত্রৈ লৌহময়ৈর্হিরণ্য পদবীপ্রাপ্তাপিকো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্নিরমাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
যৎপাত্রাণি হিরণ্ময়ান্যপি পুনর্যান্তান্যয়োবর্ণতাং॥

১৭। আকৌমারমপার সঙ্গর ভর ব্যাপার তৃষ্ণাবশ—
শ্রান্তস্যাস্য নিশম্যবীর পরিষদ্বন্দ্যাপদো বিক্রমং
নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দ্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছন্তিররাতি ভূপ নিবহৈর্ভ্রাম্যন্তিরে বাস্যতে॥

১৮। আকর্ণাকৃষ্ট মেলকার বিশিখক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানাম্বুঃ কণগর্ভ দর্ত্তকল নৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধ বিসারণৈঃ পরিষদিত্রস্তৎ কুরঙ্গী দৃশা
মব্যাপার সুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি নৈতৎকরঃ॥

১৯। তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলী নীরদৈ
নীরন্ধ্রে্ব নভস্তটী মরকতৈঃ কণ্ঠাভুবঃ স্মারুহঃ
নীলগ্রীব কদম্বকৈ রবিরলা ভোগেব মুক্তাবলী
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞ হুত ভুগ্ধূমাবলী খেলতি।

২০। কল্পস্মারুহ কাননানি কনকক্ষ্মা ভৃদ্বিভাগান্নি ধে
রত্নানাং পুলিনান্তরাণিচ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা।
এতৎপাদ পয়োধর প্রণয়িনীচ্ছায়া বিতানাঞ্চলে
বিশ্রাম্যন্তি সতামনিন্দ্র বিদশোস্ত্যান্তা মনোবৃত্তয়ঃ।

২১। কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিত লোক্পালাবলী
বিলোকিত বিশৃঙ্খল প্রধন জৈত্র যাত্রোত্তরঃ।
শশাস পৃথিবী মিমাং প্রথিত বীরবর্গাগ্রণী
সগন্ধপবনাম্বয়ঃ প্রলয়কাল রুদ্রোনৃপঃ॥

২২। পদ্মালয়েতি ব্যাখ্যাতির্লক্ষ্ম্যা এব জগত্রয়ে।
সরস্বত্য পিতাং লেভে যদ্দান ন কৃতালয়া।

২৩। আরুহ্যাভ্রং লিহ গৃহ শিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং
পশ্যন্তীভিঃ পুরি বিহরতঃ পৌরসীমন্তিনী ভিঃ।
বার্ত্তাকুতৈর্নয়ন চলিতৈ বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণ বিঘটিতঃ প্রেমবদ্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ॥

২৪। এতদ্দোষ্মত বেশ্ম সঙ্কটভুজ স্রোতস্বতী সৈকত
ক্রীড়া লোল মরাল কোমল কণৎকাণ প্রণীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যা দধিরে মহীমথবতানেক প্রতিষ্ঠাভৃতা
পার ক্রমশালী শালি সরল ক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ॥

ইহখলু জম্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্ধা বারাৎ সমস্তস
প্রশস্ত্যপেত অরিরাজ শূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয়
সেন দেব পাদানুধ্যাত সমস্ত স প্রশস্ত্য পেত অরিরাজ
শূদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লাল সেন পাদানু

খ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যু পেত অরিরাজ সূদন শঙ্কর
গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন পাদানুধ্যাত সমস্ত
সপ্রশস্ত্যু পেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি
রাজাত্রয়াধিপতি সেনকুল কমল বিকাশ
ভাস্কর সোমবংশপ্রদীপ প্রতিপন্ন দানকর্ণ
সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্র-
পঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমসৌর
মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর
গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেন দেব পাদা
বিজয়িনঃ সমুপাগতা শেষরাজ রাজন্যক
রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্যমহা
পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসন্ধি বিগ্রহিক
মহা সেনাপতি মহাদৌঃ সাধিক চৌরো
দ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষা জীবিকা
দিব্যাপৃত গৌল্মীক দণ্ডপাশিক, দণ্ড
নায়ক নেয়গ পত্যাদী ন ন্যাংশ্চ সকল
রাজ্যাধিপ জীবিনোহ অধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ
চট্টভট্ট জাতিযান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ
যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিশ্চ।
বিদিত মস্তু ভবতাং॥ যথা—
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যান্তঃ পতি বঙ্গে বিক্রম
পুরভাগ প্রদেশে প্রশস্তলতা টঘড়া ঘাটকে
পূর্ব্বে সত্রকাধি গ্রাম সীমা, দক্ষিণে
শাকর বসা গোবিন্দ বনান্তর্ভূঃ সীমা
পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদান্ত্যায় সর
গ্রামসীমা, উত্তরে বাগুলীক্ষি গাতাস্তদ্য
মানভূঃ সীমা ইথং যথা প্রসিদ্ধ সসীমা
বচ্ছিন্ন বৃহস্পতি চরণৈঃ শুভবর্ষ বৃদ্ধৌ দীর্ঘা

যুষ্ঠ কামনয়া সমুৎসর্গীতা, সচ্ছায়োৎ
পত্তিকা সাচ ভূমিঃ সগর্ত্তো ষরা
সজল স্থলখিল পলাশ গুবাক নারিকেল
চণ্ড-ভণ্ড প্রদেশাবর্ত্তির্মন্তা আচন্দ্রার্ক
ক্ষিতি সমকালং যাবদ্দিনং তৎসজল
নানাপুষ্করিণ্যাদিকং কারয়িত্বা গুবাক
নারিকেলাদিকং লগ্‌গায়িত্বা পুত্র
পৌত্রাদি সন্ততি ক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপ
ভোগে নোপ ভোক্তুং। বাৎস্য সগোত্রস্য
ভার্গ চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য
পঞ্চ প্রবরস্য পরাশর দেবশর্ম্মণঃ প্র
পৌত্রায়, বাৎস্য সগোত্রস্য, তথা পঞ্চ
প্রবরস্য গর্ত্তেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়
বাৎস্য সগোত্রস্য তথাপঞ্চ প্রবরস্য
বনমালীর্দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য
সগোত্রায়, ভার্গ্য, চ্যবণ, আপ্নুবৎ, ঔর্ব্ব
জামদগ্ন্য পঞ্চপ্রবরায় শ্রুতি পাঠকায়
শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদা
শিবমুদ্রয়ামুদ্রয়িত্বা তৃতীয়াকীয়
জ্যৈষ্ঠা দিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন
চণ্ড-ভণ্ড দত্তা তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা
যত্র চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শাসন ভূমির্হি। ৩০০
যন্তবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানু মন্তব্যং।
ভাবিভির্নৃপতিভিরপহরণে নরকপাত
ভয়াৎপালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়াঃ
ভবন্তি ; চাত্রধর্ম্মানুসংশিনঃ শ্লোকাঃ
"আস্ফোটয়ন্তি পিতরোবর্ণয়ন্তি পিতামহা
ভূমিদোঽস্মৎ কুলে জাতঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি
উভৌতৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিণৌ
বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভি সগরাদিভিঃ
যস্য যস্য যদাভূমি তস্য তস্য তদাফলম্।
সদত্তাংপরদত্তাংবা যোহরেত্ত্ব বসুন্ধরান্
সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রানি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ
আক্ষেপ্তাচারুমন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ।
সর্ব্বেষামেবদানানামেক জন্মানুগং ফলং॥"

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয় মনুচিন্ত্য
মনুষ্য জীবিতঞ্চ সকলমুদাহৃতঞ্চ
বুদ্ধ্যানহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা।
সচির শতমৌলিলালিত পদাম্বুজস্য
সুশাসনভূতঃ শ্রীযুত দত্তোদ্ভব গৌড়মহা
ভট্টকখ্যাত শ্রীমৎ মহ্ননাকরণনিশ্রী
মহামদনক করণনি শ্রীমৎকরণনিসং।
ইতি ৩রা জ্যেষ্ঠ দিনে—

শ্রীরোহিনীকুমার সেনগুপ্ত।

ঘরের কথা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সিজারের পরিত্যক্ত পদের জন্য চুনাগলি হইতে বিস্তর আবেদনকারী উপস্থিত হয়, কিন্তু বর্ণে অনেকটা মৃত সিজারের সাদৃশ্য থাকায় ও মেষলোম-লাঞ্ছিত কেশগুচ্ছাবলীর কল্যাণে জোসেফ ব্যারেগাই মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতনে **উক্ত কর্ম্মে** ব্রতী হয়েন। দুর্ভাগ্যের ন্যায় সৌভাগ্যদেবীও সখিদলসঙ্গে মানব অদৃষ্টের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে অবতীর্ণা হয়েন। জো ব্যারেগার যদি চাকরী হইল, তবে কিছুদিন পরেই বিবাহও হইল। আবার বিবাহ বলিয়া বিবাহ নয়, জোর অদৃষ্টে অতি পরিপাটী চমৎকার মেম সাহেব জুটিল।

সোফি সুন্দরী নয়, কিন্তু সুশ্রী। কিঞ্চিৎ দীর্ঘায়তন ছিপ্‌ছিপে; যৌবনের পূর্ণতায় যেন নবপত্রাবলীসুশোভিত বাসন্তী লতার ন্যায়, দল্‌-দল্‌, লক্‌-লক্‌ করিতেছে। সোফি শ্যামাঙ্গিনী; কিন্তু সে মনমোহন শ্যাম-বরণ কাঞ্চন বা তুষার বর্ণাপেক্ষা শতগুণ সুন্দর, সহস্র গুণ মুগ্ধকর। সোফি নিজে তাহা বুঝিত; তাই সে পাউডার কিনিত না, রুজ চিনিত না। সোফির গর্ব্ব ছিল, যে তাহার মুটি-ভোর কটী খানি কর্সেটের দাসত্ব করে না। লক্কা পায়রার মত তাহার কোমলে-কঠিন বক্ষ স্বতঃই উন্নত, স্ফীত হইয়া থাকে। কিন্তু সোফির সার্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার কেশরাশির ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বিপুল ছিল। ভ্রমর-কৃষ্ণ ঈষৎ তরঙ্গায়িত, রেশমাপেক্ষা কোমল ও উজ্জ্বল, এলায়িত কেশরাশি যেন সোফির সিঁথিখানি চিত্রাকারে বেষ্টন করিয়া প্রতিমার চালের ন্যায় সুঠাম পৃষ্ঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া থাকিত। সিঁথির দুই ধারে দুইটী কুঞ্চিত ফণা অঙ্গুরী-আকারে

ঈষৎ নম্র হইয়া যেন সুচিত্র ললাটখানির মোহিনী ছটায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিত। যখন উষার স্নিগ্ধ সমীরসঞ্চালনে সেই শ্যামা কেশরাশি তরঙ্গ তুলিয়া দুলিত, তখন চুলের বিমল পরিমলে আকাশ ভাসাইয়া দিত। আহা, যে সে চুল দেখিয়াছে, ছুঁইয়াছে, দুই কর ভরিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে, আপনার চুলে, চিবুকে, বুকে স্পর্শ করাইয়া শিহরিয়াছে, চুল চুয়া পরিমলে মাতাল হইয়াছে, তাহারই জীবন— কি আর বলিব! আর ছিল, আমাদের সোফির চক্ষু। ভুরু দুটী যেন আঁকা, তার কোলে ঘন কালপাখা পাতলা পাতায় ঝালর দেওয়া, তার আড়ালে যুগল কাল তারা। সোফি কখন চক্ষে কাজল দিত না; কিন্তু দেখিলেই বোধ হইত যে, অতি সুন্দর কজ্জল-লেখায় সে চক্ষু-যুগল স্বতঃ উদ্ভাসিত। সমুজ্জ্বল তারা দুটী যেন সুনীল সফরীর ন্যায় সোহাগের শান্ত সলিলে সতত চঞ্চলভাবে খেলা করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দৃষ্টিতে কষ্ট-কটাক্ষপাত নাই; কিন্তু প্রতি চাহনিই যেন এক একটী মর্ম্মস্পর্শী কটাক্ষ। সে চক্ষে কি তাপ, কি তেজ, কি ব্যাকুলতা, কি বিহ্বলতা, কি বিলাস, কি বিভ্রম, কি আলস্য, কি লালসা, কি আবেগ, কি আবেশ! সে চোখ কি চায়, কাকে চায়, কেন চায়, ছল্ ছল্ ক'রে কি বলিবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়, কেমন করিয়া বলিব? সে চক্ষু হাসিলে কাঁদে, কাঁদিলে হাসে। সে চাহনি যেন ভালবাসার মধুতে ঢল্ ঢল্ করিয়া জগৎ সংসারে কোন অনুরাগের হারান ধন খুঁজিয়া বিহ্বল হইয়া বেড়াই-তেছে। সোফির সেই কুসুম-কোমল বিদ্যুদ্দীপ্তিপূর্ণ সুনীল নয়ন-যুগলে বায়রণের আবেগ, সেলির স্বপ্ন, জয়দেবের অমৃতময় অনুরাগের মুরলীঝঙ্কার, বিদ্যাপতির গোপ-বধূ-নয়নজলপ্লাবিত যমুনালহরী, চকিত চাহনিতে সোহাগের সহস্র ভাবের ফুলের ফোয়ারা খুলিয়া দেয় যে চক্ষু, তাহার বর্ণনা কেমন করিয়া করিব? অনুভব করিলেও

কি যে অনুভব করিতেছি ঠিক বুঝা যায় না; প্রাণের ভিতর যেন সব উদাস করিয়া দিয়া, একটা ভাষাহীন গান, একটা রবহীন সুর বসিয়া, কাঁদিবার জন্য অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়ায়। আমি যদি বৈজ্ঞানিক হইতাম, তবে হয়ত বলিতাম, সোফির চক্ষুদুটী তরলতড়িতপূরিত স্ফটিকপাত্রযুগল। তাই তাহার দীপ্তি, ব্যোমতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া হৃদয়ের রক্ত, তুমুল আন্দোলনে উথলিয়া দেয়; তাই তাহার অঙ্গুলি মাত্র স্পর্শে পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশশেষ পর্য্যন্ত সচকিতে শিহরিয়া সুখের কাতরতায় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে; তাই সেই স্নান-ধৌত স্ফীত চাঁচর চিকুরের সান্ধ্যসমীরণসন্তরিত একটী মাত্র কেশও অঙ্গে আসিয়া পড়িলে, শরীরের সূক্ষ্মাভ্যন্তর পর্য্যন্ত হর্ষের পীড়নে রি-রি করিয়া উঠে ও বাহ্য চৈতন্য ধীরে ধীরে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসে।

এই সোফি আবার সেই সৌন্দর্য্য সাজাইতে জানিত। বনে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আছে বটে, কিন্তু বনকে বাগান করিয়া তুলিলে, তার আর এক মধুর রমণীয়তা হয়। ফুল, গাছে গাছে ফুটিয়া, ডালে ডালে দুলিয়া রূপ ছড়ায় বটে, কিন্তু সেও জানে যে, সাজিলে তাকে আরও মানায়, তাই সে পাঁচটী অফোটা, দুইটী আধ-ফোটা কলির মাঝে গিয়া ফুটিয়া উঠে। কচি কচি সবুজ পাতাভরা নবীন শাখাটী বাছিয়া লইয়া, তার উপর ঘোমটা খুলিয়া নাচিতে থাকে। কোথাও বা ঘন পত্রদলমাঝে স্তবক বাঁধিয়া মালাকরকে তোড়া গড়িতে শেখায়। আবার কখন কলা-বিলাসিনী যুবতীর চম্পক-কলি-অঙ্গুলি হেলনে, হাররূপ ধরিয়া তার কবরীকুণ্ডল ঘিরিয়া বিহার করে। যুবতীকে সাজায় আপনি সাজে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জগদীশ্বর মানবকে আপনার অংশ দিয়া সৃজন করিয়াছেন, সেই পরম সুন্দরের সুন্দর সৃষ্টিকে সুন্দরতর করিবার ভার মানবের উপর।

যেমন কোন মহাকবির মহাকাব্যের অংশ হইতে, অংশান্তর বাছিয়া লইয়া মন্দ কবিযশপ্রার্থীগণ নব নব কবিত্বের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, তেমনি সেই প্রেমময় নটবর জগৎ-কবির এই ভাবময় সুষমাপূর্ণ বিশ্ব-কাব্যের প্রতি চরণ হইতে, উপাদান সংগ্রহ করিয়া মানব সংখ্যাতীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে; সৃষ্ট পদার্থবিশেষকে সৃষ্ট পদার্থান্তরের সুচারুসহযোগে অলঙ্কৃত করিতে পারে। দেহমন-সম্পন্ন মানবকে সমগ্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের সারভূত বলিয়া মানব গর্ব্ব করিয়া থাকে। সুতরাং এই ভগবদ্দত্ত দেহমনকে মাজিয়া ঘসিয়া রূপ তুলিয়া, বসনভূষণ দিয়া অলঙ্কৃত করা প্রত্যেক নরনারীর অবশ্য পালনীয় প্রথম কর্ত্তব্য। মনকে মলীনতা মাখাইয়া উলঙ্গ, নিরলঙ্কৃত রাখিলে, মানব যেমন মনুষ্যত্বের উচ্চ পদবী হইতে বিচ্যুত হইয়া, ইতর পশুত্ব, পূতিময় প্রেতত্বের সুদূর নিম্নস্তরে পতিত হয়; তেমনি পরমাত্মার লীলাক্ষেত্র হরিমন্দিরস্বরূপ এই দেহকেও অবহেলা করিয়া ময়লামাটি মাখা ব্যাধি-বিকার-আধার করিয়া রাখিলে, ইহার স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠবের শ্রীবর্দ্ধন না করিলে, মানবত্বের উন্নতির স্ফূর্ত্তি হয়না।

দেহের সহিত মনের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আর্য্যঋষিগণ তাহা বিলক্ষণ রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, একের অবনতিতে অপরের অধোগতি, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের সৌন্দর্য্যে অপরের সৌন্দর্য্য, এবং উভয়ের সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্ফূর্ত্তিতে আত্মার ঐশ্বর্য্যবিকাশ। সেই জন্যই এত স্নানাহ্নিকের ধুম, এত সঞ্জম উপবাসের নিয়ম, এত খাদ্যাখাদ্যের বিচার, বেশভূষারও এত বাঁধাধরা বন্দোবস্ত। সনাতন শাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করিলে দেখা যায়—প্রতি গ্রন্থ প্রতি অনুশাসন, প্রতি শ্লোকের সারার্থ—মুখ্য উদ্দেশ্য, দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন।

যখন কোন জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা সৌন্দর্য্য

উপলব্ধি করিতে, সুন্দরের আদর, সুন্দরের পূজা করিতে শিক্ষা করে। একদিন ভারতবাসী আর্য্যগণ সেই উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া কবিতার স্বর্গীয় সুধারসে বসুমতী প্লাবিত করিয়া দিয়াছিলেন। জড়জগতে, জীবরাজ্যে, উদ্ভিদ্-উদ্যানে সলিলসম্ভারে, নক্ষত্রনিকরে, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের ঘটাছটা দেখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তাকে সুন্দরের সুন্দর পরম সুন্দররূপে অনুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বুঝিয়াই সৌন্দর্য্যের সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে শিখিয়া, সূর্য্য সোম, বহ্নি, বৃক্ষ, গিরি, নদী প্রভৃতিকে দেবসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া কুসুমচন্দনে কবিতাময় স্তুতিগানে ইহাদের পূজা করিতেন। সুন্দরকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া শ্যামসুন্দরের শিরে শিখিপাখা, গলায় বনমালা, কণ্ঠে কৌস্তুভ রতন; তাই শ্মশানবিহারী রজতবরণ, নীলকণ্ঠ ও ফণিফণা ভূষিত, ভালে শশী শোভিত, বক্ষে অক্ষমালা বিরাজিত, অপূর্ব্ব সুন্দর যোগী। সেই জন্যই জগজ্জননীর কাঞ্চন-কমল-লাঞ্ছিত অঙ্গে এত অলঙ্কার, শ্রীচরণে এত জবা চন্দন, মন্দিরে এত ধূপ দীপ।

সেই মহিমাময় আর্য্য-জাতি চলিয়া গিয়াছেন, সেই মনোরম-কান্তি, হিরণ্ময়-হৃদয় পূর্ব্বপুরুষগণ, পরমসুন্দর পুরুষোত্তমের চরণে মিলিত হইয়াছেন। কর্ত্তিত শস্য ভারতক্ষেত্রে আমরা কতকগুলা আবর্জ্জনা মাত্র পড়িয়া আছি। খনির কহিনুর রাজগৃহে গিয়াছে, শূন্য গহ্বরতল অন্ধকার করিয়া ক্ষার-অঙ্গার গড়াগড়ি যাইতেছে। সৌন্দর্য্যের আদর আমাদিগের নিকট হইতে লোপ পাইয়াছে। সুন্দরের অর্থই আমরা বিকৃত করিয়া লইয়াছি। প্রেমের পবিত্র পদে পাশব কামকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, রূপকে মনুষ্যত্ব ধ্বংসকারী অপদেবতার সুরাপাত্র-বাহিনী সেবিকার কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছি। সুতরাং মিতাচারী লোকের নিকট রূপ-চর্চ্চা এক প্রকার নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

এই প্রকারেই নৃত্যগীতাদি স্বর্গীয় কলাও ভদ্র পরিবারের পরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোভ ও মাৎসর্য্য আসিয়া সময়ে সময়ে সৌন্দর্য্য পূজার নামে আমাদের সেবা লইয়া থাকে। জ্ঞানশিক্ষাতে অলঙ্কারের যথাযথ বিন্যাসদ্বারা মনের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি না করিয়া, আমরা পুরুষ জাতি যেমন গ্রন্থগত সূত্র, বচনের রাশিকৃত ভারে মনের স্বাস্থ্য ও শ্রীহরণপূর্ব্বক, তাহাকে বিকৃত, দুর্ব্বল ও অবশ করিয়া পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছি; আমাদের মহিলাগণও তদ্রূপ শরীরের লাবণ্য বা সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, স্বর্ণকার বিপণি-শোভা খচিত রজতকাঞ্চনস্তূপে তাঁহাদিগের সুকোমল দেহগুলিকে ভারাক্রান্ত বিকৃতশ্রী, অপটু ও সাংঘাতিক প্রেমালিঙ্গনের উপযোগী করিয়া মাৎসর্য্যের পরিতৃপ্তি করিতেছেন।

ননীন্দ্র বাবুকে দেখিলেই যেমন বুঝা যায় যে, তাঁহার পাণ্ডুর-মস্তিষ্কটী বিশৃঙ্খল ব্যবহৃত বলটিং কাগজের ন্যায় এলজেব্রা, ট্রিগনমেট্রি, মিল, মেকলে, হক্সলি, স্পেন্সার প্রভৃতির মুদ্রিত পৃষ্ঠারাশির অস্পষ্ট প্রতিলিপিতে পরিপূর্ণ; তাঁহার সহধর্ম্মিণী ননীবালাকেও দেখিবেন, যেন সুন্দরীর ভুজমৃণালযুগলের সমস্ত অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে; তাই বাছার বাহুমূল হইতে মণি-বন্ধ পর্য্যন্ত, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলিচয়ের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সমস্ত হাত দুখানি সোণার পতর-রাশির সাহায্যে এক রকম করিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছে; যেন উভয়পক্ষের প্রণয়-শৃঙ্খলাভাবের ক্ষতিপূরণার্থ সুন্দরীর কম্বুকণ্ঠ হীরামতিকাঞ্চনের শত শৃঙ্খলভারে অবনত করা হইয়াছে। কুণ্ডলীকৃত কৃষ্ণকবরী, জরী, জাল, ফিতা, ফালি, ঝালর, কাঁটার আবরণে মনোহারীর পসরার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, আর যেখানে সুচারু শ্রবণযুগল থাকার কথা, সেইখানে কাঞ্চনের করী-কর্ণ-দ্বয় দপ্ দপ্ করিতেছে। অলঙ্কারের যাতনায়, সতর্কতার তাড়নায় শশীমুখীর শরীর আড়ষ্ট, বদন পীড়াক্লিষ্ট, শুল

ব্যথার পরিচায়ক। সুন্দরীর শরীরখানি হয় আকগাছটী, নয় চাল-কুমড়াটী; কোন ভাবেই সরুমোটা-খেলা সৌষ্ঠবের সম্পর্ক নাই।

আবার সৌন্দর্য্যের মুলোপকরণ স্বাস্থ্যের কথা যদি ধরা যায়, তবে, তাহার অভাব বা বিকারই বর্ত্তমানকালে স্ত্রীপুরুষ উভয়ের মধ্যেই সৌন্দর্য্য সৌকুমারত্ব ও সমৃদ্ধির নিদর্শন। অবলার যদি অম্বল, হিষ্টিরিয়া বা অন্য একটা রিয়া-টিয়া দেওয়া পীড়া না রহিল, তবে তাঁহার ভূজঙ্গিনী বেণী, কুরঙ্গিনী নয়ন, চন্দ্রমা বদন, জোছনা বরণ, মুক্তার সেলিকারচোপের কাঁচলি সকলই ব্যর্থ হইল। যুবতীর জন্য যদি বেতন-ভোগী ডাক্তার না রহিল; বাছা যদি উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিলেন তবে তাঁহার যৌবনেও ধিক, আর তাঁর স্বামীর কলেজের পাশ, তেতলায় বাস, কাছারীর শামলা, মক্কেলের মামলা, এ সকলেও শতধিক্!

বাবুদের বেলা বলিতে হইবে, যে শ্রীযুতের তেরখানি তালুক, তেত্রিশ লাখ টাকার কাগজ, তিপ্পান্ন খানি বাড়ী, তেরখানি গাড়ী, আর এই তিন বৎসরের ডাইয়েবেটিস। যখন শুনা যাইবে যে, অমুক মোহন অমুক মহাশয় জগদীশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত আহার্য্যেই বঞ্চিত হইয়াছেন, কোন রসেই রুচি নাই, জল জীর্ণ হয় না, ছাগ-দুগ্ধের মাখনে দুইখানি মিছরীর বাতাসা ভাজিয়া, সায়াহ্নে পথ্য করেন; দুই কুক্ষিতে দুইটী থার্মোমিটার গুঁজিয়া এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয় দক্ষিণে, বামে দিবারাত্রি বসিয়া আছেন; হাকিম ও কবিরাজ প্রত্যেকে এক একখানি হস্ত লইয়া অবিরাম নাড়ী টিপিতেছেন আর দু'একখানি হস্ত থাকিলে গোবৈদ্য, অশ্ববৈদ্য প্রভৃতিও প্রতিপালিত হইত। যখন, অপরাহ্ণ চারিটার সময়ই হিমের ভয়ে, বাবু ঘরের সমস্ত শাশী খড়খড়ি বন্ধ করিতে বলিয়া, গৃহতলস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলনিকাশের পথগুলিতে ছেঁড়া মোজা গুঁজিয়া দিতে আজ্ঞা দেন; যখন দেখা যাইবে যে, দ্বাদশটী

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর্ককলা আস্ফালন করিয়া যজমানের আরোগ্য কামনায় অনবরত চণ্ডীপাঠে ভ্রম করিতেছেন ;—তখনই স্থির বুঝা যাইবে যে, বাবুর ব্যাঙ্ক-বহিতে এইবার ক্রোর পূর্ণ হইয়াছে, চাঁদার খাতায় রাজাবাহাদুরের পূর্ণ মাশুল জমা পড়িয়াছে। যাঁহাদের উঠ্‌তির সময় তাঁহারাও দেখা-দেখি চিনি দেখা দিয়াছে বলিয়া, মৃদু হাস্যে বিষাদের আস্ফালন করেন। ছত্রধারী ভূপতির ন্যায় ডায়েবেটিস বিদ্বান ও ধনী উভয়কেই সমাদর করেন। আর মধ্যবিৎ ব্যক্তিরা অবস্থানুসারে অম্বল বা ধাতুদৌর্ব্বল্যের দোহাই দিয়া, এক রকম তিলকাঞ্চনে কার্য্য সারিয়া লয়েন।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্র।

কর্তৃপক্ষগণ পূর্ব্বে আমাদের আর্থিক উন্নতির জন্য কিরূপ ব্যগ্র ছিলেন তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুস্তকে * ভাল রকম করিয়াই দেখান হইয়াছে, যদিবা কাহারো তৎসত্ত্বেও কোন সন্দেহ থাকে, তবে বর্ত্তমান স্বদেশী-আন্দোলনে যেরূপ সাগ্রহ সহায়তা পাওয়া গিয়াছে, লাট হইতে একজিকিউটিভ টিকৃটিকি পর্য্যন্ত যেরূপ সহানুভূতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে অন্তত আশা করা যাইতে পারে যে, এ বিষয়ে আমাদের কুসংস্কার এজন্মের মত ঘুচিয়া যাইবে।

---

* Dutts' Economic History of British India.

সামদানদণ্ডভেদ ত সেকালের রাজনীতিশাস্ত্রে জানা ছিল ; সুসভ্য প্রতীচ্যগণ যে তাহার উপর কিছু বাড়াইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি ? ডিগ্‌বী সাহেব * দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের আবিষ্কৃত রাজ-নৈতিক অস্ত্রের মধ্যে প্রধান, পোস্ত অর্থাৎ অহিফেন। অসভ্য চীনের চিকিৎসার্থে তোপের মুখে যে অহিফেন প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহার কথা হইতেছেনা ; ডিগ্‌বী সাহেবের পোস্ত রূপকমাত্র। বাংলায় তাহাকে সম্মোহনমন্ত্র বলিলে চলে।

সাম ও সম্মোহনে প্রভেদ আছে। সংযত অত্যুক্তি, সুসম্বদ্ধ মিথ্যাকথন, ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অপব্যবহার এই শেষোক্তটির উপকরণের মধ্যে গণ্য। Political Economy নামক যে অলীক শাস্ত্রটি য়ুরোপে কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হয় তাহা এই সম্মোহন কার্য্যের বিশেষ উপযোগী। ইহার কাঠাম বৈজ্ঞানিক, কিন্তু বাস্তব রাজ্যের সহিত প্রকৃত যোগাযোগ অল্পই, সুতরাং ইহার বচনের দ্বারা নানা বিপরীত মতের সমর্থন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রথম প্রথম য়ুরোপের আসিয়া ও আফ্রিকাবিলুণ্ঠনকার্য্যকে শ্রুতি-মধুর শব্দাড়ম্বরে ঢাকিবার কার্য্যে এই শাস্ত্রের বচনাবলী নিযুক্ত হয়। আত্মপ্রসাদ ভিন্ন তখন এ চেষ্টার অন্য কোন উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ ছিল না, কারণ যে দুর্ব্বল জাতিগণের সর্ব্বনাশ সাধিত হইত তাহাদের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা এমনেও ছিল না, অমনেও ছিল না, ভাল মন্দ নামে তাহাদের কি আসিবে যাইবে ? ক্রমে, কিন্তু, আমরা যখন সবল ও সমজদার হইয়া উঠিতে লাগিলাম তখন সেই বুলিগুলি আমাদের সম্মোহন কার্য্যে প্রয়োগ হইতে লাগিল ; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠেকিয়া শিখিবার অবসর এতবার ঘটা সত্ত্বেও, সেই একই

* Digby's Prosperous British India.

সনাতন কৌশল ইংরেজ কর্ত্তৃক আজও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আজও অনেক ক্ষেত্রে সফল হইয়া থাকে।

ইংরেজের কৌশলকেও বাহবা দিতে হয়, আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতাকে বলিহারি যাই! বার বার যাহারা ভক্ষককে রক্ষক করিতে প্রস্তুত তাহাদের আর উপায় কি? যাহার সহিত দ্বন্দ তাহারই পরামর্শ-গ্রহণ একার্য্য মহাভারতের আমলে ভীষ্ম পিতামহের মত লোক সম্বন্ধে সুযুক্তি হইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালী কি কলিকালেও সত্যযুগ-সুলভ বালকত্ব পরিত্যাগ করিবে না?

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের উপর প্রথম কোপ পড়িয়াছিল সুতরাং সে সময়কার নিশ্চেষ্টতার জন্য নিজেদের দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এত দিনের ভোগের পরেও আমাদের মধ্যে অনেকে উঁহাদের বাঁধ গতের ত'লে তালে নাচিয়া বেড়ান। Demand, Supply, Export, Import, Division of labor প্রভৃতি শুনিলে আমাদের হাতপায়ে খাল ধরিয়া আসে কেন? যাহাদের দেশে খাদ্যাভাব তাহাদের free trade নইলে চলে না, আমরা তাই বলিয়া স্বদেশকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য দুই এক পয়সা অধিক মূল্য দিতে এত কুণ্ঠিত কেন? যাহার পরের ধন লুটিবার বল আছে তাহার নবাবী করা সাজে, অন্তত সাজুক না সাজুক কাহারো আপত্তি করিবার সাহস হয় না। কিন্তু যাহাদের সর্ব্বস্ব অপহৃত হইতে চলিল তাহারা High standard of living বলিয়া মরে কেন? যাহাদের তোপ আছে তাহারা মিলের রদ্দি মাল অনায়াসে কাটতি করাইতে পারে, আমরা কিসের জোরে এমন ভাব দেখাই যেন মিল না হইলেই জন ষ্টুয়ার্ট অশুদ্ধ হইয়া গেল?

স্বীকার করি যে, আমাদের দেশে যখন অর্থনৈতিক চিন্তা করা হয় নাই তখন কর্ম্মক্ষেত্রে য়ুরোপীয় চিন্তার সাহায্য গ্রহণ করিতে

হইবে। আমার বক্তব্য শুধু এই টুকু যে, উহারা আমাদের যাহা গিলাইবার জন্য ব্যস্ত থাকে তৎসম্বন্ধে যেন আমরা বিশেষ সতর্ক থাকি। নিজেদের দুরবস্থা মোচনের জন্য যে ভাবনা উহারা ভাবিতেছে তাহা হইতে বরং আমরা যথেষ্ট উপকার পাইতে পারিব।

উহাদের দুরবস্থা! এ কথাটা অনেকের হাস্যকর লাগিতে পারে। লাগিবে না কেন? যাহাদের কথা হইতেছে, তাহাদের মধ্যেই বা কয়জনের সে সম্বন্ধে চৈতন্য আছে? জন বুলের বাচ্ছা হুইস্কিগেলাস হস্তে আরাম কেদারায় ঠেসান দিয়া চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে কতই না সুখস্বপ্ন দেখিতে থাকে। আহা! তাহার বিলাসের উপকরণ যোগাইবার জন্য পৃথিবী শুদ্ধ খাটিয়া খুন। ভারতবর্ষ পর্ব্বত-প্রমাণ ফসল পাঠাইতেছে, অষ্ট্রেলিয়া কসাইখানা ও আমেরিকা ফলের বাগান হইয়া উঠিল, দেশ-বিদেশ হইতে বস্ত্রের উপকরণ বর্ষণ হইতেছে। তাহার বিনিময়ে কালো কুর্ত্তার মধ্যে লুকান সভ্যতা, বন্দুকে গাদা সুশাসন ও বোতলে পোরা ধর্ম্মজ্ঞান সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। পৃথিবীব্যাপী জটিল আদান-প্রদানের কি মনোহর দৃশ্য!

কিন্তু ইহা কি বারুদের উপর বসিয়া চুরুট ফোঁকা নহে! তাহার ত কিছু কিছু পরিচয় এই বারেই পাওয়া গেল। বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠের "বন্দে মাতরম্" শব্দে ম্যাঞ্চেষ্টার কাঁপিল। বাঙ্গালীর আওয়াজ আজও ক্ষীণ, কারণ সমস্বরে চীৎকার করিবার অভ্যাস নাই। কিন্তু অভ্যাসে যদি তোৎলা সুবক্তা হইতে পারে, তবে বাঙ্গালীও একদিন একতান গীত গাহিতে শিখিবে। তখন?

কর্ত্তারা এখানেই হাতে হাতে টের পাইয়াছেন যে, রেলওয়ে গার্ডদের ধর্ম্মঘট ও নিরীহ ছাপাখানাওয়ালাদের ধর্ম্মঘটে প্রভেদ কি। যখন বিলাতি কারিগরবৃন্দের পেটের জ্বালায় মাথা গরম হইবে, তখন তাহার ফল বন্দে মাতরমে অবসান হইবে না তাহা

লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের কথা পার্লামেণ্ট কাণে তোলে না, কিন্তু যাহারা কাণ টানিতে জানে তাহারা যখন আমাদের মুখের কথায় ও কলমের আঁচড়ে ক্ষেপিবে তখন পার্লামেণ্ট মাথায় তুলিয়া কুলাইতে পারিলে হয়।

শুধু আমাদের নিকট হইতে যে য়ুরোপের বিপদের আশঙ্কা তাহা নহে। উহাদের দানবিক সভ্যতার ধ্বংশের বীজ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার অঙ্কুরও দেখা দিয়াছে। শ্রমবিভাগ (Division of labour) নামক যে ভিত্তির উপর উহাদের সমস্ত কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে শ্রমজীবিদের মনুষ্যত্ব লোপ করিয়া তাহাদিগকে সুবৃহৎ কলের রক্তমাংসের খণ্ডাংশ করিয়া তোলে। এই সম্প্রদায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশই বিপ্লবের মুখে ছুটিতেছে।

কিন্তু এই বিপ্লব যে আকারেই আসুক না কেন, ইহা ভয়াবহ নহে। ইহা দানবিক ভৌতিক মায়ার শৃঙ্খল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিবে। কলির শেষের সূচনা করিয়া সাত্ত্বিক সভ্যতার বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক করিবে। কিন্তু সে বাঞ্ছনীয় পরিণামের পূর্ব্বে বিস্তর রাজসিক আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রেও তাহাই বলে, ইতিহাসে তাহা প্রত্যক্ষ করা যায়।

যাহাদের সভ্যতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে, তাহারা এ বিপ্লবকে ভয় করিবে, তাহার প্রতিকারের জন্য প্রাণপণ করিবে তাহাত ধরা কথা। কিন্তু যাহাদের পক্ষে ইহা প্রাণদানস্বরূপ হইবে তাহাদের উপর উহাকে অগ্রসর করিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। বিধাতার সে লিখন সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হইতেছে।

বঙ্গমাতার ছিন্ন কলেবরের মধ্য হইতে এবার আমারা যে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়াছি সে বিষয়ে কি কুলাঙ্গার ব্যতীত অন্য কোন বঙ্গ সন্তানের সন্দেহ আছে? তবে সে অস্ত্রের প্রয়োগকৌশলসম্বন্ধে এখনো অনেক সাধনা আবশ্যক, তাহা গুর্খারা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। সমদমত্যাগাদি সাধনার সমগ্র ঠাট বজায় রাখিতে হইবে, সে কথাও ভুলিলে চলিবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে যে নেতার আঁচল ধরিয়া সাধনা হয় না, উহা প্রত্যেকের একাই করিবার বিষয়; ইহা মনে রাখিতে পারিলে

আনুসঙ্গিক এইটুকু উপকার পাওয়া যাইবে যে, কোন নেতার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে তজ্জন্য গৃহবিবাদ করিতে বসিবার প্রলোভন উপস্থিত হইবে না। ভ্রম হইলে নিজেকে ধিক্কার দেওয়াই পুরুষোচিত। তাহা হইলে সান্তনার কথা এইটুকু থাকিয়া যায় যে, যে কিছুই করে না সেই ভুল করে না। আমরা যদি অর্থনীতির চর্চ্চা করিতে চাহি তাহা হইলে লাভ-লোকসানের দিকে চোখ সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। আত্মগ্লানির একমাত্র লাভ দ্বিগুনিত চেষ্টা। পরের উপর রাগ করাটা সম্পূর্ণ লোকসানের মধ্যেই গণ্য।

সাময়িক আন্দোলনে চিত্ত যেরূপ উদ্ভ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে এ প্রবন্ধে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়িয়াছে। শিরোদেশে মূল আলোচ্য বিষয় বলিয়া যাহা প্রকাশ, তাহা এতক্ষণে এতই সুদূরপরাহত হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রবন্ধের শেষভাগে আর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যাবর্ত্তনের বিফল চেষ্টা করিব না। মনের আবেগে আজ নানা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা গিয়াছে। তন্মধ্যে উপস্থিত ক্ষেত্রে যে গুলির সার্থকতা আছে, তৎসম্বন্ধে বারান্তরে ঠাণ্ডাভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামদাস ও তাঁহার পত্নী।

নদিয়া জেলার মেটেরিগ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণসন্তান রামদাসের অলৌকিক বলবীর্য্যের কথা অনেকেই বোধ হয় পরিজ্ঞাত নহেন। এই বীর্য্যবান পুরুষের সম্বন্ধে যে কয়েকটী অত্যাশ্চর্য্য প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে তিনি যে একজন অসীম দৈহিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্ষীণদেহ শক্তিহীন বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক ভীমদেহ বলবান পুরুষের সন্ধান দুর্লভ হয় না। রামদাস সম্বন্ধীয় কয়েকটী অমানুষিক ঘটনা নিম্নে দেওয়া হইল :—

রামদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন ; তাঁহার জগ্ ...

দ্বিতলগৃহে পিতৃপিতামহপ্রতিষ্ঠিত একটী বিশ মন ওজনের রাম-সীতা বিগ্রহ ছিল। সে দিন ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি; রামদাসের জীর্ণ বাসবাটী বায়ুবেগে পতনোন্মুখ। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কাতর স্বরে পুত্রকে বলিলেন,—"বাবা বিগ্রহ রক্ষা হয় কি করিয়া? আজ বুঝি আমার রাম-সীতা এই ভগ্ন বাটীর ইষ্টকস্তুপের মধ্যে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া যান!"

দেবতার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধার নয়নে দরদরধারে অশ্রু বহিল।

রামদাস চঞ্চল হইলেন, বলিলেন,—"ভয় কি মা! আমি কি করিতে রহিয়াছি?—আমিই রাম-সীতাকে আজ রক্ষা করিব।" বলিয়াই রামদাস বিদ্যুদ্বেগে একেবারে দ্বিতলকক্ষে উপস্থিত হইলেন; পিতা যেমন ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে লয়, রামদাস তেমনই সেই বিশ মন ওজনের বিগ্রহটী বুকে তুলিয়া ধরিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই সুউচ্চ দ্বিতল কক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাটীর সেই অংশ প্রবল শব্দে ভূমিসাৎ হইল।

রামদাস নিচে পৌঁছিয়া অনাহত বিগ্রহকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিলেন। তাঁহার গাত্রে এক আঁচড়ের দাগও দেখা গেল না।

রামদাস এক সময়ে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। আরোগ্যের জন্য কবিরাজ পরামর্শ দিয়াছিলেন, প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের সময় তিনি যেন ডুব দিবার পরিবর্ত্তে মাথায় জল ঢালিয়া স্নান করেন। রামদাস জল ঢালিবার জন্য প্রত্যহ পাত্র সঙ্গে আনিতেন, কিন্তু সে দিন তাঁহার ভুল হইয়াছিল। বাড়ী নিকটে ছিলনা, ব্রাহ্মণ তাই আর ফিরিলেন না। নিকটে একখানা জেলে-ডিঙ্গি বাঁধা ছিল, তিনি সেইটাই দু'হাতে তুলিয়া লইলেন, এবং বারম্বার তাহা পূর্ণ করিয়া মাথায় জল ঢালিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা স্নান করিতেছিলেন তাঁহারা অবাক হইয়া রামদাসের এই কীর্ত্তি দেখিলেন।

এক ধনীর গৃহে শ্রাদ্ধ। নানারকম আয়োজন হইয়াছে। দানের জন্য হাতী ঘোঁড়া বাঁধা রহিয়াছে। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত রামদাসও নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে গিয়াছেন। তাঁহার অমিত বলের কথা তখন গ্রামস্থ কেহই অপরিজ্ঞাত ছিলেন না। সকলেই ধরিয়া

পড়িলেন, রামদাসকে তাঁহার শক্তিসামর্থ্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে হইবে। রামদাস অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তখন তিনি একজন মাহুতকে ডাকিয়া সম্মুখে বড় হাতীটা আনিতে বলিলেন। হাতী আসিলে রামদাস এক হস্তে সবলে হাতীর শুঁড় ধরিলেন, মাহুতকে বলিলেন—"তোর হাতীকে তুই ফিরিয়া নিয়ে যা!" মাহুত ইঙ্গিত করিল, হাতী নিরবনিশ্চল, এক পাও হটিতে পারিতেছে না। মাহুত তখন প্রহার করিল, বেদনায় অস্থির হইয়া হাতী নিরুপায় বশত ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল—তবু এক পাও নড়িবার সামর্থ্য হইলনা। তখন রামদাস ছাড়িয়া দিলেন।

রামদাসপত্নী স্বামীর উপযুক্তাই ছিলেন। সে দিন কোথা হইতে রামদাসের বাটীতে একটী বৃহৎ সিন্দুক আসে। আট দশ জন মুটিয়া সেটা মাথায় করিয়া আনে। যে কারণেই হউক, সিন্দুকটী আর ঘরের ভিতর তোলা হইলনা, দরজায় সামনেই পড়িয়া রহিল। রামদাস সে দিন একটু অসুস্থ ছিলেন, এই সংবাদ শুনিয়া তিনি সিন্দুক তুলিতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"অসুখ শরীরে যাচ্ছ কোথা?" রামদাস বলিলেন, "যাই সিন্দুকটা তুলিয়া আসি।" রামদাসপত্নী তখন হাসিয়া বলিলেন—"তোমায় আর যেতে হ'বে না, আমি একলাই সেটা তুলে রেখে এয়েছি।"

এ কথা গুলি বিশ্বাসযোগ্য না অবিশ্বাস্য বলিব? আমাদের মনে হয়, ইহা একেবারে অসম্ভব নহে। অসুরদেহ স্যাণ্ডো যে প্রকার শারীরিক বলের পরিচয় দিয়াছেন তাহা চোখে দেখিয়াও যে বিশ্বাস হয় না—তাহা যখন সম্ভব, তখন রামদাস ও তাঁহার পত্নীর কার্য্যসমূহ যে সম্ভবপর নহে তাহা কেমন করিয়া বলি। যাহাহউক, বাঙ্গালী রামদাসের মত আরও কত অমানুষিক শক্তিশালী মহাপুরুষ বাঙ্গালার চিতাস্তূপের মধ্যে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া আছেন, কে তাঁহাদের সন্ধান লইবেন?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

খেয়াল খাতা।

গোরাচাঁদ বনাম শ্যামামা।

(শ্যামাবিষয়।)

ওহে গৌর গৌর হে, তোমার মুখে পড়ুক্ ছাই।
ইচ্ছে করে যাই হে মরে' লয়ে তোমার গুণের বালাই॥
তোমার মুখে জ্ঞানের আলো, যে পায় সে না বাসে ভালো,
আপন জনে খোলা মনে, হয়ে যায় ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই॥
ভেদবুদ্ধি ভেবে সার, পাকা চাল চাল্‌লে এবার
সোণার বাংলা চুরমার, কর্‌লে তুমি ছুটা ছুঠাঁই॥
শেল দিয়েছ মোদের বুকে, বল হে গৌর আর কি মুখে,
সখা ভাবে ভজ্‌বো তোকে, তোমার প্রেমনীতিতে ফাই ফাই॥
তোমার মুলুকের আমদানী, বসনভূষণ চূড়ীচিরুণী,
ছড়ি জুতা চোখরাঙ্গানী, প্রেমের গৌর আর না চাই॥
চুরুট সাবান পাঙ্গা লবণ, দোবরাচিনি লোহার বাসন,
সাগর জলে দিই বিসর্জ্জন, তোমায় ভজ্‌লে ধর্ম্ম নাই॥
কালাপানির অতল জলে, চায়ের রাশি দিল ফেলে,
স্বদেশব্রতে প্রাণটা ঢেলে, মার্কিণতুল্য কীর্ত্তি চাই॥

এখন গোরাচাঁদকে ছেড়ে দিয়ে, ভজ্‌বো মোদের শ্যামা মায়ে,
কালী কালী নাম জপিয়ে, মনের কালী মুছব ভাই॥
ঘুচেছে মোহ এতদিনে, সুজন কুজন লইহে চিনে,
গতি নাইরে শ্যামা বিনে, ঘরের ছেলে ঘরে যাই॥
ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে, সাধের শ্যামা মাকে ঘিরে,
আবেগভরা চাপা সুরে, স্বদেশপ্রেমের গুণ গাই॥
লাঞ্ছনার আর বাকী নাই, পর হয়েছে আপন ভাই,
সবাই মিলে কানমলা খাই, মিটেছে মোদের বিলাতী বাই॥

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কণিকা।

যাকে চিরকাল "আপনি" বলে আসছি তাকে একদিন অকস্মাৎ "তুমি" বল্‌তে বাধেনা কিন্তু একবার "তুমি" অভ্যাস হ'লে আবার "আপনি" বলা বড় কঠিন।

বিষ্ণু যখন অখণ্ড দেবতা তখন বৈকুণ্ঠে তাঁর অমর জীবনের এক মাত্র সঙ্গিনী লক্ষ্মীদেবী, আবার তিনি যখন অখণ্ড মানব রামচন্দ্র, তখন তাঁর একমাত্র প্রণয়িনী জানকী; কেবল তিনি যখন কৃষ্ণ অবতারে কতক মানুষ, কতক দেবতা তখনি তাঁর সত্যভামা, রুক্মিনী ছেড়ে আরো অনেকগুলির আবশ্যক হয়েছিল।

নূতন আবিষ্কৃত X (rays) রশ্মি সব কাঠিন্য, দৃঢ় সম্বদ্ধ প্রাচীর, কাষ্ঠ অন্তরাল, অস্থি মাংসভেদী; কিন্তু প্রিয়জনের চক্ষে তার অপেক্ষা চতুর কুশল, ক্ষিপ্র তীক্ষ্ণ আলোক আছে সে একেবারে অন্তরাত্মায় পৌঁছয়।

বর্ত্তমানে যিনি প্রভূত ধনের অধিকারী আমরা তাঁকে বলি বড় মানুষ, কিন্তু কালক্রমে যখন তিনি ধনহীন হ'ন তখন তাঁর পরিচয় বনিয়াদী ঘরের ছেলে। আজ যার জীবনে অনেক সুখ, ভবিষ্যতে অনেক আশা তিনি তো জীবনের রাজা, কিন্তু যাঁর জীবনে একটি বৃহৎ সুখের স্মৃতি আছে তাঁকেও দরিদ্র বলা যায় না।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নাম।

আধুনিক বঙ্গে ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন কোমল মলয় সমীরের মত নামগুলিতে বাঙ্গালীর ললিতলবঙ্গলতার মত ভাবটিই ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বতন ধীর গম্ভীর বীর্য্যব্যঞ্জক নামের পরিবর্ত্তে এক্ষণে কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত একটা দুর্ব্বল আহ্লাদে ন্যাকা ভাবের নামের ক্রমশ বিস্তার হইতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি পরিষ্কার হইতে পারে।

আগেকার রামগঙ্গা, গঙ্গাধর, জগন্নাথ, জনার্দ্দন প্রভৃতি ঠাকুর-দেবতার নামগুলি একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের স্থল, ললিত, শিশির. কুমুদ, বিনোদ, চারু প্রভৃতি সরস নামসকল অধিকার করিয়াছে। জয়দেব সরস্বতীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী বঙ্গসন্তানের নামের নিকট এতদিনে হার মানিতে বসিয়াছে। পূর্ব্বের কাত্যায়ণী, দাক্ষায়ণী, ক্ষেমঙ্করী, রাজলক্ষ্মী ইত্যাদির পরিবর্ত্তে এক্ষণে লতিকা মুকুলা, বেলা, হেনার আমদানী হইয়াছে। আত্মারাম, বিশ্বম্ভর, জগদ্ধাত্রী, শিবশঙ্করী প্রভৃতি নাম শুনিলে আজকালকার অনেক ছেলে হাস্য সংবরণ করিতে পারে না এমনও দেখিয়াছি। আমাদের দেশের মিন্‌মিনে মেরুদণ্ডহীন নামের সহিত মহারাষ্ট্রীয়, পার্শী প্রভৃতি সকল জাতীয় নাম তুলনা করিয়া দেখিলে আমার বক্তব্য আরও একটু পরিষ্কার হইবে। রামকৃষ্ণ গোপল ভাণ্ডারকার, মহাদেও গোবিন্দ র‍্যানাড়ে, মানচারজি মানিকজি ভবনগরী, দিনসা ঈদুলজি ওয়াচ্চা প্রভৃতি নাম শুনিতে একটী তেজস্বী ভাব যেন চোখের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়!

সকলেই জানেন—মেয়ের বিবাহের সময় নাম বড় সামান্য দরকারী জিনিষ নহে। মেয়ের নাম যদি 'রেবা' কিম্বা 'হেনা' থাকিল তবে কন্যাদায়ক্ষিপ্ত পিতার অন্ততঃ চারি পাঁচ শত টাকার সুবিধা

পারে; পক্ষান্তরে যদি মেয়ের নাম 'বগলা' কি অন্নপূর্ণা হইল, তবে খেসারৎ-স্বরূপ বেচারীকে আরও পাঁচশত টাকা গণিয়া দিতে হইবে। আর মেয়ের নাম যদি জগদম্বা হয়, তবে ত কথাই নাই—সে মেয়ের আর বিবাহই হইবেনা।

কেবল মানুষের নামে কেন, সর্ব্বপ্রকার নামেই এই প্রকার একটা শিথিল অকর্ম্মণ্য ভাব প্রবেশ করিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম—ষ্টার থিয়েটারে একদা 'সীতার অগ্নিপরীক্ষা' নামে একখানি পুস্তক অভিনীত হয়—ঐ পুস্তকের নামে কোন নূতনত্ব বা লালিত্য না থাকায় প্রথম প্রথম অভিনয়ে মোটেই লোক হইত না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মাথায় হঠাৎ একটি সুবুদ্ধি আসিল; তিনি অভিনয় পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'অনলে বিজলী' বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন। পরদিন আর থিয়েটারে লোক ধরে না, এতই ভিড়। অনেকে স্থানাভাবে ফিরিয়া আসিল।

পূর্ব্বেকার একখানি পুস্তক খুলিলেই দেখিতে পাইবেন—লেখা আছে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ"—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত অথবা "বিধবাবিবাহ বিচার"—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত, কলিকাতা রাজধানী হইতে, সংস্কৃত বা বুধোদয় বা শাস্ত্রপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত ইত্যাদি। আর এখনকার একখানি বই হাতে লইয়া প্রথম দর্শনে ত তাহার নামই পাওয়া যাইবে না। বহু অনুসন্ধান এবং বিস্তর গবেষণার পর, পুস্তকের শীর্ষদেশের বাম কোনে—অতি ছোট সোণার অক্ষরে 'বেলা' এবং নিম্নদেশে নৈঋত কোনে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অক্ষরে 'হেম' কি এই প্রকার একটা কিছু দৃষ্টিগোচর হইবে। নতুবা হয়ত বাঁকা করিয়া ছবি আঁকা একটি 'কঙ্কণ' কি 'মঞ্জীর' এমনি একটা কিছু আছে, গ্রন্থকারের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা, পুস্তকের পিছন

দিকের মলাটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোনে ছোট করিয়া 'নীরু' বা 'বিনু' বা এমনি একটা কিছু লেখা। আবার 'চেরী' অথবা 'ফ্যান্সি' প্রেসে হইতে উহা মুদ্রিত। ঐ সকল পুস্তক কামিনীজনসুলভ পারিপাট্যে কোথাও মখমলে কোথাও সাটিনে কোথাও বা কিংখাবে মণ্ডিত। পাঠকগণ সত্বরই স্বর্ণচুমকী ও সাঁচ্চার কাজও উহাতে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ নানা বিষয় হইতেই আমার বক্তব্যটি পাঠকের সম্মুখে প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

দান।

নির্ব্বিচারে ভিক্ষা দাও শাস্ত্রের বিধান
যোগ্য পাত্র খুঁজে এনে তবে কো'র দান।

ঋণ শোধ।

আজ আমি একেবারে রিক্ত অর্থহীন
তবুও নিশ্চিন্ত প্রাণ শুধিয়াছি ঋণ।

চুটকী।

১। দেশী পণ্ডিত বনাম বিলাতী সংস্কৃতনবীশ *(savants)*।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অগাধ পাণ্ডিত্য আছে, কেহ বা বিদ্যাসাগর কেহ বা বিদ্যাম্বুধি, বিদ্যার্ণব। কিন্তু তাঁহাদের বিদ্যা-বারিধির এক ফোঁটাও সাধারণের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করেনা। আপামর সাধারণের নিকট জ্ঞানপ্রচার করা তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেননা। যদি বা সে বিষয়ে প্রয়াসী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের ভাষা এমন কঠোর ও দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে যে, তাহাতে তোমার আমার দন্তস্ফুট করিবার যো থাকে না। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, কিন্তু সুপেয় জল একবিন্দুও নাই; খাইতে গেলে ক্ষার জলে বমনোদ্রেক হয়, তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। 'Water, water, every-where, But not a drop to drink.' পক্ষান্তরে বিলাতী সংস্কৃত-নবীশগণের সংস্কৃতজ্ঞান অল্প, হয় তো তাহাতে ভ্রমপ্রমাদও আছে; কিন্তু সেই সামান্য জ্ঞানটুকু তাঁহারা সাধারণ্যে বিতরণ করিতে সর্ব্বদাই যত্নশীল; তাঁহাদের নিকট হইতে তবু আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চারিটা কথা জানিতে পারি। কূপের পরিধি সঙ্কীর্ণ, জলও অল্প; কিন্তু হইলে কি হয়, পশ্চিম অঞ্চলের কূয়ার জল বড় মিঠা।

২। সেকাল আর একাল।

সেকালের লোকে স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্রে কোশাকুশি, টাট, তাম্রকুণ্ড লইয়া বসিতেন, তাহাতে পূজার উপকরণ গঙ্গাজল, ফুল, বিল্বপত্র, তুলসী চন্দন থাকিত। আর একালের যুবকযুবতীরা স্নানের পরেই আয়না-চিরুণী, ব্রুস লইয়া বসেন, পাউডার, রূষ্, পমেটম, এসেন্সের সদ্ব্যবহার করেন। 'একেই বলে সভ্যতা'।

৩। চোগা।

চোগাটা ঠিক যেন গিন্নিমানুষের ঘোম্‌টা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া অথচ মুখটা ঢাকা পড়িবে না। ওটুকু না দিলেও আবার কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখায়। চোগাও ঠিক তাই, চাপকানের উপর না পরিলেও ভাল দেখায়না, অথচ পরিলেও আল্‌গা ভাবে পরিতে হয়, বোতাম আঁটিয়া বুকটা ঢাকিয়া ফেলা হইবেনা।

৪। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।

অনেকে যেথানে-সেখানে যখন-তখন বিদ্যা ফলান, ইহাকে ইংরাজীতে বলে pedantry (বিদ্যার জাঁক)। একজন ইংরেজ লেখক (J. S. Blackie) ইঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যেমন তামাক-খোরের কাপড়-চোপড়ে, গায়ে-মুখে সর্ব্বদা তামাকের গন্ধ, তেম্‌নি ইঁহাদের কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদা বিদ্যাফলানর চেষ্টা দেখা যায়। আমাদের মধ্যে তামাকের প্রচলন এত অধিক, যে ও উপমাটায় আমাদের মন উঠে না, তামাকখোর না বলিয়া পিঁয়াজ-রশুনখোর বলিলে কথাটা আমাদের কাছে আরও ঘোরালো হইত। আমার মনে হয়, বিদ্যালাভ অনেকটা তেলমাথা বা সাবানমাথার মত। তেল মাথিয়া বেশ করিয়া পা রগ্‌ড়াইয়া স্নান করিলে তেলটা উঠিয়া যায়, কিন্তু তেল মাথার ফলে চামড়াটা বেশ মসৃণ ও স্নিগ্ধ হয়। সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালাভ করিলে স্বভাব, চরিত্র, আচার, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা বেশ মোলায়েম হয়। কিন্তু চাষালোকে খানিকটা তেল জব্‌জবে করিয়া মাখে, হয়ত তার কোনও পুরুষে একটু তেল পায় নাই, তাই একদিন ভদ্রলোকের বাড়ীতে মজুরী করিতে আসিয়া সে আধপোয়া তেল গায়ে ঢালিল, মাথার চুল হইতে চুঁচিয়া তেল পড়িতে লাগিল।

Pedantএর অবস্থাও ঠিক তাহাই। হয়ত বংশের মধ্যে বা গ্রামের মধ্যে বা সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে তিনিই কোনও সুযোগে কিঞ্চিৎ বিদ্যা উদরস্থ করিয়াছেন, তাই সর্ব্বদা চালচলনে কথাবার্ত্তায় সেটুকু জাহির করিতেছেন। দণ্ডে দণ্ডে খড়্কেপ্রমাণ ঘৃতের ঢেঁকুর তুলিতেছেন। সাবান মাখিলে গায়ের ময়লা কাটে, চর্ম্মরোগ দূর হয়। বিদ্যা শিখিলেও মনের ময়লা কাটে, চরিত্র নির্ম্মল হয়। কিন্তু আনাড়ীতে সাবান মাখিলে খানিকটা সাবানের ফেণা কাণে, কপালে লাগিয়া থাকে, সেটা ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলেনা। হয়ত লোককে দেখাইতে চায় 'আমি সাবান মাখিয়াছি'। Pedantদেরও বিদ্যার ফেণা তাহাদের কথাবার্ত্তায় লাগিয়া থাকে। কাঙ্গালীরামের গোঁফে দুধের সর লাগাইয়া আঁচাইতে যাওয়ার গল্প মনে পড়ে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ কবিতা।

চাতক।

গর্জ্জিছ মেঘ নাহি বর্ষিছ জল,
আমি যে চাতক পাখী চিত্ত বিকল,
দৈবাৎ আসে যদি দক্ষিণ বাত
কোথা তুমি, কোথা আমি, কোথা জলপাত!

গর্জ্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতক পক্ষী ব্যাকুলিতোহহং।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক ত্বং কাহং কচ জলপাতঃ।

পরোপাসনা।

জলদ হে, দেহ জল অথবা না দেহ,
চাতকশরণ তুমি অন্য নহে কেহ,
পিপাসায় প্রাণ যায় সেও গণে শ্রেয়,
পর উপাসনা তবু তার কাছে হেয়।

পয়োদ হে বারি দদাসি বা ন বা
ত্বদেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ।
বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া
তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনা॥

তুমিই শরণ।

নদে হ্রদে অন্যে করে তৃষ্ণা নিবারণ,
একমাত্র তুমি ঘন চাতক-শরণ।

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে সদা পয়ঃ।
চাতকস্য তু জীমূত ভবানেবাবলম্বনঃ॥

আটক।

কেতকী ভুবন খ্যাত স্বরণ বরণে সাজে,
পদ্ম ভ্রমে দৈব ক্রমে অলি পড়ে তার মাঝে ;
কণ্টকে ছিঁড়িল পক্ষ, চখে লাগে ফুলধূলি,
তিষ্ঠিতে উড়িতে নারি ঝাঁপয়ে পড়িল অলি।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকে ছিন্নপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তোদ্বিরেফঃ॥

হতাশ।

রাত্রি হলে অবসান প্রভাত আসিবে,
রবির উদয় দেখি কমল হাসিবে,
কোষে বদ্ধ অলি তাই ভাবে সারা রাতি ;
হেন কালে পদ্ম হায়! উপড়ায় হাতি।

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজালং
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার।

দৈবের বিচিত্র গতি।

ভয়াকুলা কপোতিকা কপোতেরে কয়
আসিল মোদের এবে অন্তিম সময়।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে ব্যাধ নিচুতে বিচরে,
পক্ষীরাজ বাজ দেখ উড়ে শিরোপরে;
অমনি শ্যেনেরে ব্যাধ হানিল গো বাণ;
ব্যাধ বেটা সর্পাঘাতে ত্যজিল পরাণ;
শীঘ্রই দুজনে তারা গেল যমালয়,
দৈবের বিচিত্র গতি কথন কি হয়।

কান্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া নাথান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপসজ্জিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রমতি।
ইত্থং সত্যহিনা সংদষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহতঃ
তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং প্রতিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সুপ্রভাত।

হয়েছে রে শেষ নিবিড়-তিমির-পুঞ্জিত,
ঝঞ্ঝামুখর, ক্ষুব্ধ, সুচির যামিনী,
হের মেঘমালা—সুদূর অরুণ রঞ্জিত,
স্তব্ধ ঝটিকা; লুপ্ত আকাশে দামিনী।
এখনি কাননে উঠিবে বিহগসঙ্গীত
কুসুমগন্ধ আসিবে মন্দ পবনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

একটিও তারা ছিলনা বিশাল অম্বরে,
ক্ষীণ আলোরেখা পড়ে নাই আসি ভূতলে,
প্রহর গ'েছে জাগিয়া সভয় অন্তরে
আকাশের পানে চাহিয়া, বসিয়া বিরলে।
ভয় সংশয় হোক্ তবে সব অন্ত রে,
হের শুকতারা উদিত পূর্ব্ব গগনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী—
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

ওই আসে উষা—আনন অনবগুণ্ঠিত,
মধুরহাস্যে বিকাশি শান্ত মহিমা,
হেম-অঞ্চল চরণকমলে লুণ্ঠিত,—
তিমির প্রান্তে দীপ্ত আশার প্রতিমা।

এখনো কে আছে সুপ্ত, কে আছে কুণ্ঠিত?
উঠ উঠ বলি ডাক, ভাই, ডাক স্বজনে,
ওরে আশাহত, ভীত, আর নাই রজনী,
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

ওগো উঠ, উঠ, ছিঁড়ি এস মোহবন্ধন,
ভাই ভাই মিলি দাঁড়াও আসিয়া বাহিরে;
কেন রে নিরাশা, কেন রে বিফল ক্রন্দন,
দুঃখ রজনী নাহি বাকি, আর নাহি রে।
আনন্দে লয়ে সুগন্ধি ফুলচন্দন
অঞ্জলি সবে দাও জননীর চরণে,
ওরে আশাহত, ওরে ভীত, নাই রজনী
নবীন প্রভাত আসিছে আবার ভুবনে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

গত সংখ্যার ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০৭	২১	পাঠাইলেন	পাঠালেন
,,	২২	পাঠাইলেন	পাঠালেন
৭০৯	১৭	রক্তিম পল্লবময়	কিশলয়-রক্তিমা
৭১৬	১২	লঙ্কা সে কলঙ্কাঙ্কিতা	লঙ্কা কলঙ্কাঙ্কিতা
৭২৮	৮	ছাড়ি সীতার কামনা	ছাড়িদেবে সীতার কামনা
	৯	তুমি আর কপিসেনা	তুমি আর তব কপি-সেনা।

মহানাটক।

অষ্টম অঙ্ক।

যুদ্ধোপক্রম।

অঙ্গদের মুখে শুনি'　　　　রাবণের বিভব ও কুল
মুহূর্ত্তের তরে রাম　　　　ঈষৎ হইলা চিন্তাকুল।

শ্লাঘ্য বটে মোর রিপু এই দশানন ;
—প্রত্যক্ষ দেখিয়াও এ মোর বিক্রম,
না করিল মোর হাতে সীতা সমর্পণ,
কিম্বা না করিল ত্যাগ গরব আপন॥
"সুবেল"-শিবিরে আছে রাম ও লক্ষ্মণ
—দূত মুখে শুনি ইহা, লঙ্কেশ রাবণ,
দশ হাতে টঙ্কারিল ধনুক গরবে ;
পূর্ণ হ'ল দশদিক্ সেই ঘোর রবে ;
প্রবৃত্ত হইল পরে করিতে মার্জ্জন
খরধার "চন্দ্রহাস" খড়গ আপন।

আর দশ হস্ত দিয়া,　　　　চিত্রপটে করয়ে অভ্যাস
সীতা-কুচে, মন সুখে,　　　　পত্র লেখা-রচনা-বিন্যাস।

(পরে স্বীয় প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া দর্শন)

"ওই সেই দগ্ধপুচ্ছ　　　　কাল-সম হনুমানে হেরি,
পূর্ব্বে যে করিল হেন　　　　হতশ্রী এই লঙ্কাপুরী ;
কামতুল্য রাম ওই—　　　　রহিয়াছে ধনুর্ব্বাণ ধরি"।
মঞ্চস্থিত দশানন　　　　এইরূপ বলিতে বলিতে
শত্রু সৈন্য-শিবিরের　　　　প্রতিজনে লাগিল দেখিতে॥

(অরবিন্দ ও বিরূপাক্ষ এই মন্ত্রিদ্বয়ের প্রবেশ)

মন্ত্রিদ্বয়।—জয়তি জয়তি মহারাজ! ইন্দ্র-মৌলি-মুকুট-রত্ন যাঁর পাদপীঠে জিত সেই রাবণের জয় হোক্!

রাজন্ আমরা এবে বীর-স্তোত্র-পাঠে তোমা
করিব না যুদ্ধে উৎসাহিত;
শুধু এই হিতকর বাক্যগুলি শুনাইতে
মোরা মন্ত্রি—হেথা উপস্থিত।

অরবিন্দ।— সীতার রক্ষণ-তরে লক্ষণ কাটিল রেখা
ভূমি-পরে শশুর আজ্ঞায়;
হে রাজন্ দশানন! পারনি লঙ্ঘিতে তুমি
লক্ষণের সেই সে রেখায়;
কিন্তু এ মহান্ রাম কপিসৈন্য লয়ে সাথে
মহাসিন্ধু লঙ্ঘিল হেলায়॥
যাঁর বার্ত্তাবহ দূত পবন-নন্দন হনুমান,
হেলায় লঙ্ঘন করি' মহাসিন্ধু গোষ্পদ সমান,
নিজালয়-সম পশি' লঙ্কাপুরী, করিয়া সাক্ষাৎ
সীতা-সনে, ভাঙ্গি' বন, করিল এ পুরী ভস্মসাৎ
—মানব কেমনে হবে সেই রাম কহ রক্ষোনাথ।

বিরূপাক্ষ।— কাহার নহেক প্রিয় মুখ-সুখ মধুর বচন?
বিপদের কালে কিন্তু তাহা শুধু ক্লেশেরি কারণ।
প্রিয় বা মধুর বাণী স্বামিত্বেরি কালে শোভা পায়;
কর্কশ সুনয়-বাক্য হিতকর—বিত্তের রক্ষায়॥
বিভবে, ভোজনে, দানে, থাকে যত প্রিয়বাদিগণ;
বিপদ আগত হলে দেখা দেয় কেবলি সজ্জন॥
আসন্ন যাহার নাশ—তার কাছে মুকতাই প্রিয়;
প্রভুভক্ত ভাবে' কিন্তু—একমাত্র মুখরতা শ্রেয়॥
স্বামীদের ফ্যালে যারা স্তুতিবাক্যে বিপদের কূপে,
পরে উদ্ধারিতে নারি' শেষে তারা রহে মৌনরূপে॥

নদী, আর খল-মৈত্রী, নীতি-দ্বেষী জনের বিভব,
আর কোমলাঙ্গী নারী—অচির-যৌবন এরা-সব ॥
যাবৎ না দেখ প্রভো দাশরথি রামের আনন,
যাবৎ না হয় এই জলধির সলিল শোষণ,
বিজিত-অলকা লঙ্কা যাবৎ না হয় ছারখার,
তবানুজ বিভীষণ যাবৎ না হয় কুলাঙ্গার,
তাবৎ আপনি তুমি কর সমর্পণ
রাম-হস্তে জানকীরে, শোনো গো রাজন্ ॥

রাবণ। (ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া)

বুদ্ধি পণ্ডিতেরি মন্ত্র, রতি-মন্ত্র জপয়ে বিলাসী,
পরাক্রম-সার মোরা —আমাদের মন্ত্র শুধু অসি ॥
যদি পুত্র কুম্ভকর্ণ বীর মহাবলী,
শুনি' তোমাদের এই শাস্ত্র কথা গুলি,
যুদ্ধে সংহারিতে পারে পবন-নন্দনে,
তাহলে পাঠাও তারে সর্ব্বপ্রথমে।

বিরূপাক্ষ।—(রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া)

নৃপেরি নিকটে শুধু নীতি কহে নীতিবেত্তাগণ,
যুবরাজাদির কাছে নাহি তারা কহে কদাচন ॥

নীতিশাস্ত্রানুসারে আপনি শুদ্ধাধিকারী,—প্রকৃত অধিকারী; আপনি দুরধিকারী ন'ন্,—অযোগ্য রাজা ন'ন্, তবে কেন আপনাতে বিরুদ্ধভাবের লেশ মাত্র আশঙ্কা করচেন? শাস্ত্রে আছে :—

সর্পমুখে, দষ্টদেহে,—রক্ত কভু নাহি দৃষ্ট হয়;
কিবা রাজা, কিবা প্রজা,—অযোগ্যেতে ধন নাহি রয় ॥

রাবণ। (স্বগত) এই মন্ত্রিদ্বয়, ছলোক্তির দ্বারা আমাকেই দেখ্‌ছি দুরধিকারী বলচে; তবে বোধ করি শত্রুভয় আসন্ন। শাস্ত্রে আছে :—

মন্ত্রি-হস্তে যে নৃপের ন্যস্ত রাজ্যভার,
সৌধ-বিহারই যার জীবনের সার,
বিড়ালেরে দুগ্ধ-ভাণ্ড করি' সমর্পণ
ঘুমায় নিশ্চিন্ত হয়ে সেই মূঢ় জন ॥

কিন্তু কখন কখন, রাজার্ষের মধ্যে এই নীতি-বিরুদ্ধভাব গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে—তার সাক্ষী শশাঙ্কশেখর মহাদেব।

পরিপাক করিয়াও উৎকট্ গরলে,
স্মরে দগ্ধ করিয়াও নয়ন-অনলে,
ভাল-নেত্রে প্রলয়াগ্নি করিলেও ধৃত,
সর্ব্ব-শকতি গুণে হলেও ভূষিত,
—শশী, গৌরী, গঙ্গা যিনি করেন ধারণ,
সেই শঙ্করের নীতি কৌতুক-জনন॥

শিবের নীতি-বৈপরীত্য দেখে ভৃঙ্গীর যে দশা হয়েছিল, আমার নীতি-বৈপরীত দেখে আমার মন্ত্রিদ্বয়েরও সেইরূপ দশা হয়েছে দেখছি।

দিগম্বর যদি, তবে ধনুকে কি কাজ ?
শস্ত্রধারী যদি, তবে কেন ভস্মসাজ ?
ভস্মধারী যদি, তবে কেন লন নারী ?
নারী লয়ে,কেন তবে কামের সংহারী ?
—এ হেন বিরুদ্ধ কাজে রত হেরি আপন স্বামীরে
ভৃঙ্গি-বপু—শিরাপূর্ণ অস্থিসার হইল অচিরে॥

(মন্দোদরীর প্রবেশ।

(মন্দোদরী রাবণের সহিত নিভৃতভাবে মন্ত্রণা করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় মন্ত্রিদ্বয়ের প্রস্থান)।

মন্দোদরী। (স্বগত)

কৈলাসোত্তোলনকারী কুবের-অনুজ সেই
অদ্বিতীয় বীর দশানন ;
তবু জিতবালি-বীর্য্য এই রঘুবীর রাম
রাক্ষসের শঙ্কার কারণ।
রিপুদলে প্রবেশিল এবে বিভীষণ ;
মহাবীর কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় মগন ;
মহামানী দশানন পতিত কলঙ্কে ;
মগন গভীর পঙ্কে তুমিও গো লঙ্কে !

সূর্য্যবংশী এই রাম —নৃপগণ-চূড়ামণি
সর্ব্বমহীশ্বর দশরথের নন্দন ;
রক্ষণের তরে যারে আরাধনা করে সবে
—সীতাপহারীর সেই কৃতান্ত ভীষণ।
ত্রিভুবন-হিত-তরে প্রজ্জ্বলিত করিল যে জন
স্বভুজ-প্রতাপানল —জান না কি তাহারে রাজন্!
(প্রকাশ্যে) সত্য তুমি করিয়াছ উত্তোলন পর্ব্বত কৈলাস ;
সমর্থ অনুজ তব করিবারে ত্রিভুবন গ্রাস ;
পুত্র তব ইন্দ্রজয়ী, কিন্তু সেই বালী-হন্তা রাম
শত্রু তব উপস্থিত ; —তারে সীতা করহ প্রদান ;
—সেই সে অবলা নারী বলে যারে করিয়া হরণ
এই লঙ্কাপুরী মাঝে করিয়াছ তুমি সংস্থাপন।
সুগ্রীবের ভৃত্য এক ক্ষুদ্র কপি আসি'
সমস্ত এ লঙ্কা যবে করে ভস্মরাশি,
কি করিল তোমার এ বীরেরা তখন ?
এখন রাঘব হেথা করে আগমন
জলধি লঙ্ঘন করি' কপি-সেনা-সঙ্গে ;
—এবে ছাড়' জানকীরে ছাড়' অবিলম্বে।

রাবণ। (বাহু আস্ফালন পূর্ব্বক)
অয়ি ভীরু! কেন তুমি বৃথা কর ভয়,
মোর কাছে মহা রিপু রাম কভু নয়।
নিশাচর-পতি আমি—আরম্ভিলে রণ
বাসবাদি দেবেরাও করে পলায়ন।
দেখো সতি! সদ্য মোর ধনু-ক্ষিপ্ত বাণ
হরিবেক ক্ষুদ্র এই তপস্বীর প্রাণ।
(পরে নিজালয়ে প্রবেশ করিয়া)

ভোভো মায়াবী রাক্ষসগণ! আমি আজ মায়াজাল বিস্তার করে, মৃদু স্মরস্মিত পীনোন্নত কুচ-কলস-শোভিত জানকীর বক্ষস্থল মনে মনে সম্ভোগ এবং তার সেই মধুর অধর-পল্লব নিরীক্ষণ করব। তোমরা প্রস্তুত হও।

অনুচরগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ! (মায়া-রচনায় প্রবৃত্ত)

রাম লক্ষণের মুণ্ড বিরচি' মায়ার বলে
পাপাত্মা রাবণ
স্থাপিল সীতার আগে; —যেন উহা হইয়াছে
কৃপাণে ছেদন,
রক্ত ঝরে অবিরল উন্টায়ে গিয়াছে নেত্র
মৃতের মতন।

(মায়া মুণ্ড দেখিয়া)

আহা ঝরে বারি-ধার —ঘন-গাঁথা-মণি-হার,
জানকীর পঙ্কজ-নয়নে॥

সীতা। রমণ-মরণ-ভীতা কেন না হইনু নীতা
এখনোগো কৃতান্ত-সদনে?
যে অনলে দহে হৃদি কেন না দহিল বিধি
আমারেও সেই-সে দহনে।

(রামের মস্তক গ্রহণ করিয়া)

হাহা জগদীশ মম! জগতের বীর অদ্বিতীয়!
অধর-পিযূষ মোর পান করি' বলিতে—"অমিয়,"
হতে যবে কেলি-রত বেতসের লতাকুঞ্জ বনে;
—হে নাথ অমৃতময়! সেকথা কি নাহি পড়ে মনে?
সূর্য্যবংশে জন্ম তব —সূর্য্য যথা নাশে অন্ধকার
তুমিও কি তার মত করিবে না শত্রুর সংহার?
স্ফুরে না মধুর বাণী কেন আর এ-মুখ-কমলে?
বিলাস-বিভ্রম কোথা এবে এই নেত্র-শতদলে।
অমর-বধূ-বল্লভ তুমি নাথ হয়েছ এখন;
পরমাত্মারূপে তোমা সীতা এবে করে আলিঙ্গন।

(সীতা রামের মস্তক আলিঙ্গন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ
করিতে উদ্যত হইলে)।

আকাশবাণী। ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না সীতা রাক্ষসের দেহ,
শ্রীরামে বধিতে রণে নাহি পারে কেহ।
এ যাহা দেখিছ মাতঃ—এ নহে প্রকৃত
—শিবভক্ত রাবনের মায়ায় রচিত॥

(রাবণ প্রস্থান করিলে, সীতা আশ্বস্ত হইয়া, সরমার প্রতি)।

সীতা। সরমে, একি অদ্ভুত কাণ্ড!

সরমা। ওই শুন সুলোচনে! নিশাচরগণ
রাম-আগমন-বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ
ঢাক-ঢোল বাজাইয়া করে কোলাহল,
হ্রেষারব করে আর তুরঙ্গম-দল।
শান্ত হও, শান্ত হও করিও না শোক,
প্রজ্বলিত হইয়াছে শ্রীরামের কোপ।
পুত্র-পশু-বন্ধু-সহ দুষ্ট দশাননে
নিশ্চয়ি আজিকে রাম বধিবেন রণে।
ইন্দ্রনীলমণি-শ্যাম রামের অধর-মধু-পান
পুনঃ তুমি হে সুন্দরি! করিতে পারিবে অবিরাম॥

রাবণ। (স্বগত) মায়াধারী হয়ে পুনর্ব্বার যাওয়া যাক্।
অশ্ব-গজ-রথ-শব্দে　　শঙ্খ-ভেরি-নিঃস্বনন
করি' বিবর্দ্ধিত,
সৈন্য-ভুজ-আস্ফালনে　　যোদ্ধৃ-কোলাহলে লঙ্কা
করিয়া পুরিত,
সানন্দে রাক্ষস-ইন্দ্র　　কেশে ধরি দশ মুণ্ড
পাঁচ-পাঁচ করি' দুই হাতে,
শ্রীরামের মায়া-রূপ　　আপনি ধারণ করি'
আসে পুন সীতার সাক্ষাতে।

কুচভার-নম্রা-সীতা —কাঁচুলি ঈষৎ ছিন্ন
কুচের বিস্তারে—
সাক্ষাৎ রামেরে হেরি' ঝটিতি দাঁড়ায়ে উঠি'
কহিলা তাঁহারে ঃ—
ধন্য হ'নু প্রাণনাথ! রাক্ষসের ওই সব
ছিন্ন মুণ্ডগুলা তুমি করহ মোচন;
গাঢ় আলিঙ্গন দানে ঘুচাও সকল খেদ,
বিরহ-মহাপাতক হোক্ প্রশমন।

আকাশবাণী। তুমি ত জানহ রামে; মন্দোদরী করিবে চুম্বন
—রঘুনাথ-শরাঘাতে হত রক্ষোরাজের বদন।
ও জানিবে লঙ্কাপতি —রামভদ্র নহে কদাচন,
মায়া-রাম সাজি,' হাতে দশমুণ্ড করেছে ধারণ॥

সীতা। (লজ্জিতা)

রাবণ। (স্বগত) রাম-রূপ ধরিবারে কৃতকার্য্য হ'লেম বা যদি,
পাপ-মূল প্রবৃত্তিতে দেবতারা হ'ল প্রতিবাদী॥

তা হোক্, এখন আমি রণস্থলে তাপসদ্বয়কে বধ করে,' সীতা সহবাসে আমার কেলীকলা কৌতুহল নিবৃত্তি করব।

ইতি "মায়া-রাবণ" নামক অষ্টম অঙ্ক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তেল, লুন, লকড়ি।

যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশী রকমে অভ্যাস করেছি তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশী নিয়মে চর্চ্চা কর্‌তে হবে। আমরা সাহেব হয়েছিলুম বাঙ্গালীভাবে, সে ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক ঢিলেমি এবং এলোমেলো-ভাবেরি শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দলবেঁধে বিধিব্যবস্থা-পূর্ব্বক সাহেব হইনি। প্রতি জনেই নিজের খুসি কিম্বা সুবিধা অনুসারে নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ সাহেব হয়ে উঠেছি। ইঙ্গবঙ্গসমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। স্বদেশী আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষরা পাহিলা-সমিতি করিনি এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা-সমিতি পর্য্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে আমাদের নূতন ভাব কার্য্যে পরিণত কর্‌তে হলে, ভাবনা-চিন্তা চাই, কি রাখ্‌ব কি ছাড়্‌ব তার বিচার চাই, পাঁচজনে একত্র হয়ে কি কর্‌তে পারব এবং কি করা উচিত তার একটা মীমাংসা করা চাই—এক কথায় ইংরেজ যে উপায়ে কৃতকার্য্য হয়েছে সেই উপায়—একটা পদ্ধতি অবলম্বন করা চাই। সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার ভিতর নিয়ম নেই। ঝোঁকের মাথায় রোখের সহিত কাজ কর্‌তে গেলে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়াই দরকার। কিন্তু সমাজে থাকৃতে কিম্বা ফির্‌তে হলে সকলেরই মান-সিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই, এক নিয়মে অনেক্‌কে ধরা দেওয়া চাই। আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিলনা' স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই। যে পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি, তার বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ বাহ্যবস্তু। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সুসাধ্য

কর্‌তে হলে, মনকে অনেকটা খাটাতে হবে। সমাজে থাকতে হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোন চর্চ্চা কর্‌বার দরকার নেই, প্রচলিত নিয়মের নির্ব্বিচারে দাসত্ব স্বীকার কর্‌লেই হল; ছাড়তে হলেও দরকার নেই—নির্ব্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌লেই হল। কিন্তু ফির্‌তে হলে, মানুষ হওয়া চাই, কারণ যে ফেরে সে নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে। আমরা বাঙ্গালী-সাহেবই হই আর খাঁটি বাঙ্গালীই হই, আমরা সকলেই এক পথের পথিক হয়েছিলুম; কেউ বা বিপথে বেশি দূর এগিয়েছি, কেউ বা কিছু পিছিয়ে আছি। আমাদের সমাজস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ণচোরা-বাঙ্গালী-সাহেব। আমাদের হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা অতীতে গঠিত হয়েছিল, আজকালকার দিনে নূতন অবস্থায় কতকাংশে তা সকলেরই পক্ষে শৃঙ্খল মনে হয়। আমরা জনকতক শুধু উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি, বাদবাকী সকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে ফেলেছেন। সুতরাং সকলে মিলেই স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি। সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সুতরাং যে পরিমাণে সাধ্য এবং উচিত সেই পরিমাণে ফির্‌ব, তার বেশি নয়। জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিলনা ব'লে এতদিন আমরা গা ঢেলে দিয়ে স্রোতে ভাসছিলুম, তার ভিতর কোন আয়াস, কোন চেষ্টা ছিলনা—এখন গম্যস্থানের একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে, সুতরাং সাঁতার কাট্‌তে হবে, শুধু এলো-মেলোভাবে, অতিবেগে হাত-পা ছুঁড়লে চল্‌বে না, তাতে পাঁচজনে হাস্‌বে, দশজনে "বহুত কি বাহবা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" বল্‌বে কিন্তু আমরা লাভের মধ্যে শীঘ্রই এলিয়ে পড়্‌ব এবং নাকানি-চুবুনি খাব।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমরা বাঙ্গালী মাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারও মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট, কারও মাথায় বা শুধু টিকি,—যাঁর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তিনি সেইটেই স্বদেশীয়তার

ধ্বজাস্বরূপ আস্ফালন করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ইঙ্গবঙ্গদলের মন ভারি কর্বার কোন দরকার নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের জাতি যদি কোন স্থায়ী সুফল লাভ করে থাকে ত সে মনে, —আর যা যা ক্ষণস্থায়ী কুফল লাভ করেছে সে বাহ্য আচার-ব্যবহারে। মোটামুটি ধর্তে গেলে এ ব্যাপারের লাভ-লোকসানের হিসেবটা ঐরূপ দাঁড়ায়। সেই আচার-ব্যবহারের বিজাতীয়তা আমাদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট এবং জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে এমন আর অন্য কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে হয়নি। সকলেই অল্প-বিস্তর বিলেতি মধু পান করেছেন কিন্তু পুরো নেশা শুধু আমাদেরি ধরেছে। বিদেশী বস্তুর বড় বস্তা আমরা মাথায় বহন করছি, অপরে পুঁটলি-পাঁটলা নিয়ে চলেছে। আমরা যদি আমাদের মাথার সে ভার নামাতে পারি, তা হ'লে অপরের পক্ষে তাদের মাথার সে ভার ঝেড়ে ফেলা কঠিন হবেনা। এই স্বদেশীয়তার কথা শুধু দেশের কথা নয়—এ ঘরেরও কথা। বাঙ্গালী যখন নিজের সমাজ ছাড়ে তখন সেই সঙ্গে নিজের স্বভাব ছাড়ে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; অর্থাৎ সেখানেও অপরের পায়ের চাপ না পেলে, তার দিন চলেনা। আমাদেরও তাই। নিজের সমাজের চাপ থেকে বেরিয়ে এসে বিদেশী সমাজের পায়ের চাপ আমরা পিঠ তুলে নিই। বাঙ্গালিজাতকে পিটে গড়া হয়নি। আমরা ঢালাই হতে ভালবাসি। এক ছাঁচ থেকে বেরুলে আমরা অন্য ছাঁচে না পড়্লে ঠাণ্ডা হইনে। অনুকরণ আমাদের স্বাভাবিক। এবং অনুকরণে যে হেতু শুধু উপকরণ সংগ্রহ করা যায় কিন্তু কিছুই আত্মসাৎ করা যায় না, সেই কারণে আমরা বিলেতি সভ্যতার উপকরণে আমাদের দৈনিক জীবন নিতান্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অস্থি-মজ্জায় অনুভব করেছেন যে, বিলেতি সভ্যতার কুলিগিরির মজুরি পোষায় না। কিন্তু দু একজন ছাড়া মুখ

ফুটে সে কথা বল্‌তে বড় কেহ সাহসী হননি। দেশীয় সমাজের রীতি-নীতির অধীনতার মধ্যে, কার্য্যের না হোক চিন্তার স্বাধীনতা আছে। যার মন আছে তার সামাজিক আচার-ব্যবহার স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার এবং মতামত ব্যক্ত কর্‌বার অধিকার আছে, কিন্তু বিলাতের অনুকরণে যে বাঙ্গালী ঘর বাঁধে তার একুল ওকুল দুকুল যায়। আমাদের মধ্যে যার মন যত ঢিলে তার সাহেবি-আনার আঁটা-আঁটি তত বেশি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ কোথায় যে বুঝতে পারেনা সে তার সর্ব্বাঙ্গে হাতড়ে বেড়ায়। আমরা অনেকে এক... খোরপোষের বন্দোবস্ত কর্‌তে বিলেত যাই, সুতরাং বিলেতি সভ্যতার যে শুধু খাওয়া-পরার অংশটা আয়ত্ব কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব, এর আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যে আরামের লোভে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসি, সেই আরামও আমাদের যোটে না। দেশীয় সমাজের চালচলন শৈশব হতে অভ্যস্ত বলে সে দিকে মন দিতে হয়না ঠিক ঠিক জিনিষটে আমরা অবলীলাক্রমে করে যাই, কিন্তু বিদেশী চালচলনসম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচে গণ্ডুষ কর্‌তে হয়। একটু বয়েস হলে একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করা যেমন কষ্টসাধ্য, তেমনি একটি বিদেশী সমাজের ...রো-এক খুটি-নাটি, আচার-ব্যবহার আয়ত্ব করাও তেমনি কঠিন। ...ত সভ্যতার সুমুখে বাঙ্গালি-সাহেবের আঁচলটা টান্‌তে টান্‌তে প্রাণ যায়। খানায়, পোষাকে যাঁরা সভ্যতা খোঁজেন তাঁদের খানার, পোষাকের কায়দা কানুন কত্তে কত্তে নাস্তানাবুদ খানেখারাপ হতে হয়। যাঁরা মাছি-মারা নকল করতে চান তাঁদের নিত্য দেখ্‌তে পাই অক্ষরের পর অক্ষর ধরে বিদেশী হালচাল অভ্যেস কর্‌তে প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হচ্ছে। অন্ধকে বানান করে পড়্‌তে শুনলে মায়াও করে বিরক্তিও ধরে, সাধারণ ইঙ্গবঙ্গের প্রতিও আমাদের ঐ মনোভাব। কারও কারও

যা বিলেতি সভ্যতার বর্ণপরিচয় হয়েছে কিন্তু অর্থবোধ হয়নি। এতদ্দেশীয় মুসলমান মহিলার কোরাণপাঠের মত তাঁদের সভ্যতা-চর্চ্চার পরিশ্রমটা বৃথায় যায়। সংস্কারবশতঃ হিন্দুসমাজের প্রতি যাঁদের প্রাণের টান আছে অথচ শিক্ষাবশতঃ, যাঁরা সংস্কারমাত্রেরই অধীন নন, যাঁদের ধারণা যে ইউরোপের শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ, যাঁরা বিলেতি আচার-ব্যবহার কতক পরিমাণে অবলম্বন করেন, হয় বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করে নয় জীবনে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে,—এক কথায় যাঁরা শ্যাম এবং কুল দুই রাখবার চেষ্টা করেন তাঁরা আহেল বিলাতি ইঙ্গবঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট। বাদবাকি যাঁরা নিজের নিজের ব্যবসায় ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনোপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে-খরচ মনে করেন তাঁরাই বুদ্ধিমান। কেন্দ্রভ্রষ্ট ? কোথাকার কোন্ সমাজের কোন্ কেন্দ্র-ভ্রষ্ট ? এ প্রশ্ন করলে সকল বুদ্ধিমানই নিরুত্তর। পড়ান কাকাতুয়ার কপচান বুলির মত যদি তাঁদের কথা নিরর্থক না হয়, যদি তাঁদের বক্তব্যের ভিতর মনের কার্য্য কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে ত সে মনোভাব এই—তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি কেন্দ্র, তাঁদের কাছ থেকে যে যতটা তফাৎ সে জেরা কেন্দ্রচ্যুত, ততটা উন্মার্গগামী! বিলেতফেরত পাড়ায় প্রতি গৃহ একটি সৌর জগৎ, হয় কর্ত্তা নয় গৃহিণী সেই জগতের কেন্দ্র—পরিবারের আর সকলে গ্রহ-উপগ্রহের মত তারই চারিদিকে পাক খায়, এখানে-সেখানে দু একটি ধুমকেতু দেখা দেয়। আমাদের কারও গৃহ, হিন্দুগৃহের একটি পরিবর্ত্তিত, যুগপৎ-পরিবর্দ্ধিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র ; কারও বা গৃহ বিলাতি গৃহের একটি নিকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ মাত্র। আমরা কেউবা বিদেশীয়তার দুচার সিঁড়ি ভেঙ্গেছি, কেউবা এক লম্ফে বিলাতি সভ্যতার মন্দিরের চূড়ার উপরিস্থিত ত্রিশূলের উপর

সাহেবি-আনার প্রচণ্ড নেশায় বঙ্গসন্তানকে যে কতদূর বে-এক্তিয়ার করে ফেল্‌তে পারে তার প্রমাণ ধর্ম্মতলার রঙ্গমন্দিরে ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার্থে করুণ যাচ্ঞালব্ধ বিদেশীর পৃষ্ঠপোষকতায় Tableaux Vivant অভিধেয় বিচিত্র চিত্র অভিনয়। নেশা ধরা পড়ে দুই জিনিষে,—অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্য বিপর্য্যয়ে। এ ব্যাপারে দুই লক্ষণেরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। ঐ দৃশ্যকাব্যের পিছনে একটি দর্শন আছে, একটি কবিত্ব আছে; সেই কবিত্বপূর্ণ দর্শন কিম্বা দার্শনিক কবিত্বের প্রকাশ New India সংবাদপত্রে। উক্ত ব্যাপারের সাপক্ষে New Indiaর মতামত Indian না হোক্ new বটে। জষ্টিস্ অনুকূল মুখর্জ্জির জীবনীর ভাষা যেমন নতুন, এর ভাবও তেমনি নতুন; এবং উভয় রচনাই এক উপায়ে সিদ্ধ হয়েছে। ইংরাজি, ফরাসি, লাটিন, গ্রীক এবং ইটালিয়ান নানা ছোট বড় বাছা বাছা বাক্য ও পদের অসঙ্গত সমাবেশে মুখোপাধ্যায়মহাশয়ের জীবনীলেখকের রচনা ভাষার রাজ্যে যেমন এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি; জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের ছোট বড় নানা বাছা বাছা শব্দ এবং বাক্যের অসঙ্গত সমাবেশে সম্পাদকমহাশয়ের রচনা চিন্তার রাজ্যে তেমনি এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। লেখক কিছুই বাদ দেন নি—চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়। কলাবিদ্যার কতকটা জ্ঞান অনেকটা চর্চ্চার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উল্টা। দাম্ভিকতার বলে অজ্ঞতা বিজ্ঞতার সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারে। কলাবিদ্যার শুধু শেষাংশ দেখাবার চেষ্টা করে অনেকে, তাঁরা যে শুধু তার প্রথমাংশ জানেন, এই প্রমাণ করেন। এ বিশ্ব ভগবানের লীলাখেলা হতে পারে, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি এবং উন্নতি মানুষের লীলাখেলার ফল নয়। এই প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারের অবতারণা করবার একটু

বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের নকল সভ্যতা এর উর্দ্ধে আর উঠতে পারে না। আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা, পেণ্ডুলমকে ঐখান হতেই ফিরতে হবে, এবং কার্য্যতঃ ফিরতে আরম্ভ করেছে। ঘরে বিদেশী অনাচারের ঠেলা এবং বাইরে বিদেশী অত্যাচারের চাপ এই দুয়ের ভিতর পড়ে যাঁরা কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব কর্‌ছিলেন তাঁদের অনেকেরই চৈতন্য হয়েছে। ঐ ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেক অন্য-মনস্ক লোকেরও মনে পড়ে গেছে যে, আমাদের একটা সমাজ বলে কোন জিনিষ নেই। আমরা ঝরা পাতার দল, হাওয়ায় আমাদের কখন একত্র জড় করে, কখনও বা ছড়িয়ে দেয়। গাছের অসংখ্য পাতা, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের সকলের ভিতর নাড়ীর এবং রক্তের বন্ধন আছে—তাদের একের প্রাণের মূলও যেখানে অপরের প্রাণের মূলও সেখানে—দেশের মাটিতে। কিন্তু আজ আমাদের অনেকেরই চোক ফুটেছে। আমরা নিজের নিজের সঙ্কীর্ণ সমাজ ত্যাগ কর্‌লেও হিন্দুসমাজ আমাদের ত্যাগ করেনি। আমরা নিজেরা শুধু সেই বৃহৎ সমাজের মধ্যে আর একটি সঙ্কীর্ণ সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলুম,—সৌভাগ্যক্রমে তাতে কৃতকার্য্য হইনি। আজকাল ভারতবাসীর দেহে নূতন প্রাণ এসেছে, হিন্দুসমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশীসমাজে পরিণত হচ্ছে, জাতের ভাব দূর হয়ে জাতীয় ভাব উপস্থিত হয়েছে, আমরা পরস্পরের পার্থক্য ভুলে গিয়ে স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর পার্থক্য অনুভব কর্‌তে আরম্ভ করছি, এ অবস্থায় আমাদের স্বদেশীয়তায় ফেরার অর্থ, আমরা যে বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্ভূত হয়েই আছি সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান জন্মান। আমরা যে সমাজে ফির্‌ছি সে সমাজ পূর্ব্বে ছিল না, আজও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়নি, ভবিষ্যতে তার রূপ যে কি হবে তাও আমরা আজ ঠিক ধরতে পারিনে, তার স্বরূপ জানবারও কোন আবশ্যক নেই, শুধু এই জানি যে, আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে, সেই

শক্তি আমাদের সকলেরই প্রাণে জাগরূক হয়ে উঠেছে, সেই শক্তির কার্য্য হচ্ছে, আমাদের সমগ্র জাতির অপরূপ শ্রী এবং উন্নতি সাধন করা। জড় পদার্থ নিয়ে একটা কিছু গড়্‌তে হলে—আগে হতেই একটা plan এবং estimate কর্‌তে হয়, কিন্তু প্রাণ নিজের আকৃতি নিজে গড়ে নেয়, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রকৃতি যে ফুল ফোটাবে মানুষ তার সাহায্য করতে পারে কিম্বা বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাতে স্বকপোলকল্পিত বর্ণ, গন্ধ, আকার এনে দিতে পারে না। কাগজের ফুল রচনায় আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, গাছের ফুল ভাল করে ফোটানতে সে স্বাধীনতা নেই। আমাদের স্বদেশী সমাজের অক্ষয়-বটে নূতন পাতা দেখা দিয়েছে, আমাদের কর্ত্তব্য এখন তার গোড়ায় প্রচুর সার এবং জল যোগান, আর চারপাশের জঞ্জাল ও জঙ্গল দূর করা। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল স্বদেশী সমাজ অবলম্বন করেও আমাদের স্বাতন্ত্র রক্ষা কর্‌ব কিন্তু সে তার শাখাপ্রশাখা হয়ে—পরগাছা হয়ে নয়। সুতরাং আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশী না হই সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে। আমাদের তন-মন-ধন দেশের পায়ে বিকুতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়। আমাদের এই ধারণাটুকু জন্মান উচিত যে, আমাদের কেউ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত করে ফেলবার অধিকারী নন, সকলের শক্তি একত্র করে, সংহত করে স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির কার্য্যে প্রয়োগ করতে হবে। অল্প হোক, বিস্তর হোক আমাদের প্রত্যেকের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয় তার জন্য প্রথমতঃ দিক নির্ণয় করা দরকার। তার পর, কোথায় কি উপায়ে নিজ শক্তি প্রয়োগ কর্‌তে পারি তার হিসাব জান্‌তে হবে। অনিচ্ছাস্বত্বেও আমার বক্তব্য দেখ্‌তে পাচ্ছি ক্রমে ফালাও এবং গুরুতর হয়ে আস্‌ছে। এই স্থানেই সুতরাং আমাকে মনের রাশ টেনে ধর্‌তে হবে। এ

প্রবন্ধে আমি কতকগুলো সাদাসিধে ছোটখাট দৈনিক আচার-ব্যবহারের আলোচনা করব অভিপ্রায় আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌ছি—ধান ভান্‌তে বসে শিবের গীত সুরু করে দিয়েছি। এখন ভূমিকা ছেড়ে জমিতে নামাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। আর একটি কথা বলেই আমি প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করব। সে কথাটি হচ্ছে এই—ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আজকের নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নূতন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি—তাকেই পত্রপুষ্প-ফলমণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্ব-দেশের জ্ঞান লাভ কর্‌তে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই। আমাদের নূতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক না কেন, মাটির গুণে তা স্বদেশী হতেই হবে। জীবনীশক্তির স্ফূর্ত্তি, পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একটা ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে না, অদ্ভুত সমাজও হবে না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চ্চা করছিলুম কিন্তু ভূতে না পেলে যে অদ্ভুতত্ব বর্জ্জন করা যায় না এমন নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্ত্তমান অশান্তি শুধু নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্যুর কালব্যবহিতপূর্ব্বে বিকারের ছট-ফটানি নয়। যে সমাজের প্রাণ আছে, সে সমাজে প্রাণের যে প্রধান লক্ষণ,—বাইরের অবস্থার উপযোগী আত্মপরিবর্ত্তন,—সে লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ জগৎ গম ধাতু হতে উৎপন্ন, এমন গুণী আমরা কেউ নই যে জগতের ধাৎ বদলে দিতে পারি। মূল বেয়ে অনেক আশার ফুল ফুটবে, কিন্তু ফল ধর্‌বে না। দেশের মাটি ভালবাসি বলে যে মাটি নিতে হবে, মাটি কামড়ে পড়ে থাক্‌তে হবে, শেষটা মাটি হতে হবে এ ভুল যেন কেউ না করেন। আমরা আজ যখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে চলেছি, তখন এইটে মনে

...ত হবে যে, দেশের মাটি আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে ভগবান-ও অটল নির্ভর। অতীতের যে আগুণ নিবেছে, যার এখন ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাতে অতি ভক্তিভরে বাতাস দিলেও শুধু ছাই উড়িয়ে সমাজের চোখে ফেলব, কিন্তু আমাদের জাতির প্রাণে যেখানে আজও আগুন আছে সেখানেই ফুঁ দিতে হবে, পাখা করতে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, কোথায় শুধুই ছাই আর কোথায় ছাইঢাকা আগুন আছে কি করে জান্‌ব? তার উত্তর,—যদি স্পর্শ করে আগুন না চিনতে পার ত, পাঁজি পুঁথির সাহায্যে তা পাবে না। অতঃপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এগোতো হবে। বড় গোছের একটা লাফ মার্‌বার পূর্ব্বে মানুষ কিঞ্চিৎ পিছু হটে পাল্লা নেয়—আমাদের সমাজ এখন পাল্লা নিচ্চে। সরিস্থপের মত সমাজও ক্রমাগতঃ দেহকে আকুঞ্চন প্রসারণ ক'রে অগ্রসর হয়। কি উপায়ে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বল্‌তে উদ্যত হয়েছি।

(২)

বিবাহিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে।

"ভুল গেয়া রাগরঙ্গ ভুল গেয়া ইয়কড়ি
ইয়াদ রহ আজ খালি তেল লুন লকড়ি"

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আজকাল কতকটা ঐ ভাবে দাঁড়িয়েছে। আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরা এতদিন প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য কতই না হাবভাব, লীলাখেলার চর্চ্চা করেছি। ওনার মনোমত কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস, বাগ্‌বিন্যাসের চাতুরি অভ্যাস করেছি। আত্মহারা হয়ে ইউরোপের আত্মীয় হতে যত্ন ও

পরিশ্রমের ত্রুটি করিনি। এত করেও যখন মন পেলুম না তখন মান অভিমানের পালা সুরু কল্লুম। ফল তাতে উল্টো হল, দাম্পত্য প্রণয়ের দাবি করাতে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ তেল লুন লকড়ির কথাই আমাদের মনে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানবজাতিকে আমরা যে যেই ভাবে দেখি না কেন, মানবজীবনে সকলেই তেল-লুন-লকড়ির গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। দেহকে আত্মার কারাগারই মনে করি, আর আত্মার মন্দিরই মনে করি, এ পৃথিবীতে দেহমনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ভিত্তির উপর, ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন গড়তে হবে। ইহলোকের সত্য, মিথ্যা জ্ঞান করলে শুধু পরলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে অন্ন, প্রাণ। সুতরাং অন্নচিন্তাই প্রাণীমাত্রেরই আদিম চিন্তা। এই অন্নচিন্তা হতে উদ্ধার না পেলে অন্য চিন্তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেল-লুন-লকড়ির অধীনতাপাশ মোচন না করতে পারলে মনের এবং আত্মার পূরো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না।—Material prosperity সভ্যতার চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু একটি বিশিষ্ট উপায়। তেল-লুন-লকড়ির অধীনতা হতে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়—তেল-লুন-লকড়ির সংস্থান করা। আমাদের আজ হঠাৎ চৈতন্য হয়েছে যে ভারতবাসীর সে সংস্থান নেই। আমরা শুকিয়ে যাচ্চি, কেননা দেশের রস বিদেশ টেনে নিচ্ছে। নিজ দেশের রস, নিজ দেহের রক্তে কিরূপে পরিণত করতে পারি সেই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা যদি ভুলে গিয়ে না থাকি তাহলে, আমাদের "রাগ রঙ্গ ইয়কড়ি" ভুলে যেতে হবে, আর আমাদের মনে যদি না থাকে, তা হলে মনে রাখতে হবে, শুধু "তেল-লুন-লকড়ি" রস্কিন্ তাঁর সমস্ত জীবন ইংলণ্ডকে এই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, economics এই গ্রীক শব্দের আদিম অর্থ household management অর্থাৎ

গৃহস্থালা। প্রতি গৃহে যদি লক্ষ্মী না থাকেন তা হলে সমগ্র জাতি লক্ষ্মীছাড়া হবে। ঘর যদি অগোছাল রাখ তা হলে হাটেবাজারে যতই কেনা, বেচা করনা কেন, তাতে নিজে কিম্বা জাতি যথার্থ শ্রী এবং সুখলাভে বঞ্চিত হবে। এ মতের মধ্যে এইটুকু খাঁটি সত্য নিহিত আছে যে, দশে মিলে জাতীয় সমৃদ্ধিলাভের যে সমবেত চেষ্টা করি তার সুফল আমরা ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাচারিতায় নিষ্ফল করে দিতে পারি। আমরা যদি সকলে একত্র হয়ে বাইরে একদিকে টানি, আর প্রতিলোক ঘরে এসে তার উল্টো টান্ টানি—তাহলে ঘর, বার দুই নষ্ট হবে। আমি রস্কিনের শিষ্যস্বরূপে এই প্রচার করতে উদ্যতা হয়েছি যে, সুগৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহ সম্মার্জ্জনা করা।

(৬)

আমরা যে গৃহে বাস করি, সে যে কোন্ দেশীয় বলা কঠিন। বাঙ্গালার বাইরে, কি স্বদেশ কি বিদেশ, কোথায়ও তার জুড়ি দেখতে পাইনে। গৃহ যেমন সমাজের মূল, তেমনি আবার সহরেরও বুনিয়াদ। গৃহ হতে পল্লী, পল্লী হতে নগর, নগর হতে সহর, ক্রমবিকাশের এই নিয়ম। রোম, প্যারিস্ প্রভৃতি বনেদি সহরের architectureএতেই তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। ঐ architecture-এর প্রসাদেই নাগরিকগণ বর্ত্তমানে অতীতের সঙ্গে ঘর করে, অতীতের সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, সফলতা ও বিফলতা, গৌরব ও লজ্জা অলক্ষিতে তাদের মন অধিকার করে নেয়, প্রত্যেকেই নিজের, আত্মার ভিতর বৃহত্তর জাতীয় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের পক্ষে স্বজাতীয়তার ও স্বদেশীয়তার কাছে নিজেদের ধরা দেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক; তা হতে মুক্তি পাওয়াই আয়াসসাধ্য। আমাদের ভিতর মহদান্তঃকরণ ব্যক্তিরা যেমন অহংজ্ঞান খর্ব্ব ক'রে, স্বজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে

করেন—তেমনি ইউরোপের মহদান্তঃকরণ ব্যক্তিরাও স্বজাতিজ্ঞান খর্ব্ব ক'রে, মানবজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন। আমাদের সাধনার বিষয় হচ্চে Nationalism, তাহাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্ছে inter-nationalism। সে যাই হোক, কলিকাতার মত ভুঁইফোড় সহরে, শ্রীহীন, অর্থহীন, কিম্ভুত-কিমাকার ভুঁইফোড় গৃহে বাস ক'রে আমাদের পক্ষে স্বদেশী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়,—চকমেলান বাড়ী হালফেসানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একটি লম্বা গোছের ঘর, তার এপাশে দুটি, ওপাশে দুটি এই পাঁচ কামরা নিয়ে আমাদের গৃহ। মধ্যের ঘরটি হচ্ছে বাইরের ঘর, এবং উভয় পার্শ্বের বহির্দিকের ঘর কটা হচ্ছে অন্দর। বাস-স্থানের এই উল্টো পাল্টা ভাবের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের বরাবর যোগ রয়ে গেছে। আমাদের গ্রীষ্মর দেশে ঘরে হাওয়াও চাই ছাওয়াও চাই,—এক সঙ্গে দুই পাওয়া অসম্ভব বলে, এদেশের গৃহ দু ভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক অংশ বায়ুর পক্ষে যথেষ্ট খোলা, অপর অংশ সূর্য্যের পক্ষে যথেষ্ট রুদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত মিলে মানুষের গৃহনির্ম্মাণের হিসাব বাৎলে দেয়। প্রকৃতিই এদেশের গৃহ, সদর এবং অন্দরে ভাগ করতে শিখিয়েছিলেন। এবং আমাদের সমাজের গঠনও গৃহের গঠনের অনেকটা অনুসরণ করেছে। এই কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অবরোধ একটি সামাজিক প্রথা। আমার বিশ্বাস, এই কড়া রোদ এবং চড়া আলোর দেশে অসূর্য্যম্পশ্যা হবার লোভেতেই রমণীজাতি স্বেচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন। যেখানে গৃহে স্ত্রী-পুরুষের স্বতন্ত্র রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট নেই—সেখানে সমাজেও স্ত্রী-পুরুষের সাম্য অর্থ ঐক্য এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করে। ইংরেজি-আনার প্রসাদে আমাদের বাসগৃহের সদর অন্দর ভেঙ্গে যাবার প্রধান ফল যে, আমাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই

গৃহে অনেকটা সঙ্কুচিত ভাবে বাস করি। আমাদের ড্রয়িংরুম পাড়া-পড়সীর বৈঠকখানা হতে পরে না এবং বাড়ীর কোন অংশই মেয়েদের দুর্গ নয়। ইংরাজ এ দেশটি যে বিদেশ, সেটা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখবার জন্য দেশীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন, নইলে ভয় পাছে জাতিরক্ষা না হয়। আমরা তাদের অনুকরণে বাসা বাঁধলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বসমাজ হতে দূর হয়ে পড়ি। মোটামুটি আমার বক্তব্য কথা এই, মানুষমাত্রেরই দেশের সঙ্গে প্রধান যোগ গৃহ দিয়ে, স্বদেশীয়তার গোড়াপত্তন ঐ খানেই, গৃহসূত্র হতেই মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। গৃহের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীর রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি কাউকে বাড়ীবদলানোর পরামর্শ দিয়ে লোকসমাজে নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে প্রমাণ দিতে রাজি নই। এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যতের আশার একমাত্র ভরসা একটা বড় গোছের ভূমিকম্প।

গৃহে প্রবেশ করেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখ্‌তে পাই যে, বিদেশী বস্তু আমাদের গৃহ আক্রমণ করেছে, এবং তার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করে বসে আছে। সাহেবী-আনার খাতিরে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভব রকম জটিল হয়ে পড়েছে। আস্‌বাবের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকাই মুস্কিল, চলে ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা ত একবারেই নেই। এই জটিলতার মধ্যে সকলকেই কুটীল গতি অবলম্বন করতে হয়। প্রথমেই মনে হয় যে এ ঘর বাসের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য নয়, সাজাবার জন্য, দেখাবার জন্য, গৃহস্বামীর ধন এবং শিক্ষার পরিচয় দেবার একটা প্রদর্শনী মাত্র,—লক্ষ্মী স্বরস্বতীর মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের নূতন ধরণের গৃহসজ্জার বর্ণনা কর্‌বার কোনও দরকার নেই, কারণ তা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। চেয়ার, টেবিল, কোচ, টিপয়, পিয়ানো,

আয়না, ছিটের পরদা, ব্রাসেলসের কারপেট, চিনের পুঁতুল, ওলিওগ্রাফের ছবি, এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ এবং নিদর্শন। গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে এই সকল উপকরণ হয় Lazarus এবং Osler, নয় বৌবাজারের বিক্রীওয়ালার দোকান হতে সংগ্রহ করা হয়। যিনি ধনী তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখ্তে দোকান বলে ভুল হয়। আর যিনি লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতাল বলে ভ্রম হয়; আসবাব-পত্র সব যেন লড়াই থেকে ফিরে এসে, হয় মেরামত নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে। কোন চৌকির হাত নেই, কোন টিপয়ের পা নেই, কোন টেবিলের পক্ষাঘাত হয়েছে, পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কৌচের নাড়িভুঁড়ি নির্গত হয়ে পড়েছে, চিনের পুঁতুলের ধড় আছে কিন্তু মুণ্ডু নেই, পারিস পালেস্তারার ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত; ওলিওগ্রাফ সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে, আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো দন্তহীন এবং হারমোনিয়াম শ্বাসরোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা এই সকল অব্যবহার্য্য, কদর্য্য আবর্জ্জনা দূর করে, তার পরিবর্ত্তে ফরাস বিছিয়ে বসি না কেন? কারণ ইংরাজের কাছে আমরা শিখেছি যে, দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।

আমাদের এই নবসভ্যতার আজবঘরে স্বর্গীয় পিতামহগণ যদি দৈবাৎ এসে উপস্থিত হন, তাহলে নিঃসন্দেহ সব দেখে শুনে তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। অবাক্ হয়ে তাঁরাও ঊর্দ্ধনেত্রে চেয়ে থাক্‌বেন, নির্ব্বাক্ হয়ে আমরাও অধোবদনে বসে থাক্‌ব। উভয় পক্ষে কোন বোঝা-পড়া হওয়া অসম্ভব। অপরিচিত অশনবসন আসনভূষণের ভিতরে কিরূপে জাতি রক্ষা হয় তা তাঁরা বুঝতে পারবেন না; কৈফিয়ৎ চাইলে আমাদের মধ্যে যাঁর কিছু বলবার আছে, তিনি সম্ভবতঃ এই উত্তর দেবেন যে, "জাতি শব্দের অর্থ আপনাদের নিকট

সঙ্কীর্ণ ছিল, আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে। রক্ষা অর্থে আপনারা বুঝতেন শুধু স্থিতি আমরা বুঝি উন্নতি, আপনাদের গুরু ছিল মনু আমাদের গুরু হার্বার্ট স্পেনসার, আমাদের নূতন চাল আপনাদের হিসাবে জাতিরক্ষার প্রতিকূল কিন্তু আমাদের হিসাবে অনুকূল"। এ কথা যদি সত্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ নেই, কারণ যে প্রথা অবলম্বন করলে হিন্দু মুসলমান এমন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে আচারব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন, জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন করতেই হবে তার কোন প্রমাণ নেই। গতি মাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান-ভূমি আছে একটি দিক নির্দ্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্ব্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়। কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করি সেটা যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তেমনি কোন্ সমাজে জন্মগ্রহণ করি সেও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। পরিবর্ত্তন যেমন কালসাপেক্ষ পরিবর্দ্ধন তেমনি দেশ ও পাত্র সাপেক্ষ। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনের মূলে পূর্ব্বপুরুষরা বিরাজ করছেন, এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সামাজিকতার মূলে পূর্ব্ব-পুরুষদের সমাজ বিরাজ করছে। বংশপরম্পরা heredity হতে বিছিন্ন হয়ে কোন উন্নতি অসম্ভব। যে গৃহে পূর্ব্বপুরুষদের স্থান হয় না, সে গৃহে ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মানব-জীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। স্মৃতি যেমন প্রতি মানবের অহং জ্ঞানের মূল, পূর্ব্বাপরের যোগসূত্রস্বরূপ স্মৃতির অস্তিত্ব না থাকলে আত্মোন্নতি দূরে থাকুক কেহই আত্মার সন্ধান পেতেন না, তেমনি অতীতের স্মৃতি জাতীয় অহং জ্ঞানেরও মূল। অতীতের জ্ঞানশূন্য

হয়ে কোন জাতি জাতীয় আত্মার সন্ধান পায় না, জাতীয় আত্মোন্নতি ত দূরে থাকুক। এবং সামাজিক জীবের পক্ষে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হচ্চে পিতা-পিতামহ ইত্যাদি, এবং ক্ষেত্র হচ্ছে বাস্তু। সেই বাস্তুজ্ঞানরহিত হলে আমাদের বস্তুজ্ঞানশূন্য হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তর্ক তুলে, ইঙ্গবঙ্গনামক খেটে-খাওয়া দলের লোক্‌কে বিরক্ত করবার কোন অভিপ্রায় নেই। এঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দেন, আলোচনা বন্ধ করবার জন্য, আরম্ভ করবার জন্য নয়। হার্বার্ট স্পেন্‌সার এঁদের গুরু, কিন্তু শিক্ষাগুরু নন্, দীক্ষাগুরু। ইউ-রোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে এঁরা কিছুই শিক্ষালাভ করেননি, শুধু দুটি একটি বীজমন্ত্র গ্রহণ করেছেন, যথা, সভ্যতা, উন্নতি ইত্যাদি। অন্যান্য তান্ত্রিকদের মত এই নব্যতান্ত্রিকদেরও নিকটে বীজমন্ত্র যত দুর্বোধ, সম্ভবতঃ যত অর্থশূন্য তার তত মাহাত্ম্য। ইউরোপীয় সভ্যতা এঁরা জ্ঞানের দ্বারা পেতে চান্‌না, ভক্তি দ্বারা পেতে চান্। দাস্য ভাব সখ্যভাবের চর্চ্চাই এঁরা মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করেছেন। আমরা এঁদের যে অবস্থাটাকে দুর্দ্দশা বলে মনে করি, সেটি শুধু ইউরোপ ভক্তির দশা মাত্র।

যাঁরা তর্ক কর্‌তে প্রস্তুত তাঁরা তর্কে হার মান্‌তেও প্রস্তুত, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের মনোভাব এই, নগদ দামে না হয় ধার ক'রে দুখানা কোচ মেজ কিন্‌ব, এর মধ্যে আবার দর্শন, বিজ্ঞান কোথায়। নিজের কি আবশ্যক এবং নিজের কি মনোমত সেটা ঠিক কর্‌তে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করবার দরকার নেই। সুতরাং সাহেবি-আনার স্বপক্ষে এঁরা হয় সুবিধা না হয় সুরুচির দোহাই দেন। যখন beautyর দোহাই চলে না তখন utilityর দোহাই দেন, যখন utilityর দোহাই চলে না তখন beautyর দোহাই দেন। যখন এ শ্রেণীর লোকেরা বিজাতীয় আচার

ব্যবহারের utilityর ব্যাখ্যান সুরু করেন্ তখন মনে হয় এঁরা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের কৃষ্ণপক্ষীয় সন্তান, আর যখন এঁরা বিলাতি ছিট, বিলাতি কারপেটের beautyর ব্যাখ্যান সুরু করেন্ তখন মনে হয় Oscar Wildeর মাসতুতো ভাই। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ এঁদের জিজ্ঞাসা করে যে, জেল কিম্বা পাগলাগারদের অধিবাসী না হয়েও চুলের অবস্থা ওরকম কেন, এঁরা হেসে উত্তর করবেন আমরা "কবি নই, কাযের লোক"। এঁদের বিশ্বাস, দো-আঁসলা কুকুরের ল্যাজের মত ইঙ্গবঙ্গের চুল যত গোড়াঘেঁষে কাটা যায়, তার তেজ তত বৃদ্ধি হয়, তত রোক বাড়ে। এবং এই বিশ্বাস মিলের মতানুযায়ী। এঁদের রুচিসম্বন্ধেও এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ইংরাজি আসবাবের আবশ্যকীয়তা এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক।

বিদেশী রকমে ঘর সাজানতে যে আমাদের কি পর্য্যন্ত অর্থের শ্রাদ্ধ সে ত সকলেই জানেন। অধিকাংশ ইঙ্গবঙ্গের পক্ষে ঠাট্ বজায় রাখতেই প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হয়। ধার করা সভ্যতা রক্ষা করতে শুধু ধার বাড়ে। আমাদের এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে, অনাবশ্যক বহুব্যয়সাধ্য আচারব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকী ত বটেই সম্ভবতঃ অন্যায়ও। ক্ষমতার বহির্ভূত চাল বাড়ানো, গৃহ হতে লক্ষ্মীকে বিদায় করবার প্রশস্ত উপায়। তা ছাড়া বিদেশীর অনুকরণে বিদেশী-বস্তুতে যদি গৃহপূর্ণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, দেশের ধনে যদি বিদেশীর পকেট পূর্ণ করতে হয়, তাহলে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সে অনুকরণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইউরোপে সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত বাড়ান যায় জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিস্কার হয়। যদি আমার এত না হলে দিন চলে না এমন হয়, তাহলে তত সংগ্রহ করবার জন্য অধিক পরিশ্রম করতে হবে, এবং যে জাতি যত অধিক শ্রম

স্বীকার করতে বাধ্য সে জাতি তত উন্নত, তত সৌভাগ্যবান। কিন্তু ফলে কি দেখতে পাওয়া যায়? ইউরোপবাসীরা এই বাহুল্য চর্চ্চার দ্বারা জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে বলে, কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসিয়াবাসীদের নিকট সর্ব্বত্রই হার মান্‌ছে। এই কারণেই দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চিনে, জাপানি, হিন্দুস্থানী শ্রমজীবিদের বিরুদ্ধে নানা গর্হিত বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এসিয়াবাসিরা খাওয়া-পরাটা দেহধারণের জন্য আবশ্যক মনে করে, মনের সুখের জন্য নয়, সেইজন্য তারা পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই সন্তোষ, আমাদের জাতিরক্ষার, জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমরা যদি আমাদের পরিশ্রমের ফলের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ লাভ করতুম, আমরা যদি বঞ্চিত, প্রতারিত না হতুম, তা হলে দেশে অন্নের জন্য এত হাহাকার উঠত না। আমাদের এ দোষে কেউ দোষী কর্‌বেন না যে, আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিনে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে। আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষিত লোকের, বিশেষতঃ ইঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, standard of life বাড়ান, সভ্যতার একটি অঙ্গ। এ সর্ব্বনেশে ধারণা তাঁদের মন থেকে যত শীঘ্র দূর হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। উপরোক্ত যুক্তি ছাড়া জীবন-যাত্রার উপযোগী ইউরোপীয় সরঞ্জামের স্বপক্ষে আর কোন যুক্তি শুনেছি বলে ত মনে পড়ে না। তবে অনেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলে থাকেন, "আমার খুসি"! আমাদের দেশের রাজা, সমাজের অধি-নায়ক নন্। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা এদেশে কখন সামাজিক দলপতি হতে পারেন না—সুতরাং আমাদের সমাজে এখন অরাজকতা প্রবেশ করেছে। যে সমাজে শাস্ত্র আছে, কিন্তু শাসন মানাবার কোনও উপায় নেই, সেখানে শাসন না মেনে, যে কার্য্যে কোনও

বাইরের শাস্তি নেই সে কার্য্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে, এঁরা যে নিজেদের বিশেষরূপে নির্ভিক্, স্বাধীনচেতা এবং পুরুষসার্দ্দূল বলে প্রমাণ করেন, তার আর সন্দেহ কি ? অবশ্য একথা স্বীকার কর্‌তে হবে যে, "এঁদের খুসি" প্রভুদের খুসির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। সেত হবারই কথা। এঁরাও সভ্য, তাঁরাও সভ্য সুতরাং পরস্পরের মিল সে শুধু সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যদি কেহ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে চেয়ার, টেবিল, কোচ, মেজ, ইত্যাদি দেহ, আত্মা, কিম্বা মনের উন্নতির কিরূপে এবং কতদূর সাহায্য করে তাহলে আমি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাক্‌ব, কারণ সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, চৌকি, কোচ অনেকটা আরামের জিনিস, এবং আমরা অনেকেই অভ্যস্ত আরামভোগে বঞ্চিত হতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদণ্ড কিঞ্চিৎ কম-জোর এবং ঈষৎ বক্র সুতরাং আমরা পৃষ্ঠের একটা আশ্রয়ের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী। এবং আরাম-চৌকি এখন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যোগশাস্ত্রে বলে, সকল প্রকার আত্মোন্নতির মূলে সরল পৃষ্ঠদণ্ড বর্ত্তমান। সুতরাং যোগের প্রথম সাধনা হচ্ছে আসন অভ্যাস করা— পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করা। দাসজাতির দেহভঙ্গী স্ত্রীলোকের মত, সম্মুখ দিকে ঈষৎ আনমিত ; অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভারে নয়, অতি অভ্যস্ত সেলাম এবং নমস্কারচর্চ্চা বশতঃ। আমাদের জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগ্রত কর্‌তে হয়, তাহলে আমাদের পিঠের দাঁড়া খাড়া কর্‌তে হবে, অনেক অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ কর্‌তে হবে। সুতরাং একমাত্র দৈহিক আরামের খাতিরে বিদেশী আসবাবের প্রচার এবং অবলম্বন সমর্থন করা যায় না। সকলেই জানেন যে, জাপান ইউরোপের কাছে যা শিখেছে আমরা তা শিখিনি, কিন্তু খুব কম লোকেই জানেন যে ইউরোপের কাছে আমরা যা শিখেছি

ফলে ইউরোপের সঙ্গে কারবারে জাপান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে, ইউরোপের সঙ্গে কারবারে আমরা শুধু শক্তির অপচয় করেছি। এই কারণেই আমাদের জাপানের কাছে এই শিক্ষালাভ করতে হবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কি আমাদের বর্জ্জন করা উচিত। এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাটাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান দরকার এবং জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আমাদের গুরু হতে পারে না, কারণ জাপান শুধু এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করেছে!—খাওয়া-পরা থাকা-শোওয়া সম্বন্ধে জাপান স্বদেশের সনাতন প্রথা ত্যাগ করেনি। বিলেতি আস্‌বাব জাপানীর ঘরে স্থান পায়নি। আজও সমগ্র জাপান মাদুরের উপর বীরাসনে আসান্।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

---

* জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ যাঁরা জানতে চান তাঁহাদের আমি বক্ষ্যমান গ্রন্থগুলি পড়তে অনুরোধ করি। K. Okakuraর Ideals of the East এবং The Awakening of Japan, Y. Okakuraর Spirit of Japan, Nitobeর Bushido, Lafcadio, Hearnএর Kokora প্রমুখ গ্রন্থাবলী। যদি কাহারও এত বই পড়বার সময় এবং সুবিধা না থাকে এবং তাঁর ফরাসি ভাষা জানা থাকে তাহলে তাঁকে আমি Felicien Challayeর Au Japan নামক গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি। গুটি পঞ্চাশ পাতায় গ্রন্থকার আসল কথা অতি পরিস্কার করে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন। —লেঃ

পাণিনি তত্ত্ব।

(লিখন-প্রণালী)

(১)

পাণিনি-ব্যাকরণের নির্ম্মাণকৌশল, শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, এবং রক্ষা এ গুলিও লিখন-প্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক। একটু প্রণিধানের সহিত সূত্রগুলি পাঠ করিলেই এই বিষয় সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। পাণিনি, সংস্কৃত শব্দগুলিকে বিশ্লেষ করিয়া তাহা-দিগের প্রকৃতি ও প্রত্যয় এই দুইটি প্রধান অবয়ব পরিকল্পিত করিয়া প্রথম অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রকৃতির অনুশাসন শাস্ত্র বলিয়াছেন। ইহার মধ্যেও তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত যে সকল প্রত্যয়ের বিধান করিয়াছেন সেগুলিও প্রকৃতি নির্ম্মাণের উপযোগী, প্রকৃতিরই এক অঙ্গ মাত্র। মূল প্রকৃতি ও প্রত্যয়যুক্ত প্রকৃতির উত্তর যথাসম্ভব সুপ ও তিঙ্ বিভক্তি যোগের, এবং ঐ সকল বিভক্তি যোগে নিষ্পন্ন পদের, কিরূপ আকৃতি হয় তাহা ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে ক্রমে বলিয়াছেন। সর্ব্বশেষে পদ সন্ধি ও ষত্ব ও ণত্বের বিধান বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে স্বরবিষয়ক সূত্রগুলি যথা স্থানে, অর্থাৎ প্রকৃতির স্বর প্রকৃতি-প্রকরণে, প্রত্যয়ের স্বর প্রত্যয়-প্রকরণে ও পদস্বর পদ-প্রকরণে বলিয়াছেন। এই নির্ম্মাণকৌশল, প্রচলিত অন্যান্য ব্যাকরণ হইতে বিভিন্ন। এক সন্ধিসূত্রই নানাস্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়ের সন্ধি, প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সন্ধি, পদের সহিত পদের সন্ধি, প্রকরণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। এইরূপ প্রকৃতির সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিকার এক স্থানে, প্রত্যয়ের সান্নিধ্যে প্রকৃতির বিকার অপর একস্থানে, এবং পদসান্নিধ্যে পদবিকার

অন্য এক স্থানে নিবিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপে প্রথম পরিকল্পিত প্রকৃতি ও বিকৃতি ও তাহাদের বিকৃতির কথা পর পর থাকায় কোথাও বা শব্দ-সাধন ও ধাতু-সাধনের নিয়ম একই সূত্রে বলা হইয়াছে। তদ্ধিত ও সুপ্ বিভক্তির নিয়মও ঐরূপ একই স্থানে বলা হইয়াছে। এই প্রকার সূত্রবিন্যাসের ফল এইরূপ হইয়াছে যে, সাহিত্যের ব্যবহৃত একটি পদ সাধন করিতে হইলে পাণিনি ব্যাকরণের নানা অধ্যায়ের নানা সূত্রের সাহায্য লইতে হয়। পাণিনির একাংশ অধ্যয়ন করিলে কোন বিষয়েরই সম্যক অধিকার জন্মেনা। সমগ্র পাণিনি অধ্যয়ন না করিলে সংস্কৃত শাস্ত্রে সম্যক্ বুৎপত্তি জন্মেনা। মুগ্ধবোধ বা কলাপ ব্যাকরণের নির্ম্মাণপ্রণালী অন্যরূপ। সন্ধি, শব্দসাধন, ও ধাতুসাধনের সূত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত নাই, সন্ধিসূত্রগুলি একস্থানে, শব্দসাধনসূত্রগুলি একস্থানে, ধাতুসাধনসূত্রগুলি একস্থানে নির্দ্দিষ্ট থাকায় একবিষয়ক সূত্র একই স্থানে সমগ্র অবস্থায় আছে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই নিয়মটী বড়ই সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই পরবর্ত্তী ব্যাকরণগুলি সর্ব্বাঙ্গীন না হওয়ায় উহাদিগকে সম্যক্ শাস্ত্রশিক্ষার উপযোগী বলা যায় না। ঐ সকল ব্যাকরণের সাহায্যে বৈদিকসাহিত্যে প্রবেশের অধিকারই জন্মেনা, ভাষা-সাহিত্যেরও সম্যক্ জ্ঞান হয়না। পাণিনি, ব্যাকরণ-নির্ম্মাণে কিরূপ প্রয়াস করিয়াছিলেন, ও কত বিষয়ে যুগপৎ লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, স্বল্পাক্ষরে তাহার পরিচয় দেওয়া দুঃসাধ্য। পাণিনিসূত্রের একটী নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিতে হইলে ঐ বিষয়ের অনেক আভাস পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত ঐরূপ কোন নির্ঘণ্ট মুদ্রিত হয় নাই। প্রকৃতি প্রত্যয় ও উহাদের বিকৃতি বিষয়ক নিয়ম করিয়াই পাণিনি সহজ উপায়ে স্বল্প সংখ্যক সূত্র দ্বারা অনন্ত সংস্কৃত শব্দরাশির শাসন করিয়াছিলেন। এই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে

গিয়া যে সকল "অধিকার সূত্র" সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ঐ সকল অধিকার সূত্রের কোথায়ও পূর্ণানুবৃত্তি, কোথায়ও বা আংশিক অনুবৃত্তির নিয়ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ সকল অধিকারের গতি দেখিলে অনায়াসেই বুঝা যায় যে, এক উদ্যমেই এমন সর্ব্বতোমুখী, নিরবদ্য, স্বল্পাক্ষর, সারবান, নিরর্থক অক্ষর-বিহীন, অসন্দিগ্ধ শাস্ত্র নির্ম্মিত হয় নাই। প্রথম রচিত সূত্রগুলির পুনঃ পুনঃ সংস্কার করিতে করিতে এবং তাহাদিকে নানাস্থান হইতে ভ্রষ্ট করিতে করিতে যথাস্থানে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এবং অনেক অভাব, ক্রমে লক্ষিত হইয়া পরে তাহাদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ও পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় উদাহরণ প্রদানে বিরত হইলাম। কুতূহলী পাঠক নির্ঘণ্ট করিবার প্রয়াস পাইলেই সহজে বিষয়টি বোধগম্য করিতে পারিবেন। সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে পারি যে, পাণিনি ভাষাস্কন্ধের কেবল বহিরাকার দর্শান যথেষ্ট মনে করেন নাই; উহার অস্থি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক উপাদানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুগুলিও দর্শাইয়াছেন। একটী সূত্র বা তাহার একটী অক্ষরও স্থানভ্রষ্ট করিবার যোগ্য নহে। মহাবৃত্তিকার কাত্যায়ণ, এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি-প্রমুখ মনীষীগণ সূত্রগুলির তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া রচনাকৌশলের ও সম্পূর্ণতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। নমস্কারসূত্রই তাহার প্রমাণ।

"যেনাক্ষর সমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাৎ।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥
যেন ধৌতা গিরঃ পুংসাং বিমলৈঃ শব্দবারিভিঃ।
তমশ্চাজ্ঞানজং ভিন্নং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ॥

পাণিনির সময়ে বহু বৈয়াকরণের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, তাহাও তিনি আপন ব্যাকরণে সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবল স্মরণ-শক্তির সাহায্যে এইরূপ ব্যাকরণ

হয়। লিখন-প্রণালীর সাহায্য অবশ্যই গৃহীত হইয়াছিল বলিতে হইবে।

মোক্ষমূলার মহোদয়ও পাণিনিসূত্রের রচনাকৌশল দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তথাপি মোক্ষমূলারের বিস্ময় কেবল বিস্ময়েই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি বিস্মিত না হইয়া, বিস্ময়ের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই, পাণিনিসূত্রের নির্ম্মাণকৌশলের মধ্যেই লিপিপ্রণালীর প্রভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। তাঁহার পক্ষ এই যে, আর্য্য জাতির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল তাহা লোকপ্রসিদ্ধ। তাঁহারা বেদ ও বৈদিক অন্যান্য শাস্ত্র বংশপরম্পরা মুখে মুখে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং পাণিনিব্যাকরণ রচনায় লিখনপ্রণালীর সাহায্যের অত্যাবশ্যকতা দেখা যায় না। কেবল স্মরণশক্তির সাহায্যেই পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তটী ঠিক হইল না। কোন একটি সন্দর্ভ রচনা করা বা তাহার ব্যাখ্যা করা অথবা ঐ সন্দর্ভ ও তাহার ব্যাখ্যা বংশপরম্পরা অভ্যস্ত রাখা এক কথা; আর সমগ্র সংস্কৃত শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহা হইতে পাণিনি ব্যাকরণরত্ন সংগ্রহ করা অপর এক কথা। দুইটা গুরুতর বিভিন্ন বিষয়। বিষয়ের সাম্যাভাবে দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে। সে যাহাহউক, লিখন-প্রণালীর সাহায্য না লইয়াও পাণিনিই যেন ব্যাকরণ রচনা করিলেন। লিখনপ্রণালীর সাহায্য ব্যতীত তাহার প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার অন্য কি উপায় কল্পনা করা যাইতে পারে? কেবল পাণিনি-ব্যাকরণের সূত্রগুলির আবৃত্তিতে ফলোদয় হয় না। যোগ্য অধ্যাপক অথবা বৃত্তি এবং উদাহরণ ও প্রত্যুদাহরণের সাহায্য ব্যতীত সূত্রের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাপ্তি হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এই ব্যাপার দীর্ঘকালসাপেক্ষ। মোক্ষমূলার মহোদয়ের মত ঠিক হইলে পাণিনির সময়ের প্রত্যেক ছাত্রই তাঁহার ন্যায় স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিপ্রতিভাসম্পন্ন

ছিলেন একথা স্বীকার না করিলে পাণিনি-ব্যাকরণের প্রচার ও রক্ষা হওয়ার অন্য কোন উপায়ই দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, লিপিকৌশল এত মহোচ্চ প্রতিভার বিজ্ঞাপক নহে যাহা আর্য্য জাতির বুদ্ধিস্থ হওয়া অসম্ভব ছিল। সুতরাং মোক্ষমূলার মহোদয়ের পক্ষ সমর্থন জন্য কোনরূপ কষ্টকল্পনা না করিয়া লিপিপ্রণালীর অস্তিত্ব স্বীকার করাই সুগম পথ।

পাণিনির সময়ে লিখনপ্রণালী প্রচলিত থাকার অনুকূলে অনেক যুক্তি পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ যুক্তিগুলি ব্যতিরেক-মুখী। পক্ষসমর্থণে ঐরূপ যুক্তি অনেকের পক্ষে যথেষ্ট না হইতে পারে। সুতরাং এক্ষণে অন্বয়মুখী কয়েকটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। ইহাতে দেখা যাইবে যে, পাণিনি-ব্যকরণেই লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব পরিচায়ক, এমন কি লিখিত বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জকও অনেক শব্দ আছে।

৩।২।২১ সূত্রে* "লিপিকর" শব্দ আছে। লিপিকর শব্দের অর্থ লেখক, তাহা সকলেই অবগত আছেন। লিখনপ্রণালীর প্রচলন না থাকিলে লিপিকর শব্দটীর প্রচলন হইত না। লিপিকর শব্দ চির-প্রচলিত শব্দ না হইলে পাণিনি-ব্যাকরণে স্থানও পাইত না। পাণিনির প্রতিজ্ঞাসূত্র এই—

অথ শব্দানুশাসনং।

অর্থাৎ এক্ষণে শব্দানুশাসন শাস্ত্র বলা হইতেছে। এই শব্দ সাধু শব্দ। বেদে ও লোকে যে সকল শব্দ চিরপ্রসিদ্ধ আছে সেই গুলিই সাধু শব্দ। শব্দানুশাসন শাস্ত্রে লোকে ও বেদে যে সকল শব্দ চির-

---

* দিবা-বিভা-নিশা-প্রভা-ভাস্কারান্ত নন্তাদি-বহু--নান্দী--কিং--লিপি-লিবি-বলি

প্রসিদ্ধ আছে তাহারই যথাযথ ব্যুৎপত্তি বলা হইবে। নূতন কোন শব্দের বা নূতন কোন ব্যুৎপত্তির সৃষ্টি করা হইবেনা। ইহাই পাণিনির প্রতিজ্ঞাসূত্রের অর্থ। এই অর্থ ই আর্য্য মনীষীগণ একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এই অর্থ সমীচান বলিয়া স্বীকৃত হইলে, এক "লিপি-কর" শব্দ দ্বারাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পাণিনির সময়ের স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতেই আর্য্যগণের মধ্যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। মোক্ষমূলার মহোদয় এই "লিপিকর" শব্দটার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ শব্দটী তাঁহার অভীষ্ট তর্কের অত্যন্ত প্রতি-কূল তাহাও অবশ্য বুঝিয়াছিলেন। তর্কটীও ত্যাগ করিলেন না, শব্দটীকেও উঠাইয়া দিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, এরূপ একটি শব্দদ্বারা লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হয় না। ধন্য সত্যানুসন্ধিৎসা!

৫।১।৪৯ সূত্রে* "যবনানী" শব্দ আছে। ভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—"যবনাল্লিপ্যাম্" "যবনানী লিপিঃ"। "যবনানী লিপিঃ" অর্থে যবনদিগের লিপি বুঝায়। প্রসিদ্ধ বীরবর আলেকজাণ্ডারের ভারত-অভিযানের পর ভারতপ্রান্তে যে একটী গ্রীক্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তত্রত্য গ্রীক্গণ যবন নামে অভিহিত হইয়া থাকিলেও সূত্রস্থ যবনশব্দ উহাদিকে লক্ষ্য করিতেছে না। পাণিনি সূত্র গ্রীক অভিযানের বহু পূর্ব্বে রচিত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তবেই দেখা যাইতেছে যে, পাণিনির সময়ে যবনদিগের মধ্যে লিখন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, ইহা আচার্য্যগণ জানিতেন। এমন কি লিপি-বোধক "যবনানী" শব্দ সিদ্ধ-শব্দ-পর্য্যায়-সন্নিবিষ্ট অবস্থায় বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আর্য্যগণমধ্যে সাধু শব্দরূপে প্রচলিত হইয়া পাণিনি

ব্যাকরণে স্থানলাভ করিয়াছিল। বেদপ্রাণ আর্য্যগণ লিখন প্রণালীতে অভিজ্ঞ থাকিয়াও, প্রবল প্রয়োজন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপন াদিগের শাস্ত্র রক্ষার জন্য আপনাদিগের মধ্যে ঐ প্রণালীর প্রচলন করেন নাই, একথা সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। "যবনলি পি" অন্যবিধ লিপির ব্যাবর্ত্তক। সুতরাং যবনলিপিই আর্য্য লিপির অস্তিত্ব সূচিত করিতেছে। এস্থলে আর এক তর্ক হইতে পারে, কোন্ জাতি সর্ব্ব প্রথমে লিখনপ্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছিলেন? আর্য্যজাতি কি তদিতরজাতি? এ তর্কের সম্যক্ উত্তর দেওয়ার প্রমাণাবলী এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। আর্য্যজাতির বর্ণমালায় সম্পূর্ণতা ও অক্ষর সমাম্নায় অর্থাৎ বর্ণগুলির ক্রমপাঠ, স্বর ব্যঞ্জনবিভাগ, উচ্চারণ ভেদে বর্ণের বর্গাদি নিরূপণ ও স্থান বিভাগ, ইত্যাদি আর্য্য লিখনপ্রণালীর মৌলিকত্বের অনুকূলে প্রবল প্রমাণ বলিয়া একদিন না একদিন সকল দেশেই গৃহীত হইবে, আশা করা যাইতে পারে।

মোক্ষমুলার মহোদয়ের আর একটী তর্ক এই যে, পাণিনি ব্যাকরণে বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দ নাই। লিখনপ্রণালী তাঁহার সময়ে প্রচলিত থাকিলে উহাতে বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দ অবশ্যই থাকিত। ইহাকে সুতর্ক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্যাকরণশাস্ত্র রচনা করিতে হইলেই বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দের অবশ্য উল্লেখ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। বর্ত্তমানকালের কোন প্রথা, প্রাচীন প্রথার নিয়ামক হইতে পারেনা। বর্ত্তমান কালেও বর্ণের আকৃতি-ব্যঞ্জক শব্দ অন্যান্য সংস্কৃত ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় না। মুগ্ধবোধের "অং অঃ নুবী" সূত্রে বর্ণের আকৃতির কোন কথা নাই। বৃত্তিতে আছে। সে যাহাহউক পাণিনি, "শব্দানুশাসনম্" শাস্ত্রে শব্দের যথাযথ ব্যুৎপত্তি বলিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বর্ণ বা অক্ষরের লিখনপ্রণালী

বলিবেন এমত কোন অঙ্গীকার করেন নাই। তিনি বর্ণের আকৃতি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র আপন ব্যাকরণে মুখ্যভাবে বলিতে গেলে প্রতিজ্ঞা-ভ্রষ্ঠ হইতেন। সুতরাং, পাণিনিব্যাকরণে বর্ণের আকৃতিব্যঞ্জক শব্দের অভাব থাকা প্রকৃত হইলেও তদ্দ্বারা লিখনপ্রণালীর প্রতিকূলে কোন সিদ্ধান্তই করা যায়না। সৌভাগ্যক্রমে দুই একটী বর্ণের আকৃতি ব্যঞ্জক শব্দ পাণিনি-ব্যাকরণে প্রসঙ্গাধীন পাওয়া যায়। কর্ণে লক্ষণস্যা-বিষ্টাষ্ঠ পঞ্চ-মণি-ভিন্ন-ছিন্ন-চ্ছিদ্র স্রুব-স্বস্তিকস্য ৬।৩৫। এই সূত্রে "পঞ্চকর্ণ" ও "অষ্টকর্ণ" শব্দ আছে। এই সূত্রের অর্থ এই যে "কর্ণ" শব্দ উত্তরপদে থাকিলে লক্ষণবাচি পূর্ব্বপদস্থ অন্ত্যস্বর দীর্ঘ হয়, "পঞ্চ কর্ণ" "অষ্টকর্ণ" প্রভৃতি স্থলে হয় না। এই লক্ষণবাচি শব্দ কি? এই সূত্রে পূর্ব্বপ্রচলিত একটী প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এই, পূর্ব্বে পশুস্বামিগণ আপনাপন পশুর পরিচয় জন্য উপায়বিশেষদ্বারা পশুর কর্ণের বিশেষ বিশেষ আকৃতি করিয়া দিতেন। ঐ ঐ আকৃতি-বিশিষ্ট কর্ণই পশুর স্বামীর পরিচায়ক হইত। এই সূত্রের 'লক্ষণ' শব্দ ঐ ঐ আকৃতিকে সূচিত করিতেছে। সুতরাং "পঞ্চকর্ণ" ও "অষ্টকর্ণ" শব্দের অর্থ পঞ্চাকৃতি কর্ণ ও অষ্টাকৃতি কর্ণ। উচ্চারণে বর্ণের আকৃতির অসম্ভব। সুতরাং ঐ আকৃতিকে লিখিত পাঁচ ও আটের আকৃতি বলিতেই হইতেছে। এই এই আকৃতি দ্বারা পশুরক্ষক রাখালগণও আপনাপন স্বামীর পশু অবশ্য চিনিয়া লইত। যে দেশের রাখালগণেরও লিখনপ্রণালীর কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়, সে দেশের শিক্ষিত আর্য্যগণের লিখনপ্রণালীর অভিজ্ঞতা ছিলনা, একথা বলা বক্তার বিড়ম্বনামাত্র। বেদপ্রাণ আর্য্যগণের লিখন-প্রণালীর অত্যাবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে ঐ সকল কথার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। দুঃখের বিষয় এই যে, মোক্ষমূলর

তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই অথবা উহাদের সমালোচনা করা তিনি অনাবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা অনাবশ্যক।

সমুদাংভ্যো যমোং গ্রন্থে।১।৩।৭৫

অধিকৃত্য কৃতেগ্রন্থে।৪।৩.৮৭

গ্রন্থান্তাধিকেচ।৬।৩।৭৯

সূত্রে "গ্রন্থ" শব্দ আছে। এই গ্রন্থ শব্দের অর্থ কি? 'গ্রন্থ' শব্দে লিখিত পুস্তক বুঝায় ইহা সকলেই জানেন। চুরাদিগণীয় 'গ্রন্থ' বন্ধনে, এই ধাতু হইতে পুস্তকার্থক গ্রন্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ তালপত্রে বা অন্য কোনরূপ পত্রে পুস্তক লিখিয়া পত্রগুলির মধ্যে ছিদ্র করিয়া সূত্রদ্বারা গাঁথিতেন এবং বন্ধনও করিতেন। ইহাকেই গ্রন্থ বলা হইত। বোধ হয় এই কারণেই গ্রন্থশব্দের পুস্তক অর্থ হইয়াছে। ধাতুপাঠে 'গ্রন্থ' শব্দের আরও ব্যুৎপত্তি ও অর্থ থাকা দৃষ্ট হয়। 'গ্রন্থ' সন্দর্ভে (চুরাদি), 'গ্রন্থ' সন্দর্ভে ক্র্যাদি। সন্দর্ভার্থক ধাতু হইতেও 'গ্রন্থ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। সন্দর্ভ অর্থে 'রচনা'। পাণিনি-সূত্রস্থ 'গ্রন্থ' শব্দ উভয়ার্থের সহিতই ঐক্য হয়। পুস্তকার্থ গ্রহণ করিলে 'গ্রন্থ' শব্দ লিখনপ্রণালীর অস্তিত্বের পরিচায়ক হয়। মোক্ষমুলার মহোদয় সন্দর্ভার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। অপর অর্থ ত্যাগের যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করেন নাই। স্বরিতেনাধিকারঃ ১।৩।১১ সূত্রে পাণিনি বলিয়াছেন যে 'স্বরিত' দ্বারা অধিকার বুঝিতে হইবে। এই 'স্বরিত' কি? ইহা কি লিখিত চিহ্ন, যাহা বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টিতে যুক্ত থাকিবার কথা, অথবা ইহা সমাহারঃ স্বরিতঃ ১।২।৩১ সূত্রের কথিত স্বরবিশেষ? ঐরূপ অনুদাত্ত ঙিত আত্মনেপদম্।১।৩।১২ সূত্রে 'অনুদাত্তেৎ' ধাতুর এবং স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে।

যে এই অনুদাত্ত ও স্বরিত কি লিখিত চিহ্ন, কি উচ্চারিত স্বর, যাহা নীচৈ রনুদাত্তঃ ।১।২।৩০ সূত্রে ও সমাহারঃ স্বরিতঃ ।১।২।৩১ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে ? বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ১।৩।১১, ১।৩।১২, ও ১।৩।৭২ সূত্রের লিখিত অনুদাত্ত ও স্বরিত লিখিত চিহ্ন, থাকার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬।১।১৬২ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ধাতুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইবে। যথা পচতি, যাতি।

ধতুর গণ পাঠে দেখা যায়, অনেক একস্বরবিশিষ্ট ধাতু আছে যাহারা উদাত্ত বা স্বরিত অথচ অনুদাত্তেৎ। এই সকল ধাতুর পারায়ণ কিপ্রকারে করা যাইবে ? যদি অনুদাত্ত বা স্বরিত, লিখিত চিহ্নমাত্র হয় তাহা হইলে কোন তর্কের বিষয় থাকেনা। ধাতুর পারায়ণ কার্য্য, গণ পাঠোক্ত স্বরেই হইতে পারে। কিন্তু অনুদাত্ত বা স্বরিতকে উচ্চারণবিশেষ স্বীকার করিলে অনুদাত্তেৎ স্বরিত অথবা উদাত্ত এক স্বরবিশিষ্ট ধাতুর পারায়ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভগবান্ পাণিনি ব্যাকরণে অনেক সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি স্বরিতেৎ বা অনুদাত্তেৎ ইত্যাদি না বলিয়া ঐ ঐ বিষয়ের পরিচায়ক এক একটী স্বতন্ত্র ইৎ সংজ্ঞক অনুবন্ধ বর্ণ মাত্র ধাতুর সহিত যোগ করিয়া দিলেই শিষ্যদিগকে এই ব্যাকুলতা হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিতেন। এক স্বরবিশিষ্ট অনুদাত্তেৎ ধাতুরও অন্ত্যস্বরবর্ণ পারায়ণ সময়ে অনুদাত্ত ও প্রয়োগ সময়ে ।৬।১।১৬০ সূত্রানুসারে উদাত্ত পাঠ করার গোলযোগ হইতে শিষ্যদিগকে মুক্ত করিতে পারিতেন। ধাতুর গণ এক্ষণে যেমন প্রচলিত আছে ভগবান্ পাণিনির সময়েও ঐরূপ গণ-পাঠ যে প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাণিনি-ব্যাকরণেই আছে, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।১।২।৩, ৪, ১২, ৭২॥২।৪।৭১।৭২, ৭৫, ৭৯॥৩।১।৬৮, ৩৯, ৭৩, ৭৭, ৭৮,৮১॥ সূত্রগুলি পাঠ করিলেই ঐ বিষয়ক যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়।

১।৩।১১ সূত্রে যে স্বরিতদ্বারা অধিকার বুঝিবার উল্লেখ আছে, এই অধিকার কি ? অধিকৃত বর্ণ বা বর্ণসমূহ পর পর সূত্রে যুক্ত থাকিবে ইহাই অধিকার শব্দের তাৎপর্য্য। সূত্রের অবয়বের লাঘব করাই অধিকারের প্রধান উদ্দেশ্য। পাণিনি-ব্যাকরণের অনেক স্থলেই এই অধিকারের আশ্রয় গৃহীত হইয়াছে। কোথাও বা সমগ্র সূত্র কোথায় বা সূত্রের একাংশের অধিকার চলিয়াছে। এক্ষণে সূত্রপাঠে তাহা সর্ব্বত্র বুঝা যায় না। বৃত্তি বা উপদেশের সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হয়। স্বরিত দ্বারা এই অধিকার বুঝিতে হইবে, একথা ভগবান্ পাণিনি বলিয়াছেন। যেস্থলে একটীমাত্র বর্ণের অধিকার বুঝিতে হয় সেস্থলে স্বরিতকে উচ্চারিত স্বর বলিলেও কথঞ্চিৎ চলিতে পারে, কিন্তু যেস্থলে শব্দসমূহ অধিকার সংজ্ঞার অন্তর্গত হয় সে স্থলে বড়ই কঠিন সমস্যা। এমন অনেক স্থল আছে যে, অধিকৃত শব্দসমূহের মধ্যে কতকগুলির স্বরবর্ণ উদাত্ত, কতকগুলির অনুদত্ত ও কতকগুলির স্বরিত প্রকৃত উচ্চারণ। ঐ সকল স্বাভাবিক নিয়ম অতিক্রম করিয়া সকল গুলিকেই স্বরিতস্বরে উচ্চারণ করার ব্যবস্থা ছিল, একথা স্বীকার করা বড়ই কঠিন। বিশেষতঃ ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ। তাহার শব্দ উচ্চারণ ঠিক ঠিক স্বরে হইতেই হইবে। নতুবা উচ্চারণ ফলবান হইবে না, প্রত্যুত উচ্চারকের অপরাধ হইবে ও তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। সমাস ও প্রত্যয়ের যে সকল স্বর নিরূপিত আছে অধিকৃত-সমাস-যুক্ত ও প্রত্যয় স্বরবর্ণ গুলি যুক্ত ঠিক সেই সেই স্বরে পঠিত না হইলে সূত্রের অর্থই অন্যরূপ হইবার আশঙ্কা। এতগুলি অনিষ্ট দর্শন করিয়াও ভগবান্ পাণিনি প্রকৃত উচ্চারণের পদ্ধতি অতিক্রম করিয়া অধিকৃত শব্দগুলিকে একস্বরিত স্বরে পাঠ করার ব্যবস্থা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন একথা স্বীকার করা যায় না। অনুদাত্ত ও স্বরিতকে এই এই স্থলে লিখিত

হইতে ঐ চিহ্ন তিরোহিত হইয়াছে। এখনকার প্রচলিত ব্যাকরণে অধিকারের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

অদর্শনং লোপঃ ১।১।৬০ সূত্রে অদর্শনের লোপ সংজ্ঞা করিয়াছেন। প্রয়োগকালে যে যে বর্ণের দর্শন হয় না তাহারই লোপ সংজ্ঞা বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ ধাতু, প্রত্যয়, বিকরণ, আদেশ, আগম প্রভৃতি অনেক স্থলেই অনুবন্ধযুক্ত থাকে, ঐ অনুবন্ধগুলির অন্য ফল আছে। উচ্চারণের সময়ে ঐ ঐ ফলের জন্য ঐ অনুবন্ধগুলিরও উচ্চারণ হয়। লেখার সময়েও লিখিত হয়, কিন্তু প্রয়োগকালে ঐগুলির অস্তিত্ব থাকে না, অদর্শন হয়, এজন্য অদর্শনকেই লোপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ধাতু যথা ডুকৃঞ্ করণে। প্রয়োগকালে ডুঞ্ ভাগের অদর্শন হয়, কৃ অংশমাত্র থাকে। প্রত্যয়—যথা অচ, চ্এর অদর্শন হয়। প্রয়োগকালে অকার মাত্র থাকে। বিকরণ—শপ্, শ্ ও প্এর অদর্শন হয়। প্রয়োগকালে অকার মাত্র থাকে।

আদেশ—চক্ষ্ ধাতু স্থানে খ্যাঙ্ আদেশ হইলে ঙ্এর অদর্শন হয় এবং প্রয়োগ কালে খ্যা মাত্র বিদ্যমান থাকে। আগম—নুম্, উ ও ম্এর অদর্শন হয় প্রয়োগ কালে ন্ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। যে গুলির অদর্শন হয় উহাদিগের সাধারণ নাম অনুবন্ধ। উহাদিগেরও ফল আছে। ঐগুলি নিরর্থক নহে! বাহুল্য ভয়ে এস্থলে উহার বিস্তৃতি করা হইল না। এক্ষণে অদর্শন কাহাকে বলা যায়? দর্শনের অভাবকে সকলে অদর্শন বলিবেন। পূর্ব্বে দর্শন পথে ছিল পরে দর্শন পথের অতীত হইয়াছে। এই অর্থ করিলে সূত্রস্থ অনুবন্ধগুলি লিখিত বর্ণ হয় কারণ, লিখিত বর্ণ হইলেই অদর্শন ও দর্শনের বিষয় হয়, ইহাও বলা আবশ্যক যে দর্শনস্থলে শব্দেরও গৌণার্থ আছে। মুখ্যার্থের বিষয় সম্ভবপর হইলে গৌণার্থ গৃহীত হওয়ার শাস্ত্রাভাব।

৩।২।১৭৮ ॥ ৩।২।১৭৫ ॥ ৩।৩।১৩০ ॥ ৩।২।১০১ ॥ ৩।৪।৬৪ ॥

সূত্রে "দৃশ্যতে" "দৃশ্যন্তে" ইত্যাদি শব্দ আছে। অন্যান্য অনেক সূত্রেও ঐ ঐ শব্দ আছে। এগুলিরও মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে পাণিনি-সূত্রগুলি কেন, ঐ ঐ সূত্রের পক্ষীভূত শাস্ত্রগুলিও লিখিত থাকা সপ্রমাণ হয়। মোক্ষমুলার মহোদয় "দৃশ্" ধাতুর গৌণার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষ কত দূর সবল সুধী পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

মান্যবর গোল্ডষ্টুকার মহোদয় "পাণিনি" শীর্ষক পুস্তকে এই প্রবন্ধোক্ত অনেক তর্ক ও অন্যান্য অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া মোক্ষমুলার মহোদয়ের তর্কখণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতেও মোক্ষমুলার মহোদয় আপন তর্ক ত্যাগ করেন নাই। অথচ মান্যবর গোল্ডষ্টুকার মহোদয়ের তর্কগুলির খণ্ডনেরও কোন চেষ্টা করেন নাই, মোক্ষমুলার মহোদয়ের গ্রন্থই আমাদের দেশের বিদ্যামন্দিরে সচরাচর অধীত হইয়া আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেকেই বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার মতের পক্ষপাতী হইতে পারেন আশঙ্কায় এবং তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানের কথঞ্চিৎ সাহায্য হইবে বলিয়া এই প্রবন্ধে এই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইল।

শব্দশাস্ত্রঘটিত তর্কগুলি নিতান্ত নীরস। পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে বিবেচনায় লিখনপ্রণালী প্রবন্ধের এইখানে শেষ করা হইল। কুতূহলী পাঠক মাহাত্মা গোল্ডষ্টুকারের পুস্তক পাঠ করিলে আরও অনেক বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডা.. .

রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক ঘটনা।

বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের জীবন আলোচনা আমাদের মধ্যে অনেকেই করিয়াছেন, আমিও যৎসামান্য করিয়াছি তাহাতে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার বিশ্বাস, এখনও অনুসন্ধান করিলে সীতারাম রায় সম্বন্ধীয় ও তৎসাময়িক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয় না।

বাঙ্গলা দেশের যখন ধারাবাহিক ইতিহ (স্ক সন্ধান পাওয়া যায় না তখন অনেক স্থলে কিম্বদন্তি, প্রবাদ ইত ত ইচ্ছুৎ পর নির্ভর করিয়া ইতিহাস লিখিতে হয়। আমাদের দেশে যাথের পরা নেক চলিত গল্প ও কিম্বদন্তি আছে যাহার মধ্য হইতে আমরা একজন য়াসে কিছু না কিছু ইতিহাস সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ করিতে পারি। আমি সেইরূপ একটী কিম্বদন্তির অবতারণা করিয়া সীতারাম রায়ের সমসাময়িক যৎকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্য পাঠক সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

যশোহর জেলার বুনাগাতি নিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সরকার মহাশয়ের নিকট কথাপ্রসঙ্গে একদিন যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই নিম্নে বলিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আমি বিন্দুমাত্র সন্দিহান নহি।

তিনি বলিলেন—"আমরা এই যশোহর জেলার কায়স্থবংশের প্রধান মৌলিক। দক্ষিণরাঢ়ীসমাজে আমারা খুব মান্য গণ্য। আমাদের বংশের কৌলিক উপাধি অগ্রে দত্ত ছিল। সময়ে, রায় উপাধি হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমরা রায় নামে পরিচিত ছিলাম। আমাদের রায় বংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে নিতান্ত কম ছিল না। বিষয়

আমার পূর্ব্বপুরুষগণ, তৎকালীন অধিবাসীগণের মধ্যে
ব ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে বুনাগাতির রায়বংশ চিরকালই
লেন। একদিন একজন নবাবী চোপদার আসিয়া আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রঘুনাথ রায়কে মুরশিদাবাদ যাইতে অনুরোধ করে। তাহার হস্তে নবাবের পাঞ্জাযুক্ত পার্সি ভাষায় লিখিত একখানি পত্র ছিল। উক্ত পত্র আমাদের গৃহে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আমার পূজ্যপাদ রঘুনাথ রায়, চোপদারের সঙ্গে মুরশিদাবাদে যাইবার সময়ে অগ্রদ্বীপের নিকটে এক দরিদ্রার কন্যাকে বিবাহ করেন। বলিতে গেলে, এই পূজনীয়া মহিলার শুভাগমনে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী ও সুপ্রসন্ন হন। মতিমান ঘুনাথ, নবাবীসরকারে কার্য্য পাইয়া "সরকার" নামে পরিচিত হইতে

এই হইতে আ ংশ সরকার নামেই পরিচিত। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘটকগণ রঘুনাথে র বিবাহের জন্য বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া কোন স্থানে সমান অথবা উচ্চ-ঘরে পাত্র-পাত্রী জুটাইতে পারিলেন না।

এদিকে রঘুনাথের একমাত্র পুত্র বিনোদবিহারীর নাম সাধারণে "বিনোদ বীর" নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। তাহার অসাধারণ শারীরিক শক্তিসামর্থ্য দেশময় রাষ্ট্র হইল। রঘুনাথ সরকার বুনাগাতিতে এক প্রকাণ্ড গড়যুক্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া সমাজের মধ্যে একটা "একজাই" করিতে ইচ্ছুক হইলেন—কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না। কেন না, বিনোদের শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাইয়া মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায় তাহাকে সেনাপতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিনোদ এবং রঘুনাথ তাহাতে অসম্মত হন। এবং এইজন্য রাজা তাহাদের একজাই কার্য্যে বাধা দিয়াছিলেন। এই সূত্রে বিনোদের সঙ্গে সীতারামের মনোমালিন্য এবং মেনাহাতী ও "ছিদে হাতীর"

সহিত পরিচয় হয়। রাজা, বিনোদের প্রতি কুপিত হইয়া তাহাদের বাড়ী হইতে নিজের রাজ্যান্তর্গত ভূভাগ পৃথক করিবার জন্য তাঁহার দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের নামে "যদু খালি" বলিয়া একটী খাল কাটাইয়া লইলেন। এই খাল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

বিনোদবীর, মেনাহাতী এবং ছিদেহাতীর সমকক্ষ বলিয়া অনেক সময় আপন পরিবারমধ্যে গৌরব পাইতেন—কিন্তু সাধারণে তাহা আদৌ বিশ্বাস করিত না। সরকারপরিবার এই বিনোদবীরের বাহুবলে দস্যুতস্করগণের হাত হইতে ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতেন। বিনোদ এই সব কারণে কিছু গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যখন তাঁহারা একজাই করিতে না পারিয়া অপ্রতিভ হইলেন—তখন রঘুনাথ সরকার সীতারামের সহিত বিপক্ষতা করিবার জন্য মুরশিদাবাদ হইতে নবাবী ফৌজ আনাইয়া তাঁহাকে জব্দ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এদিকে তাহার এক সুযোগও উপস্থিত হইল। রঘুনাথের পরামর্শে আর দেওয়ান রঘুনন্দনের জোগাড়ে বক্স আলি খাঁ নামে একজন মোগল সেনাপতি মহম্মদপুর ধ্বংস করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সুযোগে সীতারামের, চিরবিদ্বেষী চাঁচাড়া রাজবংশের মনোহর রায় মোগলসেনার সঙ্গে মহম্মদপুর অভিমুখে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র সীতারাম, বক্স আলিকে সংহার করিয়া মনোহর রায়ের হালি সৈন্যগণকে তাড়াইয়া দিলেন। রঘুনাথ সরকার এই সংবাদ পাইয়া পুত্র বিনোদ-বীরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বুনাগাতিতে বাস করিতে হইলে সীতারামের সঙ্গে শত্রুতা করা উচিৎ নহে; কিন্তু ভাগ্য দোষে যখন তাহা হইয়াছে, তখন সেনাপতি মেনাহাতীর সহিত তুমি প্রীতি স্থাপন কর।

পিতার পত্র পাইয়া বিনোদ সরকার গোপনে মেনাহাতীকে অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু সীতারামগতপ্রাণ মহাবীর মেনাহাতী তাহাতে [illegible] "আমি রাজাকে ছাড়িব না এবং তাঁহার

কোন অনিষ্ট চিন্তাও করিতে পারিব না। তবে তোমাদের প্রতি যাহাতে তাঁহার কোন বিদ্বেষ না থাকে তাহা করিতে পারি। তুমি এক কায কর, আমার পুত্র শঙ্করকে তোমার ভগ্নী দান কর, আর তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ কর। তাহা হইলে আমার আত্মীয় বলিয়া রাজা তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন না।" বিনোদ ইহাতে সম্মত হইয়া পিতাকে ইহা জানাইলেন।

রঘুনাথ তখন ঘটক ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কি না? ঘটক উত্তর করিল—শুনিয়াছি, মেনাহাতী বঙ্গজ কায়স্থ; কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহারা একরূপ দক্ষিণ-রাঢ়ীর মধ্যে গণ্য, আপনার ইচ্ছা হয় বিবাহ দিতে পারেন। রঘুনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন ঘটকগণ বুনাগাতির প্রধান মৌলিক রায় (সরকার) গণের মনস্তুষ্টির জন্য বলিলেন—

"আসমানি কুদ্রতী রাজা কেশব ঘোষ
রায় গাঁর শঙ্কর ডুমুর শিয়ার বোস্
খেদাপাড়া বাগডাঙ্গা চূড়ামণকাঠি
এক ঘোষ তিন ঠাঁই অমূলজ খাঁটি।"

অর্থাৎ এই স্থানগুলির ঘোষগণ এক। ইহাদের মূল নাই অথচ ইহাঁরা খাঁটি। সুতরাং তখন মেনাহাতীর পুত্র শঙ্করের সঙ্গে সরকারগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থির হইল। বিনোদ সরকার মেনাহাতীর কৌশলে সীতারামের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাইলেন এবং তাঁহার আত্মীয় হইলেন বটে কিন্তু তাহাতে সীতারামের কোন ক্ষতি হইল না। কারণ মহাপ্রাণ মেনাহাতী পাণ্ডব-বীর ভীমসেনের ন্যায় কেবল "দাদা আর গদা" বুঝিয়া চলিতেন।

এদিকের কার্য্য এই ভাবে শেষ হইল। তাহার পর সীতারাম যখন ভূষনার কেল্লা দখল করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিলেন—তখন

মুরশিদাবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে এক মহা ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। রঘুনাথ সরকার তখন কিন্তু সীতারামের বিপক্ষ নহেন। প্রত্যুত ষড়যন্ত্রীগণের কৌশলভেদকারী ছিলেন। রঘুনন্দন, মুণিরাম, রামদেব রায় এবং মনোহর রায় প্রভৃতিই এই বিষম ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন। ইহাঁদের উত্তেজনায় এবং দয়ারাম রায়ের গোয়েন্দাগিরিতে নবাব, একদল সেনা মহম্মদপুর ধ্বংস করিতে পাঠাইয়া দিলেন। দয়ারাম ফৌজ লইয়া মামুদপুরের উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ ভূষণার দক্ষিণে "বরিষাট্" গ্রামে আসিয়া ছাউনি পাতিলেন*। দয়ারাম রায় সীতারামকে দমন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বহু পরামর্শের পর স্থির হইল যে, হয় মেনাহাতার বিনাশ না হয় তাহার অন্যত্র অবস্থান, এই দুইয়ের একটি করিতে হইবে। তখন দয়ারাম, রঘুনাথপুত্র বিনোদবীরকে ডাকিলেন এবং তাহাকে মেনাহাতী বিষয়ে পরামর্শ দিয়া বিদায় দিলেন। বিনোদ তখন এক অলীক বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া মেনাহাতীকে রায়গ্রামে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। পথে চৌকি বসিয়া গেল, মেনাহাতী মহম্মদপুর আক্রমণের সংবাদ জানিতেও পারিলেন না। মহম্মদপুর বিধ্বস্ত হইল। এই সময় সীতারামের অপর সেনাপতি ছিদেহাতার মৃত্যু হয়। সে ব্যক্তি পশ্চিমদেশবাসী বিখ্যাত মুসলমান পালওয়ান। তাহাকে মারিয়া মামুদপুরে কবরস্থ করা হয়। মেনাহাতী, সীতারামের পতনের পর মনের দুঃখে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবসেবা করিয়া রায়গ্রামেই দেহত্যাগ করেন। এক্ষণে যে কবরটি মেনাহাতীর কবর নামে পরিচিত উহা প্রকৃতপক্ষে ছিদেহাতীর কবর।"

* পূর্ব্বে এস্থানের নাম কি ছিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু দয়ারামের সঙ্গী সাতজন বীরের পরবর্ত্তী বাসস্থান বলিয়া পরিবর্ত্তনে বীরসাতের স্থানে বরিষাট হইয়াছে অদ্যাপি এখানে দয়ারাম বংশীয়দিগের কাছারী বাড়ী আছে।

এই গল্পটির মধ্যে যে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য আছে এখন তাহার আলোচনা করিতেছি।

এই গল্প মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালীর উল্লেখ আছে, যাঁহাদের কাপুরুষতায় ও স্বার্থপরতায় জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা অপহৃত হয়। সীতারামের সহিত যে সকল বাঙ্গালী বিপক্ষতা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মুণিরাম, রঘুনন্দন, রামদেব, মনোহর, দয়ারাম আর এই রঘুনাথ সরকার অগ্রগণ্য। অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় এরূপ অনেক পাষণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়।

বুনাগাতির নিকট "কেল্লার মাঠ" নামে একটি স্থান আছে উহা বক্সআলির অভিযানের অকুস্থান। যদুখাল খালের ইতিবৃত্ত যাহা সীতারাম-জীবন-চরিতে প্রকাশ হইয়াছে উহা সত্য কি, এই ঘটনা সত্য, তাহা প্রমাণ করা বড় কঠিন। তবে ঘটনা যাহাই হউক উহার কোনটিকেই তাচ্ছিল্য করিতে পারা যায় না—কেন না উভয় তত্ত্বই প্রবাদমূলক। আবার উক্ত খাল যে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের নামীয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। বুনাগাতি ও যদুখালি এই দুইটি স্থান অষ্টাদশ শতাব্দি হইতে বিখ্যাত। তাহার পর মাগুরা মহকুমার উত্তরবর্ত্তী বরিষাট গ্রামেই সীতারামের পতন হয়। দয়ারাম রায় এই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার দলস্থ সাতজন বীরের পরবর্ত্তী বাসভবন বলিয়া ইহার নাম বোধ হয় বীরসাতের স্থানে "বরিষাট" হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই স্থানে যে সকল মুসলমান বাস করিতেছে তাহারা—অধিকাংশই বীর পাঠান মোগল দিগের বংশধর।

এই দেশে এককালে যে সকল বহুবলশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া শরীর পাতে জন্মভূমির পদ সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের শরীর এই দেশের জল বায়ুর গুণে সুস্থ থাকিত আর আজ তাহার

পরিবর্ত্তে ম্যালেরিয়ার গুণে জীর্ণশীর্ণ হইয়া দেশ দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় উঠিয়াছে। এই অঞ্চলে মনোহর চক্রবর্ত্তী, রূপরাম ঘোষ (মেনাহাতী) এবং সীতারামের অপর সেনাপতিগণ, বিনোদ সরকার, কাশিরাম দত্ত, হরে পাটান, কালো ধোপা, জগন্নাথ মুন্সী, হারাণ মাঝি প্রভৃতির শারীরিক কীর্ত্তির খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত। এই সকল প্রমাণসত্ত্বে পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী যে দুর্ব্বল, ভীরু, অকর্ম্মণ্য একথা কি প্রকারে স্বীকার করিব।

এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি মেনাহাতী অবিবাহিত পুরুষ ছিলেন। এই গল্পে জানা গেল যে, তিনি বিবাহ করিয়া পুত্রকলত্রসহ জীবনাতিপাত করিতেন মেনাহাতীর পুত্রকন্যার কোন তালিকা পাই নাই। রায়গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের কুর্চিনামা পাইলে এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতাম। পারিবারিক কার্য্যের জন্য তিনি যে মহম্মদপুর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্বাদ পান নাই এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। বহুদিন হইতে শুনিতেছি যে, মেনাহাতীকে গোপনে হত্যা করিয়া দয়ারাম রায় মহম্মদপুর আক্রমণ করেন,এখন শুনিলাম তাহা নহে। এখন কোন কথা সত্য, কোন কথা মিথ্যা তাহা স্থির করা বড় কঠিন। যে হেতু সমস্তই শুনা কথা।

"ছিদেহাতী" নামে সীতারামের আর একজন সেনাপতি ছিল। মহম্মদপুর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সে নিহত হয়, ইহার কবর এখনো মহম্মদপুরে আছে। লোকে এই কবরকে মেনাহাতীর কবর বলে। এই গল্পে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ হইতেছে। এখন কোন কথা সত্য তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই গল্পের ঘটনা কতকটা স্বাভাবিক, কেননা মেনাহাতী হিন্দু তাহার কবর হওয়া অসঙ্গত প্রত্যুত এই কবরের কাহিনী বহু লোকের নিকট শুনিয়াছি সুতরাং ইহা কি করিয়া মিথ্যা বলি।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

সম্মোহন-বিদ্যা* ।

(১)

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা একবার সম্মোহন-বিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলাম। সেই সময় এই সংক্রান্ত কতকগুলি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিব। এই সম্মোহন-বিদ্যার প্রক্রিয়া নানা রকমের আছে, তন্মধ্যে যেটী হউক একটী লইয়া অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে এবং উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলে এ বিষয়ে সফলতা লাভ করিতে বড় বেশি বিলম্ব হয় না। অনেকেই জানেন, আজ কাল আমেরিকা-বাসীরা এই সম্মোহন-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে ইহার অনুশীলন অধুনা বিশেষভাবে চলিতেছে। আমরা তাঁহাদেরই নির্দ্ধারিত প্রণালীতে সম্মোহন বিদ্যা অভ্যাস করি ; বেশির ভাগ পুস্তকের সাহায্যেই আমাদের শিক্ষালাভ ; কিন্তু পরে অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি, শুধু পুস্তকে চলে না, শিক্ষিত গুরুর উপদেশ এবং তাঁহার নিকট হইতে রীতিমত শিক্ষা লওয়াও আবশ্যক, নচেৎ অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা।

(২)

যাঁহাকে সম্মোহিত করিতে হইবে, তাঁহার চোখের উপর চোখ স্থির-দৃষ্টিতে রাখিয়া, তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিয়া কয়েক দিন অসফলতার পর আমরা সত্য-সত্যই একদিন তাঁহার চৈতন্যাপহরণ করিয়া ফেলিলাম। বাস্তবিকই তিনি অজ্ঞান হইয়াছেন কি না তাহার পরীক্ষার ত্রুটী হইল না। চেঁচা-মেঁচি করিয়া, চিম্‌টী কাটিয়া, পায়ে সুড় সুড়ি দিয়া, আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটাইয়া এবং ছুরির

* Hypnotism.

সাহায্যে দেহের এক স্থানে রক্তপাত করিয়াও দেখা হইল, কিন্তু চৈতন্যের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না—তিনি নিশ্চল কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক, এ অবস্থায় সম্মোহিত ব্যক্তি সম্মোহনকারীর সম্পূর্ণ বশীভূত, তিনি যা বলিবেন, যা আজ্ঞা দিবেন সম্মোহিত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিনা আপত্তিতে আজ্ঞাবহের ন্যায় পালন করিবেন। সে সময় স্পষ্ট বুঝা যায়, সম্মোহিত ব্যক্তির নিজের কোন রকম ইচ্ছাশক্তি থাকে না, সম্মোহনকারীর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায়, ক্রীতদাস হইয়া পড়েন। শুনিতে পাওয়া যায়, এরূপ অবস্থায় সম্মোহনকারী সম্মোহিত ব্যক্তি দ্বারা নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করাইয়া লন, এমন কি খুন, প্রতারণা, চুরি পর্য্যন্তও। সে দিন একটা এই ভাবের গল্প পড়িতেছিলাম, সেটা সত্য কি না জানি না, কিন্তু একেবারে অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না। বিলেতে একজন ভাল হিপনটিষ্ট ছিলেন, তাঁর এক শত্রু ছিল, তাকে তিনি মনে মনে এতই ঘৃণা করিতেন এবং সে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার ক্রোধ এতই ঘনীভূত হইয়াছিল যে তাহাকে হত্যা করিলেও যেন সে ক্রোধের শান্তি হইত না। এই হিপনটিষ্টের একজন খুব ভাল মিডিয়ম * ছিল, সে একটী বালিকা। হিপনটিষ্টের মনে তাঁহার শত্রুর প্রতি যে ভয়ঙ্কর ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে এই বালিকা তদ্‌কর্ত্তৃক বারম্বার সম্মোহিত হইয়া নিজের মনে ঐ ক্রোধের ভাব আপনা-আপনি পোষণ করিত—অর্থাৎ তাহাকে দেখিলেই বালিকার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। অজ্ঞান বালিকা কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিত না, কেবল মনে মনে কারণ অনুসন্ধান করিত। অবশেষে একদিন হিপনটিষ্টের কৌশলে সম্মোহিত অবস্থায় এই বালিকা তাহার পিতার

* যাহাকে সম্মোহিত করা হয়।

ঘর হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া আনিল, বস্ত্রমধ্যে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া সেই শত্রুর গৃহে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিল এবং পিছন হইতে তাহার দিকে পিস্তল ছুঁড়িল। এই হতভাগিণী বালিকা শেষে হত্যাপরাধে ধরা পড়ে, এবং এই সম্মোহনের গুপ্ত রহস্য অবগত না থাকায় বিচারকেরা তাহাকে উন্মাদিনী স্থির করিয়া পাগলা-গারদে প্রেরণ করেন। নিরপরাধিণীকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই ভয়ঙ্কর স্থানে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে একদিনও মনে করিতে পারে নাই, যে সে নিজেই কাউকেও খুন করিয়াছে—এ ঘটনা তাহার নিকট জটীল রহস্যাবৃত ছিল। তবে গারদরক্ষীগণ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইত, এই পাগলিনী রাত্রে এক এক সময় স্বপ্নাবেশে চিৎকার করিয়া যেন বলিত—"রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমাকে আর খুন কোর্ত্তে বোলো না।"

সম্মোহনবিদ্যারপ্রভাবে অনেকের অনেক মঙ্গলসাধনও করিতে পারা যায়। যেমন মাতালকে মদত্যাগ করান, অসুখ-বিসুখ সারান, মানসিক চঞ্চলতা বা শোকাদি অপনোদন করা ইত্যাদি। এগুলি অতি সহজেই করা যাইতে পারে। কেবল সম্মোহিত অবস্থায় তাঁহাদের মনোমধ্যে এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া যে, তাঁহার আর মদপিপাসা নাই বা শারীরিক অসুস্থতা হইতে সুস্থ হইয়াছেন। ইহার পরীক্ষা অনেক বার অনেক স্থানে হইয়া গিয়াছে।

এখন আমাদের কথাই বলি। সম্মোহিত ব্যক্তিকে আমরা এখন মিডিয়ম নামেই অভিহিত করিব। সম্মোহনকারী এই মিডিয়মকে বলিলেন—কেমন, তুমি এখন আমার ইচ্ছার অধীন?

মি—হাঁ।

স—আমি যা বলিব তাই করিবে, তাই শুনিবে?

মি—হাঁ।

স—আমি যা বলিব তা তোমায় শুনিতেই হইবে।

মি—আচ্ছা।

সম্মোহনকারী তখন পকেট হইতে একটী পেন্সিল বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা বরিলেন, এটা কি ?

মি—একটা পেন্সিল।

স—উঁহু! ওটা যে একটী খোকা।

মি—হাঁ, তাইত!

স—ওকে চুম্বন কর।

মিডিয়ম পেন্সিলটী হাতে করিয়া আগ্রহের সহিত চুম্বন করিলেন।

স—দেখ, দেখ, কি ভয়ঙ্কর স্থানে তোমায় এনেছি, রাশি রাশি গুলি ছুটছে, রক্তের সমুদ্র, চারিদিকে শুধু কামানের গর্জ্জন।

মিডিয়ম একটু আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—উঃ! কি ভয়ঙ্কর স্থান!

স—চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ—কেমন সুন্দর স্থান, উপরে নীল আকাশ নীচে নীল জল—সূর্য্য-রশ্মি কেমন তরঙ্গের সঙ্গে খেলা কচ্ছে!

—কি দেখছ ?

মি—সমুদ্র! সুন্দর স্থান!

স—ঝাঁপিয়ে পড়, ঝাঁপিয়ে পড়, এই যাঃ নৌকা ডুবলো—তুমিও ডুবলে!

মিডিয়ম এই কথা শুনিয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন, হঠাৎ নিশ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করিয়া দিলেন।

তৎক্ষণাৎ সম্মোহনকারী বলিলেন, তোমায় উঠিয়েছি।

মি—আঃ, বাঁচলুম।

(৩)

এই ভাবে কিছুদিন চলিল। মিডিয়মকে লইয়া এই প্রকারে যখন যা-ইচ্ছা-তাই করান যাইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন আমাদের মিডিয়ম

বিগড়াইয়া গেলেন। সম্মোহনকারীর কোন কথাই শুনেন না, তাঁহার কোন কথার জবাবই দেন না—কোথায় তাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রভাব আর কোথায় কি! সেদিন সবই নিষ্ফল। অন্যদিন মিডিয়মের চক্ষু মুদ্রিত দেখিতাম, আজ সহজ মনুষের মত চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি শূন্য, পলক-বিহীন।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমরা সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। শুনা গিয়াছিল, কখন কখন না কি মিডিয়মের দেহে প্রেতাত্মার (spirit) আবির্ভাব হয়। প্রেতাত্মা বা ভুতে বিশ্বাস যে আমাদের ছিল তা বলিতে পারি না। কিন্তু পরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে তাহাতে ভুতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হউক বা না হউক ভুতের মত আর একটা কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস হইয়াছিল। যাহা হউক, শুনিয়াছিলাম মিডিয়মের দেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইলে সে সময় প্রশ্ন করিলে প্রায়ই জবাব পাওয়া যায়। তাই সম্মোহনকারী প্রশ্ন করিলেন—কে আপনি?

অল্পক্ষণ পরে উত্তরের পরিবর্তে মিডিয়মের মুখ হইতে এক বিকট হাস্যধ্বনি নির্গত হইল—হাঃ,—হাঃ,—হাঃ,—কি ভয়ঙ্কর হাসি, কি মুখভঙ্গিমা! আমরা একটু চকিত হইলাম। তার পরেই ইংরাজীতে কথা বাহির হইল, তার ভাব এইঃ—

হাঃ হাঃ হাঃ কেমন মজা! কেমন তার বুকে ছুরি বসিয়েছি—সে যেমন তেমনি হয়েছে! কেমন—তাকেও ছুরি মেরেছি, নিজের বুকেও ছুরি বসিয়েছি! হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজা! হাঃ হাঃ!

এই ভাবের হাসির তরঙ্গ খানিকক্ষণ ধরিয়া চলিল, আমরা প্রশ্ন করিবার অবসরই খুঁজিয়া পাইতে ছিলাম না। একটু চুপ হইলে, প্রশ্ন করা হইল—অনুগ্রহ করে বলুন আপনার নাম কি! ইংরাজীতে উত্তর মিলিল। "কি হ'বে আমার নাম শুনে?—আমি একজন মস্ত ফুর্ত্তিবাজ লোক, খালি হেসে খেলেই বেড়াই—হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।"

স—আপনার সদাই আনন্দ ?

মি—হাঁ—বলিয়াই গুন্ গুন স্বরে একটী গান ধরিলেন। তার পর চুপ, কোন সাড়া শব্দ নাই।

অল্পক্ষণ পরে মুখে আবার ভাষা ফুটিল—ইংরাজীতে বলিলেন, কই মেরি রস্—কই মেরি রস ?

প্রশ্ন—মেরি রস্ কে ?—তিনি কি আপনার পত্নী।

উ—(হাঁসিয়া)—না।

প্র—আপনি বাংলা জানেন ? বাংলা কথা বলবেন ?

উ—বোল্‌বে।

তখন বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে যে কথা গুলি বলিলেন তার মর্ম্ম এই :—আমার নাম লেফ্‌টানাণ্ট্ রেনল্ড, আমার বাড়ি সাসেক্সে ছিল, লর্ড ডালহাউসির সময়ে সৈনিক জীবন লইয়া আমি ভারতবর্ষে আসি—লক্ষ্ণৌ সহরে ছিলাম, ডিপ্‌থিরিয়া রোগে সেইখানে আমার মৃত্যু হয়। যুদ্ধক্ষেত্র সন্দর্শন আমার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই, যুদ্ধের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা আমার নাই। কোন ধর্ম্ম ভাল জিজ্ঞাসা করিতেছ ?—ধর্ম্ম সবই ভাল, তবে জান আমি ক্রীশ্চান্, আমি আমার ধর্ম্মই ভাল বলিব।

মিডিয়মের বাক্যরোধ হইল।

(৪)

এখন ব্যাপারটা কি তাহা বলা উচিত। আমরা দেখিলাম, মিডিয়মের দেহে একবার প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইলে এক আত্মার খানিকক্ষণ অবস্থানের পর আর একটী আত্মার আগমন হয়। উপরে যে দুই এক বার মিডিয়ম চুপ করিয়াছিলেন, সেই অবসরে এক আত্মার পরিবর্ত্তে অন্য আত্মার অধিষ্ঠান হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। এই আত্মার আবির্ভাবের ব্যাপার সর্ব্বপ্রথম যে দিন আমরা দেখিলাম সেই দিন মিডিয়মের চেতনা হইলে সর্ব্ব বিবরণ তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ

করা হইল—তিনি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আমরা এই অভূতপূর্ব্ব অভিনব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া নূতন উৎসাহে সম্মোহন কার্য্যে লাগিয়া গেলাম। প্রতিদিনই, মিডিয়ম সম্মোহিত হইয়া পড়িলেই তৎক্ষণাৎ তাহাতে আত্মার আবির্ভাব হইত, বেশি সাধ্য সাধনা করিতে হইত না, কত রকম বে-রকমের আসিয়া জুটিত। এক একদিন পাঁচ সাতটার অধিক পাওয়া গিয়াছিল। তার মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, সাহেব, মেম, জার্ম্মাণ পর্য্যন্ত সব রকমই ছিল। তাহাদের ভাষা দেখিয়া আমরা তাহাদের জাতি ঠিক করিয়া লইতে পারিতাম। আমাদের সঙ্গে অনেক কথোপকথন হইত—সব গুলি এখানে লিখিবনা তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। তবে দুই একটা লিখিয়া রাখি :—

আমার নাম জোসেফ ক্রোহেন, আমি একজন দীক্ষিত ক্রীশ্চান, মোকামা অঞ্চলে রেল কোম্পানির গার্ড ছিলাম, ৪৮ বৎসর বয়সে মারা যাই, মৃত্যুর তারিখ ১৮৯১, ৭ই ফেব্রুয়ারী। আত্মীয়ের মধ্যে বরাকরে আমার এক খুল্লতাত আছেন, তাঁর নাম ইসমাইল, বরাকরে তাঁর একটী মনোহারীর দোকান আছে। আমি মুসলমান ছিলাম, বাধ্য হইয়া আমাকে সে ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়; কারণ আমি বড়ই গরীব ছিলাম, একজন সদাশয় পাদরী আমায় দীক্ষিত করেন, আমাকে লেখাপড়া শেখান এবং দয়া করিয়া ঐ চাকুরীটী জুটাইয়া দেন। মৃত্যুর পর আমার গোরের উপর বিশেষ কোন চিহ্ন নাই—আর কেই বা দিবে? মোকামার এক বৃহৎ পুষ্করিণীর পাড়ে, এক বৃহৎ বৃক্ষের তলে, সুশীতল ছায়ায় আমার দেহের ধ্বংশাবেশ আজও মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত আছে।

আর একজনের কথা :—

প্র—আপনার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কি হইয়াছিল—বলুন ত।

উ—তা আমি বলিতে পারিবনা—সে অধিকার আমার নাই।

প্র—ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?

উ—একটা অত্যাশ্চর্য্য অবোধ্য শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি মাত্র।

প্র—আপনার কোন বিশেষ আকার আছে?

উ—না।

প্র—আপনার দেহ আছে?

উ—আছে।

প্র—কি রকম?

উ—আমাদের দেহ কোন জড়বস্তু নির্ম্মিত নহে—কেমন করিয়া বুঝাইব?

প্র—আপনি থাকেন কোথা?

উ—কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—অনবরত বাতাসের মত পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছি।

প্র—মৃত্যুর পর সকলকেই কি এই ভাবে ঘুরিতে হয়?

উ—হাঁ, অন্তত কিছু কালের জন্য—মাপ করুন, আমায় প্রশ্ন করিবেন না, আমি আর কিছু বলিতে পারিবনা।

অপর একজনের কথা:—

প্র—আপনাদের কোন্ আক্ষায় ডাকিতে পারি।

উ—ইচ্ছা করিলে, স্পিরিট বলিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক—স্পিরিট বলিলে আপনারা যা বুঝেন আমরা ঠিক তা নই। আমাদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আপনাদের পক্ষে অসম্ভব।

প্র—আপনাদের মধ্যে পরস্পরে বাক্যালাপ করিতে পারেন?

উ—পারি—কিন্তু শব্দ দ্বারা নয়—নানাবিধ আকার ইঙ্গিতে।

প্র—মৃত্যুর পরের অবস্থা কি রূপ?

উ—জীবিত ব্যক্তির তাহা জানিবার অধিকার নাই।

প্র—পরজগতে পিতা, পুত্র, মাতা, স্ত্রী, কন্যা, ইহাদের পরস্পরে কোন সম্বন্ধ থাকে?

উ—না—এখানে কোন বন্ধনই নাই।

প্র—আপনি সুখে আছেন ? না কষ্টে ?

উ—এখানে সুখ দুঃখের কোন প্রভেদজ্ঞান নাই।

প্র—আপনি ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন ?

উ—ভবিষ্যৎ জানিবার কাহারও আবশ্যক নাই—যাহা অদৃষ্ট তাহা দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। কর্ত্তব্য কর, বিবেকানুমোদিত পথে চল।

এই সকল প্রেতাত্মা জীবিত অবস্থার যে সমস্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা যেখানে সম্ভব অনুসন্ধান করিয়াছিলাম তাহা প্রায়ই মিলিয়াছিল। আমরা জনৈক ইংরাজ রেলওয়ে গার্ডের প্রেতাত্মাকে পাইয়াছিলাম, তিনি রেলগাড়ি চাপা পড়িয়া বর্দ্ধমানে মারা যান—তাঁহার নাম ইত্যাদী লইয়া অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহাতে সংবাদ পাওয়া যায় ১৮৯৬ সালে ঐ নামীয় জনৈক গার্ড রেল চাপা পড়িয়া সত্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

(৫)

সব দিনের ভূত সবাই যে এক রকম তা নয়। কেউ বেশি কথা বলে, কেউ কথাই কয়না—অনেক সাধাসাধনার পর দুই চারিটী প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রতিদিন প্রায়ই নূতন নূতন প্রেতাত্মা পাইতাম, তাহার মধ্যে কোন কোন পুরাতন আত্মা, যিনি আগে কখনও আসিয়াছিলেন তাঁকেও পাওয়া যাইত। এসবের মধ্যে একজন আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্টতা পাতাইয়াছিলেন—তিনি প্রায়ই আসিতেন। তাঁর নাম রামলাল চাটুয্যে, বাড়ি ছিল কাশীতে। কোন আত্মাকে অনুরোধ করিয়া যদি বলিতাম আপনি যাবার সময় রামলালকে পাঠাইয়া দিবেন, অমনি পরমুহূর্ত্তে রামলাল আসিয়া হাজির। আমাদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা কইতেন, যে সব প্রশ্নের উত্তর অন্য কারু কাছে পাই নাই, রামলাল তাহার অনেক জবাব দিয়াছে। রামলাল আর ২।১ জন ছাড়া ভবিষ্যতের কথা কেউ বড় বলিতে চাইতেন না।

আমরা দেখিতাম, আমাদের মানুষদেরই মত নানা আত্মার নানা মত—কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, কেউ করেন না, কেউ স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কেউ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তবে পাপের শাস্তি সম্বন্ধে কারুর মতের অনৈক্য ছিলনা। কেউ কেউ আবার বলিতেন পুনর্জন্মও হয়। অনেক ক্রীশ্চান Last day of Judgment—এর সত্যে বিশ্বাস করেন না। এই সব জটীল বিষয়ে এঁরা যে কেউ বিশেষ অভিজ্ঞ তাহা আমাদের কারুরই ধারণা হয় নাই। তবে পরজগতে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা, হিংসা প্রতিহিংসা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাব নাই; এই সব বিশেষ তথ্য ছাড়া সকলেই প্রায় একমত হইতেন না। মোট কথা, পরজগতের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তার একটা স্পষ্ট ছবি কেউই ফুটিয়ে তুলিতে পারিতেন না—হয় তাঁরা অনভিজ্ঞ, না হয় এ সব কথা বলিতে চাইতেন না। যাহা হউক, রামলাল আমাদের কাছে এক অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছে। রামলালের ভবিষ্যৎ উক্তি এত দিনে অনেক মিলিয়াছে, আবার অনেক ঠিক মিলেও নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনা, সে যত দূর দেশেই হউক, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র রামলাল তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব দিয়াছে—বলিয়া দিয়াছে, অমুক স্থানে এখন অমুক ঘটনা ঘটিতেছে। আমরা সংবাদ লইয়া অনেক স্থলে তাহার সত্যতা স্থির করিয়াছিলাম। কলিকাতা সহরের অনেক ঘটনা, যে মুহূর্ত্তে রামলাল আমাদের সমক্ষে উপস্থিত আছে, সেই মুহূর্ত্তে কিরূপ ঘটিতেছে তাহা সে আমাদিগকে জানাইয়াছে—আমরা তখন কলিকাতা হইতে অনেক দূরে। এই সম্বন্ধে রামলালকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, মানুষের স্থূল দেহ চিন্তামাত্রেই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়ার পক্ষে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক। আত্মার এইরূপ দেহ না থাকায় তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে অবলীলাক্রমে সব স্থানে যাইতে পারে।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সাময়িক ভারত।

আর্থিক অবস্থা।

(২)

বোম্বায়ের বন্দর দিয়া যখন ভারতে প্রবেশ করা যায়, তখন একটা উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্র মনোমধ্যে গভীররূপে অঙ্কিত হয়। নগর ও বন্দরের উদ্যমশীলতা দেখিয়া মনে হয়,—বোম্বাই একটা বিপুল বাণিজ্যের স্থান। অথচ বোম্বাই-বন্দর, ইংরাজ-উদ্যমের একটা সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী, এরূপ বোধ হয় বলা যায় না। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা, করাচির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা খুব দ্রুত ভাবে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই বন্দরগুলির উন্নতির ইতিহাস ও বহির্বাণিজ্যের উন্নতির ইতিহাস—একই কথা। শুনা যায়, ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে, এই দেশ হইতে দশ লক্ষ পৌণ্ড মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইত। ইহার ৮৫ গুণ বেশি মূল্যের মাল আজ এখান হইতে রপ্তানি হইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যায়, রপ্তানি-বাণিজ্য কি বিপুল পরিমাণে পুষ্টি লাভ করিয়াছে। এক্ষণে ভারত, চীনের সহিত, জাপানের সহিত, ফ্রান্সের সহিত, ইটালির সহিত, রুসের সহিত, যুক্তরাজ্যের সহিত, বিশেষতঃ ইংরাজ রাজধানী লণ্ডনের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। লণ্ডনের "ডক্" দেখিলেই বুঝা যায়, কি বিপুল এই উদ্যমতৎপরতা—কি বিস্তীর্ণ এই বাণিজ্যব্যাপার।

এই উদ্যমতৎপরতা দেখিয়া এবং পূর্ব্বেকার সহিত এখনকার রপ্তানির তুলনা করিয়া, প্রথমেই কাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া না যায়? পূর্ব্বাপেক্ষা ৮৫ গুণ বেশী—ইহা মনে করিলে কল্পনা অভিভূত হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, আর একটু নিকটে গিয়া দেখা যাক্।

প্রথমেই দুঃখের সহিত বলিতে হয়, তৈয়ারি মাল অতি অল্পই ভারত রপ্তানি করে। কার্পাস, পাট, শস্যদানা, চাম্‌ড়া, এই সব কাঁচা মালই ভারত বৈদেশিকের নিকট বিক্রয় করে। এই সব কাঁচা মাল হইতে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া যে লাভ হয়, তাহা ভারত পায় না—তাহা অপরে পায়। এই কথার ভিতরে একটু বিশেষ গুরুত্ব আছে। ভারতের শিল্পব্যবসায়গুলি যে অঙ্কুরেই দলিত হইয়াছে তজ্জন্য ইংরাজের রাজনীতিই বিশেষরূপে দায়ী। দ্বিতীয়তঃ—তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও আলোচনার পর এদেশের বাণিজ্যের তথ্য-তালিকা হইতে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা আশানুরূপ নহে। এ দেশের বাণিজ্যিক তথ্য-তালিকা যাহা পাওয়া যায়—তাহা অতীব কৌতুকজনক; সত্যকথা বলিতে কি তাহা গড়া-পেটা ও ঘরগড়া হিসাব। সাবধান! এইসব হিসাবের অঙ্কপাতে ভুলিও না। শিশুরা যেরূপ অকপটে মিথ্যাকথা বলে, সেইভাবে এই অঙ্কগুলিও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এক ব্যক্তি এই অঙ্কগুলির সহিত মুখামুখি করিয়া চিরজীবন কাটাইয়াছেন। তাই, সমসাময়িক ভারত সম্বন্ধে ইনি কিরূপ সাক্ষ্য দেন তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হয়। ইনি দাদাভাই নওরোজি। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, "কণ্টেম্পোরারি-রিভিউ" পত্রিকায়, রপ্তানি-মালের হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া তাহা হইতে যে সকল বিভিন্ন উপাদান ইনি বাহির করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

১। স্বাধীন দেশীয় রাজ্য হইতে যে সব দ্রব্য বিক্রীত হয়।

২। ভারতরাজ্যের সীমান্তদেশের পরবর্ত্তী রাজ্য হইতে যে সকল দ্রব্য আইসে (তিব্বৎ প্রভৃতি)।

৩। প্ল্যাণ্টার ও য়ুরোপীয় কারখানাওয়ালা যে সকল দ্রব্য চালান্ করে এবং যাহা হইতে এদেশের কোন লাভ হয় না।

৪। ভারতের স্কন্ধে-চাপানো ইংলণ্ডের রাজধানী-সংক্রান্ত খর্চ্চা;

(ইহার অন্তঃভুর্ক্ত সরকারী ঋণের সুদ যাহা ইংর. দিতে হয়) এবং মুদ্রা বিনিময়-জনিত ক্ষতির অঙ্ক।

৫। রেলপথ নির্ম্মাণ ও সরকারী পূতকর্ম্মের দরু সুদ—যাহার হিসাবনিকাশ ও পরিশোধ ইংলণ্ডেই হইয়া

৬। য়ুরোপীয়েরা কিংবা অন্য বৈদেশিকেরা, স্বকী কিংবা লভ্যাংশ, যাহা নিজ পরিবারের জন্য স্বদেশে প্রেরণ

৭। প্রাগুক্ত অঙ্কগুলি বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে রপ্তানি-বাণিজ্যের অঙ্ক; অর্থাৎ, বিদেশীয় রাজাদিগকে তাহা দিয়া, ভারত-বিক্রীত দ্রব্যাদির মূল্য যাহা অবশিষ্ট প্রকৃত রপ্তানি মালের অঙ্ক।

যখন দশ টাকার মূল্য এক পৌণ্ড ছিল (ফরাসী এক টাকার মূল্য, ২ ফ্র্যাঙ্ক—৫০ সেন্‌টীম্) সেই ১৮৮৫ খৃষ্ঠ. রপ্তানির অঙ্ক ৮৩২০০৫২৪ পোণ্ড পর্যন্ত উঠিয়াছিল। স্বাধীন রাজ্যের রপ্তানি মাল, কর্জ্জটাকার বিপুল পরিমাণ সুদ পূতকর্ম্মের ব্যয়—এই সমস্ত বাদ দিয়া, দাদাভাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, ভারতের বিক্রীত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য, ৩ কোটি পৌণ্ডের অধিক নহে। তিনি মনে করেন, ইহাও বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে। তাঁহার মতে, ইহা ৩ কোটি অপেক্ষা ২ কোটির বেশি কাছা-কাছি। যাই হোক্, বেশীর অঙ্কটাই ধরা যাউক। তাহা হইলে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দাঁড়াইতেছে;—ইঙ্গ-ভারতের বিশ কোটি লোকের পক্ষ হইতে ৭৫ কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের রপ্তানি মাল; অর্থাৎ, মাথা-পিছু ৩ ফ্রাঙ্ক ৫০ সেন্‌টীম্। দাদাভাই বলেন, য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় ইহা কত অল্প। মনে কর, বেল্‌জিয়ম মাথা-পিছু ৪৬২ ফ্রাঙ্ক, এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা তরুণ যে ইংরাজ উপনিবেশ—সেও ৩৬ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের মাল রপ্তানি করে!

"ব্লুবুকের" প্রকাণ্ড তালিকাগুলির মধ্যে এই সমস্ত কথা প্রচ্ছন্ন

উপরে যে সকল অনিষ্টের কথা বলা হইল, উহা বিদেশীয় শাসনের অপরিহার্য্য সহচর;—উহা দূর-শাসন-দোষের (absenteeism) প্রকার-ভেদ মাত্র। লুণ্ঠনার্থ কোন দেশ একবার মাত্র আক্রমণ করা এক কথা;—এস্থলে শত্রুপক্ষ লুটের দ্রব্য লইয়া সত্বর প্রস্থান করে। আক্রমণকারী দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়মিতরূপে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হওয়া—সে এক কথা; তাহারা যাহা লুট করে তাহা দেশকেই ফিরাইয়া দেয়—অর্থাৎ দেশেই তাহা খরচ করে। কিন্তু নিয়মিতরূপে, পদ্ধতিক্রমে দেশের ধনশোষণ করা—সে স্বতন্ত্র কথা। এইরূপ স্থলে, যাহা কিছু দেশ হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহার কিছুমাত্র দেশকে প্রত্যর্পণ করা হয় না।

উদার-নৈতিকেরা এই অনিষ্টের কথা বেশ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় সাহসপূর্ব্বক ব্যক্তও করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে, ইংরাজের মুখ হইতেই খুব সজোরে ও স্পষ্টাক্ষরে ভর্ৎসনা-বাক্য বাহির হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষীয়গণ, চক্রান্ত করিয়া, ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্ব্বক, খুব দক্ষতার সহিত, নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাদের সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ করিয়া দেয়। যখন ভারত-সচিব পার্লেমেণ্টের নিকট বলিলেন, ভারত এতই দরিদ্র যে, মোটা বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ করা তাহার সাধ্যাতীত, তখন ইঙ্গ-ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ কাঁধ নাড়া দিয়া সে কথা উড়াইয়া দিলেন! ইঙ্গ-ভারতীয় শাসনতন্ত্র যতই প্রশংসনীয় হউক না কেন, উহার সার্থকতা কি যদি উহা ভারতবাসীর প্রয়োজনোপযোগী না হয়,—যদি উহা অনাবশ্যক ভাররূপে ভারতের শুধু গলগ্রহ হইয়া থাকে; কোন এক ব্যক্তি ঠিক্‌ই বলিয়াছেন—"ইহা যেন হিন্দু কৃষকের হাতী দিয়া লাঙ্গল চষা।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

নরবলি।

নরবলি অতিশয় গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস আছে। আর সেরূপ বিশ্বাস হইবার কারণেরও অভাব নাই। কাতরস্বরে শব্দায়মান ছাগমেষাদিকে বলি দিতে দেখিলে যখন চিত্তে যারপরনাই বীভৎসভাবের উদয় হয়, তখন নরবলির কথা শ্রবণ করিলে যে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে, চিত্ত আলোড়িত হইবে, অনুমোদনকারী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

ডারউইন প্রভৃতি ক্রমোন্নতিবাদিগণের মতে জীবজগতে অতিশয় নীচ জীব ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঋষিরা ঠিক্ বিপরীত ভাব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির জন্য যে কয়জন মানসপুত্রের আবির্ভাব করেন, তাঁহারা মূর্ত্তিমান জ্ঞানস্বরূপ ; তাঁহারা সৃষ্টিব্যাপারে উদাসীন হওয়ায় ভগবান্ ব্রহ্মাকে, স্বকার্য্যসাধনার্থ, তাঁহাদের অপেক্ষা হীন সন্ততির উৎপাদন করিতে হইয়াছিল। সেই হীনতা ক্রমাবনতি-স্রোতে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে এই মতের সত্যতা সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয়। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জগতের এই ক্রমাবনতি বশতঃ শেষে এমন হইয়াছে যে, প্রাণটুকু উবিয়া গিয়াছে শবমাত্র পড়িয়া আছে, আর সেই শবই এখন পূজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যবহারিক জগতে, বহির্বেশে, আচারব্যবহারে, চুলা-চৌকায়মাত্র ধর্ম্ম আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাও যায়—বেসি দিন নহে।

বিনা বলিতে শক্তিপূজা হয় না, এবং যাবতীয় বলির মধ্যে নরবলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে এই মহাবলি সমর্পিত হইয়া থাকে।

নরবলিতে যে শক্তি প্রীতা হইয়া মহদুদ্দেশ্য সাধন করেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—ইহা ধ্রুব সত্য। ভারতবর্ষের সাধকাগ্রণিগণই নরবলির মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন। ভাগ্যদোষে তাঁহাদের ভাব দূষিত হইয়া বিকৃতিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—সুতরাং ইহা সকলেরই হেয় ও ত্যাজ্য হইয়া পড়িয়াছে। অতিষ্ঠা কামনায় নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। সর্ব্বভূত অতিক্রম করিয়া যে স্থান আছে তাহার নাম অতিষ্ঠা। বাস্তবিকই, অতিষ্ঠা লাভ ভিন্ন নরমেধ-যজ্ঞের অন্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমাবনতিই সবিশেষ লক্ষিত হইতেছে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, কালে এই নরমেধের উদ্দেশ্য ও ভাব ক্রমে দূষিত ও বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। এবং অবশেষে নরবলি, শুধু মনুষ্যকে হত্যা করিয়া তাহার মাংসাদি দ্বারা হবনাদি কার্য্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ক্রমে যখন এই ভাব সকলের হেয় হইয়া উঠিল তখন কলিতে ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রাজ্ঞা ঘোষিত হইল। তান্ত্রিক নরবলি বৈদিক নরমেধের ছায়ামাত্র; বিশেষত্ব এই যে, ইহা অধিকতর বিকৃত ও দূষিত।

বিনা নরবলিতে মহাশক্তি তুষ্টা হন না এবং অতিষ্ঠাও প্রদান করেন না। ইতিহাসের প্রতি পত্র এই সত্যকে সপ্রমাণিত করিতেছে। জগতে কোথায় কবে বিনা নরবলিতে কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে? সর্ব্ববিধ হিতকর মহাযজ্ঞে নরবলি দিতে হইয়াছে, তবে সে যজ্ঞের উদ্যাপন হইয়াছে। কোথাও বা এক, কোথাও বা দুই, কোথাও বা বহুল নরবলি প্রদত্ত হইয়াছে, তবে যজ্ঞের উদযাপন হইয়াছে।

শিবপুরাণে আছে যে অভির প্রদেশে মহা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন। ভগবান্ ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া সকলকে বলিলেন—"তোমরা মহা পাপ করিয়াছ, সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ এই অনাবৃষ্টি ও দুষ্কালের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি কাহারও সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত, শুদ্ধ ও শান্ত একমাত্র পুত্র আপনাকে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে পারে, তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে"। ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই প্রদেশে শতমন্যু নামে এক ব্রাহ্মণপুত্র বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত, শান্ত, দান্ত ও বৈরাগ্যবান্ ছিলেন। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে দেশের হিতার্থ, সর্ব্বজনের মঙ্গলার্থ, আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পিতামাতা জীবিত থাকিতে তাঁহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে পুত্রের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই; তাই শতমন্যু পিতামাতার অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন। পিতঃ, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী; সেই জন্মভূমির জন্য এ দেহ ত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। যে দেহের কোন নিশ্চয়তাই নাই, প্রাণান্তে যাহা হয় ভস্মসাৎ হইবে, না হয় শৃগাল কুক্কুরাদির আহার হইবে, অথবা জঘন্য কৃমিরাশিতে পরিণত হইবে, সেই অকিঞ্চিৎকর জড়দেহদানে যদি মাতৃভূমির হিতসাধন করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ অধিকতর নিশ্রেয়ঃ আর কি হইতে পারে।" আজ ভারতবাসী সগর্ব্বে যে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহা মহাত্মা শতমন্যুর মুখনিঃসৃত।

পিতা নীরব রহিলেন। তখন শতমন্যু মাতার নিকট গমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। মাতা সৎপুত্রের বহু গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন। "বাবা, আমিই অগ্নিপ্রবেশ করিতেছি,

তখন শতমন্যুর পিতা বলিলেন "তোমরা দুই জনেই ধন্য, তোমদের কাহাকেই অগ্নিপ্রবেশ করিতে হইবে না, আমি অগ্নি প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করিতেছি"। তখন আকাশবাণী, সেই মহানুভবত্রয়ের ভুয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তোমাদের দৃঢ়নিশ্চয়তায় আবশ্যকীয় নরবলির কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে।" অনন্তর সুবৃষ্টি হইয়া ধরাকে শস্যপূর্ণ করিল।

সত্যস্থাপন করিবার জন্য, ভ্রমাপনোদনপূর্ব্বক জগতে জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বিস্তারকল্পে কত সর্ব্বগুণান্বিত মহাপুরুষকে কোথাও রক্তদান করিয়া, কোথাও জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে প্রাণাহুতি দিয়া মহাশক্তির প্রীতি সাধন করিতে হইয়াছে, তাহার সীমা নাই। ইতিহাস জ্বলন্ত অক্ষরে তাঁহাদের গুণগ্রাম ঘোষণা করিতেছে।

শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য কত মহাপুরুষ আত্মরক্তদানে মহাশক্তির প্রীতি সাধন করিয়াছেন। কতশত নরনারীর মস্তক মহাশক্তির সম্মুখে সমর্পিত হইয়াছে, তবে দেবী মহাশক্তি প্রীত হইয়া পতিতের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, অপগত দেশকে সমুন্নত করিয়াছেন, দাসকে রাজা ও দাসীকে মহারাজ্ঞী করিয়াছেন।

নরবলিরূপে প্রদত্ত মহাপুরুষের রক্ত, রক্তবীজের রুধির। মহামতি ওয়ালেস্ মহাশক্তির নিকট হৃদয়ের রক্ত দান করেন, সেই নরবলিতে প্রীতা হইয়া মহাশক্তি, স্কটলণ্ডের মস্তকে স্বাধীনতার সমুজ্জ্বল মুকুট স্থাপন করেন। শত্রুবিদলিত ইটালি আপনার উদ্ধারের জন্য এক মহা নরমেধের অনুষ্ঠান করে; তাহাতে তুষ্টা হইয়া মহাশক্তি তাহাকে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া সমৃদ্ধিশালিনী করেন।

বাইবেলে যে মহা নরমেধের উল্লেখ আছে, তাহারই ফলে, সেই মহাপুরুষের রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া মহাশক্তি, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ইউরোপে

আবার যখন ভারতের ঘোর দুর্দ্দিনে সস্ত্রীক পৃথ্বীরাজ মহাশক্তির নিকট বলিরূপে সমর্পিত হইলেন, মহাশক্তি প্রীত হয়েন নাই, হইলে কি আর মুসলমান প্রবেশ লাভ করিতে পারিত?

রাণাপ্রতাপ মাতৃভূমির জন্য এক বহুদিনব্যাপী মহাযজ্ঞ করিয়া শেষে আপনাকে তাহাতে পূর্ণাহুতিস্বরূপ প্রদান করেন, তাহাতেও মহাশক্তি প্রীতা হয়েন নাই, হইলে কবে মুসলমান ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইত।

তাহার পর উগ্রচণ্ডাবেশে মহাকালী কত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে উদরসাৎ করিয়াছেন, তবুও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। হইলে কি আজ ভারতের এ দুরবস্থা হইত?

ইহার বিশেষ কারণ আছে। শাস্ত্র মিথ্যা নয়, শাস্ত্রের ফলশ্রুতিও মিথ্যা নহে। সদস্যাদি যজ্ঞকর্ত্তাগণের দোষেই যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় না। কোথাও বা দ্রব্য শুদ্ধির অভাবে, উপকরণের ও আয়োজনের অভাবে যজ্ঞ ভ্রষ্ট হয়। কোথাও যজ্ঞপশু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বগুণান্বিত না হওয়ায় যজ্ঞ নষ্ট হইয়াছে। সকল বিষয়ের যথাযথ সমাবেশ না হইলে যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না। আর সেরূপ সমাবেশ না করিয়া যজ্ঞ করা বৃথা। তবে ইহাও বিবেচ্য যে, ফল একদিনে না ফলিতে পারে, এক বৎসরে না হইতে পারে কিন্তু যথাযথ প্রদত্ত নরবলি কখন বৃথা হয় না, তাহার ফল ফলিবেই; বিলম্বও হইতে পারে শীঘ্রও হইতে পারে।

নরবলিরূপে প্রদত্ত মহাপুরুষের প্রতি রক্তবিন্দু হইতে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। নরবলির কয়েকটি বিশেষ ভেদ আছে। কেবল দেহপাতেই, হৃদয়ের রক্তদানেই যে নরবলিদান সিদ্ধ হয় তাহা নহে। দেশের জন্য, জনসাধারণের হিতার্থ সর্ব্বস্ব মহাশক্তির শ্রীচরণে উৎসর্গ করা, সেও এক উচ্চ ভাবের নরবলি। যখন মহাপুরুষগণ মানবের দুঃখে কাতর হইয়া, দেশের দুর্গতি দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া, আপনার

গ্রহণপূর্ব্বক জগতের হিতসাধনকল্পে ব্যাপৃত হন, তখন আর তাঁহাদের মনুষ্যত্ব থাকে না, তখন তাঁহারা ইহজন্মেই নিষ্ঠা লাভ করেন, দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন এবং সকলের শরণ্য ও পূজ্য হইয়া থাকেন।

দেশের লোকের মহাপাপেই দেশের দুর্গতি হইয়া থাকে। দুর্গতি নাশ করিতে হইলে মহাশক্তির নিকট নরবলি দান করিতে হয়। একটা মানুষকে, মুখহাতপা বাঁধিয়া, পশুর ন্যায় দেবমূর্ত্তির নিকট হত্যা করা নরবলি নহে। মহাশক্তির নিকট প্রদানের জন্য যজ্ঞপশু শতমন্যুর ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত, বহুশ্রুত, শান্ত, দান্ত, নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন ; তাঁহার হয় বীরবেশ না হয় কাঙ্গালের বেশ হইবে, রণস্থলে স্বয়ং মহাভৈরবের মহা অসিতে তাহার মস্তক ছিন্ন হয়। যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া যে এরূপ বলি প্রদত্ত হয় না এরূপ নহে, তাহাও হয়, এমনকি জীবন্ত আহুতিও দত্ত হয়। এ নরমেধে মনুষ্যকে পশুবৎ জ্ঞান করিয়া তাহার মেদ ও মাংস অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয় না, এ বলির মুখে আর্ত্তনাদ বহির্গত হয় না। সে মুখ হইতে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" "সত্যমেব জয়তি" "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়" প্রভৃতি উচ্চারিত হইয়া দিক্‌-দিগন্তর প্রকম্পিত করে, ভীরুকে বীর করে, পাষণ্ডকে ধার্ম্মিক করে, পতিতের উদ্ধারসাধন করে, ও জড়কে কর্ম্মিষ্ঠ করে। সে বলি কোন প্রত্যক্ষ দেবতার সমক্ষে প্রদত্ত হয় না। কারণ মহাশক্তির পূজায়ই নরবলির প্রয়োজন। সেই মহাশক্তি কখন জন্মভূমিরূপে কখনবা ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান হয়েন এবং তাঁহারই সমক্ষে এ নরবলি প্রদত্ত হয়। নিহত বলির সঙ্গে সঙ্গে অতিষ্ঠা প্রাপ্তি হয়। কারণ এ মহাযজ্ঞে যিনিই বলি, তিনিই পুরোহিত, তিনিই আপন ইষ্টমন্ত্রে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেন, অপরে হত্যা করে মাত্র।

যখন এরূপ মহাবলির মস্তক মহাশক্তির নিকট প্রদত্ত হয় তখন সমগ্র জগতের মস্তক বিচলিত হইয়া উঠে। যখন সে নরশিরে বর্ত্তিকা

শোণিত মহাপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক মহাশক্তিকে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়, তখন মহাকালীকার শ্রীমুখ হইতে অট্ট অট্ট হাস্য বিনির্গত হইয়া দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়, ম্লান মুখে হাসি ফুটায়, শোক-তাপকে দূর করে। আর অতিষ্ঠা লাভ করিয়া সেই মহাপুরুষ হাসিতে হাসি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া পিতৃপুরুষগণের সহিত মিলিত হয়েন।

ইহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে নরবলি বলে। ইতিহাসপাঠকমাত্রেই জানেন, এ নরমেধযজ্ঞ কিরূপ, তাহার মন্ত্র কি? তাহার সাধন ও অনুষ্ঠান কিরূপ, এবং তাহার ফলাফলই বা কিরূপ।

দেশে কয়টা শতমন্যু জন্মগ্রহণ করে, কয়জন ওয়ালেস্ বা ওয়াসিংটন আবির্ভূত হয়? সমগ্র জগতে কয়জন বুদ্ধ, কয়জন খ্রীষ্ট, কয়জন চৈতন্য প্রকটিত হয়েন। এই এক এক মহাপুরুষ কেহ বা দেশের জন্য, কেহ বা সত্যের জন্য, কেহ বা ধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় নিষ্পাপ, নির্ম্মল হৃদয়ে মহাশক্তির নিকট আত্মবলি প্রদান করিয়া জগতের কতই মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, এই সকল মহাপুরুষের রক্তবিন্দু হইতে কত শতসহস্র মহাপুরুষের অভ্যুত্থান হইয়াছে।

দেশকালপাত্র অনুসারে এই নরবলি সুসিদ্ধ বা নিষ্ফল হয়। একেবারে নিষ্ফল হয় একথা বলা যায় না, তবে ফললাভের বিলম্ব হয়। মহাশক্তি, আপন শক্তির অংশ এইরূপে মহাপুরুষে আবির্ভূত করিয়া পুনশ্চ বলিরূপে আপনাতে প্রতিসংহার করেন। কখন বা আপনার শক্তি, সু ও কুভাবে প্রকটিত করিয়া, লোকশিক্ষার্থ প্রথমতঃ কু'র প্রভাব বিস্তার করিয়া, পরিণামে শুভদ্বারা অশুভের বলি সম্পাদন করিয়া সেই অশুভ-শক্তি আপনাতে প্রত্যাহরণ করেন; সেও নরমেধযজ্ঞ ও নরবলি।

মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ, রক্তবীজ প্রভৃতি এইরূপে মহাশক্তির নিকট বলিরূপে প্রদত্ত হওয়ায় জগতের শান্তিবিধান হইয়াছে।

মাতৃপূজা।*

ভগিনিগণ ! ভিন্নজাতি, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নবেশী আমরা আজ একত্র এখানে সম্মিলিত হয়ে'ছি কেন ? এর উত্তর আমার সম্বোধনের মধ্যেই নিহিত আছে। দৃশ্যতঃ এত ব্যবধানসত্ত্বেও বস্তুতঃ আমরা যে এক, এক ভারতমাতার কন্যা—পরস্পরে ভগিনীসূত্রে আবদ্ধ, এই সত্য হৃদয়ে অনুভব করে আমরা মাতৃপূজার জন্য একত্র সম্মিলিত হয়েছি। কিন্তু এই সত্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা ও শিক্ষা আমাদের অল্পদিন ও অল্পজনের হয়েছে, আর তাঁদের মধ্যেও সকলের এখানে সম্মিলিত হবার সুবিধা নাই। আজ যাঁরা এখানে সমবেত হ'তে পেরেছেন, তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবতী। সংসারের নিয়ম এই যে, যিনি যে বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবান, তিনি অপেক্ষাকৃত ভাগ্যহীনকে তাহার অংশ দান করেন। ধনী দরিদ্রকে, বিদ্বান মূর্খকে, সুস্থকায় রুগ্নকে সাহায্য দান করেন। এই করুণার ধারা সংসারে প্রবাহিত না থাকিলে সংসার চলিত না—মনুষ্য ও পশুতে প্রভেদ থাকিত না।

যে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ আজ মাতৃপূজার জন্য সম্মিলিত হ'তে পেরেছেন, মাতৃপূজা করে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেছেন—দূরস্থিতা ভগিনীগণকে কি তাঁদের এ সৌভাগ্যের অংশ দানের জন্য তাঁদের মন লালায়িত হচ্ছেনা ?

কিন্তু বাসনা আর কার্য্য দুই এক জিনিস নহে ; অনেকে ইচ্ছাসত্ত্বেও উপায়াভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না।

---

* একবিংশ কংগ্রেসের সমসাময়িক ভারতমহিলা পরিষদে পঠিত।

পুরুষদের মধ্যে পুরুষরা যেরূপ সহজে কাজ করিতে পারেন, স্ত্রীলোকদের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে। আমাদের দেশের সাধারণ মেয়েদের মধ্যে মিটিং বা বক্তৃতার চলন নাই সুতরাং সে উপায়ে কায করতে গেলে সাধারণের মধ্যে তাহা কার্য্যকরীও হয় না। মেয়েদের মধ্যে কায করিতে গেলে, বন্ধুভাবে, ভগিনীভাবে প্রথম তাঁহাদের মিলন আবশ্যক। সেইজন্য প্রতিবেশিনী ও গ্রামস্থ মহিলাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ও তাঁহাদের বাটী গিয়া কথাবার্ত্তা আলাপনের মধ্য দিয়া তাঁহাদের মাতৃপূজায় ব্রতী করিতে পারিলে সমধিক ফললাভের সম্ভাবনা। সম্প্রতি আমি দুইটী বিভিন্ন গ্রামে এ বিষয়ের উদ্যোগ যেরূপ দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা জানিতে পারিলে হয়ত এখানে উপস্থিত মহিলাদের মনেও সেইরূপ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে, এই মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার উদ্দেশ্যেই আমি এই সভার সেক্রেটারী মহোদয়ার অনুরোধ রক্ষা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বে যে সকল মহিলা এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন, আর যাঁহারা সকলকে মুগ্ধ করিয়া বক্তৃতা দিলেন, তাঁহাদের ন্যায় বক্তৃতাশক্তি আমার নাই—বক্তৃতা করিতে আমি আসি নাই—আমার এ কেবল একটী কাজের কাহিনী বিবৃত করা। যদি ইহা আপনাদের চিত্তাকর্ষক হয়—যদি কেহ এই উপায়ে কার্য্যের সহজ পথ লাভ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, সে আমার বিশেষ সৌভাগ্য।

ইহারই নিকটস্থ কোন গ্রামে কয়েকজন মহিলা একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। সমিতির কোন সভ্য নাই, কোন নাম নাই—চাঁদা নাই ; কিন্তু তিনখানি খাতা আছে। একখানি খাতায় সে গ্রামস্থ সব বাড়ীর তালিকা আছে। গ্রামস্থ মহিলাগণ সকলে 'মায়ের কৌটা' নামক একটী ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য এই, প্রতিদিন

হইতে এক মুষ্টি চাউল তাহাতে রাখিতেছেন। মাসান্তে কার্য্য-কর্ত্রী সঞ্চিত দ্রব্য নিজের প্রতিবেশিনীদের ছেলেদের দ্বারা গ্রামস্থ সকল ঘর হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়েন। এটা এমন সহজ যে, এই মুষ্টিভিক্ষাদানে কেহই অস্বীকৃত হ'ননা। এতদ্ভিন্ন আর একটা উপায়ে মহিলারা সমিতির আয়বৃদ্ধির সাহায্য করেন। স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রায় কোন-না-কোন রকম শিল্পকর্ম্ম অল্প বিস্তার জানেন। কার্য্য-কর্ত্রী প্রত্যেক মহিলাকে তাঁহার ইচ্ছামত শিল্পপ্রস্তুতার্থে উপকরণ প্রদান করেন, তাঁহারা অবসরসময়ে প্রতিদিন এক-আধঘণ্টা এই কার্য্য করেন। একটী শেষ হইলে তাহা কার্য্যকর্ত্রীকে প্রদান করিয়া আর একটি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খাতা খানিতে ইহারই হিসাব রাখা হয়। তৃতীয় খাতাখানি এককালীন দানের খাতা। যাহাতে ধনী, দরিদ্র কাহারও দিতে কষ্ট না হয় এইজন্য দৈনিক মুষ্টিভিক্ষার নিয়ম প্রচলিত থাকিলেও, যাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, যাঁহারা মাসিক দান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এককালীন দান করেন। গ্রামস্থ অনেক ভদ্রলোকও এই উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন। সপ্তাহে একবার করিয়া মহিলাদের সম্মিলন হয়। কখন কার্য্য-কর্ত্রীর বাটীতে কখন বা অপর কোন মহিলার বাটীতে এই সম্মিলন হয়। কিন্তু সকল মহিলা এ সম্মিলনে আসেন না। অনেকে মুষ্টিভিক্ষা ও শিল্পসাহায্য নিয়মিত করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহ ভিন্ন অন্যত্র যাইতে পারেন না। যাঁহারা আসেন তাঁহারা এই সময়টা মিথ্যা নষ্ট না করিয়া এই সময়ে শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রথমে তাঁহারা পরস্পরের নিকট শিক্ষা লইতেন, অল্পদিন হইল দুইজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সমিতির আয় তিন প্রকার। মাসিক মুষ্টিভিক্ষার সংগ্রহ, বিক্রীত শিল্পের মূল্য ও এককালীন সাহায্যপ্রাপ্তি। ব্যয়,—শিল্প শিক্ষয়িত্রীর বেতন ও শিল্প উপকরণ ক্রয়। এই ব্যয়ের পর যাহা

উদ্বৃত্ত হইতেছে তাহাদ্বারা গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্য হইয়া থাকে। এই গ্রামের একটী কন্যা তাঁহার শ্বশুরালয়ে, অপর একটী গ্রামে, গিয়া এইরূপ সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। আপাততঃ কেবলমাত্র এই দৈনিক মুষ্টিভিক্ষা স্থাপন ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন—এককালীন দানও কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু শিল্পের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। এই সঞ্চিত অর্থ, তাঁহার পুরুষ অভিভাবক-কদের হস্তে অর্পণ করিলে, তাঁহারা গ্রামস্থ ভদ্রলোকদের পরামর্শ মত একটী তাঁতশিক্ষালয় স্থাপনে ব্যয় করিতেছেন। ইহাদ্বারা তথাকার দরিদ্র তন্তুবায়দের বিশেষ সাহায্য হইতেছে। গ্রামে গ্রামে যদি স্ত্রীলোকেরা এই মাতৃপূজার আয়োজন করিতে পারেন, তবে সে আয়োজন যতই সামান্য হউক, তাহার সুফল সামান্য হইবে না। অনেক সময় সামান্য কার্য্যের ফলও যে কত সুদূরব্যাপী হয় তাহা আগে ধারণাই করা যায় না। আজ যে শিল্পপ্রদর্শনী বর্ষে বর্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অ[illegible]ষ্ঠিত হইতেছে—ভারতের শিল্পোন্নতির সহায়তা করিতেছে, ইহার [illegible]থম সূত্রপাত মহিলার দ্বারা। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কতিপয় মহিলা সখি-সমিতি নামক একটী মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন—সমিতি[illegible] অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে মহিলাশিল্পের উন্নতি করা একটী প্রধান উ[illegible] ছিল। এই উদ্দেশ্যে, সমিতি হইতে বর্ষে বর্ষে মহিলা শিল্প-মেলা নামক একটী বার্ষিক প্রদর্শনীর অধিবেশন হইত, তথায় মহিলাশিল্পের একটী বিশেষ বিভাগ থাকিত ও এই মহিলাশিল্পের জন্য পারিতোষিক প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন আগ্রা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশী, কাশ্মীর, কটক, কৃষ্ণনগর, জয়পুর, বহরমপুর প্রভৃতি শিল্পপ্রসিদ্ধ স্থান হইতে তথাকার বিশেষ বিশেষ শিল্প আনীত হইত। ৫।৬ বৎসর এই শিল্পমেলার অধিবেশনের পর, কলিকাতার Industrial Association হইতে সুবৃহৎ আকারে এইরূপ শিল্পমেলার অধিবেশন

হয়। এই মেলার অনুষ্ঠাতাগণ ইতিপূর্ব্বে মহিলা শিল্পমেলায় তাঁহাদের আত্মীয়দের অভিভাবকরূপে সহায়তা করিতেন এবং Industrial Association হইতে অনুষ্ঠিত মেলার মহিলা-বিভাগে—সখি-সমিতির মহিলাগণ বিশেষ সাহায্য করেন। এই অধিবেশনের পর মহিলা শিল্পমেলার স্বতন্ত্র অধিবেশন আর হয় নাই। ক্রমে এই Industrial Association এর অনুষ্ঠিত শিল্পমেলা কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া Industrial Exhibition এ পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি, সখি-সমিতি একটী মহিলা শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আবশ্যক মত অর্থ সংগ্রহ হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থে ভদ্রবিধবাদের সাহায্য করা হয়।

এই যে ভারতের দুটী বিভিন্ন গ্রামের মহিলা-অনুষ্ঠিত মাতৃপূজার বিবরণ বলিলাম, এ দুটী যেমন সহজসাধ্য সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী। পূজার অর্থ, উপহার। দানেই পূজার সম্যক বিকাশ। মাতার উদ্দেশ্যে ভাঁড়ার হইতে প্রতিদিন একমুষ্টি অন্ন বা অবসরসময়ের এক-আধ-ঘণ্টা সামান্য পরিশ্রম প্রদান করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু এটি উদ্যোগ করিয়া করায় কে? আজ এখানে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি প্রত্যেকে ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্র হৃদয়ে গ্রহণ করেন যে, তিনি গৃহে ফিরিয়া প্রতিবেশিনী ও গ্রামস্থ মহিলাগণকে লইয়া এইরূপ মাতৃপূজার আয়োজন করিবেন, তবে আমাদের আজিকার শুভ সম্মিলনের পুণ্য ফল ফলিবে। গ্রামের অবস্থানুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা—কোথাও কাযের আয়োজন বেশী হইতে পারে, কোথাও কম হইতে পারে; কিন্তু এর সামান্যতম অংশ, কেবল গৃহে গৃহে মুষ্টিভিক্ষা স্থাপনের ব্যবস্থা, যদি করা যায় তবে সেটীও কম নয়। ইহা দ্বারা

ধর্ম্ম অনুষ্ঠান দেখিয়া নিজের মনে যেমন ধর্ম্মের বীজ স্থাপিত হয়, সেইরূপ প্রতিদিন স্বদেশের জন্য এই মুষ্টিভিক্ষা অর্পণানুষ্ঠান দেখিয়াও শিশুর মনে স্বদেশপ্রীতির যে বীজ স্থাপিত হইবে, তাহা পরে, তাহার জীবনে ও শিক্ষায় পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। তাহাদের দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ভগিনিগণ—যদি আমাদের চেষ্টায় দেশের সে সুদিন আসে, আমাদের গৃহে গৃহে তীর্থস্থান স্থাপিত হয় ; তবে সে চেষ্টা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে ? আজ কি গৃহে ফিরিবার আগে, এই শুভ সম্মিলনক্ষেত্র হইতে এই মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বদেশব্রতে দীক্ষিত হইবনা ? ঈশ্বর আমাদের এই মঙ্গল ইচ্ছায় তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের বাসনা সুফলময় হইবে।

এই প্রবন্ধে উল্লিখিত মহিলা শিল্পসমিতি সংক্রান্ত কোন কিছু জানিতে চাহিলে, ৫৭ নং ঝাউলতলা রোড বালিগঞ্জে, আমাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী

ঢাকার কাটরা।*

এন্তেজামদ্দৌলা নসিরুল্ মুল্‌ক্ সৈয়দ আলী খান বাহাদুর নসরৎ জং সাহেব ১৮১৭ খৃঃ অঃ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দ্বারা ঢাকার (জাহাঙ্গীর নগরের) সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি ইংরেজদিগের আদেশ অনুসারে ঢাকার বিবরণী (তাওয়ারিখে জাহাঙ্গীর নগর) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন, এবং ঐ পুস্তকখানি "স্মণ্টাস" নামে জনৈক ইংরেজকে উপহার প্রদান করেন। পুস্তকের নাম ঢাকার বিবরণী হইলেও তাহাতে তিনি সংক্ষেপে মোগল-শাসনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার

পাণ্ডুলিপি এখন এসিয়াটিক সোসাইটিতে বর্ত্তমান আছে। আমরা সেই পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে ঢাকার কাটরাগুলি সম্বন্ধে যৎসামান্য পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। অন্যান্য বিষয় বারান্তরে বলিবার বাসনা রহিল।

সম্রাট আকবরের সময় সর্ব্বপ্রথম সুবাবাঙ্গলা আংশিকরূপে মোগলাধিকৃত হয়। ইতিপূর্ব্বে আফগানসম্প্রদায়ের হস্তগত ছিল। মোগলসৈন্যেরা আফগানসৈন্যের নেতা ওস্‌মান্ খাঁর সহিত অনেকবার যুদ্ধ করে। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হইয়া অনেক সৈন্যসামন্তসহ আফ্‌গানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াও সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের সাত বৎসর পর ১০২১ হীজ্‌রীতে এছলাম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গলা অধিকার করিতে সুজাত খান্‌কে নিযুক্ত করেন। সুজাত খাঁ অনেক যুদ্ধের পর ওস্‌মান্ খান্‌কে পরাস্ত করেন। ওস্‌মান্ খাঁর পুত্র আলীখান্ ও তাঁহার ভ্রাতা মেম্‌রেজখান্, এস্‌লাম্ খাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময় বাঙ্গালা সম্পূর্ণরূপে মোগলাধিকৃত হয়। এবং এস্‌লাম্ সুবাদারীর সময় ঢাকা "জাহাঙ্গীর নগর" নামে অভিহিত হয়।* এস্‌লাম খাঁ বিশেষ যত্নের সহিত অনেক সুরম্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া জাহাঙ্গীর নগরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন। ১০৫০ হিজ্‌রীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র কুমার আজিমওশ্বানের দেওয়ান মির আবুল কাসেম তদীয় আদেশ অনুসারে একটী কাটরা প্রস্তুত করেন। কিন্তু রাজকুমারের মনোমত না হওয়ায় উহা দেওয়ানকে প্রদান করেন। এই কাটরা বর্ত্তমানে "বড় কাটরা" নামে পরিচিত। আজিম্‌ওশ্বান্ ঈদের নামাজ পড়িবার জন্য "ঈদ্-গাহ" প্রস্তুত করেন। ঐ কাটরা ও ঈদ্-গাহ ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আবুল কাসেমের উত্তরাধীকারীদিগের হস্তে ছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ আর একটী কাটরা প্রস্তুত করেন; বর্ত্তমানে ইহা

ছোট-কাটরা নামে পরিচিত। আজিমওশ্বান লালবাগ প্রস্তুত করিয়া সায়েস্তা খাঁকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। জাহাঙ্গীর নগরের বিবরণ লেখক বলিয়াছেন যে, তিনি সায়েস্তা খাঁর উত্তরাধিকারী মৃজারওসন্ আলী এবং তাহার ভ্রাতা কাসেমআলীর পুত্র মজরআলীকে ছোট কাটরা ও লালবাগ ভোগ করিতে দেখিয়াছেন। আজিমওশ্বানের সময় সৈয়দ বংশোদ্ভব মির মুরাদআলী "মীর এমারতের"* কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ঢাকার প্রসিদ্ধ "হুসনী দালান" নির্ম্মাণ করেন। এহতেসাম্ খাঁর সুবাদারীর সময় রাজকীয় নৌকাবিভাগের দারগা মহম্মদ মকিম্ আরও একটী কাটরা প্রস্তুত করেন। অদ্যাপিও উহা মকিমের কাটরা নামে পরিচিত। নবাব জাফর খাঁ নাসরী (যিনি ইতিহাসে কারতলব খাঁ ও মুর্শিদকুলী খাঁ নামে প্রসিদ্ধ) একটী মস্জিদ্ ও বাজার নির্ম্মাণ করান। উক্ত মস্জিদ্ যাফ্রী মস্জিদ্ নামে খ্যাত। উহা ১৮২০ খৃঃ অব্দে মুর্শিদ-কুলীখাঁর উত্তরাধিকারী গজনফর হুসেন খাঁর কন্যা হাজী বেগমের তত্ত্বাবধানে ছিল। লালবাগে যে একটী মকবেরা (সমাধি) আছে তাহা সায়েস্তা খাঁর ইরানী কন্যার সমাধি। নারায়ণগঞ্জের নিকট যে দুর্গ-চূড়া দৃষ্ট হয় উহা নবাব খান খানা ময়াজ্জেখার নির্ম্মিত।

খান, "আর-খাঙ্গিদের" উপদ্রব নিবারণ করিতে দুইটা তোপ নির্ম্মাণ করেন, উহার বড় তোপটী চক্‌বাজারে রক্ষিত আছে। ছোট তোপটী ও দুইটী গোলা নদীগর্ভে নিহিত আছে। নদীর পার্শ্বস্থ যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ দেখা যায় উহার অধিকাংশই সুবাদার এব্রাহিম খাঁর নির্ম্মিত বলিয়া ঢাকার বিবরণী লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট আলমগীরের সময় "শাহটঙ্গি" নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষ (ফকির) ঢাকার উত্তরে ৫।৬ ক্রোশ দূরে একটী পোল নির্ম্মাণ করান উহা বর্ত্তমানে টুঙ্গির পুল নামে অভিহিত।

শ্রীআজিজর রহমান।

* মীর-এমারত Engineer, তিনি কোন কোন সময় তহশীলাদি করিতেন।

ভয় নাই।

একই সাথে মোরা শুনেছি সবাই
জননীর আহ্বান,
তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া তাই সবে মোরা—
হইয়াছি আগুয়ান;
ক্ষুব্ধ সিন্ধু কাঁপিছে দ্বিগুন,
আকাশে বজ্র ঢালিছে আগুন;
মোরা যে ছুটেছি হাত ধরি ধরি
সপ্তটী কোটী ভাই;
মায়ের আশীষে বুকের মাঝারে
কোন ভয় নাই, নাই।

সারাটা বিশ্ব চকিতচক্ষে
চাহিয়া মোদের পানে,
'পতিত দলিত এ জাতি কভু কি
পারিবে জিনিতে রণে?'
লব শিরে কি গো কলঙ্কডালি!
সহিব পরের উপহাস গালি!
কভু নয়, নয়। মাঝপথ হতে
আমরা কি ফিরি ভাই!
মায়ের মন্ত্রে দীক্ষিত সবে
কোন ভয় নাই, নাই।

যে ভাবে ভাবুক মোদের ভিখারী,
যে ভাবে ভাবুক হীন,
মোরা নহি আর পথের কাঙ্গালী
নহি, নহি মোরা দীন।
ছেড়েছি, ছেড়েছি পরের দুয়ার,
চিনিয়া লয়েছি পথ আপনার ;
বাহুতে লভেছি কোটীগুণ বল
মিলি সাতকোটী ভাই ;
ফিরিয়া পেয়েছি জননীর ক্রোড়
কোন ভয় নাই, নাই।

অভ্র-চুম্বি অদ্রি যদিবা
দাঁড়ায় রোধিয়া পথ,
লক্ষ লক্ষ পদাঘাতে সে যে
হ'য়ে যা'বে ধূলিবৎ।
সকল বাধারে করিয়া তুচ্ছ,
দৃঢ়তার ধ্বজা ধরিয়া উচ্চ,
অচিরে সবাই দাঁড়াইব গিয়া
মোদের লক্ষ্য ঠাঁই ;
জননী যখন আছেন সহায়
কোন ভয় নাই, নাই।

ঘরের কথা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আমরা যেমন আত্মীয়, বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বিশেষ—কোন ধনবান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্ভাষণ করিতে গেলে, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য বলি—"মহাশয়কে বড় কাহিল দেখিতেছি।" যদি কোন ইংরাজকে ঐরূপ আপ্যায়িত করিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অস্থি-ভেদী মুষ্টাঘাতে আমাদের পৃষ্ঠের উপর তাঁহার দৌর্ব্বল্যের প্রত্যক্ষ পরিচয় বসাইয়া দেন। "তোমায় যে খুব সুস্থ ও সবল দেখিতেছি" ইংরাজী সমাজে পরস্পরের মধ্যে ইহাই ভদ্র আলাপ। তবে মেমসাহেবদের পুরুষসমক্ষে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট, সামান্য কারণে মূর্চ্ছা যাইবার অধিকার প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে; এবং সেজন্য তাঁহারা সর্ব্বদা পাখা, এসেন্স, সুবাসিত লবণের শিশি প্রভৃতি সঙ্গে প্রস্তুত রাখেন।

সোফিরও এ সকল সরঞ্জামের অপ্রতুল ছিল না। কিন্তু স্বাস্থ্য-সুখের প্রফুল্ল গোলাপ, তাহার কপোলযুগলে সতত প্রস্ফুটিত থাকিত। নিয়মিত আহার, বিহার, শ্রম, গমন, বিরামাদির গুণে সোফির প্রতি অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া, সম্পূর্ণ সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সুষম সুঠাম লাবণ্যের তরীখানি সরল সৌন্দর্য্যে সাজাইয়া সোফি সান্ধ্য-সমীরসেবনে বিচরণ করিত। আস্‌মানি রংটী বুঝি সোফির বড় মনের মত; তাই প্রায়ই সেই রংয়ের সুচিকন সাটিনের আঁটা-সাঁটা পোষাকে তাহার আপাদবক্ষ সজ্জিত থাকিত; সেই নয়নতৃপ্তিকর সুনীল জলদ জলনিধির উপর সোফির মুখখানি যেন হিম-ম্লান পূর্ণচন্দ্রের

ন্যায় ভাসিয়া থাকিত। সেই অবেণীবদ্ধ ঘন কেশদাম একটী সামান্যগুচ্ছে পরিণত হইয়া, শ্যামাঙ্গিনীর সুন্দর স্কন্ধদেশে শিথিলভাবে ঢুলিত। সিঁথির বামপাশে কখন বা একটী বাসন্তী রংএর ফুটন্ত ক্যামেলিয়া, কখন বা একটি সপত্র শুভ্র গোলাপ-কলিকা শোভা পাইত। পারিসের পটুশিল্পী-গ্রথিত কৃত্রিম মুক্তার নেকলেস, কুন্দকুসুমমালার ন্যায় তাহার হৃদয়তরঙ্গে নৃত্য করিত। তাহার কর্ণদ্বয়ে যে দুটী উজ্জ্বল দুল দুলিত, তাহা কৃত্রিম হীরার বলিয়া অল্প লোকেই বুঝিতে পারিত। হাতে দুগাছি সুন্দর রক্ততব্রেসলেট, তাহাও কৃত্রিম মণিমুক্তাখচিত। যখন এই সুললিত লাবণ্যের লহর তুলিয়া সোফি খরপদে রাজপথ বাহিয়া চলিয়া যাইত, তখন কে বুঝিতে পারিত যে, রেলওয়ে-পোর্টার জো-ব্যারেগা এই দেবদুর্লভ রত্নের অধিকারী? এ রূপরাশি কেন সোফি ভস্মে ঢালিয়া দিয়াছিল? কেন এ সোণার কমল সে পঙ্কিল সলিলে ভাসাইয়া দিয়াছিল, এ আমুল-মুকুলিত শ্যামলতা কেন কদর্য্য মাদারবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিল! সোফির কি বর মিলে নাই? অই নবযৌবনের তরঙ্গ, অই লাবণ্যের লহর, সোহাগে হৃদয়ে ধরিবার উপযুক্ত পাত্র কি এদেশে ছিল না? অই কাঞ্চন কুরঙ্গিণীকে আনায়ে আনয়ন করিবার ব্যাধ কি কলিকাতার ফিরিঙ্গিকুমারকুলের মধ্যে এতই অপ্রতুল ছিল? অই পল্কা নৃত্য-লীলা-হাল্কা চরণযুগলে লোটাইবার লোথেরিও কি সোফির নীল-লোচনপথে একটীও পতিত হয় নাই? না, সে কথা বলিলে কলিকাতার কৃষ্ণ-বুটনকুলের উপর ঘোর অরসিকতার কলঙ্ক অর্পণ করা হয়। চূণাগলির অনেক অলিই সোফির কমলকুঞ্জে গুণ গুণ ক'রে, অবশেষে ভাঙ্গা মন জোড়া দিতে শুঁড়ির দোকানে প্রবেশ করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন এই বঙ্গদেশ ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত কয়েকজন বরও সময়ে সময়ে সোফির নয়নবাণে চঞ্চল

সহকারীও ছিলেন। কেদার-টিমথি-চকার-বটি নামক একজন বাঙ্গালী রেভারেণ্ডকুমারও একবার অই কুরঙ্গলোচনা ফিরিঙ্গিবালার চাহনির চমকে পাগল হয়েন, এবং তিন মাস ধরিয়া, আনাচে কানাচে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, আড়খেমটা তালে "Two lovely black eyes" (কাল কাল আঁখি তুটী) গাইয়া, অবশেষে হতাশমনে ব্যাপারীটোলাবাসিনীদিগকে প্রায়শ্চিত্তমর্ম্ম বুঝাইয়া, পরিত্রাণের পথ দেখাইবার জন্য জর্ডন-জল-ধৌত দেহ ও মদনাহত মন উৎসর্গ করেন।

এমন স্বচ্ছন্দের সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, এত প্রলোভনীয় কণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, সোফিসুন্দরী কেন তাহার প্রেমহার ধনহীন, রূপহীন, বংশহীন ব্যারোগাকে পরাইল! রমণীচরিত্র বুঝিতে দেবতারা অক্ষম, মনুষ্য কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? তবে সোফির আত্মীয় স্বজন সকলেই জানিত,—যে বালিকা অতি বুদ্ধিমতী। যাহাতে নিজের মন্দ হয়, আপনার সুখের হানি হয়, সোফি তাহা কখনই করিবে না। এইজন্য সোফির এই স্বয়ম্বরে কেহই আপত্তি করে নাই। সোফির পিতামাতার অবস্থা অতি সামান্য ছিল। কন্যাকে উত্তম বসনভূষণে সাজাইবার সঙ্গতি তাঁহাদের কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু বেশভূষাভি-লাষিনী কুমারী সর্ব্বদাই আপনার সুচারু অঙ্গ পরিপাটী বেশভূষায় সজ্জিত রাখিত। সোফি নৃত্যগীত শিখিল, গিটার বাজাইতে অভ্যাস করিল, অথচ পিতামাতাকে শিক্ষকের বেতন দিতে হইল না। পিতা-মাতার কস্মিন্‌কালে কোন ভদ্রসমাজে নিমন্ত্রণ হয় নাই; কিন্তু কন্যা অল্পদিনই নিজবাটীতে সান্ধ্যভোজ করিবার অবকাশ পাইত। একবার সোফির মার কঠিন পীড়া হয়; একজন ইংরাজডাক্তার বিনা ভিজিটে পক্ষাধিককাল তাঁহাকে দেখিয়া যান। আবার ঘরে বসিয়া ফল, ফুল, পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ বিলাসের উপহার সোফি সময়ে সময়ে প্রায়ই

সহকারীও ছিলেন। কেদার-টিমথি-চকার-বটি নামক একজন বাঙ্গালী রেভারেণ্ডকুমারও একবার অই কুরঙ্গলোচনা ফিরিঙ্গিবালার চাহনির চমকে পাগল হয়েন, এবং তিন মাস ধরিয়া, আনাচে কানাচে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, আড়খেমটা তালে "Two lovely black eyes" (কাল কাল আঁখি দুটী) গাইয়া, অবশেষে হতাশমনে ব্যাপারীটোলাবাসিনীদিগকে প্রায়শ্চিত্তমর্ম্ম বুঝাইয়া, পরিত্রাণের পথ দেখাইবার জন্য জর্ডন-জল-ধৌত দেহ ও মদনাহত মন উৎসর্গ করেন।

এমন স্বচ্ছন্দের সম্বন্ধ উপেক্ষা করিয়া, এত প্রলোভনীয় কণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া, সোফিসুন্দরী কেন তাহার প্রেমহার ধনহীন, রূপহীন, বংশহীন ব্যারোগাকে পরাইল! রমণীচরিত্র বুঝিতে দেবতারা অক্ষম, মনুষ্য কেমন করিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? তবে সোফির আত্মীয় স্বজন সকলেই জানিত,—যে বালিকা অতি বুদ্ধিমতী। যাহাতে নিজের মন্দ হয়, আপনার সুখের হানি হয়, সোফি তাহা কখনই করিবে না। এইজন্য সোফির এই স্বয়ম্বরে কেহই আপত্তি করে নাই। সোফির পিতামাতার অবস্থা অতি সামান্য ছিল। কন্যাকে উত্তম বসনভূষণে সাজাইবার সঙ্গতি তাঁহাদের কিছুমাত্র ছিল না। কিন্তু বেশভূষাভি-লাষিনী কুমারী সর্ব্বদাই আপনার সুচারু অঙ্গ পরিপাটী বেশভূষায় সজ্জিত রাখিত। সোফি নৃত্যগীত শিখিল, গিটার বাজাইতে অভ্যাস করিল, অথচ পিতামাতাকে শিক্ষকের বেতন দিতে হইল না। পিতা-মাতার কস্মিন্‌কালে কোন ভদ্রসমাজে নিমন্ত্রণ হয় নাই; কিন্তু কন্যা অল্পদিনই নিজবাটীতে সান্ধ্যভোজ করিবার অবকাশ পাইত। একবার সোফির মার কঠিন পীড়া হয়; একজন ইংরাজডাক্তার বিনা f পক্ষাধিককাল তাঁহাকে দেখিয়া যান। আবার ঘরে বসিয়া য পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ বিলাসের উপহার সোফি সময়ে সময়ে

মনে হইত যে, তাঁহাদের সুহাসিনী সোফিকে যে দেখে সেই স্নেহ করে; বিশেষ সোফি অতি বুদ্ধিমতী; দরিদ্র জনকজননীকে ভারগ্রস্ত না করিয়া, সে কেমন আপনার প্রয়োজন আপনি পূরণ করিয়া লয়, আবার সময়ে সময়ে সংসারেরও সাহায্য করে! ব্যারোগার প্রকৃতিতে ক্রোধ, কলহপ্রিয়তা ও দ্বেষ অতি অধিক মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল; সে লোকের ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া বিবাদ করিত। যাহাকে "খেতে বল্লে মাত্তে আসে" বলে, ব্যারোগা সেই প্রকৃতির দুর্জ্জন। ট্যাস, টোঁস, মেটিয়া, ফোঁস, সাধারণতঃ এই চারিটী শ্রেণীতে ফিরিঙ্গিকুল বিভক্ত; ব্যারোগা ফোঁস গোত্রসম্ভূত। বিবাহের প্রায় তিনমাস পরে সোফি একদিন রাত্রি একটার সময় স্যাম্পেনবিহ্বল ঢুলু-ঢুলু-নয়নে একটা নাচের মজলিস হইতে বাটী ফিরিয়া আসে; ব্যারোগা, বণিতার প্রতীক্ষায় একাকী গৃহে বসিয়া জিন পান করিতেছিল, এবং প্রতি শকট-চক্রের ঘর্ঘরে কর্ণ উন্নত করিয়া দ্বারদেশে যাইতেছিল ও গাড়ীখানি দ্বার বাহিয়া চলিয়া গেলে নৈরাশ্যে ও ক্রোধে দশনে দশনে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া জিনের মাত্রা ডবল করিতেছিল। ব্যারোগার নেশা বেশ জমিয়া আসিয়াছে। গৃহমধ্যস্থ এক মাত্র কেরোসিনের আলোকে সাহেব চারি পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার দীপ্তির অবস্থান উপলব্ধি করিতেছেন। ঘড়ি আপনার পূর্ণসংখ্যা বারোটা বাজাইয়া আবার এক থেকে সুরু করিবার উদ্যোগ করিতেছে; এমন সময় পাউডার-ধবলিত মুক্তবক্ষে বড় বড় বিলাতী মতির দানা দোলাইয়া, কবরীতে ক্যামেলিয়া গুঁজিয়া, ক্ষীণাঙ্গুলিদলে অর্কিড ফুলের সিল্কমণ্ডিত বিপুল তোড়া লইয়া সোফি অপ্সরা-ঝলকে ব্যারোগার দীন কুটীর প্রভাসিত করিল। শকটচক্রের বা বাটনের শব্দ এবার সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। হঠাৎ ান্দনের সৌরভে পরিপূরিত হওয়ায়, তাঁহার অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রযুগ

বিস্ফারিত হইল। দেখিলেন, সম্মুখে অপ্সরামূর্ত্তি। প্রায় এক মিনিটকাল ব্যারোগা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যরাশির প্রতি চাহিয়া রহিল; কিন্তু পরক্ষণেই ঈর্ষার তীব্র বিষে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল, সুরারক্ত চক্ষুদ্বয় অধিকতর রক্তিম হইল, সর্পের ন্যায় গর্জ্জন শব্দ করিয়া ব্যারোগা দন্তের ভিতর দিয়া বলিল; "মিসেস ব্যারোগা! খুব ভাল কাজ হইতেছে"। সোফি অধরের হাসি লুকাইয়া একটু ঘৃণাব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে বলিল,—"কি ভাল কাজ হইতেছে মিষ্টার ব্যারোগা?" 'মিষ্টার'' কথাটার উপর সোফিসুন্দরী একটু অধিক শ্লেষের অন্তর্টিপ্‌নি দিয়াছিল। ব্যারোগা উত্তর দিল;—''লেডির বাড়ী ফিরিবার এইই উপযুক্ত সময় বটে''!

সোফি।—''লেডি! লেডি কে? এখানেতো কোন লেডিকে উপস্থিত দেখিতেছি না; জেণ্টলম্যানের স্ত্রীকে লেডি বলে, রেলওয়ে পোর্টার কবে হইতে জেণ্টলম্যান হইয়াছে, আমিতো জানিনা"।

বণিতার এই মর্ম্মঘাতী শ্লেষোক্তিতে জো'র বুকে বারুদ জ্বলিয়া উঠিল। সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"সোফি—সোফি''।

সোফি—"ওঃ! বুঝিয়াছি তুমি আবার ঐ নিকৃষ্ট পাশব 'সরাব' পান করিতেছিলে?"

জো।—পাশব-সরাব! হাঁ অবশ্য পাশব সরাব; প্রিয়তমে! আমায় শ্যাম্পেন পান করাইবার তো বন্ধু নাই! ফুলের তোড়া দিবারও বন্ধু নাই; রাত্রি একটা পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া নাচিবার জন্য হাতে হাত দিবার বন্ধু নাই! সুতরাং আমার কষ্টার্জ্জিত 'পাশব সরাব'ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সোফি—কিন্তু তোমার পতিপরায়ণা দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী তোমার পক্ষে উহা যথেষ্ট মনে করেনা, সে সরলা অভাগিনী মনে করে না যে,

তাহার প্রিয়তম "জো" চিরকাল পোর্টার হইয়া থাকিবে, তাই সে এই শীতে প্রায় নগ্নদেহে এত রাত্রি জাগিয়া, পরের খোসামোদ করিয়া এই পত্রখানি আনিয়াছে; যদি দয়া হয়, পাঠ কর।"

এই বলিয়া সোফি একখানি চৌকা লেফেফা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। "জো" সোফির মুখপানে চাহিতে চাহিতে পত্রখানি নিল, ও আলোর নিকট সরিয়া গিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিল। সোফি কি কেরোসিনের আলো উজ্জ্বল করিয়া দিল? না, সেতো ঐ কোনে দাঁড়াইয়া ক্যামেলিয়াটী পুষ্পাধারে রাখিয়া, নৈশ বেশের উপক্রমে গ্রীবালম্বিত সুচারু কবরী উন্মোচন করিতেছে; তবে জো, ব্যারেগার মুখ অমন আলোকিত হইল কেন? কেন তাহার নয়নযুগলে অমন সন্তোষের দীপ্তি প্রভাসিত হইল? অমন শ্লেষঘৃণা-হিংসা-ব্যঞ্জক ঠোঁটের পাশে এ নবীন প্রফুল্লতা কোথা হইতে আসিল? কোথা হইতে আর আসিবে? আসিল কালীর আঁচড় হইতে। লৌহলেখনীপ্রসূত কালীর আঁচড়! তোমার অসাধ্য কি আছে? তুমি কয়েকটা অক্রবক্র রেখা টানিয়া হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি গহনবনকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্যপূর্ণ রাজধানী করিতে পার। আবার সেই রেখাবলীর প্রতাপেই ধনজনপূর্ণ নগরী মরুপ্রান্তরে পরিণত হইতে পারে। তোমারই কৌশলে ভিখারী রাজসিংহাসনে, রাজাধিরাজ পর্ণকুটীরে। তুমি মনে করিলে ভীরু হৃদয়কে বীর রসে জাগাইতে পার; আবার বিশ্ববিজয়ী বীরও তোমার মোহিনীতে রমণীর ন্যায় কাঁদিয়া থাকে। প্রণয়ীর আশা, ভরসা, বিষাদ, প্রমাদ তুমিই। আর আমি বাঙ্গালী গ্রন্থকার, কালীর আঁচড় আমার এখন জাতীয় সর্ব্বস্ব। তোমায় অবলম্বন করিয়া আমি বিশ্বমন্দিরের পাশ-সোপানাবলী অধিরোহণ করি। আমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাতীয়ত্ব, বীরত্ব, দেশানুরাগ, স্বার্থত্যাগ, শিল্প, বাণিজ্য সকলই তোমাতে নিহিত। তুমি আমাদের ঘরে ঘরে অন্ন আন। তোমার কুসুমময়

বর্ম্ম পরিধান করিয়া আমি সহাস্যবদনে বণ্ডষ্ট্রীটের বুটাঘাত পৃষ্ঠ পাতিয়া লই। সুশিক্ষিত বঙ্গের সমস্ত জীবন তোমাতে অর্পিত হইয়াছে।

হে হংসপুচ্ছহাত লৌহলেখনীপ্রসূত কালীর আঁচড় তোমায় আমি শত শত শতবার প্রণিপাত করি।

এই অসীম ক্ষমতাশালী কালীর আঁচড়ে জো ব্যারোগা দেখিল সে একেবারে পোর্টার হইতে লাইন-ইনস্পেক্টর হইয়াছে। আর চল্লিশ টাকা নয়, তাহার আয় এখন মাসিক আড়াই শত টাকা। কে এ ইন্দ্রজাল ঘটাইল? কাহার মোহিনী-দণ্ডে এই অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিল। আর কে? 'জো' দেখিতেছে, বুঝিতেছ; বুঝিয়া কৃতজ্ঞতার সাগর সন্তরণ করিতেছে। তাহার গুণবতী ভার্য্যা সোফি পতির এই মঙ্গলময় দশার সৃষ্টি করিয়াছে। জানু অবনত করিয়া জো ব্যারোগা সোফির গাউনের ভূমিলুণ্ঠিত অগ্রভাগ চুম্বন করিল। বলিল; "সোফি তুমি আমার মুক্তি! সমস্ত জীবনে নির্ব্বাক দাসত্বেও এ অধীন তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। এতদিনে বুঝিলাম— আমার মঙ্গলের জন্যই তুমি দিবারাত্র ঘুরিয়া বেড়াও; আমার সুখের জন্যই তোমার বেশভূষা, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ, ভোজে যোগ, নৃত্যে আমোদ।"

সোফি—বুঝলে তো? আর আমায় শ্লেষ উক্তি করিয়া যন্ত্রণা দিওনা; আমি কোথায় কখন কি করিতেছি, তাহার অনুসন্ধান লইও না। কুমারী মারি জানেন তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি আপনাকে বিসর্জ্জন দিতেছি। তুমি আজ এই কোচেই শয়ন কর, তোমার জিনের দুর্গন্ধ মিশ্রিত নিশ্বাসে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে। আমি আজ একাকিনী শয়ন করিয়া তোমার মঙ্গল চিন্তা করিব। আঘ্রাত কুসুমের প্রসাদি সুরভি সেই রজনীর শেষ অংশে অদৃষ্টে ঘটিল না বলিয়া জো'র হৃদয়ে একটু ব্যথা লাগিল; কিন্তু পতিপরায়ণা বণিতার অনুরাগবলে তাহার পদোন্নতি হইবে, অর্থাগম বৃদ্ধি হইবে, সে ভদ্র-

লোকের পদবীতে আরোহণ করিবে, এই হর্ষোৎফুল্ল চিত্তের স্বপ্ন দেখিবার জন্য সে সেই বৈঠকখানার কৌচে জানু বক্ষে সম্মিলিত করিয়া শয়ন করিল। সোফি আপনার শ্রীঅঙ্গ পর্য্যঙ্কোপরি, নৈশ-বাসে, চিকুর দাম স্খলিত কবরীতে সুবদ্ধ করিয়া শয়ন করিল। এক বার ঘুমঘোরে 'আর্থর আর্থর' বলিয়া শয্যা পার্শ্বে কাহার জন্য হস্ত সঞ্চালন করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অবলার নিদ্রার সে রাত্রিতে আর কোনরূপ ব্যাঘাত হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

অগ্নিহোত্রীর প্রার্থনা।

"স্বস্তি, স্বস্তি" বল "স্বস্তি" বল "জয়, জয়,"
আজি এই জীবনের পথে।
মোরা ক'টি শিশুযাত্রী ;—নাহি কোন ভয়
অই ত জননী স্বর্ণ রথে !

সার্থক হইব সবে। আর ভুলিব না
প্রেয় পেয়ে কারে কহে শ্রেয় ;
কিনিব না রক্ত দিয়ে অগণ্য লাঞ্ছনা ;
হ'ব মোরা অমর, অজেয় !

সাধু যাহা, সত্য যাহা নিখিল জগতে—
প্রাণ ভরি করিব সঞ্চয় ;
ছদ্মবেশী অত্যাচার আমাদের পথে
লভিবে নিয়ত পরাজয় !

সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ জননী আশীষ
শির পাতি লইনু হাসিয়া ;
অমৃত হইয়া যাবে ধরণীর বিষ—
আমাদের হৃদয় ছুঁইয়া।

কনে-বদল।

প্রহসন।

স্ত্রী ও পুরুষগণ।

শ্রীধর ও শশীনাথ	...	বিবাহযোগ্য যুবকদ্বয়
ভোলানাথ	...	শ্রীধরের দুরসম্পর্কীয় গরীব জ্ঞাতি ও মোসাহেব
মালতী ও চন্দ্রাবতী	...	বিবাহযোগ্যা কন্যাদ্বয়
ললিতা	...	শ্রীধরের জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ ও মালতীর সম্পর্কীয়া ভগিনী
প্রভাবতী	...	চন্দ্রাবতীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী

মাসীমা, ক্ষেপি, ক্ষেপির মা, দাসদাসী, ঘটকী প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অপরাহ্ণ কাল।

(শ্রীধর কবিতা পাঠে মগ্ন, ভোলাদাদার কমলানেবু খাইতে খাইতে প্রবেশ)।

ভো। তুমি আমার কমলা নেবু প্রাণ।
সিলেটে জন্ম তোমার বেলেঘাটায় স্থান।
যখন তুমি নৌকায় এস, অর্দ্ধেক কাঁচা অর্দ্ধেক টুঁসো
তোমার ভিতর এত রস না জানি সন্ধান।

শ্রী। বাহারে ভোলাদাদা, এ গান কোথায় শিখলে ?

ভো। দাদা হবে হবে তুমিও শিখ্‌বে; বের তত্ত্ব নিয়ে এসেছে, শীগ্‌গিরই প্রাণটা রসে টুগ্‌বুকে হয়ে উঠবে।

শ্রী। বের তত্ত্ব? কোথা থেকে?

ভো। কেন শিশির বাবুর বাড়ী থেকে। তোমায় তারা ছাড়্‌বেনা হে ছাড়্‌বে না।

এত দিনে পেলেম দেখা আর না সখা ছাড়ব।
তোমায় প্রেমের ডোরে, হৃদ্‌পিঞ্জরে বন্দী করে রাখব।
তোমায় পিয়াইব সোহাগ মধু, অঘোর হয়ে থাকবে বঁধু,
তখন—কেমন ক'রে যাওহে দূরে, দেখ্‌ব হে শ্যাম দেখ্‌ব।

শ্রী। আর গান গাইতে হবে না, আমি মরছি আপনার জ্বালায় আর উনি এলেন কি না-গান গাইতে। আমি কখনই তাকে বিয়ে করব না। এত ক'রে বৌ-দিদিকে বল্‌ছি,—কিছুতেই যদি বুঝবেন! বেশ, শেষে নিজেই ঠক্‌বেন—আমার কি।

ভো। বিয়ে কর্‌বে না কেন দাদা! যে সওগাদ দিয়েছে যদি দেখ, তা'হলে আর ওকথা বল্‌বে না। চন্দ্রপুলি ত একেবারে স্বর্গের চাঁদ মর্ত্ত্যে, দুঃখের মধ্যে কেবল পূর্ণচন্দ্র না হয়ে অর্দ্ধচন্দ্র; আর মনোহরাতে একেবারে মন মাৎ! আমি বরঞ্চ দু একটা নিয়ে আসি।

তোমাতেই মজিয়াছি হে মনোহরণ,
তোমাতেই সঁপিয়াছি জীবন যৌবন;
তোমারি চরণ তলে, প্রাণ বলি দিব বলে—
আসিয়াছি ওহে মম মরণ শরণ।

[তুড়ি দিয়া গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(ললিতার প্রবেশ)।

ল। ঠাকুরপো, কি হচ্ছে? বর দেখ্‌তে এসেছে যে,—একবার দেখা দাও।

শ্রী। দেখ বৌ-দিদি, আমি হাজার বার বলেছি,—আরও না হয় হাজার বার, হাজারবার ছেড়ে লক্ষবার—কোটিবার বল্‌তে রাজি আছি যে আমি কিছুতেই তোমাদের ফরমাসী মেয়ে বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না ;—তা তোমার মাসতুত বোন কেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মামাত বোন হলেও হবে না। লভে না পড়্‌লে আমি কিছুতেই বিয়ে কর্‌ছিনে।

বৌ। ক্ষেপালে দেখছি! দেখা শুনা না হ'লে লভে পড়্‌বে কি করে বল দেখি। আমিও ত তোমাকে হাজার বার বলেছি তাকে দেখলেই লভে পড়বে।

শ্রী। তুমি বল্লেই হোল! আমি জানি তা পড়্‌ব না। দুগ্ধপোষ্যা মেয়ের সঙ্গে আমি অমনি লভে পঁড়ে গেলুম! বল না কেন, আমার নাকে দড়ি দিলেই আমি অমনি গরু ব'নে যাব! তোমার লজিক্ দেখ্‌ছি ঠিক ঐ রকম!

বৌ। তুমি যখন তাকে দেখেছিলে তখন সে ছোটটি ছিল বটে, কিন্তু এই ক'বছরে কি সে বাড়েনি ভাব্‌ছ? এখন সে পনেরতে পড়্‌তে চল্লো। তোমার জন্য ব'লে ক'য়ে এতদিন পর্য্যন্ত আমি আর কোথাও তার সম্বন্ধ করতে দিইনি। আর ত মাসীমা তাকে আয়বড় রাখ্‌তে পারেন না। এর চেয়ে বড় মেয়ে আমাদের মধ্যে আর কোথায় পাবে বল দেখি?

শ্রী। তোমাদের মধ্যে নেই বলে, সংসারে ত আর বড় মেয়ের দুর্ভিক্ষ হয়নি। আমিত তোমাকে স্পষ্টই বলেছি,—আমি চাই কোর্ট-সিপ্‌—প্রেমালাপ, কবিতায় কবিতায় ভাব প্রকাশ; আমি চাই চোখে চোখে চেয়ে বল্‌তে,—

দেখি দেখি আবার দেখি দেখিবার সাধ মেটেনাত
যত দেখি ওমুখখানি দেখিবার সাধ বাড়ে তত।

এক কথায় আমি চাই, গানে গানে প্রাণে প্রাণে মদির মিলন। ১৪।১৫ বছরের মেয়েতে এরকম প্রেম হতেই পারে না। তুমি যদি আমার মনের মত লেখাপড়া জানা একটি বড় মেয়ে দিতে পার, তবেই বিয়ের কথা বল্‌তে এস, নইলে—

বৌ। অমন অবুঝ হয়ো না ঠাকুরপো। একটু ছোট মেয়ে ত ভালই। তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌বে; যা শেখাবে তাই শিখ্‌বে। নিতান্ত বড় মেয়ে কি সহজে পোষ মানে? আর সে যে লেখাপড়া জানে না তাও না; কবিতার বই টইও পড়ে থাকে, আর ঘরকন্নার কাজকর্ম্মও বেশ শিখেছে, সব রকমেই তোমার মনের মত হবে, একটিবার তুমি শুধু দেখ।

শ্রী। অমন পোষ মানান আমি চাই না; চোখে চেয়ে দেখে শুনে আমার লভে পড়্‌বে আমি তাই চাই। আর ঘরকন্নার কাজ জানে—তবেই ত আমার প্রাণটা সুশীতল হয়ে গেল! সে তোমার ঘরকন্নার কাজ করুক আর আমি আকাশের দিকে চেয়ে কবিতা আওড়াই, এই আরকি তোমার মৎলব! না বৌ-দিদি, এবিয়ে আমি কখনই কর্‌ব না।

বৌ। দেখ ঠাকুরপো,—কতদিন থেকে মাসীমাকে কথা দেওয়া হয়েছে, এখন যদি তুমি বিয়ে না কর, তাহলে আমাদের কতদূর লজ্জায় ফেল্‌বে একবার ভেবে দেখ দেখি।

শ্রী। তোমরা কথা দিয়েছ অতএব আমায় বিয়ে কর্‌তে হবে, এরকম লজিক্ ত আমি বুঝিনে। তোমরা কথা দিয়েছ বিয়ে কর্‌তে হয় তোমরাই কর, আমাকে কেন বিয়ে কর্‌তে হবে। কি আমার শুভাকাঙ্ক্ষিনি গো।

বৌ। (রাগিয়া) অদৃষ্টে না থাক্‌লে অমন মেয়ে কি করে পাবে বল।

এই তোমাকে ঠিক বলে দিচ্ছি, এখন হাতের রত্ন পায়ে ঠেলছ এর জন্য পরে আপশোষ করতে হবেই। (স্বগত) এর শোধ আমি তুলবই তুলব। [সক্রোধে প্রস্থান।

(শশীনাথের প্রবেশ)।

শ। ব্যাপার কিহে ভায়া! মুখখানা অমন লম্বা হয়ে পড়েছে কেন?

শ্রী। এই যে শশীদাদা! বস। মুখখানা যে তেড়াচে হয়ে পড়েনি এই ঢের! যে বিপদে পড়া গেছে।

শশী। বটে! তোমারও বিপদ! কি জ্বালা! আমি জানি আমিই বিপদে পড়েছি।

শ্রী! তুমিও বিপদে পড়েছ!

শ। ঘোর বিপদ ভায়া ঘোর বিপদ!

শ্রী। সত্য নাকি! তা যাই বল; আমার মত বিপদ হতেই পারে না, আমার দাদা মহা বিপদ, ভয়ঙ্কর বিপদ।

শ। অমনি বল্লেই হলো! আমার বিপদ যদি শোন!

শ্রী। তার চেয়ে আমার বিপদটাই কেন আগে শোন না?

শ। তবে তাই বল; কিন্তু একটু শীঘ্র শীঘ্র বলে যাও।

শ্রী। তুমিই ত দেরী করাচ্ছ!

শ। আমি দেরী করাচ্ছি না তুমি?

শ্রী। জ্বালালে দেখ্‌ছি, তবে আমাকেই বল্‌তে দাও।

শ। তুমি একটু চুপ কল্লেই আমি বলে যাই।

শ্রী। তা আমি কিছুতেই পার্‌ব না; আমার মাথার মধ্যে কথাগুলো হাবুডুবু খাচ্ছে, তুমি বল দেখি দাদা, ফরমাসী মেয়ে কি বিয়ে করা যায়?

শ। কিছুতে না—কিছুতে না। তোমারো ঐ বিপদ! আমিও যে ঠিক ঐ বিপদে পড়েছি ভায়া।

শ্রী। সেকথা এতক্ষণ বল্‌তে হয়। ছু'জনেই তা'হলে এক ঘাটে জল খাচ্চি বল।

[উভয়ের আলিঙ্গন]।

ছুঃখের কথা বল্‌ব কি ! একটি ছুগ্ধপোষ্যা মেয়ে জুটিয়ে দাদারা বল্‌ছেন তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে।

শ। এই তোমার ছুঃখ ! হা,—হা,—হা ! আমার ছুঃখের কথা শুন্‌লে পাষাণও গলে যায়। একটি কুড়ি বছরের বুড়িকে ধরে আমাকে গতাবার চেষ্টা। অপরাধের মধ্যে বিলাত যাওয়ার আগে আমি তাকে like কর্‌তুম আর আমার যেমন গ্রহ—সেই যুগযুগান্তর পূর্ব্বে নিতান্ত কাঁচা বয়সে বলেও ফেলেছিলুম যে আমি তাকেই বিয়ে কর্‌ব। সেই কথা ধরে আমি ফির্‌তে না ফির্‌তে আমাকে পাক্‌ড়া করেছে। একেই না বলে কর্ম্মফল !

শ্রী। হা,—হা,—হা ; এই তোমার ছুঃখ, হা ভগবান্ ! বিধাতা যদি এমন ছুঃখ আমার অদৃষ্টে ঘটাতেন তা'হলে ত আমি বেঁচে যেতুম। মেয়ে বড়—বেশ লেখাপড়া জানে ?

শ। ভয়ানক লেখাপড়া জানে। সেইত আরো বিপদ।

শ্রী। সেক্সপিয়ার, বায়রণ, সেলি, টেনিসন্ এসব পড়্‌লে বেশ বুঝতে পারে ?

শ। খুব পারে, বিএ এম্‌এরাও তার কাছে হার মেনে যায়।

শ্রী। উঃ-কি বলছে ! আর তুমি তাকে চাও না। আমার প্রাণের মধ্যে হুহু করে উঠছে। (ক্রন্দন) এমনতর সব মেয়ে থাক্‌তে দাদারা কিনা আমার জন্য এক নাবালিকা মেয়ে জুটিয়ে বলেন বিয়ে কর ; না জানে যে কথা কইতে, না জানে যে হেসে চাইতে,—আমার যেন আর কোন কাজকর্ম্ম নেই তাকে নিয়ে আমি এখন মানুষ করি ! ঘরের কাজ বেশ জানে, কথার বেশ

বশ হবে এসব কথা শুনতে ভাল, কিন্তু তাতে ত আর প্রাণের আশা মেটে না।

শ। বল কি হে! অল্প বয়স ঘরকন্নার কাজ বেশ জানে?

শ্রী। ঘরকন্নার কাজ নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব নাকি?

শ। তুমি যা বল্‌বে তাই সে মেনে নেবে? তুমি যদি বল সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে আর পূর্ব্বে অস্ত যায় তাই সে বুঝে যাবে?

শ্রী। তা যাবে বই কি? তাতেই ত আমার আপত্তি।

শ। হায় হায়! এমন মেয়েকে তুমি ছাড়ছ। ভগবান তোমাকে এমন সৌভাগ্য দিচ্ছেন আর তা তুমি বুঝছ না? দেখ ভাই চাউনিতে মজা, কবিতাতে প্রেমালাপ এসব ছেলে বয়েসেই সাজে, কিন্তু ওতে পেট ভরে না ভায়া! বিলাত গিয়ে ওসব ঢের করা গেছে। এখন আমি চাই একটি ছোট মেয়ে—উঠতে বল্লে যে উঠবে, বসতে বল্লে যে বসবে; যে আমার জন্য স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধবে, আমাকে আগে খাইয়ে পাতে খাবে, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে ঘুমবে—

শ্রী। বটে! আমার একটা idea মনে আস্‌ছে।

শ। কি idea? আঃ আমাকে যদি এ যাত্রায় উদ্ধার কর্‌তে পার ভাই!

শ্রী। আমরা কেন কনে বদল করি না; আমার কনেটি আমি তোমাকে দিচ্ছি—তোমার কনেটি আমাকে দাও।

শ। ঠিক্ ঠিক্! Grand idea! আঃ বাঁচালে ভায়া। তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলুম।

শ্রী। (আহ্লাদে) আমি যাই এখনি বৌদিদিকে বলি কালকেই আমি কনে দেখ্‌তে যাব। আজ হলেই হতো ভাল, কিন্তু তার ত আর সময় নেই। ক'টার সময় যাবে হে?

শ। কোর্ট থেকে এসে সন্ধ্যার সময়ই ছুটব। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে আমরা ঠিক সময়ে নিজেদের বদল করে নেব; হা হা—আমি হব শ্রীধর গড়্‌গড়ি আর তুমি হবে শশীনাথ পাক্‌ড়াশি।

শ্রী। উঃ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে? আমি কেন আগেই যাই না।

শ। তা যাওনা, তাতে আর আমার আপত্তি কি?

শ্রী। সেই ভাল! আমি যাব ৪টের সময়। কোন বাড়ীতে?

শ। ১০ নম্বর হাড়কাটা গলি, জগৎ বাবুর বাড়ী!

শ্রী। আর তুমি যাবে সন্ধ্যার সময় ২০ নম্বর আমড়াতলার গলি, শিশির বাবুর বাড়ী।

শ। যদি তারা আমাকে ধরে ফেলে?

শ্রী। তা কি করে পারবে? শর্ম্মা ৪।৫ বছর কি ওমুখো হয়েছে? কিন্তু আমাকে যদি তারা—

শ। হা,—হা,—হা! আমি কি আর বিলাত থেকে ফিরে সেখানে গেছি ভায়া! চিঠির উপর চিঠি আস্‌ছে, কিন্তু আমার এখনো সময় হয়নি। তোমাকে ঠিকই শশীনাথ ভাব্‌বে!

শ্রী। কিন্তু আমি ত তোমাদের পুরাণ' ইতিহাস আওড়াতে পার্‌ব না।

শ। সে সব আমি তোমাকে ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে দেব এখন।

শ্রী। বেশ বেশ কালই তবে যাওয়া যাবে। আমি বৌদিদিকে দিয়ে এখনি তাদের বলে পাঠাচ্ছি।

শ। আমাকে দেখ্‌ছি কাল সকালেই একখানা চিঠি লিখে পাঠাতে হবে। আমি কিনা এই একটু আগে অন্য রকম চিঠি লিখে ডাকে দিয়ে বসে আছি। হা হা! কাল থেকে আমি শ্রীধর গড়্‌গড়ি।

শ্রী। আর আমি শশীনাথ পাক্‌ড়াশি। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিশির বাবুর অন্তঃপুর।— ললিতা ও তাঁহার মাসীমা।

মা। শুন্‌ছি নাকি বাছা তোর দেওরের মন নেই! আমার ত আহার নিদ্রা বন্ধ হয়েছে। তোর কথাতেই এতদিন মালতীকে বড় করে রাখা, এখন যদি শ্রীধরের সঙ্গে বিয়ে না হয় ত লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

ল। একটু সবুর কর না, অত ব্যস্ত হও কেন?

মা। চিরকালইত বাছা ঐ কথা বলছিস্। কিন্তু এতদিন সম্বন্ধ হোয়েছে একদিনও ত সে এমুখো হোল না। চাকরবাকর তোদের বাড়ী গেলে একটিবার তার দেখা পর্য্যন্ত পায় না। সেই ছেলেবেলায় যা দেখেছি নইলে কানা কি খোঁড়া কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তুম না,—তবুও তুই বলিস্ হবে হবে।

ল। হবে না ত কি, তবে অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে না।

মা। কি যে বলিস বাছা কিছুই বুঝতে পারিনে। আমার পোড়া কপাল বলেই এত ভাবনা। আজ যদি তিনি থাকতেন তা'হলে কি আমায় এত ব্যস্ত হ'তে হোত। অভিভাবকের মধ্যে এক ওবাড়ীর বড়ঠাকুর, তিনি ত নিজের মেয়ের বিয়ের ভাবনায় অস্থির, আমার ভাবনা আর কে ভাবে বল?

ল। ক্ষেপির কি এখনো বিয়ে হয় নি?

মা। কি করে হবে বাছা। এত বড় মেয়ে হয়ে উঠেছে, এখনো না হ'ল জ্ঞান, না হ'ল বুদ্ধি। দেখ্‌তে ত ঢের লোক আসে কিন্তু একবার দেখ্‌লে কেউ যে আর এগোয় না। বড়ঠাকুর ব্‌লেন, আমাদের মালতীকে দেখিয়ে ক্ষেপির সম্বন্ধ করাও;—অমন অধর্ম্ম কাজ কি আমি করতে পারি বাছা?

ল। আমার এক বুদ্ধি জোগাচ্ছে মাসীমা। আমি যা বল্‌ব তোমায় কিন্তু তা কর্‌তে হবে বাছা।

মা। তা আর করব না,—তুমিই হলে আমার প্রকৃত অভিভাবক।

ল। দেখ, ঠাকুরপো এক আপত্তি তুলেছে আমাদের মালতী ছোট, সে বড় মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়েছে। আমি ক্ষেপির সঙ্গে তার সম্বন্ধ কর্‌তে চাই।

মা। ওমা ওকি কথা গো!

ল। ভয় কি মাসীমা! কনে দেখলেই তার বড় মেয়ে বিয়ের সাধ মিটে যাবে। তখন বল্‌বে ছেড়েদে মা কেঁদে বাঁচি, আর আপনি যেচে যদি মালতীকে তখন বিয়ে না করে তাহলে আমার নাম নেই।

মা। ওমা কি বল গো, শেষে কি কর্‌তে কি হবে।

ল। তুমি থাম না, আমার উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক। যদি ঠাকুরপো ক্ষেপিকে বিয়ে করেই ফেলে আমি তোমার মেয়ের অন্য ভাল বর জুটিয়ে দেব সেজন্য কিছু ভাবনা ক'রনা।

মা। তা বাছা যা ভাল বোঝ তাই কর, শেষে যেন হিতে বিপরীত না হয়। এই যে বল্‌তে বল্‌তে দিদি এসে উপস্থিত।—

(ক্ষেপির সহিত তাহার মার প্রবেশ)।

এস দিদি, তোমরা বসে গল্পগুজব কর, আমি ধোবার কাপড়-গুলো গুণে নিয়ে তুলে রেখে আসি। মালতী কদিন থেকে কি না তার পিসির বাড়ী গিয়ে আছে তাই আমার আর এক তিল ফুরসৎ নেই।

[প্রস্থান।

ক্ষে-মা। ললিতা কতক্ষণ এলি বাছা! সব ভালত?

ল। হ্যাঁ মাসিমা, তোমরা ভাল আছত?

ক্ষেপি। ভায়্লো ভায়্লো।

ক্ষে-মা। আর বাছা ভাল; এখনো যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য, এত বড় মেয়ে হোল এখনো বে হোল না, মনের কষ্টে মরে আছি বাছা, একটি বর জুটিয়ে দেনা মা আমার।

ক্ষে। আয়্মি চাত্তে বল খাব মা, কনে বল মা কনে বল।

(সকলের হাস্য)।

ক্ষে-মা। দেখদেখি বাছা কথার শ্রী ও চাত্তে ক্যানিংবল খাবে। দূর পোড়ারমুখী, যা এখান থেকে, যা খুড়িমার কাছ থেকে পান দোক্তা চেয়ে আন।

ক্ষে। আয়্মি পান খাব, আয়্মি পান খাব।

[প্রস্থান।

ল। (স্বগতঃ) একে ঠাকুরপোর কনে সাজাতেই হবে। (প্রকাশ্যে) তা আমি চেষ্টা দেখ্‌ব বাছা, ঠাকুরপো বড় মেয়ে খুঁজ্‌চে, তাকে একবার বল্‌ব।

ক্ষে-মা। বাছা চিরজীবি হ, হাতের নো' ক্ষয় যাক। তুই যদি বলিস্ তোর দেওর কখনই সে কথা ঠেল্‌তে পার্‌বে না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই ২৩ বছরে চলছে। সেকথা অবিশ্যি আমি আর কাউকে বলিনে। এত বড় মেয়ে বাছা তোর দেওর আর কোথায় পাবে বল। তা মালতীর সঙ্গে না তার সম্বন্ধ হয়েছিল?

ল। ঠাকুরপো অত ছোট মেয়ে বিয়ে কর্‌বে না।

ক্ষে-মা। তা বেস্ বেস্, আমার মালতীও যা ক্ষেপিও তাই, এক মেয়েকে বিয়ে কর্‌লেই হলো। কি বলিস্ বাছা?

ল। তা ত ঠিকই। তা আমি আজই ঠাকুরপোকে বল্‌ব এখন। তবে আজকা'লকার ছেলেরা ত কারো কথায় ভোলে না, নিজেরা সব যাচাই করে নিতে চায়। একথা শুন্‌লেই কিন্তু ঠাকুরপো মেয়ে দেখ্‌তে চাবে।

ক্ষে-মা। তা বাছা যখনি বলিস্ আমি কনে দেখাতে রাজি, তবে দেখ্‌লে পাছে পিছয়, এই ভয় হয়। জানিস্‌ত বাছা ওর কথার বড় একটা বাঁধুনি নেই। কনে দেখ্‌তে এলে যদি চুপ্‌ক'রে থাকে তাহলেও হয়, তা কিছুতেই ওকে চুপ্ করিয়ে রাখ্‌তে পারি না।

ল। আচ্ছা, সে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক্ করে নেব এখন, সেজন্য তুমি ভেবোনা।

ক্ষে-মা। তা তুই যদি পারিস্ বাছা। ঐ দেখ্‌না একমুখ পান ক'রে কাপড় সব পানের দাগে ভরিয়ে সং সেজে আস্‌ছে।

ল। না পার্‌লে চল্‌বে কেন বাছা, তুমি বরঞ্চ একটু ওদিকে যাও আমি ওকে এখনি শেখাই।

ক্ষে-মা। আঃ! আমার ধড়ে প্রাণ এল। বেঁচে থাক বাছা, বেঁচে থাক। শেখান হ'লেই ডাকিস্ বাছা একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির যেতে হবে।
[প্রস্থান।

(ক্ষেপির প্রবেশ)।

ল। দেখ ক্ষেপি তোর বর আস্‌ছে।

ক্ষে। (এক মুখ হাসিয়া) আমি বল ভায়ো বাসি।

ল। বর ভালবাসিস্—তা আমি তোকে দেব।

ক্ষে। চাত্তে চাত্তে বল—

ল। আচ্ছা চারটে বরই দেব—আমি যা বল্‌ব তাই কর্‌বি?

ক্ষে। কল্‌ব—কল্‌ব।

ল। দেখ তোর নাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে কি বল্‌বি বল্ দেখি?

ক্ষে। অস—মিছলি।

ল। না রসমঞ্জরী না—বল্‌বি প্রাণকান্ত আমি তোমারি।

ক্ষে। পান—পান—তোমাল পান থাব।

ল। না আমি যা বলি ঠিক বল! প্রাণকান্ত আমি তোমারি।

ক্ষে। পান কাঁদত আম্রি তোয়ারি পান।

ল। আচ্ছা ওতেই চলবে,—তারপর তোকে যদি জিজ্ঞাসা করে কি বই পাড়িস—ত কি বল্‌বি বল দেখি ?

ক্ষে। পালম শাক।

ল। কেবল খেতেই জন্মেছ—প্রথম ভাগখানা তোমার পালমশাক হয়ে পড়েছে। না পালম শাক নয়; বল্‌বি, তোমা বই আমি জানিনে।

ক্ষে। তোয়া বই আনিনে।

(ভোলাদাদার প্রবেশ)।

ল। এই যে ভোলাদাদা কি মনে করে ?

ভো। আর ভাই বল্‌ব কি, শ্রীধর ভায়া তোমার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। শুন্‌লে এখানে এসেছ তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

ল। কেন ব্যাপারটা কি ?

ভো। ভায়া কনে দেখ্‌তে রাজি, আজ ত আর সময় হোল না, কালই সন্ধ্যার সময় মেয়ে দেখ্‌তে আসবে।

ল। কালই সন্ধ্যার সময় ? (স্বগত, বিপদ ঘটালে দেখ্‌ছি, কাল ত থাক্‌তে পারব না, কাল সন্ধ্যাবেলায় আবার ছোটবৌদের খেতে বলেছি। যাহ'ক ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা যাবে।

ভো। ও মেয়েটি কে গা ?

ল। ওকেই নাম জিজ্ঞাসা করনা, উত্তর পাবে।

ভো। তোমার নাম কি দেবি।

ক্ষে। অসমিছলি—

ল। (চিমটি কাটিয়া) আবার।

ভো। আহা মরে যাই, এমন মিছরি মাখান কথা ত জীবনে কখনো শুনিনি। বেঁচে থাক রস—আমি রসগোল্লা দেব।

ক্ষে। (হাঁ করিয়া হাসিতে হাসিতে) আমি অসগোয়া খাব।

ভো। আহা কি কচি কথা গা।

ল। ভোলাদাদা জিজ্ঞাসা কর কি বই পড়েছে।

ক্ষে। তোয়া বই আনিনে পান—

ভো। একি শুন্‌ছি, আমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে ?

ল। না দাদা, আমাদের ভাগ্যিতে এখনো মর্ত্ত্যেই আছ, আর তুমি স্বর্গে যেতে চাইলেও যমের সঙ্গে লাঠালাঠি করে আমরা তোমায় ধরে রাখ্‌ব। তুমি এখন ঠাকুরপোর কাছে যাও—বলগে তাঁর কনে ঠিক থাক্‌বে, কাল সন্ধ্যাবেলা যেন দেখ্‌তে আসেন। (স্বগতঃ) ভাল করে রিহার্সেল দিলে কাল নাগাদ বেশ শিখিয়ে পড়িয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব)। যাও দাদা আমি একটু পরে যাচ্ছি।

ভো। কি করে যাই, পা যে সরে না ; কি কথাই শুনলুম !

ল। এই কথা ঠাকুরপোও শুন্‌বে এখন।

ভো। অ্যাঁ অ্যাঁ এ কি তার কনে ! আমাকে বল্‌তে হয়। চমৎকার মেয়ে, আমি গিয়েই বল্‌ছি। একবার চার চক্ষুর মিলন হলে তখন আর জন্মে ভুল্‌তে পার্‌বে না দাদা। কি রূপ গা ! চোক ঠিক্‌রে যায়।

কেগো রমণী কালবরণী, অপাঙ্গেচাহিনী নয়নধাঁধিনী,
প্রলয়-হাসিনী প্রাণ-বিনাশিনী, গজেন্দ্র-গামিনী যেনরে,
　　　　　　　　　　　　　　সিংহবাহিনী যেনরে।
কানে স্বর্ণ পাশা, নাকে নথ খাসা, বাউটিধারিণী ভুজ দৈত্যনাশা,
চরণ তাড়নে, নূপুর স্বননে মহিষমর্দ্দিনী যেনরে ! মুণ্ডমালিনী যেনরে।

[তুড়ি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জগচ্চন্দ্রের অন্তঃপুর।

(ভাণ্ডার ঘরে প্রভাবতী নিমকি প্রস্তুত করিতেছেন—নিকটে থালায় নানারকম তরকারীর ভাগ সাজান)।

প্র। (নিমকি বেলিতে বেলিতে) এত ত আয়োজন কর্‌ছি, এবার আবার নাজানি কি বলে বসে। এই ত তিন তিনবার ডাকলুম, দুবার ত ওজর করে কাটালে। কি ভাগ্যি 'ইনি' তা জানেন না, জানলে রক্ষে রাখ্‌তেন না। এবার এলে হয়। এবার বোধ হয় নিশ্চয় আসবে। না এলে কালই উত্তর দিত।

(হাবীদাসীর প্রবেশ)

হাবী। উনুন ধরিয়ে এনুক্‌ মা, কি হবেক্‌ সব বলেক্‌ দাও, বামুনকে দিয়েক্‌ আসি।

প্র। (নিম্‌কি বেলা বন্ধ রাখিয়া ও তরকারীর থালা টানিয়া) দেখ্‌ এই আলু পটলগুলোর দম হবে, এইগুলো কালিয়াতে পড়্‌বে, এই ভাগটা ছোকা হবে, এই কটা যে আস্ত আলু দেখ্‌চিস্‌ তার চপ্‌ হবে, এই তরকারীগুলো ভাজি হবে। বুঝ্‌লিত ?

দা। বুঝেছিক্‌ গো বুঝেছিক্‌, আপুনি তবুক্‌ এস।

প্র। আমি ত যাচ্ছি, এই নিমকিগুলো ঠিক করে নিয়েই যাব। তুই বাটনাগুলো সব বেটেছিস্‌ ত ?

দা। বাঁটিক্‌নি ত কি ? ঝাল মরিচ ঘসড়েক্‌ ঘস্‌ড়েক্‌ হাত জ্বলেক্‌ খুন হইছুক মা।

প্র। তবে যা, বামুন্‌কে বল্‌গে কালিয়ার মাংসটা চড়াক্‌—আ'র দই মাছের জন্যে যে কাঁচা মাছ রেখে এসেছি সেগুলোও সিদ্ধ কর্‌তে দিক্‌—দেখিস্‌ যেন জলে সিদ্ধ না করে।

দা। ও মা বলক্ কি আপুনি ? জলেক্ নাত সিদ্ধ কর্‌বেক্ কিসেক্ ?

প্র। জলেক্ না ঘোলেক্ সিদ্ধ হবে, বুঝলি এখন ?

দা। তা বুঝেছিক্ গো বুঝেছিক্, মুই কি এতই ন্যাকা নাকি যে কথা বল্লেক্ বুঝতে নারবক্।

প্র। (হাসিয়া) তুই খুব বুদ্ধিমতী আমি জানি, নইলে বাপ মা এমন নাম দেয় ? এখন চেঁচাস্ নে তরকারিগুলো নিয়ে যা।

দা। চেঁচাবুক্ না ! খাটবেক্ যত হাবী, আর বাজারকে যাবেক্ ভবি !

প্র। আ ম'লো ! আজ কি রান্নাবান্না হবে না ? এই খানেই দাঁড়িয়ে বকাবকি কর্‌বি ?

দা। মর্‌বুক্ কেন্নে গা ? মুই হাত জলেক্ খুন হইছুক্, একটু আহা-উহুক্ নেই, ক্যাবল্ মলোক্ মলোক্ ! মুই মরবুক্ কেন্নে আপুনকার ভাব্ব মরুক। (আঙ্গুল মট্‌কান)।

প্র। আহা ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস। তুই মরবি কেন, তোর বালাই নিয়ে আমি মরি। হাত জ্বলছে হাতে এখান জলের পটি বেঁধে দেব, আর কাল ভবিকে বসিয়ে তোকেই বাজারে পাঠাব ; এখন যা লক্ষ্মীটি তরকারীগুলো নিয়ে যা। (হাস্য)

দা। বড্ড হাসি্য ! চন্নুক্ ; আপুনিও এসক্।

[থালা লইয়া প্রস্থান।

প্র। জ্বালালে হাবীটা ! এখন নিম্‌কিগুলো,—শেষ করে ফেলি। (নিম্‌কি কাটিতে কাটিতে) মনে ত কর্‌ছি আস্‌বে, যদিই না আসে, কি লজ্জা কি অপমান। তা'হলে কিন্তু আমি এর শোধ তুলবই, যেমন করে পারি। নিম্‌কি কাটাত হলো, যাই এবার রান্নাঘরে। বাদাম কিস্‌মিস্‌গুলো নিয়ে যাই। (উঠিয়া হাঁড়ি

আশা। সে তাকে যে এখনো ভালবাসে, বেস্ বুঝতে পারি। তার ১৪ বছর বয়সের সময় শশীনাথ বিলাত গেছে—এই ছ বছর সে তারই আশাপথ চেয়ে আছে। বিয়ের সম্বন্ধ এলেই বলে বসে, এখন লেখাপড়া ছেড়ে সে বিয়ে কর্‌তে পারবে না। তার ভাব বুঝেইত এতদিন চুপ্ করে আছি, আর এখন এত লজ্জা অপমান সব সহ্য কর্‌ছি। কিন্তু এর পর যদি—

(ভৃত্যের প্রবেশ)।

ভৃ। আজ্ঞে ডাকের চিঠি এসেছে।

প্র। (আগ্রহে) দে। (পত্র গ্রহণ)। [ভৃত্যের প্রস্থান।

প্র। শশীনাথের চিঠি দেখ্‌ছি—আবার না জানি কি লেখে—বুকটা দুরদুর কর্‌ছে, যেন আমারি বের খবর এতে আছে। (পত্র পাঠ) "আপনার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সম্মানিত হইলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমার অদ্যই মফঃস্বলে যাইতে হইবে। কবে ফিরিব ঠিক্ নাই। পুনঃ পুনঃ আপনার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আশা করি ভবিষ্যতে আর এরূপ অস্বীকারের কারণ দিবেন না।" (পত্র ভূমে নিক্ষেপ করিয়া) উঃ কি অপমান্! আরত সহ্য হয় না। এর পর সে এসে যদি চন্দ্রার পায়েও ধরে তাহলেও আমি আর তার সঙ্গে চন্দ্রার বিয়ে দেব না। যদিই বা পরে দিই, তাকে আগে চখের জলে নাকের জলে করব তবে ছাড়ব।

[পত্র কুড়াইয়া এবং নিম্‌কির থালা উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(গৃহে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চন্দ্রা চুল বাঁধিতেছে।)

চ। আমার ত মনে হচ্ছে সেদিন ! সেই দৃষ্টি, সেই মূর্ত্তি, সেই সব কথা আমার ত মনের শিরায় শিরায় আঁকা রয়েছে। তখন বরঞ্চ অনেক কথা শুনে যেতুম্ মানে বুঝতুম্ না, এখন সেই সকল কথা প্রেমময় অর্থপূর্ণ হয়ে শতগুণ মধুমাখা স্মৃতিতে মনে জেগে ওঠে। আর সত্যই কি তিনি সে সমস্ত ভুলে গেছেন ! ফিরে এসে একবার দেখ্‌তে এলেন না, দিদি এত ডাক্‌লেন তাঁর একটিবার আসার অবসর পর্য্যন্ত হয় না। উঃ পুরুষমানুষ কি নিষ্ঠুর জাত !

বেহাগ।

সারাদিন পড়ে মনে !
মধুমাখা প্রেমরাগে, চেয়েছিল সে কেমনে !
রবির কিরণ আগে, সে আলো কিরণ জাগে ;
সন্ধ্যা না হইতে সন্ধ্যা সে দিঠির স্মৃতি পথে।
হাসি কাঁদি সারাদিন, সে নয়নে চিরলীন ;
স্বপ্নখানি যেন তার মরি বাঁচি তাহে ক্ষণে।

(একটি বিনুনি শেষ করিয়া অন্যটি বিনাইতে বিনাইতে) বেশ-বিন্যাস কর্‌ছি কার জন্য ? হয়ত তিনি আজও আস্‌বেন না। আমার নিজের উপর এত রাগ ধরছে। এত চেষ্টা করছি কিছুতে ভুল্‌তে পার্‌ছিনে। সত্যি আমার কি মনের একটুও তেজ নেই—একটুও গর্ব্ব নেই ! প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু আর তাঁকে দেখ্‌তে চাব না। ইঃ তিনি মনে করেছেন আমরা ক্রমাগত তাঁকে সাধ্‌ব আর তিনি উপেক্ষা কর্‌বেন ! কখনো না।

করিয়া কবরী বন্ধন করিতে করিতে) কে জানে কিছুতেই বিশ্বাস কর্‌তে পারিনে—

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্র। বিশ্বাস কর্‌তে পারিস্‌নে,—এই চিঠি পড়।

(পত্রপাঠে চন্দ্রার সজলনয়ন)

প্র। দেখ চন্দ্রা ওরকম কর্‌লে চল্‌বে না। ঢের হয়েছে—যতদূর অপমান সহ্য করতে হয় সওয়া গেছে। তোর যদি একটুও আত্মগর্ব্ব থাকে ত কান্নাকাটি ছাড়, মনে বল আন, তার এরূপ ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ। আমার ত রাগে অপমানে সর্ব্বশরীর জ্বলছে। এর শোধ যতক্ষণ আমি নিতে না পার্‌ছি আমার শান্তি নেই।

[ঘটকীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ও চন্দ্রার ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ঘ। কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মা'রা,
এনেছি নতুন্‌ বর, গুণে সেরা, ওগো গুণে সেরা ;
এ নয় সাধারণ ছেলে,
পাশের রাশ সে বইতে নারাজ, তাই ফেল্‌ বিএ এল্‌ এ।
গুণের কব কি সীমা, এর নাই জমী জমা
এ যে স্বনামধন্য, পুরুষগণ্য বিলাত ফেরা।
ওগো কনের মারা।
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল জোরা !
লাগ্‌বে না টাকাকড়ি, সোনাভরি ওজন করা ;
শুধু উনিশ কি বিশ যৌতুকটি দিস্‌ কাগজ ভরা,
ওগো কাগজ ভরা।

প্র। আর রঙ্গ ভাল লাগে না, অন্য জায়গায় যা।

ঘ। ও মা ওকি কথা গো, তুমিইত বল্লে শশীবাবুর কাছে যা, তা কাজ গুছিয়ে এনু—এখন দূর্ ছাই।

প্র। কাজ কি গোছালি—সেত আর আস্‌ছে না ?

ঘ। আস্‌ছে বই কি, আজই আস্‌ছে।

প্র। মরণ তোমার ওসব বাজে কথা ঢের শুনেছি। আমি এইমাত্র চিঠি পেয়েছি, সে আস্‌তে পার্‌বে না।

ঘ। কেন আমাকে যে চিঠি দিলেন আজই আস্‌বেন। আমি কি তেম্‌নি পাত্র, চিঠি নিয়ে তবে ছেড়েছি।

(পত্র প্রদান ও প্রভাবতী মনেমনে পাঠ করিয়া)

প্র। সত্যিই আজ চারটের সময় আস্‌ছে। আমি আগে যে চিঠি পেয়েছি সে কাল্‌কের লেখা—আজ সেজন্য মাপ্ চেয়েছে। (স্বগতঃ) কিন্তু আমি এত সহজে তার অপমান ভুল্‌ছিনে, তাকে মাপও কর্‌ছিনে। এখন কি করা যায়, একটা ফন্দী মনে হয়েছে।

ঘ। তবে চন্নুমা এখন, আমায় আবার আর এক জায়গায় যেতে হবে, ৪টের সময় ঠিক্ এখানে জুট্‌তে পার্‌লে হয়।

প্র। (স্বগত) দেরীতে এলেই ভাল। (প্রকাশ্যে) তা দেরী হলেই বা ক্ষতি কি ? যখন সুবিধা হয় এস।

ঘ। তবে চন্নু মা, বিদায়টা যেন ভাল করে পাই। [প্রস্থান।

প্র। কই এখনো ত ক্ষেপির মা এলেন না। দুপুরের সময় গাড়ী পাঠিয়েছি এখন ছুট। এইযে বল্‌তে বল্‌তে।

(ক্ষেপি ও ক্ষেপির মার প্রবেশ)।

প্র। মাসীমা তোমার যে এত দেরী। আমি ছানাটানা কেটে ঠিক্ ক'রে রেখেছি—আজ তোমার কাছে রসগোল্লা পান্‌তোয়াটা

মা। সে বাছা হাবীর কাছে গেল, তা বাছা তুইওত বেশ রসগোল্লা করিস্।

প্র। পোড়া কপাল আর কি! আমি রসগোল্লা কর্‌লেই তোমাদের ছেলে বলেন্ বাড়ীতে ত ঢিলের অভাব নেই,—এনে রসে ডোবালেই ত হয়—কেন মিছে ছানা কিনে পয়সা নষ্ট করা। তাই প্রতিজ্ঞা ক'রেছি আজ শিখবই শিখব।

মা। তা চল বাছা রান্নাঘরে—আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী যেতে হবে। অনেক ক'রে যেতে লিখ্‌লি গাড়ীও পাঠালি তাই এলুম্, নইলে আজ অস্‌তুমই না।

প্র। কেন বাছা সেটি হবে না। আজ আমি তোমার মেয়ের জন্য বর ঠিক্ করেছি, সে চারটের সময় দেখ্‌তে আস্‌বে।

মা। (স্বগতঃ) এ হলো কি! একটা বর জোটে না—হঠাৎ দুট দুট বর হাজির! যেখানে যাই আমার ক্ষেপির বিয়ের জন্য সবাই ব্যস্ত, যাহক্ কোনোটাই এখন হাতছাড়া করা হবে না, যেটা লেগে যায়। (প্রকাশ্যে) সত্যি বাছা ক্ষেপির জন্য বর ঠিক্ ক'রেছিস্? কি বলে যে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব ভেবে পাচ্ছিনে, জন্ম জন্ম সুখে থাক। চারটের সময় না বল্লি বর কনে দেখ্‌তে আস্‌বে?

প্র। হ্যাঁ বলেছে ত তাই।

মা। তা আমি ছটা পর্য্যন্ত থাক্‌তে পার্‌ব, ৭টাতে গেলেই হবে। তবে চল মিষ্টিগুলো সব ক'রে ফেলিগে।

প্র। হ্যাঁ আবার ক'নে সাজাতে হবে। [প্রস্থান।

পটক্ষেপ।

ইতি প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সমসাময়িক ভারত।

আর্থিক অবস্থা।

৩

এক্ষণে সামরিক ব্যয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। আমাদের য়ুরোপীয় বজেটের ন্যায়, ভারতের সামরিক বজেট্ সময়ে-সময়ে এক-এক দমকে হুহু-করিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের দরুন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হওয়ায় এবং ১৮৮৫ সালে রুসেরা আসিয়া-অঞ্চলে আরো বেশীদূর অগ্রসর হওয়ায়,—তাছাড়া নবরাজ্য জয় করিবারও উদ্দেশে,—ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে দুই লক্ষ—পরে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈনিক ভারতে প্রস্তুত রাখিলেন। তন্মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ দেশীয়। যদি কাশি-রাজের খেয়ালি উক্তিটা সত্য হয়—যদি এই বিশাল প্রায়দ্বীপটি জয় করিবার জন্য, চন্দননগর হইতে বহির্গত দুই পল্টন সৈন্যই যথেষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য কিসের জন্য? শান্ত ভারতবাসীদিগকে শাসনে রাখিবার জন্যই কি এই সৈন্যের প্রয়োজন?—কখনই না; ইহার প্রয়োজন,—রুসের গতিরোধ করিবার জন্য; আফ্গানিস্থানের সহিত, ব্রহ্মদেশের সহিত, চীনের সহিত,—এমন কি, হাপ্‌সি-দেশের সহিত যুঝিবার জন্য। ভারতের সৈন্য, ব্রিটিশ্-সাম্রাজ্যিক সৈন্যেরই অন্তর্ভুক্ত। আসিয়া অঞ্চলে, ভারতবর্ষই যে ইংলণ্ডের পরিখা-বেষ্টিত সৈন্য-শিবির, আত্মরক্ষণ ও আক্রমণের প্রধান সম্মিলন-ভূমি—এই রহস্যটি এখন আর কাহারও নিকট অবিদিত নাই। এত সৈন্য রাখা ভারতের পক্ষে যে অনাবশ্যক তাহার প্রকৃষ্ট

নিয়োগ করিতেছেন। এই ভারতীয় সৈন্য সীমান্তরাজ্যের সহিত যুদ্ধে নিয়ত ব্যাপৃত। ইহাদের এক অংশ এক সময়ে হাপ্‌সি-দেশে প্রেরিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শিখ্‌ ও গুর্খা সৈন্য, চীনের সহিত যুদ্ধ করে। এই ভারতীয় সৈন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছে বলিয়া, ইংলণ্ডের যার-পর-নাই সুবিধা হইয়াছে। ইহাদের নিয়োগে ইংলণ্ডের এক কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না। এই বেতনভোগী সৈন্যের ব্যয়ভার ভারতই বহন করিয়া থাকে; এবং সময়বিশেষে ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইলে, উহাদিগকে ইংলণ্ডের হস্তে সদয়ভাবে সমর্পণ করা হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, হাপ্‌সি-যুদ্ধে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ ভারতের হিসাবে খরচ পড়ে;—নিয়মিত সামান্য খর্চ্চাগুলি ভারতের হিসাবে ও নিয়মাতিরিক্ত বিশেষ খর্চ্চাগুলি ইংলণ্ডের হিসাবে ধৃত হয়। ইংলণ্ডের মুখ্য কোষাধ্যক্ষ দেওয়ানজি-বাহাদুর ইহার সমর্থনে কিরূপ ওজর করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কেহ কল্পনাও করিতে পার?—লর্ড-স্যাল্‌স্‌-বরি বলিলেন;—"সুযোগ পাইয়া, এই ব্যাপারে ভারত যদি কিছু লাভ আদায়ের চেষ্টা করে, তাহা হইলে ভারতের অত্যন্ত নির্লজ্জতা প্রকাশ পাইবে। কোষাধ্যক্ষ এস্থলে লজ্জার দোহাই দিবেন, এ কথা কি কাহারও মনে উদয় হইতে পারে? ইংলণ্ডের "বিল্‌"—পরিশোধ করে ভারত—ইহাই বরং ইংলণ্ডের পক্ষে লজ্জা সঙ্কোচের বিষয়। নানাছলে সত্য-অপলাপের চেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-তহবিলের প্রকৃত বৃত্তান্ত কে না অবগত আছে? এই তহবিল হইতে আফগানযুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বজেট্‌ দুরস্ত রাখা হয়।

এই সমস্ত যুদ্ধ চালাইবার জন্য ভারতীয় প্রজার প্রভূত অর্থ ব্যয় হয়—অথচ এই সকল যুদ্ধের সহিত ভারতের কোন সংস্রব নাই। পরে যখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল তখন—ভাবী দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রজা-

কিন্তু তখন দেখা গেল, সেই সমস্ত সঞ্চিত অর্থ, বিদেশীয় যুদ্ধ-ব্যাপারের গভীর গহ্বরে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে !...এই বাবদে যে অতিরিক্ত খর্চ্চা হইয়াছিল, দাদাভাই, কর্নেল্ হানার গ্রন্থ হইতে তাহার একটা আনুমানিক হিসাব সংগ্রহ করিয়াছেন। (Poverty of India)। এই অপব্যয়ের উল্লেখ করিয়া, ১৯০০ সালের কংগ্রেসে, চন্দ্রবর্কার আক্ষেপ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যে সকল সার্ব্বজনিক কাজ সাধারণের পক্ষে বিশেষ হিতজনক ও নিতান্ত আবশ্যক তাহা বিলম্বে অনুষ্ঠিত হয় ; কিন্তু যে সকল কাজ তত আবশ্যক নহে, তাহা—তহবিলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াও অবিলম্বে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। "সেদিন, আমার একজন ইঙ্গভারতীয় বন্ধুর, নিকটে একটা কথা শুনিলাম—কথাটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও, উহার দ্বারা আমার বক্তব্য বিষয়টি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইবার সুবিধা হইবে। আমার বন্ধুটি বলিলেন,—সর্ব্বদাই তাঁহার মনে মনে এই প্রশ্নটি উপস্থিত হয় ;—বোম্বাই নগরে...সৈনিকদিগের একটা সামান্য ভোজনালয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট কি করিয়া ওরূপ একটা ব্যয়-বহুল ইমারৎ প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন।"

আরও এক কথা ; সমস্ত আসিয়ায় ইংরাজ-কন্সল্দিগের বাসগৃহের জন্য,—ইণ্ডিয়া আফিসের ইমারৎ-আদির জন্য, "কুপার্স-হিল্" বিদ্যালয় নির্ম্মাণের জন্য, কেন ভারত-তহবিল হইতে খরচ পড়ে ইহার সদুত্তর আমাকে কি কেহ দিতে পারেন ? এডোয়ার্ড-রাজার অভিষেকের সময়, "Temps" নামক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বোধ হয় সকলেই সেই সময়ে পাঠ করিয়াছিলেন ;—"সকলেই জানে, অভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া, ভারতের রাজা-মহারাজা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লণ্ডনে কিছুদিন অবস্থিতি করায়, তাহার

তহবিল হইতে আদায় করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের খরচে, উৎসবাদি কিরূপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে, "জন-বুল" (জনপুঙ্গব) তাহার রহস্য বিলক্ষণ বুঝেন। ইহা আদৌ স্কচ্ ধরণের আতিথ্য নহে। হিন্দুরা ন্যায্যরূপেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। ভারতসাম্রাজ্যের ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রাদি, এই বিষয়ে দেশীয় সংবাদপত্রাদির সহিত একত্র মিলিত হইয়াছে।"

এই রাজনীতির ফলে, ভারত এমন একটা অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, যাহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ভারতের পার্শ্বদেশে এমন একটি ছিদ্র হইয়াছে যেখান-দিয়া—তাহার যে কিছু রক্ত অবশিষ্ট ছিল,—তাহা নিয়মিতরূপে ও অনিবার্য্যরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে। এই অতুলনীয় অস্বাভাবিক ভীষণ ব্যাপারটি—"শোষণ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমি ইতঃপূর্ব্বে দেশের ধন-শোষক যে সব ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে যে লাভ হয়, সেই লভ্যাংশ, ভারত হইতে প্রতি বৎসরে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে; তাহারই অন্তর্ভুক্ত,—সরকারী ঋণের সুদ, রেলের কাজে-খাটানো মূলধনের প্রতিভূস্বীকৃত সুদ, য়ুরোপীয় কারখানা-ওয়ালা ও য়ুরোপীয় মহাজনদিগের লভ্যাংশ, এবং য়ুরোপীয় রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারীদিগের সঞ্চিত অর্থ। ভারত বাধ্য হইয়া যে মূলধন ইংরাজ মহাজনদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া এখানে খাটাইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রকৃত পক্ষে ভারতের কোন লাভ নাই। ইংরাজ মহাজনদের লভ্যাংশের ফলভাগী —ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার, ইংরাজ হেড্-মিস্ত্রী, ও য়ুরোপীয় শ্রমজীবীগণ। অতএব, ভারত প্রতিবৎসর যে প্রভূত অর্থ, ইংরাজ প্রভুদের নিকট, ইংরাজ মহাজনদের নিকট প্রেরণ করে, তাহা ভারতের "গর্ভলোক্‌সান" বই আর কিছুই নয়। এই অর্থ, ভারত হইতে বাহির হইয়া যায়,

না ;—ইহা একপ্রকার সমুদ্রে জলাঞ্জলি দেওয়া বলিলেও হয়। সরকারী হিসাবের স্বীকৃত অঙ্ক, প্রায় ৪০ কোটি ফ্র্যাঙ্ক ; কিন্তু পূরাপুরি ধরিতে গেলে,—য়ুরোপীয় রাজপুরুষ ও কর্ম্মচারিগণ কর্তৃক যে টাকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তাহাও ঐ অঙ্কে যোগ করা আবশ্যক। কিন্তু উক্ত অঙ্কের মধ্যে উহা ধৃত হয় না। দাদাভাই, ২০ অক্টোবর ১৮৯৮ সালে, সার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ;—"একমাত্র ভারতেই, রপ্তানিক অঙ্ক, আম্‌দানির অঙ্ককে এতদূর ছাড়াইয়া উঠে যে তাহা ভারতের পক্ষে বিশেষ বিপদজনক ও আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। (১) যাহাতে বাণিজ্যের স্বাভাবিক ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়, যাহাতে ভারত পণ্যক্রয়ের জন্য পুনর্ব্বার অর্থ ব্যয় করিতে পারে, তজ্জন্য এতটা মাল ভারতে আম্‌দানি হওয়া আবশ্যক—যাহার মূল্য রপ্তানি মূল্যের সমতুল্য হইবে ;—তা-ছাড়া, রপ্তানি মাল বিক্রয় করিয়া বৈধরূপে যে লাভ হইবার কথা—সেই লভ্যাংশেরও তুল্যমূল্য হইবে"। মনে কর, যদি ভারত, দুই শত কোটি মূল্যের মাল বিক্রয় করে, আর বাস্তবিক তাহার হাতে আইসে শুধু দেড় শত কোটি, তাহা হইলে এই অর্দ্ধ-শত কোটি তাহার ক্ষতি হইল বলিতে হইবে। এই অর্দ্ধ-শত কোটি, শাসন-বিভাগের ও সমর-বিভাগের হিসাবে খরচ পড়িয়া পথেপথেই কাটান্ যায়। ফলতঃ এইরূপই হইতেছে। বিক্রীত পণ্যের পূরা দাম ভারত কখনই পায় না। দাদাভাই, উদাহরণস্বরূপ ১৮৯২-৯৩ হইতে ১৮৯৬-৯৭ সালের হিসাব ধরিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছে ;—আম্‌দানি অপেক্ষা রপ্তানি যে পরিমাণে বেশী হয়, সেই বেশীর অঙ্কটির পরিমাণ,—অথবা যাহা একই কথা,—যাহা ইংলণ্ড আপনার জন্য রাখিয়া দেন,—তাহার পরিমাণ—বার্ষিক ৪০ কোটি টাকা।

হায়! ভারতের সমস্ত দুর্দ্দশার ইহাই প্রকৃত কারণ। ভারত এই সমস্ত অর্থদানে বিরত হউক্, অথবা কড়া লাগাম শিথিল করিবার জন্য একটু মুখ-ঝাঁকানি দিক্,—অমনি তাহার চতুষ্পার্শ্বে, কত স্বার্থের ধ্বংসাবশেষ স্তূপীকৃত হইবে! কেন না, তাহার দেহপুষ্ট কতকগুলি জীব আছে যাহারা তাহাকেই শোষণ করিয়া, বেশ আরাম ও আয়েশে জীবন যাপন করিতেছে;—সেই সব বড় বড় লাট্, সেই সব "শেয়ার"-ধারী ক্ষুদ্র মহাজন, সেই সব রাজপুরুষ ও অবসর-বৃত্তি-ভোগী কর্ম্মচারীগণ। বোধ হয়, সমস্ত ব্রিটিশ-যুক্তরাজ্যে এমন একটি টাকার থোলে নাই, যাহার মধ্যে ভারত তহবিলের দুই এক মুদ্রা কোন-গতিকে আসিয়া না পড়িয়াছে। এই ঐন্দ্রজালিক তহবিল—অলৌকিক তহবিল—অফুরন্ত বাড়ন্ত তহবিল হইতে সকলেই অর্থশোষণ করিতেছে,—কেহবা মুঠা মুঠা, কেহ বা অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দিয়া। ইহাতে কাহারও সঙ্কোচ নাই, অনুতাপ নাই; কেন না, একথা কেহ একবার ভাবিয়াও দেখে না,—কত আত্মত্যাগ, কত দুঃখ কষ্ট,—এমন কি, হয়ত কত মৃত্যুর বিনিময়ে এই মুদ্রাগুলি অর্জ্জিত হইয়াছে...

যাহারা একথা জানে, তাহারাও তাচ্ছিল্য সহকারে এই প্রশ্নের আলোচনা করে। তাহারা সুললিত ভাষায়, অথচ উদ্ধত ও কঠোরভাবে একথা স্বীকার করিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করে না। লর্ড সালসবরি এইরূপ বলিয়াছিলেনঃ—"ভারতের রক্তমোক্ষণ যখন করিতেই হইবে, তখন দেহের সেই সব অংশে অস্ত্রচালনা করা আবশ্যক যেখানে রক্ত জমিয়া গিয়াছে"। দেহের কোন্ অংশে তোমার রক্ত-মোক্ষণ করা যাইবে?" ইঙ্গ-ভারত-সাম্রাজ্য উত্তর করিলেন;—"যে অংশেই হউক রক্ষ-মোক্ষণ আবশ্যক বটে।" তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে না; "কোন্ অংশে রক্ত মোক্ষণ করা তোমার অভি-

বলিতে পারে ;—"হাঁ রক্ত জমিয়াছে বটে—কিন্তু মাথায়। সেই উত্তমাঙ্গে দুই চারিবার অস্ত্র চালনা করিলেই আশ্চর্য্য উপকার দর্শিবে। ভারতের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মজুরি করে, তাহারা জীর্ণশীর্ণ রক্তহীন, তাহা হইতে শুধু জল অথবা পচা রক্ত বাহির হইবে।" যে পরিমাণে বৈদেশিকদিগের অবস্থা ভাল হইবে, সেই পরিমাণে দেশীয় লোকের অবস্থা শোচনীয় হইবে, ইহা ধরা কথা। কি প্রকারে ভারতের পুষ্টি-সাধন হয় তাহাই এখনকার একমাত্র সমস্যা। ভারত এখন অনাহারে মৃতপ্রায়। সকলেই জানে, ভারতে এখন দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন দেখা দিতেছে—ভীষণতর আকারে দেখা দিতেছে। গত দুই বারের দুর্ভিক্ষে যত লোক মরিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত দুর্ভিক্ষ একত্র করিলেও তাহার সমান হয় না। মহামারীর ন্যায় দুর্ভিক্ষও এখানে চিরস্থায়ী হইতে চলিল। এই ক্ষেত্রে ইঙ্গভারতীয় ইংরাজদিগের দিব্য প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। দুর্ভিক্ষের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব সত্ত্বেও, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের উল্লাসময়ী বীণার ঝঙ্কার একটুও মৃদুভাব ধারণ করে না। দুর্ভিক্ষ-বৎসরের রিপোর্ট, প্রায়ই সুখবাদীর উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত এবং উহাতে এক প্রকার সন্ন্যাসী-সুলভ ঔদাস্যের বিকট গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত প্রদেশকে-প্রদেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে, অথচ সরকারী হিসাব-তালিকায় প্রকাশ—ভারত বেশ সমৃদ্ধ। সরকারি তালিকায় যাহাই বলুক,—ইহা নিঃসন্দেহ, ভারতের অসংখ্য লোক নিত্য-নিয়ত অনাহারে মরিতেছে। রাজপুরুষদিগের রিপোর্টে প্রকাশ—লোকদিগের ভবিষ্যৎদৃষ্টির অভাব ও সু-বৃষ্টির অভাব—ইহাই দুর্ভিক্ষের কারণ। আর কিছু না হউক, এই দুর্ভিক্ষের উপলক্ষে, রাজপুরুষগণ আপনাদিগের ঐকান্তিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সমস্ত সাম্রাজ্যের বদান্যতা কীর্ত্তনের একটা সুযোগ পাইয়া থাকেন।

মহানাটক।

নবম অঙ্ক।

নেপথ্যে। ভো ভো অঙ্গদবীর! কপি-যোদ্ধাদের বল' যেন অদ্য রাত্রে সকলে সতর্ক থাকে। অদ্য রাবণ-স্থাপিত প্রাভঞ্জনী নাম্নী রাক্ষসী, শয়ান রাম লক্ষণকে বধ করবে—এইরূপ বিভীষণ বলচেন।

রাত্রে প্রাভঞ্জনীর প্রবেশ।

প্রাভঞ্জনী। (স্বগত)

যেই বীর, হস্তে ধরি' নিষ্কোষিত সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
নির্ভয়ে অটবীমাঝে রাত্রিকালে আছয়ে শয়ান;
আর, সুদর্শন চক্র রক্ষা করে যারে অবিরাম
ক্ষুদ্র আমি কি-করিয়া সে রামের হরিব পরাণ॥

তবে আমি গিয়ে রাবণকে জানাই।

(রাবণের নিকট গিয়া প্রকাশ্যে)

লঙ্কানাথের জয় হোক্! রাজন্! সুদর্শন-চক্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে' রামকে রক্ষা করচে, তাই রামকে আমি রাত্রে বধ করতে পারলেম না। কাল প্রাতে, সমরাঙ্গণ-প্রণয়ী রাক্ষসেরা এই কার্য্য সাধন করুক।

রাবণ। একথা ঠিক্। তাই হোক্।

এদিকেঃ— অথ যুদ্ধোদ্যোগ।

সুগ্রীব—যাহার বপু রাজলক্ষ্মী করয়ে আশ্রয়,
গম্ভীরশ্রী অভিরাম অঙ্গদ সে বালির তনয়,
সংগ্রামে প্রবীণ বীর আর যত বানর-প্রবর,
লঙ্ঘিয়া লঙ্ঘিয়া সিন্ধু, খেদাইয়া যত নিশাচর,

প্রভূত-প্রভাব লঙ্কা ঘেরে চারি ধারে,
—জলধি-বেষ্টিত যাহা পরিখা-আকারে॥
প্রাকার-শিখরে উঠি' যত কপিগণ
রাক্ষস-নিঃক্ষিপ্ত শিলা করিয়া গ্রহণ

বানরগণ। (পরস্পরের প্রতি)

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে, আর সে সুগ্রীব কপিপতি
পরীক্ষায় অবগত যাহাদের প্রভাব শকতি
—সেই কপি-মাঝে মোরা সামর্থ্যেতে সবাই সমান;
প্রবল রাক্ষস-চয় দেখি' চক্ষে বীর হনুমান্
যে কার্য্যে গেছেন, মোরা এবে তাহা করিব সাধন,
তা ছাড়া অপর কিছু নাহি কাজ, শোনো ভ্রাতৃ-গণ!
নিশাচর-সৈন্য সবে দুর্গমধ্যে হয়েছে মিলিত,
ঘিরিয়াছে লঙ্কা এবে কপি-সৈন্য রণে উল্লসিত;
পুনর্ব্বার মিলি' যদি রাক্ষসেরা করে নিষ্ক্রমণ,
কি জানি কি হয় তবে —এখনি যুঝুক্ বীরগণ॥

অনন্তরঃ— কপিকুল-সৈন্যদের মেঘমন্দ্র গম্ভীর গর্জ্জনে,
রাক্ষসদিগের ঘোর কোটি রণ-ঢক্কার নিস্বনে,
অদ্রিগর্ভ বিদারিয়া, দুই সৈন্য হ'ল একত্তর;
—উভয়েই শস্ত্র দক্ষ —উভয়েই সংগ্রামে তৎপর॥

রাবণ। (রামের সৈন্য দর্শনে মহোদরের প্রতি) রাম এখানে কবে এল?

মহোদর। যেই দিন ভুবলয় হ'ল অধোনীত,
মহীধর যত সবে হ'ল কম্পাম্বিত;
যেই দিন সপ্তসিন্ধু হ'ল বিক্ষোভিত
রক্ষ-বধূ-বক্ষ হ'ল অশ্রুতে প্লাবিত
কপি-সৈন্য-পদক্ষেপে সূর্য্যপথ ধুলায় আবৃত
সেই জয়-যাত্রাদিন —হে রাজন্!—নহ কি বিদিত?

রাবণ। সেই রাজলক্ষ্মীচ্যুত রাম এখন কোথায়?

মহোদর। মহারাজ!

কটাক্ষেতে বাঁধিলেন সেতু যিনি জলধি-উপরে;
উপবিষ্ট যিনি তব মাতুলের দেহ-চর্ম্ম'পরে;
চারিধারে বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করয়ে যাঁহার,
বিভীষণ প্রতি যিনি দিয়াছেন সব কার্য্য-ভার,

হেরি' নিজ বাণ যিনি স্মিতমুখে দেখেন লক্ষ্মণে,
সুগ্রীবের গ্রীবা যিনি ধরেছেন বাহুর বেষ্টনে,
পদসেবা ক'রে যাঁর কুমার অঙ্গদ, হনুমান্,
—ওই সেই—হে রাজন্— মহাবীর রঘুপতি রাম ॥

রাবণ। (অসূয়া-সহকারে) আঃ! কি তুমি বল্‌চ? আজ আমার বাহুবীর্য্য তবে একবার দেখ।

(সংগ্রামে অবতরণ)

ইত্যবসরে বিভীষণঃ—(রামের প্রতি)

অনল-শিখার মত কপি-সেনা পিঙ্গল-বরণ
সাগর-তরঙ্গ সম বেগে লঙ্কা করেছে বেষ্টন।
সীতার বিরহ-ক্লেশে আছ প্রভো হেথায়, কাতর
তব সৈন্য-ঘটা হেরি' ক্লিষ্ট আজি হোথা লঙ্কেশ্বর ॥
বিশাল প্রাকারে রহে রাবণের কলেবর
আকণ্ঠ আবৃত;
শুধু তার মুণ্ডগুলা প্রাকার ছাড়ায়ে উঠি
—উর্দ্ধে সমুত্থিত।
বাহিরের লোক যত দেখে সবিস্ময়,
মেঘশূন্য নভে যেন রাহুর উদয় ॥

অনন্তর — রাম ও লক্ষণ দোঁহে ধনুর্গুণ করিলা টঙ্কার,
ব্যাপ্ত হ'ল দিশি-দিশি তার সেই ভীষণ ঝঙ্কার;
কপিকণ্ঠ সারি সারি কদলীর প্রায়,
তাহে অসি-প্রান্ত যেন বিদ্যুৎ খেলায়;
সেই বজ্রানলে দগ্ধ নিশাচরগণ
ত্রস্ত হয়ে রণক্ষেত্রে করে সঞ্চরণ ॥

অপিচঃ— কাল-পাদপের যেন পরিণত পরিপক্ক ফল
—এসব পাটলমুখী কপিদের অগ্রসেনাদল,

(যুদ্ধে রাক্ষসেরা হত হইলে)

রাবণ। ওহে মন্ত্রিগণ! তোমরা এখন আমার অনুজ কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ কর।

মন্ত্রিগণ। যে আজ্ঞা মহারাজ! (তথা করণ)

কুম্ভকর্ণ-কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালি দিয়া
মন্ত্রি পুরোহিত সবে দিল জাগাইয়া॥

কুম্ভকর্ণ। (জাগ্রত হইয়া রাবণের সমীপে আগমন পূর্ব্বক)

মহারাজ! শ্রীচরণে প্রণাম!

সাক্ষাৎ রাজার আজ্ঞা— যদিও সর্ব্বত্র-সঞ্চারী
তথাপি সজ্জন-মতি হয় শাস্ত্র-দীপ-অনুসারী॥

ভ্রাতৃ বাক্য শুনি পরে কহে দশানন।
বিপদে দুর্লভ কিন্তু সাধুর বচন॥

রাবণ। কৈলাসের উত্তোলনে হয় যার কেউর ঘর্ষিত,
যার পীন-ভুজবলে সুরাসুর হয় পরাজিত,
তারি সে প্রখ্যাত বাহু জয়লাভ করিবে আবার,
কুম্ভকর্ণ! নাহি রাখি কিছু মাত্র প্রত্যাশা তোমার।
যাও তুমি পুনর্ব্বার তব নিদ্রালয়ে,
ঘুমাওগে সেথা গিয়া নিশ্চিন্ত হয়ে।

কুম্ভকর্ণ। প্রখ্যাত সে হরধনু ভাঙ্গিল যে জন,
কপিরাজ বালিরে যে করিল নিধন,
সেতু রচি' করিল যে সাগর বন্ধন
রক্ষোহন্তা সেই রামে আর সে জিগীষু বিভীষণে
মুহূর্ত্তে সংহার করি, আসি' পুন বন্দিব চরণে॥
রাক্ষসেন্দ্র তুমি দেব, তৃণবৎ শোকশল্য
ত্যজ' মহারাজ!
শত্রুবৃন্দে বিনাশিয়া, ক্ষালিব কলঙ্ক তব,
শত্রুরক্তে আজ।
কেবা রাম কে লক্ষ্মণ, কেবা সে অঙ্গদ, হনু,
কেবা কপীশ্বর,
কেবা ধাতা, কেবা কাল, কুম্ভকর্ণ হয় যদি
রণে অগ্রসর।

ওহে কপি মল্লগণ! কেন বৃথা হও কম্পমান
তোমাদের সনে কভু কুম্ভকর্ণ না করে সংগ্রাম।
কৃত্রিম বাপীর জল মেঘবৃন্দ করে কি লেহন?
মশক সমূহে কভু কেশরী কি করে নিষ্পেষণ?
ওহে রাম! নহি আমি বালি, খর, ত্রিশির, দূষণ;
সুবাহু, তাড়কা নহি, নহি সেতু সাগর-বন্ধন;
কিম্বা নহি হরধনু ভাঙ্গিলে যা তুমি অনায়াসে;
রুদ্রমূর্ত্তি কালানল যার তেজ ত্রিভুবন গ্রাসে,'
বীরগণ-বক্ষদেশে মহাশল্যরূপে যে বিরাজে
আমি সেই কুম্ভকর্ণ উপস্থিত আজি রণমাঝে॥

অনন্তর — বহু সেনানাশী বীর কুম্ভকর্ণ, সুগ্রীবেরে
পরিঘ-সদৃশ ভুজে করি নিপীড়ন
পূর্ব্বদিকবর্ত্তী যত কপিকুলে চূর্ণ করি'
লঙ্কার সম্মুখে শীঘ্র করিল গমন॥

(রাবণ তাহা শ্রবণ করিয়া)

রাবণ। মহাবল বালীবীর কক্ষাগত করি মোরে
যেই শল্য বক্ষে মোর দেয় বসাইয়া,
—মহামানী কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবে ধরিয়া কক্ষে
সেই শল্য এবে যেন নিল উৎপাটিয়া।

অনন্তর — কক্ষাগত সুগ্রীবেরে কুম্ভকর্ণ, ধরি' ভুজে,
আর তারে স্থাপন করিয়া স্কন্ধদেশে,
চলিলা লঙ্কার পানে; সুগ্রীব, কূর্পরা ঘাতে
কুম্ভকর্ণ-বীরে করি আহত নিমেষে,
নাসা কর্ণ ছিঁড়ি দাঁতে, কুম্ভকর্ণ-কক্ষ হতে
এক লম্ফে স্ব-শিবিরে গেল অবশেষে॥

কুম্ভকর্ণ নিশ্বসিয়া, বাষ্পবারি করি বিসর্জ্জন
—যেন নিজ প্রেতাত্মারে, বারি দানে করিয়া তর্পণ—
সকরুণে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া লঙ্কায়
লইয়া ত্রিশূল অস্ত্র, ক্রোধে অন্ধ কালমূর্ত্তি প্রায়,
—ছিন্ননাসা হইয়াও— অবতীর্ণ হল রণাঙ্গনে;
কাল-হুতাসন যেন জ্বলিতে লাগিল দুনয়নে॥

(ক্রমশঃ)

প্রতারিত।

(১)

মানুষের অনেক অভাব চিরকালই থাকিয়া যায়। হরিহরের একটীমাত্র কন্যার অভাব আর পূর্ণ হইল না। বহুকাল হইতে কন্যার জন্য যে অপত্য স্নেহটুকু সঞ্চিত ছিল, একটা কিনারা করিতে না পারিয়া, অবশেষে হরিহর তাহার সমস্তটা নিরুপমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভর হরিহরের একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, নিরুপমা তাঁহারই কন্যা।

নিরুপমা ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও হরিহরের অযাচিত স্নেহের প্রতিদান দিতে কিছুমাত্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিত না। বালিকা হরিহরের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, নানাবিধ অস্ফুট আলাপে নিজের ভালবাসা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিত। হরিহরও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। ক্রমেই নিরুপমার উপর তাঁহার একটা মায়া পড়িয়া গেল। এই ভাবে হরিহরের ইহজন্মের কন্যার অভাব পূর্ণ হইল।

নিরুপমার বর্ণ একটু কালো ছিল বটে কিন্তু সে একেবারে শ্রীহীন ছিল না। অনেকে বালিকার রূপের নিন্দা করিত, কিন্তু হরিহর নিরুপমার সৌন্দর্য্যের অভাব দেখিতে পাইতেন না; যাহারা নিরুপমাকে কালো বলিত তিনি তাহাদের দৃষ্টিশক্তির বড় প্রশংসা করিতেন না।

দিনে দিনে বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভালবাসায় হরিহর যতই মুহ্যমান্ হইয়া পড়িলেন, তাহাকে আপনার করিবার জন্য ততই তাঁহার ব্যাকুল বাসনা জাগিয়া উঠিল। বালিকাকে একটা ঘনিষ্টতর সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার সুযোগের অভাব ছিলনা। সে সুযোগ, পুত্র রমানাথ।

নিরুপমাকে পুত্রবধূ করিবার কথাটা হরিহর একদিন বিশ্বম্ভরের নিকট পাড়িলেন। বিশ্বম্ভর হাতে স্বর্গ পাইলেন; বলিলেন, এ অপেক্ষা তাঁহার আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে।

কোন দিক্ হইতে কোন আপত্তি উঠিল না। নিরুপমা একটু বড় হইলেই এক শুভমাসে, শুভলগ্নে রমানাথের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। হরিহর হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে পুত্রবধূকে গৃহে আনিলেন।

(২)

সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ মানুষমাত্রেরই থাকে, তবে রমানাথের একটু অধিকমাত্রায় ছিল। বিশ্বসংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্য পুঞ্জীভূত করিয়া বাল্যকাল হইতেই রমানাথ কল্পনায় একটা অনিন্দ্য সুন্দরীর ছবি আঁকিয়া তাহাকেই ভাবীপত্নীজ্ঞানে সুখস্বপ্ন দেখিত। বিবাহ-বাসরে নিরুপমাকে দেখিয়া তাহার সে স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল। দেখিল, তাহার মানসী সুন্দরীর এক কণা সৌন্দর্য্যও নিরুপমার মধ্যে নাই। সে একেবারে মরমে মরিয়া গেল। চোখের সাম্‌নে সে যে বিবাহিত জীবনের একটা সুখশান্তিপূর্ণ-চিত্র এতদিন দেখিয়া আসিতেছিল আজ বোধ হইল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে; তাহার পরিবর্ত্তে মরুভূমির কঠোরতা নৃত্য করিতেছে।

চিকিৎসকের ঔষধের মত আমাদের দেশের যুবকদিগকে পিতা মাতার নির্ব্বাচিত পত্নী গলগ্রহ করিতে হয় তাই ভাবীপত্নী নির্ব্বাচনে রমানাথেরও কিছু মাত্র হাত ছিল না। পিতা মাতার আজ্ঞায় সামান্য ক্রীড়ণকের মত তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে।

বিবাহে রমানাথ যে বিশেষ রকম হতাশ হইয়াছে, তাহার বন্ধুবান্ধবেরা শীঘ্রই এটা বুঝিতে পারিল এবং রমানাথকে শান্ত করিবার জন্য বিজ্ঞের মত বলিল—"ভবিতব্য খণ্ডান যায় না।"

রমানাথ, এতবড় সত্যটা বিশ্বাস করিল না, সে মনে মনে কেবল পিতামাতাকে অভিসম্পাত দিল।

(৩)

বিবাহের রাত্রে শুভদর্শনের সময় নিরুপমার মুখ দেখিয়া রমানাথের যে অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছিল আজ তিন বৎসরের মধ্যে তাহার নিবৃত্তি হইল না। যে রূপলালসা বাল্যকালে তাহার দিনগুলিকে স্বপ্নময় করিয়া রাখিয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তাহা তেমনই প্রখর ছিল। কাজেই রমানাথ নিরুপমাকে আপনার পত্নী বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনোমধ্যে কেমন একটা অশান্তির তুফান বহিতেছিল, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যেন জীবনটা বৃথায় গেল। পিতাই তাহার দুঃখের মূল ভাবিয়া পিতার উপর সে ভয়ঙ্কর চটিয়াছিল।

রাগে, ক্ষোভে রমানাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল, পিতামাতার খুব অবাধ্য হইল। মনে ভাবিল, ভালমানুষী দেখাইয়া সে খুব ঠকিয়াছে আর ভালমানুষটীর মত থাকিবে না। রমানাথের উৎপাৎ খুব বাড়িয়া উঠিল,—সে খুব যথেচ্ছাচারী হইয়া পড়িল।

রমানাথ অনেক রাত্রি জাগিয়া নভেল পড়িতে, কবিতা লিখিতে লাগিল আর কিছু করিল না। হরিহর যাহা বলিতেন, ঠিক্ তাহার উল্টা করিয়া বসিত।

রমানাথ একবার অসুস্থ হইয়া পড়ে। হরিহর ভাবিয়াছিলেন, রাত্রিজাগরণই পুত্রের অসুস্থতার কারণ। তাই তিনি পুত্রকে ডাকিয়া রাত্রি জাগিতে নিষেধ করিলেন। রমানাথ সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আল্‌মারী হইতে পাঠ্যপুস্তকগুলি বাহির করিল, সমস্ত রাত্রি ট্রিগনমেট্রী কসিয়া কাটাইয়া দিল।

পরদিন অসুখ খুব বাড়িয়া উঠিল—হরিহর সেই অবধি পুত্রকে আর বড় কিছু বলিতেন না।

(৪)

পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনের সহস্র অনুরোধে রমানাথ কর্ণপাত করিল না। স্ত্রী নিরুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কিছুতেই সম্মত হইল না।

রূপে মোহিত করিতে না পারিলেও নিরুপমা অল্পদিনের মধ্যে হরিহরের সংসারের সকলকে গুণে মোহিত করিয়াছিল। তাই তাহারা সকলে মিলিয়া নিরুপমার পক্ষ লইয়া রমানাথের কাছে অনেক কথা বলিত। তাহাতে রমানাথের নিরুপমার উপর বিতৃষ্ণা বাড়িল বই কমিল না। হরিহর প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বয়সবৃদ্ধিতে পুত্রের এ দোষ সারিয়া যাইবে কিন্তু এখন দেখিলেন, পুত্রের এ বড় বিষম ব্যাধি।

যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড সে অনেক দিন কিছু বুঝিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু বড় বেসি দিন আর গোপন রহিল না। নিরুপমার কোন কিছুরই অভাব ছিল না; শ্বশুরের অপরিমেয় স্নেহ, শাশুড়ির যত্ন তাহার ক্ষুদ্র জীবনটাকে সুখ-শান্তিতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু এই দৃঢ় আচ্ছন্নতার আবরণ ভেদ করিয়াও হঠাৎ একদিন এক গুরুতর অভাব নিরুপমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। সে একদিন স্পষ্ট অনুভব করিল, তাহার জীবন নিষ্ফল হইতে চলিয়াছে; তাহার হাসিখেলাময় অতীতের দিন ভবিষ্যৎ-জীবনের মধ্যে আর খুঁজিয়া পাইতেছেনা। কি করিবে এই প্রশ্ন শতসহস্রবার মনে মনে উঠিল, কিন্তু হৃদয়ের একটী কোণ হইতেও তাহার উত্তরের আভাষ ব্যক্ত হইল না। একটা দারুণ অস্থিরতা হৃদয়ের মধ্যে উদ্দাম ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে

(৫)

হরিহর বুঝিলেন; রমানাথের তাচ্ছিল্যতার কঠোর বাণ এতদিনে নিরুপমার বক্ষে বাজিয়াছে। সে আঘাতটা তাঁহারও হৃদয়ে লাগিল। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া হরিহর এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া খুব তিরস্কার করিলেন, বলিলেন, নিরুপমার সহিত এমন ব্যবহার করিলে ত্যজ্যপুত্র করিব। হরিহর ভাবিয়াছিলেন, আজকালকার ছেলে বিষয় প্রাপ্তির লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু এ শাসনবাক্য রমানাথের অটল একগুঁয়েমি টলাইতে পারিল না। তিনি তখন একটু সুর নামাইলেন, পুত্রের গায়ে পিঠে হাত বুলাইলেন, কিন্তু রমানাথ তাহাতেও ভুলিল না। হরিহর তখন মনে মনে বিপদ গণিলেন।

হরিহরপত্নী একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তারপর যখন নিরুপমার ব্যথাক্লিষ্ট মুখের পানে চাওয়া একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল তখন রমানাথের মাতা মনে মনে এক কৌশল আঁটিলেন।

বিবাহের পর হইতেই রমানাথ নিরুপমা হইতে দূরে থাকিবার জন্য বৈঠকখানায় শয়ন করিত। হরিহরপত্নী নিরুপমাকে একরাত্রে সেইখানে পাঠাইতে চাহিলেন; লজ্জার মাথা খাইয়া শিখাইয়া দিলেন, কেমন করিয়া নিরুপমা রমানাথের সহিত গুছাইয়া সব কথা বলিবে। নিরুপমা রাজী হইল না, তার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু শাশুড়ি যখন বুঝাইয়া দিলেন, এ না করিলে তাহার অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই তখন অগত্যা সে রাজী হইল। একটা কি অজানিত হর্ষ তার মন তোলপাড় করিয়া তুলিল।

রমানাথ অনেক রাত অবধি জাগিয়া কবিতা লিখিত, কাজেই

জাগিয়াছিল। নিরুপমা একটা কোণ খুঁজিয়া, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সে কি করিবে একটা মতিস্থির করিতে পারিতেছিল না, তাহার মনে কেমন একটা লজ্জামিশ্রিত ভয় ক্রীড়া করিতেছিল।

কবিতার রসভঙ্গ হইবে বলিয়া রমানাথ দরজার শব্দ লক্ষ্য করিল না। কড়িকাঠ পানে চাহিয়া তখন সে ছন্দের একটা মিল খুঁজিতেছিল। উপরে চাহিয়া চাহিয়া নীরস ইটসুরকির অন্তস্তল ভেদ করিয়াও যখন একটা মনোমত মিল মিলিল না তখন তাহার হঠাৎ দৃষ্টি নিরুপমার উপর পড়িল; দেখিল, ঘরের যে কোনটায় একরাশ অন্ধকার জড় হইয়া আছে, সেই খানে কে দাঁড়াইয়া। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া চিনিল নিরুপমা।

নিরুপমার কথা মনে হইবা মাত্র তাহার হৃদয়ে এক সঙ্গে শতবৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। সে কবিতার তরঙ্গে তাহার হৃদয়ের বেদনা কতকটা চাপা দিয়াছিল, সে কতকটা আত্মহারাও হইয়াছিল, কিন্তু নিরুপমার দর্শনে তাহার কষ্টস্রোত উথলিয়া উঠিল, মনে একটা দারুণ ক্রোধের শিখা জ্বলিয়া উঠিল; তাহারই পরিচয় জানাইয়া রমানাথ কর্কশ স্বরে নিরুপমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তুমি আমার ঘরে কেন?"

এই কঠোর কণ্ঠস্বর শুনিয়া শাশুড়ি যাহা শিখাইয়াছিলেন, নিরুপমার সব গোলমাল হইয়া গেল। স্বামীর নিকট এই তার প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ! নিরুপমা নিরুত্তর হইল।

রমানাথ অধিকতর কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"যাও আমার সম্মুখ থেকে—আমার ভালবাসা তোমার প্রাপ্য নয়।"

নিরুপমা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রমানাথ ভাবিল, সে আজ খুব জিতিয়াছে। নিরুপমাকে সে রীতিমত শিক্ষা দিতে পারিয়াছে—সে যে তাহার নিকট ন্যায্য প্রাপ্য প্রণয় দাবী করিতে আসিয়াছিল,

কিন্তু রমানাথ আজ অন্ধ—তাহার সে সূক্ষ্ম দৃষ্টি কোথা ? তাই সে বুঝিল না, নিরুপমা পূজার সম্ভার লইয়া আসিয়াছিল, অশ্রুসিক্ত করে সে তাহার সাধের অর্ঘ্যডালা ফিরাইয়া লইয়া গেল !

রমানাথের কঠোর প্রত্যাখ্যান বাক্য সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও নিরুপমার অন্তরে তাহা বজ্রেরও অধিক বাজিল। এতটা কঠোর অনাদর সে স্বামীর নিকট আশা করে নাই। তাহার অন্তরস্থ পঞ্জরগুলি যেন এক এক করিয়া চূর্ণ হইতে লাগিল, হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন শত ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া গেল। নিরুপমা বাটীর ভিতর ফিরিয়া আর অশ্রু রুদ্ধ করিতে পারিল না, চক্ষু ফাটিয়া হৃদয় হইতে জলের উৎস উছলিয়া উঠিল।

পর দিন নিরুপমা আর হরিহরের বাটীতে থাকিতে চাহিল না। বিস্তর কান্নাকাটী করিল। অগত্যা হরিহর তাহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিলেন। নিরুপমার যাইবার সময় হরিহরও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

(৬)

হরিহর অনেকবার আনিতে লোক পাঠাইলেও নিরুপমা আজ দুই বৎসরের মধ্যে আর একবারও শ্বশুরগৃহে পদার্পণ করে নাই। নিরুপমার প্রতি স্নেহ হরিহরের বৃদ্ধি পাইয়াছিল বই কমে নাই, তাই তিনি বিশ্বম্ভরের বাটী গিয়া নিরুপমাকে প্রায়ই দেখিয়া আসিতেন। নিরুপমা দিন দিন শীর্ণ হইতেছিল। হরিহর বড়ই চিন্তিত হইলেন।

নিরুপমা চলিয়া যাইবার পর রমানাথের কাণে আর বড় স্ত্রীর কথা উঠে নাই। সে তাহাতে অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিল।

রমানাথ বেশ স্থির হইয়া বসিয়া কবিতা লিখিত, আপনার কষ্টকে সে কতকটা শান্ত করিয়াও আনিয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাহার

সুহৃদগণ তাহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল যে, ভাগ্যের দাসত্ব স্বীকার করা পুরুষের কাজ নহে, পুরুষকারের দ্বারা ভাগ্যকে আপন অভিমতে পরিচালনা করাই কর্ত্তব্য। রমানাথ নিজের ভ্রম বুঝিল, দেখিল সে ইচ্ছা করিলেই আপনার জীবন নূতন করিয়া গঠন করিতে পারে, অভীপ্সিত সুখশান্তিকে আবার ডাকিয়া আনিতে পারে। বুদ্ধিমান বন্ধুগণ তাহার চক্ষুদান করিয়াছে বলিয়া রমানাথ তাহাদের মনে মনে বিস্তর প্রশংসা করিল।

কন্যাদায়ক্ষিপ্ত পিতার অভাব নাই। রমানাথের ইচ্ছা প্রকাশ হইবামাত্রই অনূঢ়া কন্যার বন্যা আসিয়া দেখা দিল। রমানাথ নিজে কন্যা পসন্দ করিতে গিয়া দেখিল, তাহার সেই মানসী সুন্দরীর সন্ধান কোথাও মিলিতেছেনা। এখন তাহার অনেকটা জ্ঞান হইয়াছিল যে কল্পনার ছবিটী বাস্তবে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়া উঠে না। তাই গুটিকয়েক কন্যা দেখিবার পর একজন বালিকাকে তাহার নেহাৎ অপসন্দ হইল না। তথনও মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল; অবশেষে নিরুপায় হইয়া এই ভাবিয়া প্রবোধ মানিল যে, নিরুপমার তুলনায় এ বালিকা অপ্সরা।

হরিহরের কাণে একথা উঠিল। তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একদিন না একদিন নিরুপমার অদৃষ্ট ফিরিবে, এখন তাঁহার সে আশাও ভঙ্গ হইল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া নিরস্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু রমানাথ কোন উচ্চবাচ্য করিল না। হরিহর তখন রাগিয়া উঠিলেন;—"বলিলেন, এ বিবাহ আমি কিছুতেই হইতে দিব না।"

যেটা খুব বেগবান্, তার সমুখে একটা বাধা পড়িলেই তার বেগ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। রমানাথ পিতার মুখের উপর স্পষ্টই বলিল সে এ বিবাহ করিবেই।

তাই তিনি আর কিছু না বলিয়া রাগে ক্ষোভে, বায়ুপরিবর্ত্তনের অছিলা করিয়া বাটী ত্যাগ করিয়া গেলেন। পত্নীও সঙ্গিনী হইলেন।

ইহাতে রমানাথের সুবিধা বই কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না। বিবাহের সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল, দিনস্থির পর্য্যন্ত হইল। রমানাথের মনে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা সুখবিজড়িত চিত্র প্রতিফলিত হইয়া উঠিল; ভাবিল, সত্যই সে এতদিন ভ্রমান্ধকারে ডুবিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিল।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনের খপর আত্মীয়-স্বজনের কাছে কখন ছাপা থাকে না। রমানাথের বিবাহের সংবাদ নিরুপমার কাণে পৌঁছিতে বড় বেসি বিলম্ব হইল না। পিতৃগৃহে আসিয়া নিরুপমার শরীরের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ হয় এতদিনে তাহা শেস সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এতবড় দুঃসংবাদটা তাহার নিকট যমদূতের মত আসিয়া দাঁড়াইল। নিরুপমা এতদিন যে একটা ক্ষীণ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিল আজ তাহাও ধূলিলুণ্ঠিত হইল।

(৭)

আজ রমানাথ নববধূকে লইয়া গৃহে ফিরিয়াছে। ছয় বৎসর আগে সে যখন নিরুপমাকে লইয়া এমনি করিয়াই এবাটীতে বরবেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার ও নিরুপমার অভ্যর্থনার জন্য কতই না শঙ্খধ্বনি কতই হুলুধ্বনি হইয়াছিল, শত শত উন্মুখ দৃষ্টি তাহাকে নুতন করিয়া দেখিবার জন্য সাগ্রহে তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজ সেখানে কেহই নাই। রমানাথের ইহাতে একটু দুঃখ হইল, অভিমানও হইল। বিনা অভ্যর্থনায় সে আপনি পাল্কী হইতে নামিয়া আসিল, একেবারে বাড়ির ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। গ্রামসম্পর্কে রমানাথের এক পিসি হন তিনিই সেখানে ছিলেন, রমানাথকে দেখিয়া তিনি একা বধূ আনিতে ছুটিলেন।

পিতামাতার স্নেহ-হীনতার কথা তখন রমানাথের মনে জাগিতেছিল, তাহাতে মনে একটা জ্বালা অনুভব করিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, একটা কুরূপা বালিকার অভ্যর্থনায় এত লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল, আজ তাহার এই সুন্দরী পত্নীকে আহ্বান করিতে বিশ্বসংসারে কি একটা জনপ্রাণীও নাই। রমানাথের হৃদয়ে একটা আকুলতার ঝড় বহিয়া উঠিল।

পিসিমা কোলে করিয়া নববধূকে আনিলেন, রমানাথ তখনও অন্যমনস্কে ভাবিতেছিল, পিসিমার কণ্ঠস্বরে চমক্ ভাঙ্গিল।

নববধূকে বরণ করিবার জন্য এক পিসিমা ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রাণী ছিল না। পিসিমা একাই বরণ শেষ করিলেন, বধূ দেখিবার জন্য ঘোমটা উন্মোচন করিলেন। বধূর মুখের দিকে নেত্রপাত করিয়া পিসিমার গাত্র শিহরিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"এ কি বউ আন্‌লি রমা!"

রমানাথ তখন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। নবপরিণীতা ভার্য্যার রূপমাধুরী যেন সহস্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আত্মহারা হইয়া সেই রূপসুধা পান করিতেছিল। হঠাৎ পিসিমার শিহরিত কণ্ঠস্বর তাহার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিল। রমানাথ স্ত্রীর আবরণ-মুক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পিসিমা সেই মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন,—"নিরু যে আমার সোনার চাঁদ ছিল।"

রমানাথ ভাল করিয়া চোখ মুছিল। বার বার চোখ মুছিল; মনে করিল, এ স্বপ্ন না প্রহেলিকা, কোথায় তার পত্নী? এ কোন্ রাক্ষসী! শতবার সহস্রবার চোখ মুছিয়া ভাল করিয়া দেখিয়াও নবনীতা স্ত্রীর মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যের এক অণুও খুঁজিয়া পাইল না। রমানাথ সে মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না। তাহার মাথায়

আর একবার ভাল করিয়া স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল, বুঝিল সে যে কন্যাকে দেখিয়াছিল এ সে নয়। পূর্ব্বরাত্রের শুভদর্শনের কথাটা মনে জাগিয়া উঠিল। এখন সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল কাল রাত্রে বধূর সমস্ত মুখটা কেন ময়ূরভূষণ দ্বারা আবৃত করা ছিল।

রমানাথের হৃদয়ের মধ্যে শ্মশানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পিসিমার সেই বাক্য—"নিরু আমার সোণার চাঁদ!" বায়ুতরঙ্গে আলোড়িত হইতেছিল। সেই বাক্য বজ্রশব্দের মত রমানাথের হৃদয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইল—নিরু আমার সোণার চাঁদ!

রমানাথ চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল, উন্মাদের মত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। নিরুপমার হৃদয়ে সে যে দারুণ শেল দিয়াছিল এ যেন তাহারই প্রতিশোধ বলিয়া মনে হইল; চোখের সম্মুখে যেন দেখিল, নিরুপমা তাহার ব্যাকুলতায় কঠোর বিদ্রূপ হাস্য করিতেছে "ক্ষমা কর" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রমানাথ দৌড়িল, একেবারে নিরুপমার বাটীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। তখন সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য।

আকুল ক্রন্দন স্বরে বিশ্বম্ভরের বাটী তখন কম্পিত হইতেছিল। সে তাহা লক্ষ্য করিল না। একেবারে বাটীর ভিতর দৌড়িল; উন্মাদের মত আকুলকণ্ঠে "নিরু নিরু" বলিয়া এঘর ওঘর ছুটিয়া নিরুর অন্বেষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু কোথায় নিরু? নিরুর দেহ তখন চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত—পবন সে ধূলা উড়াইতেছে।

ফিরিঙ্গি বণিকের অত্যাচার।

বাহুবলে বাণিজ্য বিস্তারের কাহিনী ইতিহাসে পুরাতন নহে; কিন্তু ফিরিঙ্গি বণিক শক্তিমন্ত্রে যত শীঘ্র ভারতে বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়াছিল, যত শীঘ্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পাশ্চাত্য জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা সহজে মিলে না। আবিষ্কারের সম্মোহন যুগে পর্ত্তুগাল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নৃপতির আশীর্ব্বাদ ও উন্মত্ত আকাঙ্খা বহিয়া চঞ্চল চরণে চতুর্দ্দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। মুসলমান বাণিজ্য-জগৎ কেন, ভূমধ্যসাগরের বৈদেশিক বণিককুল পর্য্যন্ত একদিন বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, লোহিত সাগরের পথ অবরুদ্ধ করিয়া মহাশক্তিশালী ফিরিঙ্গি বণিক ভীষণ অগ্নি-পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে—সে পর্ব্বতের নিকট দিয়া প্রতীচ্যের সুবর্ণ-পথে অগ্রসর হওয়া আর অসম্ভব!

সেকালে ভারতের পণ্যসম্ভার বহিয়া মুরগণ ক্যাম্বে, অরমাজ, এডেন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাণিজ্য করিত। অরমাজ হইতে ভারতের পণ্য বোঝাই করিয়া বৈদেশিকগণ পারস্য উপসাগরের পথে বসোরা নগরে লইয়া যাইত। বসোরা তখন মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী। সেই সকল পণ্যসম্ভার বসোরা হইতে স্থলপথে আরমেনিয়া, ট্রেবিজণ্ড, তাতার, আলেপো, ডামস্কাস্ এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বেরুট-বন্দরে আনীত হইত। য়ুরোপীয় বণিক সম্প্রদায় তথায় জাহাজ লইয়া অপেক্ষা করিত; কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা ভারতের পণ্য আপন আপন দেশে লইয়া যাইত। যে সকল সামগ্রী এডেনে আনীত হইত, সে সমুদয় লোহিত-সাগরের পথে টোরো কিম্বা সুয়েজের নিকট দিয়া,

জান্দ্রিয়ায় আসিত। আলেক্‌জান্দ্রিয়া তখন একটী অতি বৃহৎ বন্দর। আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় তখন বৈদেশিক বণিকগণ ভারতের সুবর্ণ আহরণ করিবার জন্য মহোল্লাসে অপেক্ষা করিত; সুতরাং বেরুটের মত আলেকজান্দ্রিয়া হইতেও ভারতের পণ্যসম্ভার সুদূর য়ুরোপে নীত হইয়া উচ্চদরে বিক্রীত হইত।

কোন ফিরিঙ্গি বণিক তখন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে স্থায়ীরূপে বাস করিত না। যে যখন কার্য্যভার লইয়া, সৈন্যসামন্তসহ লুণ্ঠন ব্যপদেশে ভারতে আসিত সে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ করিয়াই দুই চারি বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। স্বদেশভক্ত ফিরিঙ্গি-সর্দ্দারদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাই পুনঃ পুনঃ পর্ত্তুগাল রাজসিংহাসনতলে আবেদন জানাইত,—ভারতবর্ষে একজন স্থায়ী প্রবাসী ফিরিঙ্গি নায়েব প্রয়োজন, নতুবা সকল শ্রম পণ্ড হইবে। রাজা ইমানুয়েল তখন মালাবার তীরে যাহাতে পর্ত্তুগালের শক্তি অক্ষয় হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠায় ভেনেসিয়গণ সত্বরই বুঝিতে পারিল যে, প্রতিদিন তাহাদিগের বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইতেছে—বহুদিন পূর্ব্বে তাহারা যে আশঙ্কা করিয়াছিল এখন তাহা সত্যই ঘটিতে যাইতেছে। তাহারা আর নীরব থাকিতে পারিল না; কাইরো রাজসিংহাসনও তখন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। ফিরিঙ্গির আধিপত্য ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে দেখিয়া সুলতান অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, কারণ ভারতের অর্থেই তখন মিসরের সমৃদ্ধি। ফিরিঙ্গি বণিক অকস্মাৎ সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া ভীষণ দৈত্যের ন্যায় সেই সমৃদ্ধি গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সুলতানের সিংহাসন যে নিতান্ত বিচলিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি। সুলতান তাই আপন্নিবারণ-মানসে ঘোষণা করিলেন, ভারতের বাণিজ্যে তাঁহারই একমাত্র অধিকার। এ অধিকার এক দিনের নহে, ইহা চিরন্তন।

নিতান্ত অন্যায় করিয়া সেই চিরাগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পর্ত্তুগ্যাল যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে প্রতিশোধ লইবেন—মিসর, সিরিয়া এবং পেলেস্তাইনবাসী যীশুসেবকের শোণিতে ধরণী রঞ্জিত হইবে—সুলতান একজনকেও ক্ষমা করিবেন না! শুধু ইহাই নহে প্রতিহিংসার ভীষণ অনলে খ্রীষ্টরাজ্যের উপাসনা মন্দির ভস্মীভূত হইয়া যাইবে—জেরুজালেমের পুণ্যমন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া সুলতান মিসরের শক্তি, মিসরের ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন!

ভীষণ প্রতিশোধের কথা শুনিয়া ধর্ম্মাচার্য্য পোপ বিচলিত হইলেন। কিন্তু ইমানুয়েল অবিচলিত চিত্তে অসংশয়ে পোপের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন—নিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। তিনি আরও কহিলেন, পর্ত্তুগালের শক্তি পোপের অধিকার ও রাজ্য বিস্তারের জন্যই নিয়োজিত হইয়াছে—যীশুর মহিমা প্রচারের জন্যই পর্ত্তুগাল-বীরগণ স্বজন, স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক, অকুল বারিধি অতিক্রম করিয়া প্রতীচ্যে প্রাণান্তকারী অভিযানে নিযুক্ত হইয়াছেন—প্রতীচ্যে পর্ত্তুগালের প্রতিষ্ঠার আর অন্য কোন কারণ নাই; সুতরাং মুসলমানশক্তি বিলুপ্ত করিবার আয়োজন হইতে ইমানুয়েল কোন ক্রমেই নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না!

সুলতান বুঝিলেন, তাঁহার ভয়প্রদর্শনে কোন ফল হইল না। যুদ্ধায়োজনে ব্যাপৃত হইয়া ভেনেসিয়গণ রণতরী নির্ম্মাণ করিবার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করিলেন। মিসরে যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত কাষ্ঠ ছিল না দেখিয়া তাহারা ডালমেটিয়া কানন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে লাগিল। সুলতানের আদেশে বহু বৃদ্ধ দৃঢ় মহামহীরূহ-গুলি কর্ত্তিত হইয়া ডালমেটিয়ার ঘনবনশ্রেণী সুপরিস্কৃত হইয়া উঠিল। সুনিপুণ সূত্রধরগণ আসিয়া সুয়েজ-বন্দরে অস্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিল, কারণ কর্ত্তিত বৃক্ষগুলি জলে ভাসাইয়া সুয়েজ-বন্দরে আনীত

হইতেছিল। অবশেষে সুদক্ষ কারিকরগণ তথায় অতি বৃহৎ দ্বাদশখানি রণতরী নির্ম্মাণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

নরপতি ইমান্নুয়েলও সুলতান-সমরে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, তাঁহার অসীম উৎসাহ এবং কর্ম্ম-কুশলতা, মুসলমান বাণিজ্য চিরবিলুপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইমানুয়েল দেখিলেন এডেন, অরমাজ এবং মালাক্কা আয়ত্ত করিতে না পারিলে মুসলমান বাণিজ্যের খরস্রোত রুদ্ধ করিবার আর অন্য উপায় নাই। কালবিলম্ব না করিয়া ডম ফ্রান্সিসকো ডা আলমিডা নামক জনৈক ফিরিঙ্গি, পর্ত্তুগাল সিংহাসনের প্রতিনিধিস্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরিত হইলেন। অঞ্জদ্বীপ, কানানোর, কোচিন এবং কুইলনে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মানের জন্য আদিষ্ট হইয়া আলমিডা পঞ্চবিংশ অর্ণবযান এবং ১৫০০ শত সৈন্য সমভিব্যাহারে লিসবন নগর পরিত্যাগ করিলেন।

আলমিডাই ভারতের সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টান রাজপ্রতিনিধি। ভারতে পর্ত্তুগালের শক্তি সংস্থাপনের জন্য তিনিই স্থায়ীরূপে ভারতবর্ষে থাকিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আলমিডা কুইলোয়া দ্বীপে একটী সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, মোম্বাসার উপকূলে তদ্দেশ-বাসীদিগের বাণিজ্য তরণীগুলি বিদগ্ধ করিয়া আলমিডা মোম্বাসা আয়ত্ত করিলেন। হর্ম্ম্যাদিশোভিত সুন্দর নগর অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া আলমিডার প্রতাপ বিজ্ঞাপন করিতে লাগিল—ফিরিঙ্গির আক্রমণে রাজপ্রাসাদ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। ভারত মহাসাগরে প্রহরী কার্য্যের জন্য কতকগুলি ফিরিঙ্গি নিযুক্ত করিয়া, আলমিডা ফিরিঙ্গির বাণিজ্যকেন্দ্র সুরক্ষিত করিলেন এবং মালাবার তীরে ইসলামের বাণিজ্য ধ্বংশ ও ভারত মহাসাগরে ইসলামশক্তির চিরবিসর্জ্জনের জন্য অকুতো-ভয়ে অগ্রসর হইলেন।

পড়িতে না পড়িতেই গ্রাম জনপদসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তীরস্থ বাণিজ্য তরণীগুলির অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হইল। অনরের ধ্বংশসাধন করিয়া আলমিডা কানানোরে উপস্থিত হইলেন; তথায় অবিলম্বে একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইল। বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ রাও তখন দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা; তিনি পর্ত্তুগালের প্রতিনিধি আলমিডার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইলেন এবং নরপতি ইমানুয়েলের পুত্রের সহিত আপন দুহিতার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ফিরিঙ্গিদিগকে তুষ্ট করিলেন।

ফিরিঙ্গিগণ ক্রমে ক্রমে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করিতেছে দেখিয়া কালিকাটের জামোরিণ সুলতানের সহিত সম্মিলিত হইলেন, সঙ্গোপনে সমরায়োজন চলিতে লাগিল। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? জনৈক প্রবাসী ইংরাজ, মুসলমান ফকিরের ছদ্মবেশে জামোরিণের রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সমরের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিল—জামোরিণের কপাল পুড়িল! অবশেষে ফিরিঙ্গি বণিকের প্রবল শক্তি জামোরিণের প্রাণপণ উদ্যমকে ব্যর্থ করিয়া দিল! ফিরিঙ্গির প্রতাপ তিন সহস্র মুসলমানের শোণিতে সাগর সলিল রঞ্জিত করিয়া বিজয় গৌরবে গর্জ্জিতে লাগিল! মালাবারে মুসলমান বাণিজ্য অচিরে বিলুপ্ত হইয়া গেল—ক্রুশ, কোরাণকে পরাজিত করিয়া অবশেষে চারি বৎসরের মধ্যে শোণিতশিক্ত ভূমিতলে আত্ম-সংস্থাপন করিল।

মূরবণিকগণ, আলমিডার আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আশায়, সাহসে বুক বাঁধিয়া মালাবার তীরে বাণিজ্য করিতেছিল; পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া তাহারা হয়ত তখন পর্য্যন্তও মনে করিয়াছিল ফিরিঙ্গি দস্যু যেমন মধ্যে মধ্যে লুণ্ঠনব্যপদেশে এ দেশে আসে, মধ্যে মধ্যে তেমনি আসিবে, সুতরাং দস্যুর ভয়ে চিররত্নের আকর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

চলিবে। কিন্তু এখন তাহারা বুঝিল, ফিরিঙ্গি কেবল লুণ্ঠন করিতে চাহে না, ফিরিঙ্গি মুসলমানদিগকে উৎখাত করিতে চাহে—ফিরিঙ্গির বজ্র ক্ষণিকের নহে, উহা বিধাতার অভিশাপের মত এখন হইতে চিরদিন তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে—সে অভিশাপ-অনল হইতে মুসলমান বণিকের আর নিস্তার নাই! এখন তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল মালাবার তীর তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিপজ্জনক—মালাবারে আর অবাধ মুসলমান বাণিজ্য বিস্তারের আশা ভরসা নাই; বরং মালাবার তীরের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলে ফিরিঙ্গির হস্তে লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত, বিদগ্ধ হইতে হইবে। তাই তাহারা ভারতোপকুলের বহুদূর দিয়া সুমাত্রা এবং মালাক্কায় গমনাগমন করিতে লাগিল। রাজপ্রতিনিধি আলমিডার সমুদ্র-প্রহরীগণ এই সংবাদ জানিবামাত্র রণতরী লইয়া মুরদিগকে ধ্বংশ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

কমলা যখন শুভদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তখন মহা বিপদের মূলে, মহা সর্ব্বনাশের মধ্যেও সৌভাগ্য নিহিত থাকে। ফিরিঙ্গিগণ যখন মুরদিগের সুমাত্রা ও মালাক্কার বাণিজ্যপথ পর্য্যন্ত চিররুদ্ধ করিবার মানসে অগ্রসর হইল, তখন অকস্মাৎ একটী বিষম ঝড় তাহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া বিপথে লইয়া গেল। তুফানে, তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরিঙ্গির তরণীসমূহ একদিন সুপ্রভাতে এক অনাবিষ্কৃত নবীন তীরে আসিয়া লাগিল। ফিরিঙ্গিরা বিস্মিত হইয়া দেখিল, সেখানেও মুরবণিকের অভাব নাই।

সুদূর সিংহল পর্য্যন্ত ফিরিঙ্গিদস্যুর অভ্যুত্থান দেখিয়া ভীত মুরগণ কেহ বা পলায়ন করিল, কেহ বা নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকনে তাহাদিগকে প্রীত করিয়া জীবন রক্ষা করিল। সিংহলাধিপতি কাল-বিলম্ব না করিয়া ফিরিঙ্গির সহিত সখ্যতা করিলেন। এই অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব আকস্মিক আবিষ্কারে উল্লসিত হইয়া আলমিডা-তনয় ডন

লরেঙ্কো কলোম্বো নগরে ক্রুশ স্থাপনপূর্ব্বক কোচিনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে কুলইকাম নরপতির বীরঞ্জম্ নগর বিদগ্ধ করিয়া লরেঙ্কো ফিরিঙ্গি শোণিতপাতের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন।

জামোরিণ প্রতিদিন হতবল হইতেছিলেন। তাঁহার যে অপ্রমেয় শক্তি একদিন দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য শাসন করিত, তাহা এখন প্রতিনিয়ত শিথিল ও হীনবীর্য্য হইতেছে দেখিয়া তিনি ডিউ নগরের অধিপতি মালিকআজকে ফিরিঙ্গিনিধনে নিমন্ত্রণ করিলেন। ফিরিঙ্গির সহিত শক্তিপরীক্ষায় বিজয়লাভ দুরাশা জ্ঞান করিয়া মালিকআজ জামোরিণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। এদিকে আল্‌মিডার কর্ণকুহরে সেই গুপ্ত আমন্ত্রণবার্ত্তা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ডন লরেঙ্কো অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। গন্‌কালো ভাজ্ নামক জনৈক ফিরিঙ্গি সেনাপতি রাজপ্রতিনিধি-তনয়ের সাহায্যার্থ কানানোর হইতে অগ্রসর হইল।

আল্‌মিডার কর্ম্মকুশলতায়, সেই সময়ে কোচিন এবং কানানোর প্রবাসী ফিরিঙ্গি সর্দ্দারদিগের কোনও একজনের স্বাক্ষরিত অনুমতি পত্র ভিন্ন এতদ্দেশবাসী কোন বণিক, জাহাজ লইয়া গমনাগমন করিতে পারিত না। কানানোর হইতে যাত্রা করিয়া গন্‌কালো দেখিলেন অদূরে সমুদ্রমধ্যে একখানি মুরবাণিজ্যতরণী পণ্য লইয়া চলিয়াছে। গন্‌কালো তাহার গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ করিলেন। ভীত নাবিকগণ সসম্ভ্রমে দেখাইল, তাহারা বিনা অনুমতি-পত্রে যাইতেছে না, লরেঙ্কো ডা ব্রিটা নামক ফিরিঙ্গি সর্দ্দারের স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র তাহাদিগের সহিত আছে। গন্‌কালো সেই অনুমতিপত্র দেখিলেন, দেখিয়া মনে করিলেন, ইহা নিশ্চয়ই জাল—কখনই সত্য নহে! মুহূর্ত্ত মধ্যে মুরবণিকগণ বন্দীকৃত হইল। তিনি বন্দীকৃত নির্দ্দোষী মুরবণিকদিগকে অবিলম্বে জাহাজের পাল দিয়া জড়াইয়া উত্তমরূপে সেলাই করিলেন—যেন কোন প্রকারে কেহ পলাইয়া না যায়! তারপর, চলোর্ম্মিময় সাগরের অনন্ত গর্ভে হতভাগ্যদিগকে নিক্ষেপ

করিয়া আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন !! এ অত্যাচারে ফিরিঙ্গির দেবতাও বোধ হয় গল্‌কালোরদিকে চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

অন্ধ, অবিশ্বাসী এতদ্দেশবাসীদিগের শোণিতপাতে, তাহাদিগের নির্য্যাতনে ফিরিঙ্গিগণ কোন দোষ দেখিতে পাইত না! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সেনাপতি ক্যাব্‌রেল যখন ১২০০ শত সৈন্য লইয়া ভারতযাত্রা করেন, তখন ইমানুয়েল তাঁহার সহিত ধর্ম্মযাজক প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হন নাই; ফিরিঙ্গির ভারতাভিযান তখন জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধরূপে পরিচিত হইয়াছিল! পর্ত্তুগালাধীপ, ক্যাব্‌রেলকে বলিয়া দিয়াছিলেন—'মুসলমান এবং পৌত্তলিকদিগকে সত্য সত্য অসিহস্তে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, পুরোহিতদিগকে বলিও, তাঁহারা যেন আধ্যাত্মিক তরবারির প্রয়োগে অবিশ্বাসীদিগকে ধর্ম্মের পথে আনিবার চেষ্টা করেন। যদি ধর্ম্মহীনগণ তাহাতে যীশুর সেবক হইতে না চাহে, যদি বাণিজ্যের পথ রোধ করিতে চাহে, তাহা হইলে নিঃসঙ্কোচে অনল ও কৃপাণের সাহায্য গ্রহণ করিও—ধর্ম্মহীনদিগের সহিত কালসমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে নিহত করিও।'

এখন পর্য্যন্তও সুসভ্য সুমার্জ্জিত য়ুরোপখণ্ডে "ধর্ম্মের একতায় অধিকারের সমতা" এই মন্ত্র সঞ্জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়; তাই ক্রুশের যাহা অধিকারভুক্ত, ক্রুশের বাহিরে যাহারা বাস করে তাহারা তাহার ছায়া পর্য্যন্তও স্পর্শ করিতে পায় না। তাই ক্রুশে আস্থাশূন্য অন্ধদিগের সহিত "ধর্ম্মযুদ্ধে" প্রবৃত্ত হইয়া ফিরিঙ্গিগণ নিষ্ঠুরতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল! সংখ্যায় ফিরিঙ্গিগণ কম ছিল বলিয়া আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুবিধার জন্য তাহারা ফিরিঙ্গিদ্রোহীদিগকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিতে ক্রটী করিত না।

ভাস্কো-ডা-গামার ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার পদার্পণের পর হইতেই ভারতবাসীর প্রতি অত্যাচার, ফিরিঙ্গির শাসন ও রাজ্যবিস্তার নীতির অবশ্য প্রতিপাল্য অংশস্বরূপ হইয়াছিল। তাই সেকালের ফিরিঙ্গিগণ দস্যুর মত, পিশাচের মত ঘোরতর অত্যাচার করিয়া ইতিহাসে রাক্ষস-

তুল্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল; তাই যুদ্ধান্তে বন্দীকৃত শত্রুদিগকে নিতান্ত নিষ্ঠুররূপে নিষ্পিষ্ট করিয়া অবশেষে হত্যা করিতে, শত্রুদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামানের মুখে বন্দীদিগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিয়া শত্রুর সংবর্দ্ধনা করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হইত না—তাহাদিগের পাষাণ কঠিন হৃদয়ে কোন আঘাত লাগিত না।

ফিরিঙ্গি সৈনিকগণ তাই লুণ্ঠনব্যাপৃত হইয়া, সময় সংক্ষেপ করিবার মানসে ভীতা, কম্পিতা, রোরুদ্যমানা স্খলিতবেশা আলুলায়িতকেশা প্রাণভয়ে পলায়নপরা রমণীদিগের বাহুযুগল, নাসা, কর্ণ প্রভৃতি নির্ম্মম হৃদয়ে ছেদন করিয়া কাঞ্চনবলয় অথবা স্বর্ণ কর্ণাভরণ অকুণ্ঠিত চিত্তে অপহরণ করিত। একজনের নিকট হইতে চাহিয়া লইতে অথবা একজনের অঙ্গ হইতে টানিয়া খুলিয়া লইতে যে সময় আবশ্যক, কৃপাণের সাহায্যে লইলে সেই সময়মধ্যে যে পাঁচজনের অলঙ্কার সংগৃহীত হয়!

যে ভারতের ধনরত্নলোভে সাত সমুদ্র তের নদী অতিক্রম করিয়া ফিরিঙ্গিগণ এদেশে আসিয়া প্রথমে রাজদ্বারে ও সাধারণ্যে সম্মানিত হইয়াছিলেন, সেই দেশবাসীদিগের পরিচয় প্রদান কালে সেকালের ফিরিঙ্গি সর্দ্দারগণ পর্ত্তুগাল সিংহাসনতলে লিখিয়াছিলেন—'ইহারা কুক্কুর বিশেষ!! ইহাদিগের জন্য শাণিত কৃপাণ ব্যবস্থা!!'

ইতিহাস অতীতের জীবন্ত সাক্ষী। সেই ইতিহাস কম্পিত কণ্ঠে কম্পিতহৃদয়ে ফিরিঙ্গির পাশবিক অত্যাচার কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। এখন পর্য্যন্তও ডিউ উপনিবেশের সন্নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপ মিটি "শবদ্বীপ" নামে সুপরিচিত হইয়া ফিরিঙ্গির অত্যাচার কাহিনীর প্রমাণ দিতেছে। মিটি কি চিরদিনই শবের দ্বীপই ছিল? তাহা নহে; ১৫৩৫ সালে যখন ফিরিঙ্গিবণিক মিটিদ্বীপ অধিকার করিল তখনও সেখানে গৃহে গৃহে বালক-যুবক-রমণীর হাস্য-কোলাহল সুখসম্পদের চিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান ছিল। বিজয়ী দস্যুগণ তথাকার সমুদয় অধিবাসীবৃন্দকে নিহত করিয়া তপ্ত শোণিত-সিক্ত ভূমিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাসে মহাগৌরবে মিটিদ্বীপের নামকরণ করিয়াছিল—"শবদ্বীপ"!!

ডিউ উপনিবেশের দুর্দ্দশার কথা মনে করিলে আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আজিও মনে হয়, ফিরিঙ্গির রক্তরঞ্জিত উদ্যত কৃপাণ দেখিয়া কত ক্ষুদ্র শিশু প্রাণভয়ে রোদন করিতে করিতে তাহারই চরণতলে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু নির্দ্দয় ফিরিঙ্গি, শিশুর শোণিতে নিজ পাদমূল রঞ্জিত করিয়া পরক্ষণেই হয়ত তাহার জননীর হৃদয়ে সেই শাণিত কৃপাণই আমূল বসাইয়া দিয়াছিল! ডিউ উপনিবেশ অবরোধের সরকারী কাগজপত্রেই প্রকাশ—"আমরা কাহাকেও ছাড়ি নাই, এমন কি রমণী ও শিশু সকলকেই বধ করিয়াছি"।

এত শোণিতের উপর যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে সে সিংহাসন একদিন নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কৃপাণাঘাতে ছিন্নকণ্ঠ হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে হতভাগ্যেরা যখন ভগবানের দিকে শেষবার চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করে, তখন তাঁহার রাজসিংহাসনও টলিয়া উঠে। তাঁহার অভিসম্পাত তখন আর নিদ্রিত থাকিতে পারে না—বৃশ্চিক দংশনে সহসা জাগ্রত হইয়া দুস্কৃতির পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার অদৃষ্টস্বরূপ বিনিদ্র নয়নে ফিরিতে থাকে—তাহাকে দগ্ধ না করিয়া সে অভিশাপ শিখা আর ফিরে না। ভারতের ফিরিঙ্গি-প্রতিষ্ঠাও তাই অধিক দিন টেঁকে নাই। ফিরিঙ্গি সুধু যে প্রতিহিংসাসাধনের নিমিত্ত অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা নহে; ফিরিঙ্গির অত্যাচার প্রতিহিংসামূলক নহে, উহা অত্যাচারের জন্য অত্যাচার—হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই হত্যা—শোণিতের লোভেই শোণিতপাত! ঐতিহাসিক হণ্টার তাই বলিয়াছেনঃ—

"The Portuguese cruelties were deliberate, rather than vindictive."

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

অনন্ত জীবন।

(২)

আমরা দেখিয়াছি যে, জীবদেহের এককৌষিক (Unicellular) অবস্থায় মৃত্যু জীবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। পরে, জীবদেহ বহুকৌষিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিভিন্ন কোষসমূহের শক্তিসামঞ্জস্য রক্ষা হইল না। তখন বংশ-রক্ষণ কার্য্যেও অত্যন্ত অধিক শক্তি ব্যয়িত হইতে আরম্ভ হইল। এই অবসরে মৃত্যু জীব রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিল।

কিন্তু জীব-কোষের স্বভাব অবগত না হইলে মৃত্যুর স্বরূপ বুঝা যাইবে না। জীব কোষ যে জীব-বস্তুতে (protoplasm) পূর্ণ থাকে, উহা অতীব ক্ষণস্থায়ী; অম্লযান, উদযান, অঙ্গার, যবক্ষারযান প্রভৃতি দ্বারা গঠিত। এই সকল উপাদানের রাসায়নিক সংযোগে জীব-বস্তুর উৎপত্তি। কিন্তু ঐ সংযোগ সর্ব্বদাই বিশ্লিষ্ট হইতেছে।*

জীব-বস্তু (Protoplasm) এইরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া তদীয় উপাদান পদার্থে পরিণত হয়। পরে, জীবকোষ বাহ্য জগৎ হইতে যে সকল আহার্য্য বস্তু নিজ অভ্যন্তরে গ্রহণ করে, তাহাই উক্ত বিশ্লিষ্ট বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় জীব-বস্তু গঠন করে। স্বভাব শক্তিতেই জীব-বস্তু বিশ্লিষ্ট হইয়াছিল, আহার্য্য দ্বারা তাহা পুনর্গঠিত হইল। যদ্যপি এইরূপে পুনর্গঠিত না হইত তাহা হইলে জীব-বস্তু আর জৈব-ভাবে থাকিতে পারিত না। জীবোৎপত্তিও অসম্ভব হইত।

---

* Living matter is extremely unstable, and this is no doubt largely due to the nitrogen invariably present in considerable quantities.

Davis Text book of Biology.

এক্ষণে স্মরণ করিতে হইবে যে, এককৌষিক জীবের কোষও যে প্রকার, বহুকৌষিক জীবের দেহস্থ প্রত্যেক কোষও প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকারই। কিন্তু উভয়ের কার্য্যপ্রণালীর পার্থক্য এই যে, এককৌষিক জীবদেহের একটী কোষ ঐ জীবের আবশ্যকীয় সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন করে; আর বহুকৌষিক জীবগণের কোষ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমে যে সকল শারীর যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করে, তাহারা সকলে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করে না; উহাদিগের মধ্যে কার্য্য বিভাগ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নিষ্পন্ন করে। ইহার ফলে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের এবং কোষের শক্তি সমভাবে ব্যয়িত ও পুষ্ট হয় না। অর্থাৎ বহুকৌষিক জীবের কোষসমূহে শক্তি সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। এক যন্ত্রের ক্লান্তি বা বিকৃতি বশতঃ সমষ্টি ক্রিয়ার বা জীবন ব্যাপারের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। কারণ, বিভিন্ন কোষের ব্যষ্টি-শক্তি সমবেত হইয়া এক সমষ্টি-শক্তিতে পরিণত হয়; সুতরাং ব্যষ্টি-শক্তির কোন অংশের বিকৃতিতে সমষ্টি কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। এইরূপে উহাদিগের দেহে পীড়ার আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে সমষ্টি শক্তির অর্থাৎ জীবন-ব্যাপারের বিঘ্ন হইতে থাকে; তখন জীব-বস্তু যে পরিমাণে বিশ্লিষ্ট হয়, আর সেই পরিমাণে গঠিত হইতে পারে না। এই জন্য মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন বিশ্লেষণ-শক্তি গঠন শক্তির অপেক্ষা ন্যূন থাকে, ততদিন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি; যখন ঐ দুই শক্তি সমভাবে থাকে তখন দেহের সাম্যাবস্থা; কিন্তু যে সময় বিশ্লেষণ-শক্তি গঠন-শক্তি অপেক্ষা প্রবল হয় তখনই মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়।

এককৌষিক দেহ, কোষের বিভাগ দ্বারাই বহুকৌষিকে পরিণত হয়। আবার কোষস্থ জীব-বস্তু বিভাগ ও পুনর্গঠন দ্বারাই জীবন-ব্যাপার সম্পন্ন করে। এই বিভাগ-কার্য্য পুনঃ পুনঃ সাধিত হওয়ায় যে ক্লান্তি উপস্থিত হয় তাহা আর কালক্রমে (বহুকৌষিক জীবদেহে)

আহার গ্রহণ দ্বারা সম্যক্ পূরণ হয় না। জীব-দেহে মৃত্যু আসিবার ইহাই প্রথম কারণ।

কিন্তু পুনর্গঠন কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবার আরও অনেক কারণ আছে। যেমন, বাহ্য জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটসমূহ (bacilli)। ইহারা নানারূপে অপর জীব দেহের গঠনকার্য্যের বিঘ্ন এবং বিশ্লেষণ কার্য্যের সাহায্য করে। তজ্জন্য অসংখ্য পীড়া জীবদেহে সমুদ্ভূত হয়। ইহাদিগের কার্য্যপ্রণালী চিকিৎসা-শাস্ত্রের অন্তর্গত, সুতরাং এস্থলে বিবেচ্য নহে। ফলতঃ জীব-বস্তু স্বভাববশে বিশ্লিষ্ট হইলে উহার পুনর্গঠন কার্য্যে যে কোন হেতুতেই বিঘ্ন উপস্থিত হউক, তাহাতেই মৃত্যুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সন্দেহ নাই। এই সকল হেতুমধ্যে একটী জীবতত্ত্বের বিশেষরূপে আলোচ্য। তাহা কতকটা এইরূপ :— বহুকোষিক জীবগণের শারীর যন্ত্রসকল যখন বিভিন্নরূপে গঠিত হইল এবং উহাদিগের কার্য্যও বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন উহাদিগের সকলের আয়তন এবং ক্রিয়া সম-অনুপাতে হইল না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই অবস্থায় উহাদিগের শক্তিসামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই বলিলেই নির্দ্দোষ হইত যে, বহুকোষিক জীবগণের দেহস্থ যন্ত্রাদি সম-অনুপাতে বর্দ্ধিত হয় না এবং উহাদিগের ক্রিয়াও সম-অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হয় না। যদিও ইহাদিগের শারীর যন্ত্র সকলের পৃথক পৃথক শক্তিতেই সমষ্টি জীবনী-শক্তি কার্য্য পর্য্যালোচনা করে, তথাপি ঐ সকল বিভিন্ন যন্ত্রের আয়তন ও কার্য্যের মধ্যে অল্পাধিক অসমতা শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে কোন কোন যন্ত্র সমষ্টি-জীবনের অধিক প্রয়োজনীয়, আর কোন কোন যন্ত্র অল্প প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। এই ভাবে কালক্রমে কোন কোন যন্ত্র জীবন-ব্যাপারের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অন্যান্য যন্ত্র একরূপ অনাবশ্যকীয় হয়। শেষোক্তগুলি যদিও জীবন-কার্য্যের সাহায্য করে,

তথাপি উহারা অনেক সময় স্বয়ং বিকৃত হইয়া সমষ্টি-শক্তিকে (জীবনকে) উৎপীড়িত করিয়া তুলে। ইহারা মিত্ররূপী শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এইরূপ হইবার প্রধান কারণই হইতেছে, শারীর যন্ত্র সকলের অসম-অনুপাতে বৃদ্ধি এবং অসম-অনুপাতে ক্রিয়া-বিকাশ। এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি; হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তস্রোত নির্গত হইয়া শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়া গতায়াত করে। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, হৃৎপিণ্ডের আয়তন ও শিরা ধমনীর আয়তনের তারতম্য অনুসারে রক্তের পরিমাণের ও বেগের ন্যূনাধিক্য হইবে। শৈশবে যে আয়তনের হৃৎপিণ্ড হইতে যে আয়তনের শিরা ধমনীর মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয়, যৌবনের শেষ ভাগে হৃৎপিণ্ড, শীরা ধমনীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আয়তন হওয়ায়, এবং শীরা ধমনীর প্রণালী সেই অনুপাতে বর্দ্ধিত না হওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায় রক্তসঞ্চালন হইতে পারে না। রক্তের পরিমাণ ও বেগ উভয়ই অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হয়; অর্থাৎ এতদুভয়ই মন্দীভূত হয়। তজ্জন্য এই সময় হইতে দেহের বৃদ্ধি স্থগিত হয়, এবং জরা ও অবশেষে মৃত্যু প্রবেশ লাভ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়।*

বস্তুতঃ নানা কারণে বহুকোষিক জীবদেহে কোষসকলের মধ্যে শক্তি-সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। উহাদিগের ক্রিয়াবস্থা সম-অনুপাত রক্ষা হয় নাই। একের দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা অন্যকে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং, জীব-বস্তুর স্বাভাবিক বিশ্লেষণ-ক্রিয়ার পর গঠনকার্য্য পূর্ব্ববৎ সম্পাদিত হইতেছে না। ইহার ফলে মৃত্যু অনিবার্য্য। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, এককোষিক জীবের বংশ-রক্ষক কোষ ভিন্ন

---

* ১৯০৩ সালের নেচার (Nature) নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতুহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

স্বতন্ত্র দেহ নাই; সুতরাং মৃত্যুও নাই। আর বহুকৌষিক জীবগণের পৃথক দেহ থাকায় মৃত্যু তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে। দেহ মরে, যদিও মরিবার পূর্ব্বে অংশবিশেষকে পৃথকভাবে রাখিয়া গিয়া দেহ স্বীয় অমরত্ব রক্ষা করে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দেহের তিরোভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, আর উহা দেহজ কারণসম্ভূত; অর্থাৎ দেহরক্ষক কোষের স্বভাবধর্ম্মবশতঃ। সুতরাং যতদিন দেহ আছে ততদিন মৃত্যুও অনিবার্য্য।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে দেহকে (অন্ততঃ স্থূল দেহকে) চিরস্থায়ী বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। এই দেহের নাশ যেন সুদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং মৃত্যুরও নাশ অবশ্যই হইবে। জীবদেহের এক কৌষিক অবস্থায় মৃত্যু ছিলনা, বহুকৌষিক অবস্থায় মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আবার দেহের নাশ সহ মৃত্যুও পলায়ন করিবে।

কথাটা অন্যভাবে দেখা যাউক। জীবন ব্যাপার, দেহরক্ষক কোষের ও বংশরক্ষক কোষের ক্রিয়াসকলের সমষ্টি ফল। যদি ক খ রেখা সমষ্টি জীবন হয়, তবে ক গ দেহ-

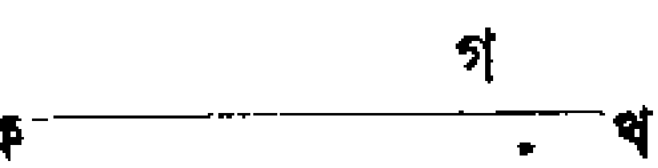

রক্ষক ক্রিয়া, এবং গ খ বংশরক্ষক ক্রিয়া। কগ + গখ = কখ। সুতরাং ইহা অনায়াসেই বুঝা যায় যে ক গ যত বড় হইবে, গ খ তত ছোট হইবে; আর ক গ যত ছোট হইবে, গ খ তত বড় হইবে। অর্থাৎ ক খ—এর সহিত গ খ—এর বিপরীত অনুপাত; একের হ্রাসই অপরের বৃদ্ধি এবং একের বৃদ্ধিতে অপরের হ্রাস।* তবেই ক গ অত্যন্ত বৃদ্ধি

* Geddes and Thomson—The Evolution of Sex p. 288. উল্লিখিত রেখাচিত্র উক্ত গ্রন্থকারদ্বয় অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তদ্দ্বারা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

প্রাপ্ত হইলে গ খ নিতান্ত ক্ষুদ্র হইবে। যখন ক গ অনন্ত, তখন গ খ নাই।* অর্থাৎ যখন দেহ এবং তাহার ক্রিয়া বিশ্বব্যাপ্ত, তখন জীবে ও ব্রহ্মে অপ্রভেদ। সুতরাং জন্ম, জরা, মৃত্যুও নাই। দেহ এবং দৈহিক ক্রিয়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি দেহীর প্রযত্নসাধ্য। আবার পক্ষান্তরে, খ গ—এর অনন্ত বৃদ্ধিতে গ ক নাই। অর্থাৎ বংশরক্ষক ক্রিয়ার অনন্ত বৃদ্ধিতে দেহও নাই। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম জীবগণের বংশবৃদ্ধি অত্যন্ত অধিক। যদি মানব দেহ (স্থূল দেহ) কালক্রমে তিরোহিত হয় তবে মানবও অনন্তে পরিণত, অনন্তে লীন হইবে। তখন মানবও ব্রহ্মের সহিত অপ্রভেদ হইবে। এই জন্যই বলিয়াছি, একদিকে যেমন দেহ অনন্ত, অন্যদিকে তেমনই জৈবশক্তি অথবা জীবাত্মাও অনন্ত। উভয়েরই শেষ পরিণাম অনন্তে।

শ্রীশশধর রায়।

---

* If genesis vary inversely as individuation, it must be suppressed altogether if individuation becomes complete.

The Evolution of Sex p. 298.

জীবন-সঙ্গীত।*

বলোনা কাতর স্বরে না করি বিচার,
জীবন স্বপন সম, মায়ার সংসার ;
সেই আত্মা মৃতপ্রায় ঘুমায়ে যে রয়—
ভাসা ভাসা দেখ যাহা বস্তুত তা নয়।

সংসার কর্ম্মের স্থান, সত্য এ জীবন,
শেষগতি নহে তার শমন সদন ;
শরীর পিঞ্জর বটে ধূলির সমান,
আত্মা কিন্তু অনশ্বর নহে তাহে আন।

হইয়ে আশার দাস ভ্রম বার বার,
বিষয় সম্ভোগ নহে জীবনের সার,
দিনে দিনে পদে পদে হয়ে অগ্রসর,
ধর্ম্ম পথে চলে যেই—ধন্য সেই নর !

চকিত তাড়িত সম জীবন চঞ্চল,
প্রস্তুত হইয়া থাক লইয়া সম্বল ;
ধুক্ ধুক্ করি করি চলেছে হৃদয়,
শমনের ডাকে যেন শমন-আলয়।

সংসারের রণক্ষেত্রে পূর্ণ কলকলে,
জীবনের ভীষণ তরঙ্গ কোলাহলে ;

---

* The Psalm of life.

হয়োনা মেষের সম নিঃসত্ত্ব পরাণ,
যুঝ রণে প্রাণপণে বীরের সমান।

ভবিষ্য সুখের আশে হয়োনা চঞ্চল,
গতানুশোচনা ছাড় নাহি তাহে ফল ;
বর্ত্তমান কার্য্যে সদা থাকহ তৎপর,
অন্তরে ভরসা রাখি উপরে ঈশ্বর।

মহত চরিত দেখি সদা হয় মনে,
মহত হইতে পারি আমরা যতনে ;
রেখে যেতে পারি ছাড়ি সংসার নিলয়,
কালের সাগর তটে পদচিহ্ন চয়—

যেই চিহ্ন ধরি কোন ভগ্নতরি জন,
দুস্তর ভবসাগরে করি সন্তরণ,
ভগণ হৃদয় অতি, বিগত ভরসা,
নূতন সাহস বল পায় সে সহসা।

উঠ তবে, লাগ কার্য্যে হইয়ে তৎপর,
হবার যা হোক্ তাহা নাহি তাহে ডর ;
প্রাণপণে সাধ যাহা জীবনের কর্ম্ম
শ্রম করি ধৈর্য্য ধরি—এই সার মর্ম্ম।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাম্রলিপ্তী।

(আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।)

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে তাম্রলিপ্তী নামে এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। অনন্ত নীল জলরাশি কল কল নিনাদে তরঙ্গ তুলিয়া সেই রাজ্যের কূলধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের সেই সমৃদ্ধিশালী রাজ্য এক্ষণে একটী ক্ষুদ্র উপনগরে পরিণত হইয়াছে এবং উহা এক্ষণে তমলুক নামে খ্যাত। আর সে সমুদ্র নাই, সেই উত্তাল তরঙ্গমালাও নাই, সেই কল কল নিনাদও নাই; তৎপরিবর্ত্তে ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বতী রূপনারায়ণ ইহার পদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে যে সমুদ্র তমলুকের কূলপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা এক্ষণে এই স্থান হইতে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। ক্রমে ক্রমে পলি পড়িয়া সমুদ্র বুজিয়া যাওয়াতে এইরূপ দূরে সমুদ্র পিছাইয়া গিয়াছে।

তমলুক পুরাকালে বহুনামে অভিহিত হইত, যথা—তমোলিপ্তী (১) তমোলিপ্ত (২), তাম্রলিপ্ত (৩), তাম্রলিপ্তী (৪), তামলিপ্তং তামলিপ্তী তমালিকা (৫), দামলিপ্তং তমালিনী (৬) আবার জে, ডবলিউ, ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেবের "Ancient India as described by Megasthenes and Arrian" নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে "—In the writings of the Buddhists of Ceylon, the name appears as Tamolitti, corresponding to Tamluk of the present day." (৭)

---

(১) ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ। (২) ইতি শব্দরত্নাবলীঃ। (৩) ইতি মহাভারতম্।
(৪) ইতি ভারতকোষঃ। (৫) ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। (৬) ইতি হেমচন্দ্রঃ।
(৭) Vide Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, edited by J. W. Mc.Crindle M.A., p. 138.

ইহাতে জানা যাইতেছে যে তমোলিতি নামেও বর্ত্তমান তমলুক অভিহিত হইত। কোন কোন চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার নাম তম্মোলিতি বলিয়াও লিখিত হইয়াছে (৮)।

তাম্রলিপ্তী, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামের অপভ্রংশে যে বর্ত্তমান তমলুক নাম হইয়াছে তাহার বহুল প্রমাণ আছে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে তমোলিপ্ত ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ আধুনিক তমলুক বলিয়া, (৯) পণ্ডিত-প্রবর সংস্কৃত-ভাষাবিৎ উইল্‌সন সাহেবের "Sanskrit and English Dictionary"তেও তমালিকা, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থ বর্ত্তমান তমলুক বা Modern Tumlook বলিয়া (১০); ও বাচস্পত্য নামক পুস্তকে তমালিকা, তমালিনী, ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১১)। এতদ্ভিন্ন মহাত্মা রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধানেও তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তাম্রলিপ্তী, তাম্রলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১২)।

আরও দেখা যায় যে, ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র এল্, এল্, ডি; সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে তাম্রলিপ্ত অথবা তমালিকা বর্ত্তমান তমলুক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরাণ হইতেও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আধুনিক তমলুক পুরাকালের সমৃদ্ধিশালী পুণ্যধাম

(৮) Vide S. Beal's Si-gu-ki, vol. ii., p. 200.

(৯) শব্দকল্পদ্রুমঃ, (পুনঃ প্রকাশিত) ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃঃ দেখ।

(১০) Vide Sanskrit and English Dictionary by H. H. Wilson, pp. 382, 383, 387 and 422.

(১১) বাচস্পত্য, ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃঃ দেখ।

(১২) সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, মহাত্মা রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৫৮, ৭৫৯ ও ৮১৫ পৃঃ দেখ।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে তমোলিতি নামেও বর্ত্তমান তমলুক অভিহিত হইত। কোন কোন চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে ইহার নাম তম্মোলিতি বলিয়াও লিখিত হইয়াছে (৮)।'

তাম্রলিপ্তী, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামের অপভ্রংশে যে বর্ত্তমান তমলুক নাম হইয়াছে তাহার বহুল প্রমাণ আছে। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে তমোলিপ্ত ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ আধুনিক তমলুক বলিয়া, (৯) পণ্ডিত-প্রবর সংস্কৃত-ভাষাবিৎ উইল্‌সন সাহেবের "Sanskrit and English Dictionary"তেও তমালিকা, তমোলিপ্তী, তামলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থ বর্ত্তমান তমলুক বা Modern Tumlook বলিয়া (১০); ও বাচস্পত্য নামক পুস্তকে তমালিকা, তমালিনী, ও তামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১১)। এতদ্ভিন্ন মহাত্মা রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধানেও তমালিকা, তমালিনী, তমোলিপ্তা, তামলিপ্ত, তামলিপ্তী, তাম্রলিপ্তী, তাম্রলিপ্ত ও দামলিপ্ত শব্দের অর্থ তমলুক বলিয়া লিখিত আছে (১২)।

আরও দেখা যায় যে, ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল্, এল্, ডি; সি, আই, ই, মহোদয়ের প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে তাম্রলিপ্ত অথবা তমালিকা বর্ত্তমান তমলুক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। পুরাণ হইতেও প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আধুনিক তমলুক পুরাকালের সমৃদ্ধিশালী পুণ্যধাম

(৮) Vide S. Beal's Si-gu-ki, vol. ii., p. 200.

(৯) শব্দকল্পদ্রুমঃ, (পুনঃ প্রকাশক) ১৪২৩ ও ১৪৪৯ পৃঃ দেখ।

(১০) Vide Sanskrit and English Dictionary by H. H. Wilson, pp. 382, 383, 387 and 422.

(১১) বাচস্পত্য, ৩২৪০ ও ৩২৭০ পৃঃ দেখ।

(১২) সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান, মহাত্মা রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৫৮, ৭৫৯ ও ৮১৫ পৃঃ দেখ।

মহানগরী তাম্রলিপ্তীর হীন পরিণতি;—ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে :—

"তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধনীতটে॥" (১৩)

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা নাম্নী দেবী বিরাজমানা ছিলেন। এখনও বর্গভীমা দেবী এখানে বিরাজিতা আছেন। তমলুক ভিন্ন অন্য কোন স্থানে বর্গভীমা নাম্নী দেবী নাই। সুতরাং বর্ত্তমান তমলুক যে প্রাচীন কালের তাম্রলিপ্তী নগরীর হীন পরিণতি এবং আধুনিক তমলুক নাম যে পুরাকালের দামলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী প্রভৃতি নামের অপভ্রংশে হইয়াছে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও উল্লেখ আছে যে, তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা নাম্নী দেবী বিরাজমানা। তাহাতে লিখিত আছে :—

"গোকুলে গোমতী নামা, তাম্রলিপ্তে বর্গভীমা,
উত্তরে বিদিত বিশ্বকায়া।" (১)

তাম্রলিপ্তী যে কত কালের নগরী তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। মহাভারত ও বহু-পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে বোধ হয় যে, ইহা বহুকালের প্রসিদ্ধ নগরী। এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া যায়। দিগ্বিজয়-প্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"জ্যোৎস্নাপতিতকিরণৈর্দ্রবীভূতো হি চারুণঃ
সমুদ্র প্রান্তভূমৌচ নিমগ্নশ্চাতি মোহিতঃ॥
অরুণাখ্যা সারথেশ্চ লেপনাৎ নৃপশেখর
তাম্রলিপ্ত মতো লোকে গায়ন্তি পূর্ব্ববাসিনঃ॥" (১৫)

---

(১৩) ভবিষ্য পুরাণম্—ব্রহ্মখণ্ডম্, দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।
(১৪) প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, দ্বিতীয় খণ্ড; ৭ ও ৩০ পৃঃ দেখ।
(১৫) দিগ্বিজয় প্রকাশঃ।

বিশ্বকোষপ্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু উপরিলিখিত শ্লোকদ্বয়ের টীকা করিয়া লিখিয়াছেন, "যে সময়ে বৃন্দাবনে বাসুদেব রাসলীলা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্রসূর্য্যের স্তম্ভন হইয়াছিল। পরে সূর্য্যদেব, সারথিকে বলিয়াছিলেন, আমি ভারতে দিন করিব, তুমি উদয়াচল হইতে শীঘ্র এস। সারথি রশ্মি লইয়া উত্থিত হইলে তাহাতে জ্যোৎস্না পতিত হইল, তখন (তাম্রবর্ণ) অরুণ দূরীভূত হইয়া সমুদ্র-প্রান্তে লিপ্ত হইল। যে স্থানে লিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থান তাম্রলিপ্ত নামে খ্যাত হয়।" (১৬)

আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাম্রলিপ্ত নামক এই স্থানের কোন রাজার নামানুসারে এই স্থলের নামকরণ হইয়াছে। তাম্রলিপ্ত নামক এই স্থলে একজন যে রাজা ছিলেন তাহা মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত আছে। সেই পর্ব্বে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেন নিজঘান মহামৃধে ॥
ততঃ পুণ্ড্রাধিপংবীরঃ বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকী কচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তশ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥
সুহ্মানামপি পশ্চৈব যে চ সাগর বাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাশ্চৈব বিজিগ্যে ভারতর্ষভ ॥" (১৭)

(১৬) বিশ্বকোষ, ৬৮৯ পৃঃ দেখ।

(১৭) মহাভারতম্, সভাপর্ব্বম্, শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র রায়েন প্রকাশিতম্। সভাঃ পর্ব্বানি দিগ্বিজয় পর্ব্বানি ভীম দিগ্বিজয়ে; ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ; ৭৩ পৃঃ দেখ। এবং বাবু উমাচরণ অধিকারী কৃত "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" নামক পুস্তকের ৬ পৃঃ দেখ।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ এইরূপে উল্লিখিত শ্লোক গুলির অনুবাদ করিয়াছেন :—"মোদাগিরিতে উপস্থিত হইয়া নিজ বাহুবলে সেই স্থলের রাজাকে সংগ্রামে সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা, এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধিশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগর-কূলবাসী-ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন।" (১৮)

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে, তাম্রলিপ্তীর রাজা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় গিয়াছিলেন, ও তথায় তিনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া রাজসূয় যজ্ঞেও তাম্রলিপ্তীর রাজা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত পাঠে বোধ হয় যে, পুরাকালে তাম্রলিপ্তা একটী সমৃদ্ধিশালী, বিশেষ গণনীয় স্থান ছিল। (১৯)

তাম্রলিপ্তীর চতুঃসীমার বিশেষ বিবরণ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। দুই একখানি সংস্কৃত ভৌগলিক পুস্তকে ইহার সীমার বিষয় কিছু কিছু লিখিত আছে। কিন্তু, কোন পুস্তকে ইহার চতুঃসীমার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।

"* * তাম্রলিপ্তান্ সমুদ্র তট পুরীশ্চ দেবরক্ষিতো রক্ষিষ্যতি।" (২০)

জেনারেল ক্যানিংহাম সাহেব তাঁহার "Ancient Geography of India" নামক পুস্তকে তাম্রলিপ্তীর সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :—

---

(১৮) ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত, সভাপর্ব্ব ; ৪১ ও ৪২ পৃঃ দেখ।

(১৯) মহাভারতম্, আদিপর্ব্বম্ ;—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়েন প্রকাশিতম্ ; ৪৮২-৮৩ পৃঃ দেখ, এবং ঐ মহাভারতের সভাপর্ব্ব, ১২৪ পৃঃ দেখ।

(২০) বিষ্ণুপুরাণম্, চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায় দেখ।

"Tamralipti—Country lying to the westward of the Hugli river, from Burdwan and Kalna on the north." (২১)

অর্থাৎ যে ভূভাগ হুগলী-নদীর পশ্চিমদিক হইতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহাই তাম্রলিপ্তী দেশ।

এক্ষণে তাম্রলিপ্তীর তিনদিকের সীমা পাওয়া গেল। ক্যানিংহাম সাহেবের কথানুসারে ইহার পূর্ব্বে হুগলী নদী ও উত্তরে বর্দ্ধমান ও কাল্‌না ছিল তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে। আরও আমরা জানি যে ইহার দক্ষিণে সমুদ্র ছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে গৃহীত শ্লোকে তাহাও প্রমাণিত হইতেছে। ইহা ছাড়া রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়ও ইহা যে সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল তাহা লিখিত আছে।

"Tamralipta being on the sea at the mouth of the Ganges, and corresponding with it in appelation, is always considered to be connected with the modern Tamluk. (২২)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "কলিঙ্গের সীমা নিরূপণ" নামক প্রবন্ধে প্রমাণাদি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে "কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান তমোলুকের সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গরাজ্যের অন্তঃর্গত ছিল" (২৩)। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে যে, তাম্রলিপ্তীর পূর্ব্বে হুগলী নদী, উত্তরে বর্দ্ধমান ও কাল্‌না, পশ্চিমে কলিঙ্গদেশ ও দক্ষিণে সমুদ্র ছিল।

---

(২১) Vide General Cunningham's "Ancient Geography of India," p. 504.

(২২) Vide Journal of the Royal Asiatic Society ; Vol. V., p. 135.

(২৩) জন্মভূমি, প্রথম খণ্ড, ৪৪৮ পৃঃ দেখ।

Documents Geographiques নামক পুস্তকে তাম্রলিপ্তী রাজ্যের পরিধির বিষয় লিখিত রহিয়াছে :—

"The kingdom of Tamluk was then about two hundred and fifty miles in circumference." (২৪)

কিন্তু, আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, মহোদয় তাঁহার "History of civilization in Ancient India" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বলেন :

"The country (*i.e.,* Tamralipti) was 300 miles in circuit." (২৫)

যাহাই হউক পুরাকালে তাম্রলিপ্তী যে বিস্তৃত রাজ্য ছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তী গঙ্গানদীর মোহনার নিকট সমুদ্রকূলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সেই মোহনায় পলি পড়িয়া চর হয়; সেই চর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া প্রায় ৫০।৬০ মাইল সমুদ্র বুজাইয়া ফেলিয়া ইহাকে একটী "অন্তর্দ্দেশিক নগর" (inland town) করিয়া ফেলিয়াছে। তাই কোন সংস্কৃতজ্ঞ কবি লিখিয়াছেন :—

"তাম্রলিপ্তো প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসভূঃ।
দ্বাদশযোজনৈর্যুক্তঃ রূপানভাঃ সমীপতঃ॥"

বিশ্বকোষে, উপরের শ্লোকের অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

"বণিকদিগের বাসভূমি তাম্রলিপ্ত প্রদেশ ১২ যোজন বিস্তৃত ও রূপা অথবা রূপনারায়ণ নদের নিকট অবস্থিত।" (২৬)

---

(২৪) Vide Documents Geographiques, p. 450.

(২৫) Vide History of Civilization in Ancient India by R. C. Dutt, C. I. E. Vol. III., p. 105.

(২৬) বিশ্বকোষ, ৬৯০ পৃঃ দেখ।

তাম্রলিপ্তীতে কোন্ বংশীয় রাজাগণ সর্ব্বপ্রথম রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং কোন্ মহাত্মা এখানকার প্রথম রাজা ছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ, বহুপূর্ব্বে ইহা কোন ক্ষত্রিয় রাজার রাজ্যান্তঃর্গত ছিল এবং তিনি এখানে আধিপত্য করিতেন। সর্ব্বশুদ্ধ এখানে তিন বংশীয় রাজাগণ রাজত্ব করিয়াছেন দেখা যায়। প্রথম ময়ূরবংশীয় রাজাগণ, তৎপরে রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয় ?) রাজাগণ এবং ইহার পরে কৈবর্ত্তবংশীয় রাজাগণ এখানে আধিপত্য করেন। কৈবর্ত্তবংশীয় রাজাগণের উত্তরাধিকারীগণ এখনও এখানকার সামান্য ভূস্বামী। ময়ূরবংশীয় রাজা মোটে চারিজন মাত্র ছিলেন, যথা :—(১) ময়ূরধ্বজ, (২) তাম্রধ্বজ, (৩) হংসধ্বজ ও (৪) গড়ুরধ্বজ। এই চারিজন ক্রমান্বয়ে এই স্থলের রাজা হন। বোধ হয় ইহাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। অন্ততঃ ইহাঁদের নাম দেখিয়া সেইরূপ অনুমান হয়। ইহাদের পরই রায়বংশীয় (গঙ্গাবংশীয় ?) রাজাগণের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ময়ূরবংশীয় রাজা গড়ুরধ্বজের পরই বিদ্যাধর রায় এই স্থলের রাজা হন। এখানকার রাজবাটীতে যে বংশ-তালিকা আছে তৎদৃষ্টে দেখা যায় যে, বিদ্যাধর রায় ময়ূরবংশোদ্ভব এবং এখানকার বর্ত্তমান রাজাও আপনাকে সেই বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। এক্ষণে ইহা সত্য কিনা দেখা যাউক।

পঞ্চম রাজা বিদ্যাধর রায়ের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই স্থলের রাজা হন :—

(৬) নীলকণ্ঠ রায়।	(৭) জগদীশ রায়।
(৮) চন্দ্রশেখর রায়।	(৯) বীরকিশোর রায়।
(১০) গোবিন্দদেব রায়।	(১১) যাদবেন্দ্র রায়।
(১২) হরিদেব রায়।	(১৩) বিশ্বেশ্বর রায়।
(১৪) নৃসিংহ রায়।	(১৫) শম্ভুচন্দ্র রায়।

(১৬) দ্বীপচন্দ্র রায়।	(১৭) দিব্যসিংহ রায়।
(১৮) বীরভদ্র রায়।	(১৯) লক্ষণসেন রায়।
(২০) রামচন্দ্র রায়।	(২১) পদ্মলোচন রায়।
(২২) কৃষ্ণচন্দ্র রায়।	(২৩) গোলোকনারায়ণ রায়।
(২৪) বলিনারায়ণ রায়।	(২৫) কৌশিকনারায়ণ রায়।
(২৬) অজিতনারায়ণ রায়।	(২৭) কৃষ্ণকিশোর রায়।
(২৮) চন্দ্রার্ক রায়	(২৯) মৌঞ্জীকিশোর রায়।
(৩০) মার্কণ্ডকিশোর রায়।	(৩১) ইন্দ্রমণি রায়।
(৩২) সুধন্বা রায়।	(৩৩) মৃগয়া দেই।
(৩৪) রায়ভানু রায়।	(৩৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
(৩৬) চন্দ্রা দেই।	(৩৭) কালুভুঞা রায়।
(৩৮) ধাঙ্গড়ভুঞা রায়।	(৩৯) মুরারিভুঞা রায়।
(৪০) হরবাবভুঞা রায়।	(৪১) ভাঙ্গভুঞা রায়।
(৪২) ধিতাইভুঞা রায়।	(৪৩) জগন্নাথভুঞা রায়।
(৪৪) যদুনাথভুঞা রায়।	(৪৫) রামভুঞা রায়।
(৪৬) শ্রীমন্ত রায়।	(৪৭) ত্রিলোচন রায়।
(৪৮) কেশব রায়।	(৪৯) হরি রায়।
(৫০) রাম রায়।	(৫১) নরনারায়ণ রায়।
(৫২) কৃপানারায়ণ রায়।	(৫৩) কমলনারায়ণ রায়।
(৫৪) আনন্দনারায়ণ রায়।	(৫৫) লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
(৫৬) উপেন্দ্রনারায়ণ রায়।	(৫৭) নরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

(৫৮) সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ময়ূরধ্বজ প্রভৃতি চারি জন মাত্র রাজাকে অনেকে ময়ূরবংশীয় বলেন ; এবং ইহা সত্য বলিয়াই বোধ হয়। কারণ তাঁহাদের নামগুলি প্রাচীন কালের নাম। পঞ্চম রাজার নাম বিদ্যাধর

রায়; ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের নাম। সুতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, ময়ূরবংশের লোপ হইলে এই রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয়) রাজাগণ এখানে রাজত্ব করেন। সপ্তত্রিংশ রাজার নাম কালুভুঞ্যা; ইহা সম্পূর্ণ অনার্য্য নাম। ইহাঁর পূর্ব্বে অপর কোন রাজার এইরূপ অনার্য্য নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বোধ হয় যে, ইনি কৈবর্ত্তবংশীয়, ইনিও রায় উপাধি ধারণ করেন। বোধ হয়, নিজ বংশের উচ্চতা প্রমাণ করিবার জন্যই ইনি এইরূপ করিয়াছিলেন। কালুভুঞ্যার পর ধাঙ্গড়-ভুঞ্যা, মুরারিভুঞ্যা, হরবাবভুঞ্যা, ভাঙ্গড়ভুঞ্যা প্রভৃতি অনার্য্য নামীয় রাজাগণ এখানে রাজত্ব করেন। ইহাঁরাও রায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাঁদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণও সেই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু ইহাঁরা ভুঞ্যা পদবীটী একবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল নিজ বংশের উচ্চতা প্রমাণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, ইহাঁরা ও ইহাঁদের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ যে কৈবর্ত্ত এবং ইহাঁদের সহিত যে ময়ূরবংশের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহা নিশ্চিত।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ রক্ষিত মহাশয় "তমোলুকের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধে এইখানকার রাজাগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন:

"* * প্রথম চারিজন রাজার নাম প্রাচীন নাম—অর্থাৎ মহাভারতীয় কালের নাম ও তৎপরে বিদ্যাধর প্রভৃতি নামগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, গড়ুরধ্বজের পরে তদ্বংশের লোপ হওয়ায় এই রায়বংশীয় (বিখ্যাত গঙ্গাবংশীয়?) রাজাগণ সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। সপ্তত্রিংশ রাজার নাম কালুভুঞ্যা। ইনিই প্রথম কৈবর্ত্ত রাজা। কেননা—ইহাঁর পূর্ব্বে এরূপ একটীও অনার্য্য নাম কোন রাজার

দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং ইহার পরে ধাঙ্গড়ভুঞা্যা, ভাঙ্গড়-ভুঞা্যা প্রভৃতি নাম দৃষ্টিগোচর হয়। যাহা হউক, আর্য্যবংশীয় রাজা-দিগের লোপ হইলে সমুদ্রগামী-জাতীয় লোকেরা ক্রমে আপনাদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি করিয়া এই কালুভুঞা্যাকে রাজা করেন। কালুভুঞা্যা উড়িষ্যা হইতে আসেন এবং স্বীয় সমভিব্যাহারে জ্ঞাতি-কুটুম্ব চারিশত ঘর আনিয়া তাঁহাদিগকে ভূম্যাদি দিয়া এখানে বাস করান। ইহাঁদের আচার, ব্যবহার ও ভাষার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বে উড়িষ্যার সহিত যে ইহাঁদের বিশেষ সংস্রব ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এখনও কতকগুলি উৎকল ভাষার ভাব (idiom) প্রচলিত আছে। ইহাঁদের পদবী দেখিলে ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে উৎকলবাসী ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়; যথা—মহাপাত্র; বিহারা বা বেরা, জানা, মহান্তি বা মাইতি, পট্টনায়েক, সামন্ত, সাঁতরী ইত্যাদি। এ সমস্তই উড়িয়া পদবী।" (২৭)

কিন্তু শ্রীযুক্ত সুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, "রাজা ময়ূরধ্বজ হইতে সুধন্বা রায় পর্য্যন্ত যে ৩২ জন রাজার নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেক অব্যবহিত পিতা পুত্র সম্বন্ধ।.... এই বত্রিশ জন রাজাই ময়ূরবংশীয়। ৩৩শ রাজ্ঞী মৃগয়া দেই ময়ূর বংশীয় সর্ব্বশেষ কন্যা। ইনি সুধন্বা রায়ের ভগিনী। জমিন ভঞ্জ রায়ের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁরই গর্ভে ৩৪শ সংখ্যক রাজা রায় ভানু রায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব রাজ্য এখন ময়ূর বংশের দৌহিত্র বংশে গেল। নিম্নের বংশাবলী দৃষ্টে, বর্ত্তমান তমলুক রাজবংশধরগণ কোন বংশোদ্ভব, প্রতীয়মান হইবে।" (২৮)

---

(২৭) নব্যভারত-ষোড়ষ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা দেখ।
(২৮) ঐ সপ্তদশ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা দেখ।

রাণী মৃগয়া দেই—

(কুঙার জমিন ভঞ্জ রায় স্বামী)

|

রায় ভানু রায়...ময়ূর বংশের দৌহিত্র বংশ।

|

লক্ষ্মী নারায়ণ রায়।

|

চন্দ্রা দেই।

(নিঃশঙ্ক রায় স্বামী)

|

কালু ভুঞ্যা রায়...ময়ূর বংশের প্রদৌহিত্র বংশ।

|

ধাঙ্গড় ভুঞ্যা রায়।

|

মুরারি ভুঞ্যা রায়।

|

হরবাব ভুঞ্যা রায়।

|

ভাঙ্গড় ভুঞ্যা রায়।

|

(৮১০ সাল অর্থাৎ ১৪০৩ খৃঃ অঃ পরলোকগত)

|

ধিতাই ভুঞ্যা রায় (৮৬১ সাল পর্য্যন্ত)

|

জগন্নাথ ভুঞ্যা রায় (৯০১ সাল পর্য্যন্ত)

|

যদুনাথ ভুঞ্যা রায় (৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত)

|

রাম ভুঞ্যা রায় (৯৭০ সাল পর্য্যন্ত)

ত্রৈলোক্য বাবু ও তাঁহার প্রতিবাদকারী সুদর্শন বাবু—ইহাঁদের দুই জনের মতামত ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, ত্রৈলোক্য বাবুর কথাই (অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কৈবর্ত্ত, এই কথা) সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরও যখন দেখা যায় যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও বলেন যে, ময়ূর বংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্তগণ এইস্থলে প্রধান হইয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তখন ত্রৈলোক্য বাবুর কথা অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন :—

"The sea-going castes asserted their supremacy, and on the extinction of the peacock dynasty placed a line of Kaibarttas on the throne." (২৯)

এখানে "Sea-going castes" বলিতে হণ্টার সাহেব যে কৈবর্ত্তগণকে বুঝিতেছেন তাহা তাঁহার "Antiquities of Orissa" নামক পুস্তক পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়।

পরন্তু ইংরাজি ১৮৯১ সালের মেদিনীপুর জেলার সেন্সস-বিবরণী পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ময়ূর বংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্তগণ এখানকার রাজা হন এবং তাঁহাদেরই বংশধর এখানকার বর্ত্তমান রাজা। District Census Report এ এইরূপ লিখিত আছে :—

"27. The Kaibarttas are probably an offshoot of a race or tribe whose original seat was in the up-country. They say that their ancestors lived on the banks of the Saraju or Gogri, in Oudh, and there is still a caste in that part of the country known by the name of

(২৯) Vide Antiquities of Orissa, by Sir W. H. Hunter. LL. D., K. C. S. I., Vol. I., p. 310.

Kanra, the descendants of those, whom their fore-fathers left behind them, when they migrated south-wards. When the forefathers of the present Kaibarttas migrated from their original home on the bank of the Saraju, their route probably lay along the eastern limit of the tableland in Central India, and tradition assigns their first appearance in the District of Midnapore to Sakabda 822. They were led by five chiefs, who established as many separate chieftaincies in the district :—

1. Tamralipta or Tamluk.
2. Balisita.
3. Turka.
4. Sujamutha.
5. Kutabpur." (৩০)

উপরের প্রমাণাদি দর্শনে বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা যে কৈবর্ত্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। এবং ইহা নিশ্চিত বোধ হয় যে, ইহাঁরা ময়ূরবংশোদ্ভব নহেন। ময়ূর বংশের লোপ হইলে কৈবর্ত্ত বংশীয় রাজাগণের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং ইহাঁদেরই বংশধর এখনও এখানে রাজা নামে অভিহিত হন।

পূর্ব্বে পঞ্চচত্বারিংশৎ রাজা রাম ভুঞা রায়ের কথা বলা হইয়াছে। ইহাঁর সময় হইতেই রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। রাম ভুঞা রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনেকগুলি পুত্র ছিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজ্য ভাগ করিয়া ছোট ছোট তালুকে পরিণত করিলেন। রাজ্যেরও অবনতি আরম্ভ হইল।

(৩০) Vide Census Report of the District of Midnapur for the year 1891, p. 4.

এইরূপে রাজ্য বহু অংশে বিভক্ত হওয়াতেই তমলুক রাজগণের অবনতি হইল। প্রকৃত রাজা কেহই রহিল না; সকলেই এক এক খণ্ড জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকলহ বাধিয়া উঠিল ইহার ফল এই হইল যে, পুরাকালের তাম্রলিপ্তী রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন হইল।

পঞ্চ-চত্বারিংশৎ রাজা রামভুঞ্যা রায়ের মৃত্যুর পর রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হয়। ইহার বার আনা অংশ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমন্ত রায় এবং চারি অংশ কনিষ্ঠ পুত্র ত্রিলোচন রায় অধিকার করেন। ত্রিলোচন রায় নিঃসন্তান পরলোক গত হইলে পর, শ্রীমন্ত রায়ই সমস্ত রাজ্যের অধিকারী হন। ইঁহার সাত পুত্র ছিল। শ্রীমন্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহারা সকলে মিলিয়া রাজ্য ভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব রায় নামমাত্র রাজা থাকেন। ইনি মোগল বাদশাহকে নিয়ম মত কর দিতে পারিতেন না বলিয়া ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে রাজ্যচ্যুত হন ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরি রায় তৎপদে অভিষিক্ত হন (৩১)। হরি রায় ১৬৫৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। সাড়ে দশ আনা ভাগ তৎপুত্র রাম রায় আর সাড়ে পাঁচ আনা ভাগ তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র প্রতাপ নারায়ণ (গম্ভির রায়ের পুত্র) প্রাপ্ত হন। অবশেষে ১৭৩১ খৃঃ অব্দে নরনারায়ণই সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হন। নরনারায়ণের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ কৃপানারায়ণ, পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া ১৭৫২ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কমলনারায়ণ রাজা হন। ইনি ১৭৫৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে মোগল সরকারকে যথারীতি কর দিতে অক্ষম হওয়াতে রাজ্যচ্যুত হন এবং খোজা মির্জা দেদার আলি

---

(৩১) Vide A Statistical Account of Bengal, Vol. III.

বেগ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। দেদার আলিবেগ নবাব ... করেন ও এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বড় রাজবাটীর পশ্চিম পার্শ্বে এখনও তাঁহার কবর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর মহরমের সময় স্থানীয় মুসলমানগণ তথায় নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শন করে। পূর্ব্বে অতি বৃষ্টি হইলে চতুঃপার্শ্বের পরগণা হইতে জল আসিয়া তমলুক পরগণা ভাসাইয়া দিত, তাহাতে বহু অনিষ্ঠ হইত; তজ্জন্য নবাবসাহেব তমলুকের পশ্চিম সীমায় একটী প্রকাণ্ড বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। অদ্যাপি সেই বাঁধ বিদ্যমান ও "খোজার বাঁধ" বলিয়া পরিচিত।

নবাব আলিবেগের মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তমলুক পরগণা মোগল সরকারের হাতে ছিল। তখন মোগল সাম্রাজ্যের পতিতাবস্থা। ইংরাজগণ ভারতে বাণিজ্যার্থে আসিয়া ক্রমে নিজ ক্ষমতা বিস্তার করিয়া ভারতবর্ষ করতলগত করিতেছিলেন। তখনকার বাঙ্গালার নবাব ইংরাজের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার কোনই ক্ষমতা ছিল না। নামমাত্র তিনি নবাব ছিলেন। রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি সমস্ত ভার ইংরাজগণের হস্তে ছিল। যখন বাঙ্গালা রাজ্যের এইরূপ অবস্থা তৎকালে তমলুক এখনকার রাজবংশের হস্তান্তরিত হইল। কিন্তু ইংরাজ সরকারের কর্ম্মচারী নন্দকুমার রায় ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়গণ বহু চেষ্টা করিয়া জমিদারী কমলনারায়ণের দুই রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও কৃষ্ণপ্রিয়াকে ফিরাইয়া দেওয়ান। ইহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ নন্দকুমারকে ছয় খানি ও গঙ্গাগোবিন্দকে আট খানি গ্রাম লিখিয়া পড়িয়া দান করেন। নন্দকুমারের তালুক বাসুদেবপুর ও গঙ্গাগোবিন্দের তালুক গোপালপুর বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত। (৩২)

---

(৩২) নব্যভারত, ষোড়শ খণ্ড, অষ্টম সংখ্যা, ৪৪১—৪২ পৃঃ দেখ।

।করিয়া পাইবার পর রাণী কৃষ্ণপ্রিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ ..ন। রাণী সন্তোষপ্রিয়ার পুত্র ছিল। ইঁহাদের পুত্রগণ উভয়ে ॥৵০ ও ।৶০ অংশে জমিদারী ভাগ করিয়া লন। পরে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে সন্তোষপ্রিয়ার পুত্র আনন্দ নারায়ণই সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হন। আনন্দ নারায়ণের দুই স্ত্রী ছিল। ইঁহাদের কাহারও সন্তানাদি না হওয়াতে জ্যেষ্ঠা রাণী শ্রীনারায়ণকে ও কনিষ্ঠা রাণী লক্ষ্মীনারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে শ্রীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তৎপরে লক্ষ্মীনারায়ণ সমস্ত জমিদারী নিজ দখলে আনেন। ইহাতে জ্যেষ্ঠা রাণী (লক্ষ্মীনারায়ণের বিমাতা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন ও রুদ্রনারায়ণকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সমস্ত জমিদারী নিজে একাই শাসন করেন। কিন্তু তৎপরে রুদ্রনারায়ণ সেই জমিদারীর অংশ দাবী করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন এবং ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে সেই আদালতের হুকুম মতে অর্দ্ধেক জমিদারী প্রাপ্ত হন।

গৃহকলহ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ প্রায় সমস্ত জমিদারী হারাইয়াছেন। তাহার অধিকাংশ ভাগ মহিষাদলের রাজা এবং বাবু ননীগোপাল ও রাখাল দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা দখল করিয়াছেন। এক্ষণে যৎসামান্য জমিদারী তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণ ভোগ করিতেছেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনারায়ণ জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রনারায়ণ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। নরেন্দ্রনারায়ণের ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে মৃত্যু হয়। এক্ষণে তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনারায়ণ বর্ত্তমান আছেন। (ক্রমশঃ)

তেল, নুন, লকড়ি।

(৫)

বিলেতি জিনিষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য বিচার শেষ করে, এখন তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্ট স্কুলে পাঠান হয়, এবং ঐ একই কারণে যুক্তি যখন অন্য কোন দাঁড়াবার স্থান না পায় তখন তা আর্টের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনায় "আমি বিশ্বাস করি"—এ কথার উপর যেমন আর কোন কথা চলে না, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় "আমার চোখে সুন্দর লাগে" একথার উপরও তেমনি আর কোন কথা চলেনা। সৌন্দর্য্য অনুভূতির বিষয়, জ্ঞানের বিষয় নয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে তার প্রমাণ দেওয়া যায় না। অতএব, যিনি আর্ট জিনিষটা অপরকে যত কম বোঝাতে পারেন নিজে তিনি তত বেশী বোঝেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হলেও সম্ভবতঃ লোক ধর্ম্মজ্ঞ হতে পারে কিন্তু রূপসম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোক সৌন্দর্য্যজ্ঞ হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্য্য স্বপ্রকাশ। সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং অস্তিত্ব উভয়ই কেবলমাত্র প্রকাশের উপর নির্ভর করে। সেই পদার্থকে আমরা সুন্দর বলি যার স্বরূপ পূর্ণব্যক্ত হয়েছে। রূপ হচ্ছে বিশ্বের ভাষা, এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শেষ কথা। প্রকৃতিও বৃথায় কিছু করেন না, মানুষেও বিনা উদ্দেশ্যে কোনও পদার্থে হাত দেয় না। যা মানবজীবনের পক্ষে আবশ্যকীয় মানুষে তাই হাতে গড়ে, সেই গঠনকার্য্যের সার্থকতা এবং কৃতার্থতার নামই আর্ট। নিরর্থক দ্রব্য সুন্দর হয় না। আবশ্যকতার বিরহে সৌন্দর্য্য শুকিয়ে মারা যায়। সুতরাং যে জাতির পক্ষে যে সকল জিনিষ জীবনযাত্রার

পক্ষে আবশ্যকীয় নয়, সে জাতির পক্ষে সে সকল জিনিষের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন। আর্ট একটি সৃষ্টি-প্রকরণ, একটি ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং আর্টের প্রাণ কর্ত্তার হাতে এবং মনে, ভোক্তার চোখে এবং কাণে নয়। আর্টের সন্ধান তার স্রষ্টার কাছে মেলে, দর্শক কিম্বা শ্রোতার কাছে নয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবার ভিতর যেটুকু আনন্দ, প্রাণ ও ক্ষমতা আছে, সেইটুকু অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য ভোগ করা। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে, যে আর্টিষ্টের সঙ্গে আমাদের চরিত্রের, ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের, রীতি এবং নীতির মিল আছে; আমরা অনেক পরিমাণে যার সুখ-দুঃখের ভাগী, যার সঙ্গে আমরা একই বাহ্য প্রকৃতির ভিতর, একই সমাজের অন্তর্ভূত হয়ে বাস করি তার আর্টই আমাদের পক্ষে যথার্থ আর্ট। বিদেশী এবং বিজাতীয় আর্টের আদর কেবল কাল্পনিক মাত্র। এই কারণেই আমাদের অনেকেরই পক্ষে বিদেশী আর্টের চর্চ্চাটা লাঞ্ছনা মাত্র হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে বিদেশী দোকানদারের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, পরে নিজেদের মনকে প্রবঞ্চিত করি। আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে। আমরা ছবি চিনিনে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়্‌তে বাঁদর গড়ে তাদেরই হস্ত-রচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে, সুখী না হই খুসি থাকি। আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলাম-চোর হওয়ায়, লজ্জা পাওয়া দূরে যাক্ আমাদের আত্মমর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। আমার মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, আমরা যদি ইউরোপীয় আর্টের মর্য্যাদা না বুঝিতে পারি তাহলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান চর্চ্চাও আমাদের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এ আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন

বাসনার, মনোভাবের মিলও যথেষ্ট আছে। সাহিত্যের বিষয় হচ্চে প্রধানতঃ মানবপ্রকৃতি; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল অতিরিক্ত মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চির-নবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার করে। এই হেতু সকল দেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বিশ্ব-মানবের সমান অধিকার আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে যে অংশ-টুকু আর্ট সে অংশ আমরা ঠিক ধরতে পারিনে। বিদেশী লেখকের লেখনার পরিচয় আমরা অনেকেই পাই না। সে যাই হোক্, সাহিত্যে এবং আর্টে, কাব্যে এবং কলায় প্রধান পার্থক্য এই যে, কাব্যের উপকরণ অন্তর্জগৎ হতে আসে, কলার উপকরণ বাহ্যজগৎ হতে আসে। মনোজগতে দেশভেদ নেই, এসিয়া, ইউরোপ নেই, এককথায় মনো-জগতের ভুগোল নেই। কিন্তু বাহ্যজগতে ঠিক তার উল্টো। এক দেশের ভৌতিক গঠন অপর দেশ হতে বিভিন্ন। দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রসের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যই কাব্য অপেক্ষা কলার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। এই উপকরণের বিশেষত্ব হ'তে প্রতি দেশের শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। আর্ট সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়তা অসম্ভব; সুতরাং, স্বদেশের অধীনতা-পাশ মোচন কর্‌বার যো নেই। বিজ্ঞানের বিষয় ও বস্তু জগৎ; কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বজনীন কেন না, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুজগতের বিশেষত্ব বাদ দিয়ে সামান্য ক্রিয়াগুলির সন্ধান নেওয়া। আর্টের সম্পর্ক বস্তুজগতের শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে। বিজ্ঞানের অভিপ্রায় বিশ্বকে এক করে আনা, আর্টের কার্য্য নিত্য বৈচিত্র সাধন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলের দিকে, আর্টের লক্ষ্য ফুলের দিকে। বিজ্ঞানের দেশ নেই, আর্টের আছে। এই সকল কারণে Newton এবং Darwin আমাদের জ্ঞাতি, Shakespeare এবং Milton আমাদের কুটুম্ব কিন্তু Raphael এবং Beethoven আমাদের

আর্ট ছাড়েনি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইউরোপের উচ্চাঙ্গের আর্টের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেন তিনি অবশ্য ভক্তির পাত্র। পৃথিবীর যে দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আছে তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা মানবের মুক্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যখন প্রায়ই দেখ্তে পাই যে, যিনি স্বরগ্রামের "গা" থেকে "পা"র প্রভেদ ধর্তে পারেন না তিনিহ Beethovenএর প্রধান সমজদার এবং যিনি রংটা নীল কিম্বা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বল্তে অপারগ তিনিই Titian এর চিত্রে মুগ্ধ, তখন স্বজাতির ভবিষ্যতের বিষয় একটু হতাশ হয়ে পড়্তে হয়। সে যাই হোক্, উপস্থিত প্রবন্ধে যে সকল বস্তুর আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, যথা ছিটের পরদা, ব্রাসল্সের কার্পেট, চিনের পুঁতুল, কাঁচের ফুলদানী কি স্বদেশী কি বিদেশী সকল প্রকার আর্টের অভাবেই তাদের বিশেষত্ব। বিলাতের সচরাচর গৃহে ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিৎ। এর দুটি কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞানের ন্যায় আর্টেরও বিষয় বাহ্যজগৎ। যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আর্টেরও বিষয় হতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণগন্ধশব্দস্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম aesthetical quality অর্থাৎ "রূপ" এবং মনের সেই সুখলাভ কর্বার ক্ষমতার নাম aesthetic faculty অর্থাৎ "রূপজ্ঞান"। ইংরাজ বিশেষ খোসাপুরু জাত। ভগবান ইংরাজকে নিতান্ত স্থূলভাবে গড়েছেন, তার দেহ স্থূল, বুদ্ধি স্থূল ইন্দ্রিয়ও তাদৃশ সূক্ষ্ম নয়। বস্তুমাত্রেই ইংরাজের হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু রূপমাত্রেই ইংরাজের চোখে কিম্বা কাণে ধরা পড়ে না। সচরাচর শিক্ষিত ইংরাজের চাইতে আমাদের দেশের

কারণেই বিলাতের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাতসকল নয়নের তৃপ্তিকর নয়। এই গোড়ায় গলদ্ থাক্‌বার দরুন ইংরাজের হাতগড়া জিনিষ প্রায়ই artistic হয় না। ইউরোপের অন্যান্য জাতিসকল এ বিষয়ে ইংরাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও অপর আর একটি কারণে ইউরোপের artএর আজকাল হীনাবস্থা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞান বিশ্বকে একভাবে দেখে, আর্ট অন্যভাবে দেখে। বিজ্ঞানের চেষ্টা সোনামুঠোকে ধুলামুঠো করা, আর্টের চেষ্টা ধুলামুঠোকে সোনামুঠো করা। বিজ্ঞান আজকাল ইউরোপীয় মানবের মনের উপর অযথা প্রতিপত্তি লাভ করেছে কেননা, বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে আলাদিনের প্রদীপ। সে প্রদীপের সাহায্যে যে শুধু অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় তাই নয়—আলোকও লাভ করা যায়। সে আলোকে শুধু প্রকাশ করে বিশ্বের কায়া, বাদ বাকী সব ছায়ায় পড়ে যায়, যথা—মন, প্রাণ ইত্যাদি। সেই বিজ্ঞানের আলোক, আমরা যদি একমাত্র আলোক বলে ভ্রম করি, তাহলে মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ, চরম লক্ষ্য, এবং অচ্যুত আনন্দ হতে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। বিশ্বকে শুধু জড়ভাবে দেখ্‌লে মনেরও জড়তা এসে পড়ে। কেবল মাত্র পরমাণুর স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্ম্মের সখি হয়েই কলাবিদ্যা পৃথিবীতে দেখা দেয়। সে সখ্য-বন্ধন ছিন্ন করে আর্টকে জীবন্ত রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্বের মতে মানবের আদিম চেষ্টা নিজের এবং জাতির জীবন রক্ষা করা। নিজে বেঁচে থাকা এবং সন্তান উৎপাদন করা এই দুটি জীবজগতের মূল নিয়ম। এই দুটি আদিম দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তাহলে "আবশ্যকতার" অর্থ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। যা দেহের জন্য আবশ্যক তাই যথার্থ আবশ্যকীয় বলে গণ্য হয়, আর যা মনের জন্য, আত্মার জন্য আবশ্যক তা আবশ্যকীয় বলে মনে হয় না। ইউরোপে Utilityর এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য হবার দরুন Utility এবং Beautyর বিচ্ছেদ জন্মেছে। ইউরোপের আবশ্যকীয় জিনিষ কদর্য্য,

এবং সুন্দর জিনিষ অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই কারণে আর্ট এখন ইউরোপে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলছে। আহার, বিহার এখন ইউরোপে প্রধান কাজ হয়ে ওঠার দরুন যে আর্টিষ্ট আর্টকে জীবনের ভিতর নিয়ে আস্‌তে চান্ তিনি আর্টকে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের দাসী ক'রে তোলেন। এই কারণেই ইউরোপে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির এত ছড়া-ছড়ি। শতকরা একজনে যদি ঐরূপ মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য খোঁজেন অবশিষ্ট নিরনব্বই জনে তার নগ্নতা দেখেই খুসি থাকেন। এ অবস্থায় আর্ট যে শুধু ভোগ-বিলাসের অঙ্গ হয়ে উঠবে তার আর আশ্চর্য্য কি?—ইউরোপের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ, তা ইউরোপ স্থির কর্‌বে। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য আমাদের জাতির পক্ষে বিলাসের প্রবৃত্তি আর বাড়ানো ইচ্ছনীয় নয়। ইউরোপের যথার্থ আর্ট আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আয়ত্ব করা অসম্ভব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার ভোগের অংশটা আমরা সহজেই অভ্যাস কর্‌তে পারি। আমার প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। আর্টকে ভোক্তার দিক্ থেকে দেখা, দূর্‌বিনের উল্টো দিক থেকে দেখার তুল্য,—দ্রষ্টব্য পদার্থ আরও দূরে চ'লে যায়। কর্ত্তার দিক্ থেকে দেখাটাই ঠিক্ দেখা। আমরা নিজে যা রচনা করেছি তারই মর্ম্ম, তারই মর্য্যাদা আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝতে পারি। আমাদের স্বদেশের কীর্ত্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমরা জাতীয় আত্মসম্মানের চর্চ্চা কর্‌ব বলে চিৎকার কর্‌ছি, কিন্তু জাতীয় কৃতিত্বের যদি জ্ঞান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসম্মান কিসের উপর দাঁড় করাব, বোঝা কঠিন। জাতীয় আর্ট যে শ্রেণীরই হোক্ তার চর্চ্চায় আমাদের জাতীয় কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠবে। এই পরম লাভ। সুলভ এবং সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিষের স্বপক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চল্‌লেও চল্‌তে পারে, কিন্তু আর্টের দোহাই একেবারেই চলে না। বিলাতি-ছিটগ্রস্ত না হ'লে বিলাতি ছিট-ভক্ত হওয়া যায়

(৫)

সভ্যজাতির পক্ষে দেশের কথা অনেকটা বেশের কথা। পরিচ্ছদের ঐক্য, সামাজিক ঐক্যের লক্ষণও বটে কারণও। আমরা প্রতিবাসীকে প্রতিবেশী বলেই জানি। হিন্দুরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসের প্রথম দীক্ষা ডোর-কৌপিন ধারণ। আমাদেরও বিদেশীয়তার প্রথম সংস্কার কোট-পেণ্টুলুন ধারণ। বিলাতের বেশ যেঁ ভারতবাসীর পক্ষে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী সেকথা বলাই বাহুল্য। কথাটা এতই সাদা যে, যিনি তা বুঝতে পারেন না, তাঁর ঔষধ মধ্যমনারায়ণ তৈল, যুক্তি নয়। দেহকে কষ্ট দিলেই যদি মনের ঔৎকর্ষ লাভ করা যেত, তাহলেও নয় এই বোতাম-বক্‌লসের অধীনতা এবং বন্ধন একরকম কায়ক্লেশে সহ্য করা যেত। কিন্তু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত কর্‌বার মাহাত্ম্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। যিনিই "কলার" ব্যবহার করেছেন তিনিই, কোন না কোন সময়ে রাগে, দুঃখে এবং ক্ষোভে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে—

ভূষণ বলে কিন্‌ব না আর
পরের ঘরে গলার ফাঁশি॥

ইউরোপ যে আমাদের বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরিয়েছে তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট এবং কাফ এবং বুটজুতা ধারণ করি। আমাদের স্বদেশী বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে, অহর্নিশি গলদ্ঘর্ম্ম হওয়াতেই সভ্য-মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ মনে হয় বিলাতি সভ্যতার প্রতি অতিভক্তিপরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরাজি পোষাক যে নয়নের সুখকর নয় এ কথা সকলেই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্য্যের অভাবেতেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। ঐ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের

কাযেই আমরা ইংরাজের অনুকরণে অন্য রং সব ত্যাগ করে কাপড়ে ছাই, পাঁশ মাটির রং চাপিয়েছি। আমাদের ধারণা, সব চাইতে সভ্য এবং সব চাইতে পুরুষালি রং হচ্ছে কালো রং। সুতরাং আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্র বসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে। শ্বেতবর্ণ আলোকের রং, সকল বর্ণের সমাবেশে তার উৎপত্তি; আর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের রং, সকল বর্ণের অভাবে তার উৎপত্তি। আমরা করজোড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে প্রার্থনা করেছি যে "আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও"—আমাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমদ্‌গারির পুরস্কারস্বরূপ হ্যাট নামক কিম্ভূতকিমাকার এক চিজ, শিরোপা লাভ করেছি, তাই আমরা আনন্দে শিরোধার্য্য করে নিয়েছি। কিন্তু ইংরাজি পোষাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু তা নয়। বেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মনের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। পুরোহিতের বেশ ধারণ করলে মানুষকে হয় ভণ্ড নয় ধার্ম্মিক হতে হয়: সাহেবি কাপড়ের সঙ্গে মনেও সাহেবি-আনার ছোপ ধরে। হ্যাট-কোট ধারণ করলেই বঙ্গসন্তান, ইংরাজি এবং হিন্দি এই দুই ভাষার উপর অধিকার লাভ করবার পূর্ব্বেই অত্যাচার করতে সুরু করেন। গলায় "টাই" বাঁধিলেই যে সকলকেই ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট গললগ্নী কৃতবাস হতে হবে, এ কথা আমি মানিনে। যে মনে দাস, সে উত্তরীয়কেও গলবস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। তবে "টাই" যে মনকে সাহেবি-আনার অনুকূল করে নিয়ে আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মোহ কাটাতে হলে ইউরোপীয় বসন বয়কট করাই শ্রেয়। ইউরোপবাসীর বেশে এবং এসিয়াবাসীর বেশে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। ইউরোপের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে বাঁধা, আমাদের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে ঢাকা। আমাদের চেষ্টা দেহকে লুকান ওদের চেষ্টা দেহকে ফলানো। আমাদের অভিপ্রায় লজ্জা নিবারণ করা,

ওদের অভিপ্রায় শীত নিবারণ করা ; তাই আমরা যেখানে ঢিলে দেই ওরা সেখানে কসে। ইংরাজরা মধ্যে মধ্যে রমণীর বেশকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরাজরমণীর বেশের ভিতর একটা ছন্দ আছে, তার গতি বিলাসিনীদের দেহভঙ্গী অনুসরণ করে ; সে ছন্দের ঝোঁক উন্নত অবনত অংশের উপরই পড়ে। লজ্জা আমাদের দেশে নারীর হৃদয় অবলম্বন করে থাকে ওদের দেশে চরণে শরণ গ্রহণ করে। লজ্জা এদেশে স্ত্রীলোকের ভূষণ এবং অস্ত্র। সেইজন্য বঙ্গমহিলারা স্বদেশী লজ্জা পরিহার করে বিদেশী সজ্জা গ্রহণ করেন নি। স্ত্রী-জাতি সর্ব্বত্রই স্থিতিশীল, আমরা পুরুষরা গতিশীল বলেই দুর্গতি বিশেষরূপে আমাদেরই হয়েছে। যদি ইংরাজি বেশ উপযোগিতা, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্বদেশী বেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'ত, তাহলেও বিদেশী বেশ অবলম্বন অনুমোদন করা যেতনা। ইংরাজি বেশের আর একটি বিশেষ দোষ এই যে, ও পদার্থে দেহ মণ্ডিত করবা মাত্রই, অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকও বেশের পক্ষসমর্থন করতে গিয়ে অতিশয় নির্ব্বোধের মত তর্ক করেন। এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি সচরাচর শোনা যায় সে সকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়। যাঁরা বেশ পরিবর্ত্তন করেন তাঁরা তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা নিজেরা সাফাই হতে চান, অপরকে ভজাতে চান না। তাঁদের অভিপ্রায়, ফাঁকি দিয়ে নিজেরা সভ্য হওয়া, স্বজাতিকে সভ্য করা নয়। তাঁদের বিশ্বাস, এ সমাজের, এ জাতির কিছু হবার নয়, সুতরাং সমাজ ছাড়াই তাঁদের মতে একমাত্র মুক্তির উপায়। এ মনোভাব যে স্বদেশীয়তার কতদূর অনুকূল তা সকলেই বুঝতে পারেন। কেবলমাত্র সমাজ ত্যাগে কি করে মুক্তিলাভ হতে পারে, এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর হচ্ছে, এঁরা এ চান না যে, এঁরা চিরকালই স্বদেশী সমাজের অন্তস্থ বর্ণ হয়ে থাকবেন ; এঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, ইংরাজি সমাজে লীন হয়ে যাওয়া। এঁদের

যাবে। কিন্তু আজ বোধ হয় এঁদের সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, সে আশা মিছে। আমরা সকলেই এ সত্যটি আবিষ্কার করে'ছি যে, প্রয়াগ পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমাদের কাশি প্রাপ্তি হবে।—

(৬)

আহার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। অপরের বেশ যত সহজে অবলম্বন করা যায়, অপরের খাদ্য তত শীঘ্র জীর্ণ করা যায় না। বিদেশীয় সভ্যতা আমাদের পিঠে যত সয় পেটে তত সয় না। আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশে আহার্য্য দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি কর্‌বার কোনই দরকার নেই। তবে যদি কেহ এমন থাকেন যে, বিদেশী মাছ-তককারি না পাইলে তাঁর প্রাণ বাঁচে না তাহলে তাঁর প্রাণ বাঁচাবার কোন দরকার নেই, আর যদি বেঁচে থাকাটা নিতান্ত দরকার মনে করেন, তাহলে স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বাস করাটাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়।

আহারসম্বন্ধে বিধিনিষেধসম্বলিত পঞ্জিকাশাস্ত্রকে গঞ্জিকাশাস্ত্র গণ্য করে অমান্য কর্‌লেই যে তৎপরিবর্ত্তে কেলনারের ক্যাটালগের চর্চ্চা কর্‌তে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদেশীয়তা প্রধানতঃ আহারের পদ্ধতিতেই আমরা অবলম্বন করেছি। বিলাতি বসন পরে স্বদেশী আসনে বসা এবং স্বদেশী বাসনে খাওয়া চলে না।

ঐ পোষাকের টানেই চেয়ার আসে, সেই সঙ্গে টেবিল আসে এবং সেই সঙ্গে চিনের কিম্বা টিনের বাসন নিয়ে আসে। এর পর আর হাতে খাওয়া চলে না, কারণ হাতে খেলে হাত মুখ দুই প্রক্ষালণ কর্‌তে হয় কিন্তু ছুরি কাঁটা ব্যবহার কর্‌লে শুধু আঙ্গুলের ডগা ধুলেও চলে, না ধুলেও চলে। এক কথায় বল্‌তে গেলে খানায়, পোষাকে "অঙ্গ অঙ্গীর" সম্বন্ধ বিরাজ করে। আহারের বিষয় উত্থাপন করে পানের বিষয় নীরব থাকলে অনেকে মনে কর্‌তে পারেন যে, প্রবন্ধটি অঙ্গহীন হয়ে রইল; অতএব এ সম্বন্ধেও দু এক কথা বলা আবশ্যক। পানের বিষয় হচ্ছে হয় ধুম, না হয় তেজ, মরুৎ এবং সলিলের সন্নিপাতে

যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাই। গাঁজা গুলি এবং চরসের পরিবর্ত্তে ভদ্র সমাজে যদি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ত সে দুঃখের বিষয় নয়। সুরাপান বেদবিহিত এবং আয়ুর্ব্বেদনিষিদ্ধ। "প্রবৃত্তিরেষা নরানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এ মনুর বচন। এবং শাস্ত্রমতে যেখানে স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতে বিরোধ দেখা যায় সে স্থলে শ্রুতি মান্য। রসিকতা ছেড়ে দিলেও, সুরাপানের দোষ গুণ বিচার করা এ প্রবন্ধে অপ্রাসাঙ্গিক হয়ে পড়বে। পানদোষ নীতির কথা, রীতির কথা নয়। সুরাপান একটি ব্যসন, ফ্যাসান্ নয়। পানাসক্ত লোক পানের প্রতিই আসক্ত, ইংরাজিয়ানার প্রতি নয়। মোহ এবং মদ দুটি স্বতন্ত্র রিপু। আমার উদ্দেশ্য ইউরোপের মোহ নষ্ট করা তার বেশি কিছু নয়। মানবজাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র কর্‌বার ভার সমাজ নীতি এবং ধর্ম্মপ্রচারকদের উপর ন্যস্ত করেছে।

(৭)

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, কেউ যেন মনে না করেন যে কোন সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দা কর্‌বার জন্যই আমি এ সকল কথার অবতারণা করেছি। যে সকল ইউরোপীয় হাল-চাল আমি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয় মনে করি, সে সকল কম-বেশি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেছে। আমি নিজে উপরোক্ত সকল দোষে দোষী। আমার সকল সমালোচনাই আমার নিজের গায়ে লাগে। দৈনিক জীবনে আমরা সকলেই অভ্যস্ত আচার ব্যবহারের অধীন। ভুল করেছি এই জ্ঞান জন্মান মাত্র সেই ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা যায় না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ করতে পার্‌লে ব্যবহারের অনুরূপ পরিবর্ত্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।

শ্রীপ্রমথ নাথ চৌধুরী।

সম্মোহন-বিদ্যা।

(৬)

আমরা বার কতক স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মাও পাইয়াছিলাম—তন্মধ্যে একজন ইংরাজ মহিলা ছিলেন। তিনি কিছুতেই তাঁহার নাম প্রকাশ করিলেন না, আমাদের সহিত বড় বেশি ক্ষণ কথাবার্ত্তাও কহিলেন না। মিডিয়মের দেহে আসিবার ঠিক পূর্ব্বে তিনি কোথায় ছিলেন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি উত্তরে বলেন—"আমি দার্জ্জিলিং পর্ব্বতের এক বৃক্ষশাখায় বসিয়াছিলাম; দার্জ্জিলিং আমার পক্ষে বড়ই মনোরম, আমি ঐ স্থানে থাকিতে বড়ই ভালবাসি। দার্জ্জিলং শৈলের স্নিগ্ধতা, ও মনোহারী দৃশ্য আমার চক্ষে চির নূতন!"

এই ইংরাজ মহিলা যখন কথা কহিতেছিলেন, তখন মিডিয়মের স্বর ঠিক স্বাভাবিক ছিলনা, যেন ইংরাজ মহিলারই গলার স্বর বলিয়া বোধ হইতেছিল—একটু খোনা-খোনা বেশ মিহি আওয়াজ!

তিনি যাইবার সময় একটি ইংরাজী গান গাহিয়া গেলেন—গানটী অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। আমরা যে দুই একবার ইংরাজ রমণীকে গাহিতে শুনিয়াছি, এ ঠিক তাহারই মত বোধ হইল, গলার সুরটি পর্য্যন্তও। গানটা এখনও আমাদের কাণের পাশে যেন ঝঙ্কার দিতেছে!

একটি বঙ্গ রমণীও আসিয়াছিলেন। মিডিয়মের দেহে আমাদের একবার হাত পড়িবামাত্রই তাঁহার দেহ কণ্টকিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের বলিলেন—"আমি স্ত্রীলোক, আপনারা আমাকে স্পর্শ করিবেন না; পরপুরুষের স্পর্শ আমাদের পাপ।"

(৭)

বেশি রকমের মেলা-মেশাতে মানুষের মধ্যে যেমন একটু হৃদ্যতা আসে, মনের একটু খোলা-খুলি ভাব হয়, অনেকদিন ক্রমাগত আত্মা-দের সংস্রবে আসিয়া আমাদের সহিত তাঁহাদেরও সেইরূপ হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁরা বড় বেশি বকিতে রাজী হইতেন না, কিন্তু শেষা-শেষি তাঁহাদের বাক্যস্রোত বন্ধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। আগে দু পাঁচ মিনিটের অধিক কেউ থাকিতে চাহিতেন না, কিন্তু অবশেষে তাঁহাদিগকে তাড়াইবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত।

প্রেতাত্মাদিগের সহিত যখন ক্রমে আমাদের এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাব আসিয়া দাঁড়াইল তখন যে সব প্রশ্নের জবাব আমরা পূর্ব্বে পাই নাই সেই সব প্রশ্ন আবার করিতে লাগিলাম। একদিন, একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আপনার মৃত্যুর পরই কি কি ঘটনা ঘটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলুন ত। তখন তিনি উত্তর করিলেন ঃ—

—"মৃত্যুর পূর্ব্বে, অসুস্থ অবস্থায় আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, সে সময়কার কোন কথা আমার মনে নাই। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর ক্রন্দনের রোলে আমার যেন চমক ভাঙ্গিল। তখনও পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, আমার মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত অবস্থায় আমার যেমন দেহ, যেখানে যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সাজান ছিল তখনও পর্য্যন্ত ঠিক্ তেমনিটি অনুভব করিতেছিলাম। দেখিলাম, আমার সম্মুখে মাতাঠাকুরাণী, তার পরে আমার স্ত্রী দুইজনেই আকুল হইয়া কাঁদিতেছে,— পাশে আমার ছোট ছেলেটী, সেও খুব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জননীর অঞ্চল ধরিয়া ক্রমাগতই আকর্ষণ করিতেছে—বালকের দুই গণ্ডে দুই ফোঁটা অশ্রু মুক্তাফলের ন্যায় গড়াইয়া পড়িতেছিল—দেখিয়াই আমি বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। সকলে কাঁদিতেছে কেন, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না। মাতাঠাকুরাণীর নিকট দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলাম—"মা কাঁদিতেছ কেন?" প্রশ্ন করিলাম বটে

বেশ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু কণ্ঠ হইতে কোন স্বর বাহির হইল না। ভাবিলাম কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া থাকিবে। গলাটা ভাল করিয়া সানাইয়া লইলাম। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, মনে হইল ঠিক উচ্চারণ করিলাম কিন্তু একটু টুঁ-শব্দ হইল না—ভাবিলাম, আমি বধির হইয়াছি না কি! মা'র গায়ে হাত দিলাম, তাঁকে বেশ রীতিমত ঠেলিলাম, কিন্তু স্পর্শ করিয়াছি অনুভব করিতে পারিলাম না। বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইলাম। বারম্বার কথা কহিয়া ও গাত্র স্পর্শ করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন চিত্ত বড়ই উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। মনে একটা ভয়ঙ্কর ক্ষোভ উপস্থিত হইল। আমি হতাশ হইয়া আমার শয্যার দিকে ফিরিলাম। বিছানার নিকট গিয়া দেখি, আমার দেহ কাষ্ঠের মত বিছানার উপর পড়িয়া আছে! এই ব্যাপার দেখিয়া আমি এতদূর বিস্মিত হইলাম যে জীবনে কখনও হই নাই। জীবিত অবস্থায় মৃত্যু বলিয়া যে একটা সংস্কার ছিল, ছাঁৎ করিয়া তাহাই মনে উদিত হইল—সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম আমি মরিয়াছি। এই কথা মনে হইবামাত্র আমার যে কতদূর কষ্ট হইল তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই, এ কষ্ট যার না হইয়াছে সে বুঝিতে পারে না। মনে মনে যেন জ্বলিতে লাগিলাম। তখনও জননী ও স্ত্রীর আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল। আমি ঘরের মধ্যে ব্যাকুল হইয়া ছুটা-ছুটি করিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতেছিল, যদি কণ্ঠে একবার স্বর ফুটে ত স্ত্রী ও জননীকে একটু প্রবোধ দিই,—জানাই আমি এখানেই আছি। কিন্তু তা কিছুতেই হইল না। জীবিত ও মৃতের পার্থক্য এইখানে মজ্জায় মজ্জায় অনুভব করিলাম। যথাসময়ে আমার শব আত্মীয়-বন্ধুরা উঠাইয়া লইয়া গেল, আমি তাহাদের সহিত একটুখানি এগাইয়া গেলাম, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলাম। কি যেন একটা আমার পথরোধ করিল—মন কিছুতেই বাটী ত্যাগ করিতে চাহিল না—কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া যাই! মায়া এমনই।"

"আমি আমার বাটীর মধ্যেই কিছু দিন রহিয়া গেলাম। মনে ক্রমাগতই ইচ্ছা হইতেছিল, পুত্রটীকে একটু আদর করি, জননীকে একটু প্রবোধ দিই, স্ত্রীর সহিত একটু কথাবার্ত্তা কই। কিন্তু হায়! আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। কথা কহি, কিন্তু স্ত্রী তাহা শুনিতে পায় না, জননীকে প্রবোধ দিই, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছায় না,

আদর করি সে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কই? এর চেয়েও আর কি কষ্ট আছে? অবশেষে নিরস্ত হইলাম, কিন্তু বাটী ত্যাগ করিতে তখনও মন চাহিতেছিল না—আহা! যতক্ষণ পুত্রটীকে দেখিতে পাই। বুঝিতেছ, মৃত্যুর পর কি ভয়ঙ্কর যন্ত্রনা!"

এইখানে প্রেতাত্মা একটু চুপ্ করিলেন। আমরা বলিতে আবার বিশেষভাবে অনুরোধ করিলাম তখন তিনি বলিলেন,—

"তার পর আর কি? ক্রমেই মনটা একটু নরম হইয়া আসিল, তখন মনে হইল, বাটীর ভিতর থাকিয়া লাভ কি?—তৃপ্তি ত নাই! তখন সেখান হইতে বাহির হইলাম, এক অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে লাগিলাম। ক্রমেই পৃথিবীর পথ, ঘাট, মাঠ, গাছপালা আর কিছুই চোখে ঠেকিল না—খানিকক্ষণ পরে দেখি, কোথায় এসে পড়েছি, সে যেন অন্ধকারের রাজত্ব—চারিদিকে খালি অন্ধকার, ঘন অন্ধকার অত অন্ধকার অমাবস্যার রাত্রেও নেই। বাপরে! সে অন্ধকারের কথা মনে হ'লে শরীর এখনও শিহরিয়া উঠে। তোমরা সে অন্ধকার ধারণায় আনিতে পার না। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না, কাজেই কোন্ দিকে যাই তার একটা ঠিকানা পাইতেছিলাম না—আর ঠিক্ করাও অসম্ভব তখন অন্ধকারের ভিতর যেদিক হউক্ একদিকে যাইতে লাগিলাম, ক্রমাগতই সেই অন্ধকারের ভিতর ঘুরিতে লাগিলাম, সে কত দিন কত বৎসর তার কিছুরই ঠিক নাই।"

প্রেতাত্মা হঠাৎ চলিয়া গেলেন—মৃত্যুর পরের ঘটনা শোনা আমাদের অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

(৮)

একবার এক প্রেতাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাঁহারা মিডিয়মের দেহে প্রবেশ করেন কেন? কি উদ্দেশ্যে?

উত্তরে তিনি বলেন—"জীবিত অবস্থায় আমাদের যে সকল ভোগ-তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং যাহা পূর্ণও হয় না, মৃত্যুর পর দেহ-ত্যাগের সঙ্গে আমরা তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে পারি না। পৃথিবীতে সে সমস্ত কখন-না-কখন পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এখানে তাহা

অভাব নাই, কিন্তু জড়দেহ না থাকায় সে সমস্ত ব্যবহার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমাদের স্পর্শে অনুভূতি নাই, আহার করিলে স্বাদ পাই না। তোমরা যে উপায়ে নিজেদের অভিলাস পূর্ণ করিতে পার, আমাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, আমরা তাহা পারি। ভোগের বাসনা খুবই প্রবল, কিন্তু তাহার নিবৃত্তি করিবার উপায় নাই—অন্তরে প্রবল তৃষ্ণা, সম্মুখে সুশীতল বারি, পানও করিতেছি কিন্তু তৃপ্তি নাই, জলপান করি আর না করি তফাৎ কিছু বুঝিতে পারি না। সব তাতেই অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তির জ্বালায় আমরা জ্বলিয়া মরিতেছি। যার যত কম ভোগ-তৃষ্ণা সেই আমাদের মধ্যে তত সুখী। এই আমাদের নরক যন্ত্রনা—নরক বলিয়া আর কি কিছু আছে? নরক ইহা অপেক্ষা আর কি যন্ত্রনা দিবে?"

"আমাদের ভোগের ইচ্ছা মিটাইবার জন্য সর্ব্বদাই আমরা পাগলের মত বেড়াইতেছি। হিপনটাইস্ করিয়া তোমরা একজনের চৈতন্য অপহরণ করিলে তাহার দেহে প্রবেশ করিবার সুযোগ ঘটে, আমরা একটা জড়দেহের আশ্রয় পাই তাহাতে আমাদের বাসনার একটু তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা হয়, সেই জন্য আমরা মিডিয়মের দেহে প্রবেশ করি। তাহাতে আমাদের কতকটা তৃপ্তি হয়, কিন্তু এই সামান্য তৃপ্তির জন্য আমাদের শাস্তি অতি কঠোর। তবুও এ প্রলোভন আমরা ত্যাগ করিতে পারি না।"

এক দিন এক প্রেতাত্মা আসিয়া বলিলেন—"আমাকে একটু তামাক খাওয়াইতে পারেন? বহুদিন আমি তামাক খাই নাই। তামাক খাইব্যর ইচ্ছাটা অনেক দিন হইতে বড়ই হইয়াছে, একটু খাওয়াবেন কি?"

আমরা তামাক সাজাইয়া বেশ করিয়া খাওয়াইলাম।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

LIBRARY

অত্যাচারীর প্রতি।

(পৌরাণিক গাথা)

হিমালয় শৈলপ্রস্থে যবে দৈত্যরাজ
  প্রাণপণে ছিল রত ব্রহ্মার সাধনে ;
সহস্র শতাব্দী-সতী শতরঙ্গে আসি
  বসন্ত শরৎ আদি অযুত কুসুমে
  দিতেছিল পুষ্পাঞ্জলি চরণে তাহার ;
  তখন মাহিমা তার ছিল দেখিবার !

যুগব্যাপী সমাধির পূর্ণতা বহিয়া
  তাহার মানসরাজ্যে প্রথম যে দিন,
পরিতুষ্ট পরমেষ্ঠী—বরাভয় করে
  দেখা দিল যেন এক সবিতা নবীন,—
  তপঃক্লশ নেত্রপুটে বহি অশ্রুভার
  ব্রহ্মারে হৃদয় ভরি' হেরে বার বার !

"হে কশিপু" কহে বেধা, "তব সাধনায়
  হইয়াছি পরিতুষ্ট ; মেগে লও বর ;
দৈত্যপতি দেহবলে উন্মত্ত স্বাধীন
  ভাবে মনে—"হব আমি অজর, অমর ;
  বিনাশের শতরন্ধ্র রোধ করি দিয়া,—
  স্বর্গমর্ত্ত্য করতলে লইব পীড়িয়া !"

তাহার জাগর-স্বপ্নে করিয়া আঘাত,
  "বর চাও ?" পদ্মযোনি কহে পুনর্ব্বার।
পুলকে, আনন্দবেগে শিহরি,' শিহরি'
  হিরণ্য-কশিপু লুটে চরণে ব্রহ্মার।
"তুষ্ট তুমি যদি দেব ! দাও এই বর
  হব আমি ত্রিলোকের অখণ্ড ঈশ্বর !"

"তথাস্তু" কমলযোনি কহিলা অমনি।
কশিপু কহিলা কাঁপি—"এই বিশ্ব'পর
অস্ত্রেশস্ত্রে জগতের কোন প্রহরণে
পশুপক্ষী দেবনরগন্ধর্ব্বকিন্নর
কিছু যেন নাহি পারে করিতে আমায়,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে দিবসে নিশায়।"

হাসিয়া "তথাস্তু" কহি' ব্রহ্মা অন্তর্হিত।
দুর্জ্জ্ঞেয় অদৃষ্টসম সে হাসি কঠিন।
বরদৃপ্ত দৈত্যপতি ভাবে মনে মনে
"মরণবিজয়ী আমি হ'নু চিরদিন।
কৌশলে ব্রহ্মারে ছলি' লইয়াছি বর ;—
হয়েছি অমর—আর হ'ব একেশ্বর।"

বিচিত্র বিলাস মধু ত্রিলোক মথিয়া,
পান করি দৈত্যরাজ যুগযুগান্তর,
উচ্ছৃঙ্খল লালসার উৎকট দাহনে
লাগিল করিতে দগ্ধ বিশ্বচরাচর!
দিক্‌পাল, ধর্ম্মরাজ ঢালি' অশ্রুধার
কহিলা বিধাতা কাছে—"কর প্রতীকার"!

বিনাশের শতচ্ছিদ্র রোধ করি সুখে
কশিপু বসিয়াছিল নিশ্চিন্ত—অটল!
ভ্রমেও কভু সে হায়! করেনি কল্পনা
নিজ গৃহ কোণে তার জ্বলিবে অনল!
মৃত্যু যার এল' যবে এল ঋজুপথে
যার কথা সে কথনো ভাবেনি জগতে!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

কনে-বদল।

(প্রহসন)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(জগৎ বাবুর বহির্বাটীর একটি কক্ষে শ্রীধর চৌকীতে আসীন।)

উঃ ভারী nervous মনে হচ্ছে, বুকটা ভারী গুর গুর করছে, কি ক'রে কথা শুরু করব ? প্রথমেই কি বল্‌ব ? My hope and heart is with thee O fair চন্দ্রাবতী ; উঁহু এটা বলা ঠিক হবেনা, সবাই ভাববে—ছোকরা গাছে না উঠতে এক কাঁদি ! আগে তার সৌন্দর্য্যের বর্ণনাটা করা চাই। যদি বলি—

What heavenly smiles O lady mine !
Through my very heart they shine !

কিন্তু চন্দ্রাবতী যে হাস্‌তে হাস্‌তেই এসে দাঁড়াবেন এমনটা ত ঠিক বলা যায় না, তা ছাড়া আগে ত অভিবাদন, তারপর ত অভিনন্দন। ঠিক হয়েছে প্রথমে কবিতা টবিতা নয়, শুধু বল্‌ব দেবি নমস্কার। তারপর একটু কথাবার্ত্তা হবার পর বরঞ্চ বল্‌তে পারি—

There be none of beauty's daughters
With a magic like thee,
And like music on the water
Is thy sweet voice to me.

কিন্তু কি বক্‌ছি ! আমি যে স্বদেশী ! সেটা এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলুম। ইংরাজি কবিতায় প্রেমালাপ করলে চলবেনা ত

বাঙ্গ্‌লায় বল্‌তে হবে। তা সেজন্য ভাবনা কি, আজকাল ত বাঙ্গ্‌লায় এ রকম কবিতার কিছু অভাব নেই। দেব-কৌতুকের এ লাইন গুলো বেশ খাটতে পারে—

এ কি কারে দেখি!
অমৃত-রূপিণী বালা, ভারতীর বীণা
রতি সুখে ঝঙ্কারি উঠিল যেন মরি!
মুহূর্ত্তে হৃদয় কুঞ্জে মুঞ্জরিয়া তুলি
অস্ফুট আশার কলি পরিমলাকুল,
গুঞ্জরিত করি মত্ত মন মধুকর।

কিন্তু কই এখনোত কেউ ডাক্‌তে আস্‌ছে না—কতক্ষণ এমন করে বসিয়ে রাখ্‌বে!

এমনে কেমনে রব না দেখে তাহায় রে!
গণিয়ে নিমেষ পল দিন না ফুরায় রে!
শবদে চমকি উঠি, দুরু দুরু হিয়া,
প্রাণ যারে চায় কেন বিধি না মিলায় রে।

(টেবিল বাজাইয়া গান, ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্—বাড়ীর ভিতরে ডাক্‌ছেন।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ ও অন্তঃপুরে প্রবেশ)

ভৃ। আপনি এইখানে বসুন আমি খবর দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

(প্রভাবতীর ও ক্ষেপির মার দুই পাশের পরদার আড়ালে অবস্থিতি। প্রভাবতীর ক্ষেপিকে লইয়া প্রবেশ। শ্রীধরের চৌকি হইতে উত্থান।)

চ। (স্বগতঃ) পাশ থেকে ভাল দেখ্‌তে পাচ্ছিনে—তবু ঢের বদল মনে হচ্ছে। (প্রভাবতীর ধীরে ধীরে ক্ষেপির অবগুণ্ঠন মোচন ও

চন্দ্রা হাসিয়া) নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন—আমি নই। একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। আমাকে এখনো তাহলে ভোলেননি দেখ্‌ছি। এ ছলনা আর ভাল লাগছেনা, ইচ্ছা কর্‌ছে এখনি কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

শ্রী। (সবিস্ময়ে) ইনি কে?

প্র। (কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া) চিন্‌তে পারনা! এই কবছরের মধ্যেই ভুলে গেলে?

শ্রী। ইনিই কি চন্দ্রা?

ক্ষে। আমি তোমারি—অস,—পান।—

শ্রী। ইনি বলেন কি? (স্বগত) কথাগুলো যে চেহারার চেয়ে আরো ভয়ানক!

প্র (মৃদুস্বরে) চুপ কর!

ক্ষে। আমি তোমা বই আমিনে।

শ্রী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এই প্রেমালাপ! এ যে বিছার কামড়? দোহাই আপনাদের—আমি শশীদাদা নই—আমার নাম শ্রীধর, ভুল করে এ বাড়ীতে এসে পড়েছি।

(ক্ষেপির মার প্রবেশ)

মা। তা যেই হও বাছা আমার মেয়ের সঙ্গে কিন্তু তোমায় পাকা করে যেতে হবে।

প্র। (হাসিয়া) আবার এ একটা নতুন চাতুরী দেখ্‌ছি!

শ্রী। আজ্ঞে না আমি ঠিক বল্‌ছি, আমি শশীনাথ নই,—আমি শ্রীধর। আমি গিয়েই তাঁকে পাঠিয়ে দেব। (প্রস্থানোদ্যত)।

মা। সে যদি না আসে তাহলে আমি কিন্তু বাছা তোমাকে ছাড়ব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(শশীনাথের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ)

শ। কি সর্ব্বনাশ! ঐ শ্রীধরের মালতী! দেখে ত নয়ন জুড়িয়ে গেল। আঃ ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে তবে দম ছেড়ে বাঁচি। রাতটা তবুও দুঃস্বপ্নেই কেটেছে। নিশ্চয়ই শ্রীধর সব জেনে শুনে মতলব করে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিল। হাঃ হাঃ হাঃ আমি কিনা অমনি কচি খোকাটি, যা হাতে দেবে তাই মুখে পুরে ফেল্‌ব। দাঁড়াওনা ভায়াকে একবার মজাটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে সয়তানের নাম কর্‌তে সয়তান এসে হাজির।

(শ্রীধরের প্রবেশ)

শ্রী। দেখ শশী দাদা,—এই রকম কাজটা কি তোমার ঠিক হয়েছে?

শ। কি সেয়ানা ছেলে গা, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার চেষ্টা! আমাকে তেমন বোকা পাওনি ভায়া, যে আমি তোমার বোঝাটি অমনি ধাঁ করে ঘাড়ে চড়িয়ে নেব।

শ্রী। বটে! তুমি নিজে যেচে ছোট মেয়ে চাইলে, আমি তোমাকে পথ বাৎলে দিলুম মাত্র, আমি ত আর তোমাকে সাধতে যাইনি।

শ। ঐ তোমার ছোট মেয়ে! গড় করি তোমার ছোট মেয়ের পায়! তাহলে আমার চন্দ্রা কি অপরাধ কর্‌লে? এত এত চেহারা দেখেছি এমন চেহারা কারো দেখিনি!

শ্রী। আর ঐ তোমার রূপবতী বিদ্যাবতী সুখবতী চন্দ্রাবতী! মূর্ত্তি দেখেই ত চক্ষুস্থির! নিজে বিয়ে করবেনা করবেনা, কেউ ত গলায় বেঁধে দিত না, আমাকে কেন বিপদে ফেলা।

শ। দেখ্ আর যা বলবার বল্ কিন্তু এরকম মিথ্যা অপবাদ দিলে আমি তোর গলা টিপে ধরব। চন্দ্রা রূপবতী নাত কি ? আমি তাকে ৫।৬ বছর আগে দেখে গেছি পদ্মমাসুন্দরী মেয়েটি, আর দুদিনে তোর কথাতেই সে বদলে যাবে ?

শ্রী। (ঘুসি বাগাইয়া) শর্ম্মা ভয় পাবার পাত্র নন, ঘুসি বিদ্যায় স্বয়ং দ্রোণাচার্য্যের ছাত্র ! এসনা কে কার গলা টিপে দেয় দেখা যাক। আমিও মালতীকে ছেলেবেলায় দেখেছি ; তখন ত ভালই দেখ্‌তে ছিল। এই কবছরে সে যদি বদলে গিয়ে থাকে তাহলে তোমার চন্দ্রা আর বদলাতে পারে না ? তোমার চন্দ্রাবতী একশবার, হাজারবার, লক্ষবার কুরূপা কদাকারা।

শ। মিথ্যাবাদী, ব্ল্যাগার্ড, দাঁড়াও না দেখিয়ে দিচ্ছি—

(উভয়ের ঘুসাঘুসি।)

শ। কেমন—এইবার।

শ্রী। কেমন, এখন !

শ। এই দেখ্‌না, কেমন টের পাইয়ে দিচ্ছি। (শ্রীধরকে দেয়ালে ঠাসিয়া ধরিয়া) কেমন আর মিথ্যা বল্‌বি ? বল চন্দ্রা সুন্দরী—তবে তোকে ছাড়ব।

শ্রী। এই চোখে দেখে এসেছি দাদা, প্রাণ যায় সেও স্বীকার তবু তোমার চন্দ্রাকে চন্দ্রবদনী বল্‌তে পারব না। চন্দ্রা একশবার থ্যাঁদা নাকী টেরা নয়নী।

শ। (শ্রীধরকে ছাড়িয়া)। আর তোমার মালতী, চঞ্চুনাসা, মৃগনয়নী—কেমন ?

শ্রী। চঞ্চুনাসা নয়, ছেলেবেলায় সুনাসা, সুনয়নী, ফুল্লাধরী ছিল বটে—কিন্তু—

শ্রী। না আমি মালতীর কথাই বল্‌ছিলুম, চন্দ্রা কোটরচোখী টিল-কপালী, পেঁচামুখী।

শ। হাঃ হাঃ ভায়া আমি মালতীর যে রকম চেহারা দেখে এসেছি তুমি দেখ্‌চি ঠিক সেই রকম বর্ণনা করছ। চন্দ্রাকে দেখ্‌তে গিয়ে তুমি মালতীকেই দেখেছ; নিশ্চয়ই তুমি ভুল বাড়ীতে গিয়েছিলে।

শ্রী। তুমি যে বাড়ীতে বলেছিলে আমি ঠিক সেই বাড়ীতেই গিয়েছিলুম। ১০ নম্বর হাড়কাটা গলি ত?

শ। হ্যাঁ ঠিক ঐ নম্বরইত বটে। তবে চন্দ্রাকে দেখনি আর কাউকে দেখে থাকবে।

শ্রী। নিশ্চয়ই চন্দ্রা। তাঁর দিদি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, তোমাকে ভেবে নানা কথা কইলেন। মেয়েও বড় বটে—দেখা হতেই প্রেমালাপ—

শ। তা হতেই পারেনা, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারিনে। চন্দ্রা লাজুক, নম্র, সুশীলা, এ ত আর তোমার মালতী নয়, যে দেখা হতেই আকর্ণ বিস্তার করে হাস্‌বে। তার সেই বদনব্যাদানীরূপ দেখেই ত আমি দে ছুট্‌।

শ্রী। অত কথায় কাজ কি, এখনি চল আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হোক্‌।

শ। সে ভাল কথা, চল। তোমার সমস্ত কথাই আমার ধাঁধাঁ বলে মনে হচ্ছে। চন্দ্রা কি এই কবছরে স'ত্যই এত বদল হয়েছে।

শ্রী। আশ্চর্য্য কি! যদি মালতী বদলে থাকে ত চন্দ্রাও বদ্‌লাতে পারে না। অমন ডাক্তারি কেস্‌ ত দু একটা শোনা গেছে।

(উভয়ের নিষ্ক্রমণ ও কিছু পরে পুনঃপ্রবেশ)

শ। হাঁ, এই বাড়ীই বটে! আচ্ছা তুমি একটু বাইরে দাঁড়াও, আমি ধাঁ করে ভিতরে গিয়ে একবার রহস্যখানা ভেদ করে আসি। [প্রস্থান।

আমিও কেন এই তক্কায় শিশির বাবুর বাড়ীটা একবার ঘুরে আসিনা। একবার নিজের চোখে না দেখ্‌লে শশীদাদার কথাটা ঠিক বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিনে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(শিশির বাবুর বহির্বাটীর একটি কক্ষে একখানি চৌকিতে মালতী আসীন, তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর একখানি খোলা বই।)

মা। (পড়িতে পড়িতে মুখ উঠাইয়া) কই এখনো ত মেম এলেন না, আমার ত এ গল্পটা পড়া শেষ হয়ে গেল, যে যে জায়গাগুলির মানে বুঝতে পারিনি, তিনি এসে বুঝিয়ে দেবেন। এইবার বুঝি আসছেন,—পায়ের শব্দ পাচ্ছি। (উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন।)

(শ্রীধরের প্রবেশ।)

শ্রী। এইকি শিশির বাবুর বাড়ী?

মা। (স্বগতঃ) একি! ইনি কে?

শ্রী। এইকি শিশির বাবুর বাড়ী?

মা। আজ্ঞে হঁ্যা।

শ্রী। (স্বগতঃ) দিব্যি মেয়েটি, এটি কিন্তু মালতী হলে মন্দ হয় না। ফন্দী করে জেনে নিতে হচ্ছে মেয়েটি কে। (প্রকাশ্যে) আমি বৌদিদির তল্লাসে এখানে এসেছি তাঁর আজ এখানে আসার

মা। বৌদিদি !

শ্রী। শ্রীমতী ললিতাদেবী, আমার দাদার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছে। অনেক দিন আসিনি তাই চিন্‌তে পারছ না দেখছি।

মা। (সলজ্জে) ওঃ দিদি ! কই তিনি ত আজ আসেন্ নি।

শ্রী। (স্বগতঃ) আমার অনুমানটা দেখ্‌ছি ঠিক্ হয়েছে। মালতীই বটে। আমি ভেবে ছিলুম্ ১৪।১৫ বছরের মেয়ে নিতান্ত ছোট হবে কিন্তু তেমন ছোটত মোটেই নয়, আর বড় হয়ে কি সুন্দর দেখ্‌তে হয়েছে। (প্রকাশ্যে) তবে কি তাঁর জন্যে একটু অপেক্ষা কর্‌ব ? তিনি আমাকে আস্‌তে বলেছিলেন।

মা। (অবনত মস্তকে পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আপনি তাহলে বসুন্, আমি মাকে খবর্ দিয়ে আসি।

শ্রী। তোমায় খবর্ দিতে হবে না, আমি নীচে থেকেই তোমাদের চাকরকে দিয়ে তাঁকে খবর্ পাঠিয়েছি। তোমার হাতে ও বই-খানি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

মা। ল্যাম্‌শ্ টেল।

শ্রী। ইংরাজিও পড় ? ইংরাজি কোন কবিতার বই পড়েছ ?

মা। মুরের একখানা ছেঁড়া বই কুড়িয়ে পেয়েছিলুম,—ভাল বুঝতে পারিনে।

শ্রী। যদি বল, আমি বুঝিয়ে দিতে পারি। আমাকে নিতান্ত পর বলে মনে হচ্ছে কি ? ছেলেবেলায় ত কত এসেছি।

(মালতীর নীরবে সলজ্জ মৃদুহাস্য।)

শ্রী। (স্বগতঃ) এই লজ্জার হাসিটি কি মনোহর। যত দেখ্‌ছি একটি কবিতা যেন মূর্ত্তিমতী বলে মনে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বাঙ্গলা কবিতা কি বেশী পড় ?

শ্রী। বল দেখি, এ কবিতাটি কোথায় আছে ?—

হেরিলে ও সুধাময়ী প্রতিমার রূপ
চাঁদের আলোক স্নিগ্ধ ঝরে আঁখি পরে
উঠিলেন পদ্মাসনা সমুদ্রমন্থনে
যে মোহিনীরূপে,—আজি তাহাই নেহারি।

মা। (লজ্জিতভাবে) যাই আমি মাকে খবর দিয়ে আসি। [প্রস্থান।

শ্রী। উঃ কি ভুলই করেছিলুম! আমি ত কিছুতেই আর একে শশী দাদাকে দিতে পারব না।

(মালতীর মাতার প্রবেশ)।

শ্রী। নমস্কার।

মা। বেঁচে থাক বাছা, চল বাড়ী ভিতরে। তোমাকে দেখে কত যে আহ্লাদ হচ্ছে। কাল তোমার আসার কথা ছিল ?

শ্রী। আস্‌তে পারিনি।

মা। তোমার শশীদাদাকে পাঠিয়েছিলে ?

শ্রী। (স্বগতঃ) সত্যি তাহলে শশীদাদা কাল এসেছিলেন। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ আমার হয়ে তাঁকে দেখে যেতে বলেছিলুম।

মা। বাছা সে কথা আর কি বল্‌ব ? তোমার বৌদিদি মালতীর বদলে ক্ষেপিকে দেখিয়েছিলেন।

শ্রী। তাই বুঝি ? ওঃ এখন সব বুঝ্‌ছি।

মা। তা এস বাছা বাড়ীর ভিতরে।

(ভৃত্যের প্রবেশ)।

চা। বাবুকে এখানে আস্‌তে দেখে ও বাড়ীর কানাই এই চিঠিখানা দিয়ে গেল।

শ্রী। দেখি।

[চিঠি দিয়া ভৃত্যের প্রস্থান।

শ্রী। (পত্র পাঠ) একি ব্যাপার ! এযে উকীলের চিঠি !

মা। চিঠিখানা পড়ে যে মুখ শুকিয়ে গেল ; কি চিঠি বাবা !

শ্রী। কি সর্ব্বনাশ। হরিহর বাবুর মেয়েকে পাকা দেখা দেখেছি এখন যদি বিয়ে না করি ত তিনি মকদ্দমা আনবেন এই হচ্ছে নোটিস।

মা। ওমা কোথায় যাব গো ! বড়ঠাকুরের কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে ? তোমার বৌদিদির বুদ্ধির দোষেই কিন্তু এটি ঘটলো।

শ্রী। কিন্তু আমি ত সে মেয়েকে মোটেই দেখিনি—দেখেছেন শশীদাদা। তাহলে এ নোটিস ত আমার হতে পারে না, আঃ বাঁচা গেল ! আমি একবার এখনি তাঁর কাছে যাই, আবার কাল আস্‌ব। নমস্কার।

মা। কি গেরো ! যদি বা অনেক সাধ্যসাধনায় বাছা এল, আস্‌তে না আস্‌তে আবার এই বিপদ। যাই একবার ক্ষেপির মার কাছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(জগচ্চন্দ্রের বাড়ীর দ্বারদেশে শশীনাথের প্রবেশ।)

শ। যেতে লজ্জা কর্‌ছে। নাঃ যেন কিছুই হয়নি,—এমনি ভাবে যাওয়াই ভাল। খবর্ না দিয়েই হঠাৎ যাই গিয়ে পড়িগে।

[নিষ্ক্রমণ।

(গৃহমধ্যে হারমোনিয়ম বাজাইয়া চন্দ্রাবতীর ধীরে ধীরে গান। শশীনাথ গৃহের পরদার আড়ালে আসিয়া দণ্ডায়মান।)

চ।— গান।

আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে !
সুখ বা দুখ দিতে, কে আছে ধরণীতে
একেলা পড়ে আছি এ মরুস্থলে !
আমারো আঁখি ভাসে কেন গো জলে।
আমি ও কোন ভুলে মালিকা গাঁথি ফুলে
পরাতে মধু রাতে কাহার গলে !
আমি ও রচি গান, ললিত নব তান
নিভৃতে গাহি মরি, কিসের ছলে !
আমি ও কি আশায়, বিজনে সাজি হায় !
বাসনা ব্যথা বহি মরম তলে !
আমি ও কাঁদি হাসি, কাহারে ভালবাসি !
মোরে কে মনে করে আপনা বলে !
আমারো আঁখি কেন ভাসে গো জলে !

শ। সত্যিই কি আমি এতদিন ভুলে ছিলুম্ ! ভারী আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে। (চন্দ্রার নিকট আগমন।)

চ। (সবিস্ময়ে গান বন্ধ করিয়া)—একি ?

শ। থামলে কেন ?

চ। আপনি এতদিন পরে !

শ। এতদিন ! আমার ত মোটেই এতদিন ব'লে মনে হচ্ছে না। যেন এই কাল তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছি আর আজ ফিরে তোমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। তুমিত বিশেষ বদল হওনি।

শ। (গোঁপে তা দিয়া) গোঁপটা বুঝি বেড়েছে। কিন্তু আমিত ছেঁটে ছুটে ঠিক্ সমানটিই রাখতে চেষ্টা করি। যা হক্ তবুত চিনেছ!

চ। আমার চেনা আশ্চর্য্য কি! আপনি যে চিনেছেন সেই ঢের! বস্থন্ দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? আমি যাই দিদিকে ডেকে আনি।

শ। না না এখন্ যেয়োনা; একটু বস, তোমার কাছে আমার মাপ চাইবার ঢের আছে।

চ। সে সব হবে এখন আমি যাই দিদিকে ডেকে আনি। আর আপনার জন্য চা গুছিয়ে আনি। আপনিত আগের মত চা ভাল বাসেন? [প্রস্থান।

শ। আতিথ্যের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি। সর্ব্বগুণে গুণবতী। আমি দেখ্‌ছি নিতান্তই বাঁদর, তাই ভেবে নিয়েছিলুম্ আমাদের দেশে বড় মেয়ে আর শিক্ষিতা মেয়ে হলে ভারী অকর্ম্মা হয়। এমন রত্ন কি না আমি শ্রীধরকে দিতে যাচ্ছিলুম। কি ভুলই করেছি। ভাগ্যিস্ আজ এলুম্।

(প্রভাবতীর প্রবেশ।)

প্র। এই যাঃ আগেই চন্দ্রাকে দেখে ফেলেছ, খবর্ দিয়ে এলে আর দেখ্‌তে দিতুম্ না।

শ। মাপ কর্‌তে আজ্ঞা হোক্।

প্র। কাল তোমার বন্ধুর উপর দিয়েই চোট্‌টা গেছে, আর আজ তোমাকে দেখে রাগটাও পড়ে গেল।

শ। বটে! বন্ধুকে কাকে দেখিয়েছেন্?

প্র। একটি অখণ্ডে অবধ্যে মেয়ে আছে, যাকে কেউ নিতে চায় না।

শিক্ষিতা মেয়ে চাও না, বিলাত গিয়ে নতুন রুচি নিয়ে এসেছ, ভাব্‌লুম্ রুচির দৌড়টা এক বার দেখা যাক্।

শ। তাই বটে! মেয়ে দেখে সে ত আমাকে ভারী বিপদে ফেলেছে।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃ। আজ্ঞে শ্রীধর বাবু আপনাকে খবর দিতে বল্লেন।

শ। ওঃ শ্রীধর! (স্বগতঃ) তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে এসেছি সেটা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম্। এতক্ষণ ধরে সে অপেক্ষা করছে চলে যায় নি? কি ফের! (প্রকাশ্যে) বল আমি এখনি যাচ্ছি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।]

(চন্দ্রার চায়ের থালা হস্তে প্রবেশ ও থালা টেবিলে রাখিয়া এক পেয়ালা চা শশীর হস্তে প্রদান।)

শ। (চা খাইতে খাইতে) এতদিন পরে চা খেয়ে আরাম হোল!

(চন্দ্রাবতী ও প্রভাবতীর হাস্য।)

প্র। এতদিন যেন কেউ এখানে এসে চা খেতে বারণ করেছিল!

শ। (স্বগতঃ) যেতেও ইচ্ছা কর্‌ছে না; কিন্তু না গেলে যদি সে এসে পড়ে আর চন্দ্রাকে দেখে ফেলে, ভয়ও কর্‌ছে।

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

ভৃ। শ্রীধর বাবু বল্লেন, আপনি যদি এখন তাঁর সঙ্গে নীচে গিয়ে দেখা কর্‌তে না পারেন—ত তিনি এই খানেই এসে দেখা কর্‌তে চান।

শ। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! সেটি হচ্চে না। (চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখিয়া) আমি চল্লেম্—দিদি, তাকে বিদেয় করে এখনি আস্‌ছি।

প্র। সে কি কথা, চাটা খেয়ে যাও।

শ। এসে খাব, আমি এখনি আস্‌ছি। [দ্রুতবেগে প্রস্থান।

প্র। আমরা চল্‌ ছাতে বসিগে—চাকরকে বলে দিই শশী এলে বল্‌বে আমরা ছাতে আছি। [প্রস্থান।

(শ্রীধর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া পায়চারি করিতেছে,
শশীর প্রবেশ)

শ। ভায়া, তুমি যা বলেছিলে, একেবারে সত্যি! খাঁদানাকী, কোটর-চোখি, টিপকপালি, পেঁচামুখী একেবারে হুবহু ঠিক! আমিত দেখে অবাক, চন্দ্রা এমন বদলাবে তা আমি স্বপ্নেও মনে কর্‌তে পারিনি, সেইজন্য এতক্ষণ লজ্জায় তোমার কাছে আসতে পারিনি।

শ্রী। (স্বগতঃ) তাত আমি আগেই জানতুম—নইলে আমাকে গছাবার চেষ্টা! এখন মালতীর দিকে যে দৃষ্টি না দিলে বাঁচি। (প্রকাশ্যে) সে কথা এখন থাক, একটা—

শ। সে কথা থাক্‌লে চলে কই। আমাকে মাপ কর ভাই, আমার কর্ম্মফল আমিই বহন কর্‌ব—তোমাকে আর সেজন্য ভীত হতে হবেনা।

শ্রী। সেজন্য আমি ভীত হচ্ছিনে দাদা,—একবার এই নোটিস খানা দেখ দেখি।—

শ। (নোটিস পাঠ করিয়া) পড়লুম—হরিহর বাবু তোমার নামে মকদ্দামা—

শ্রী। আমার নামে? তোমার নামে বল? আমিত আর সেদিন শিশির বাবুর বাড়ি যাইনি—আর হরিহর বাবুর মেয়ে যে কেমন তা এ চর্ম্মচক্ষে দেখিও নি।

শ। তাতে কি এল গেল! আমিত তোমার হয়েই দেখেছি, তারা

শ্রী। তা জানলে কি হবে? যে মেয়ে দেখেছে সে যে শ্রীধর নয়, জলজ্যান্ত শশীনাথ; তার ত অকাট্য প্রমাণ পড়ে রয়েছে।

শ। এ আইনের কথা ভায়া—অকাট্য প্রমাণ বলে অত আস্ফালন কর্‌লে চলবেনা,—আমি তোমার হয়ে act করেছি মাত্র—অতএব এ নোটিস আমাতে বর্ত্তাতে পারেইনা, তুমি বল্লেই ত আইন উল্টে যাবেনা।

(একজন চাপরাশির প্রবেশ)

চা। সেলাম, আপনার নামে একখানা চিঠি আছে।

শ। চিঠি! কই দেখি!

[চাপরাশি পত্র দিয়া সেলামপূর্ব্বক প্রস্থান।

শ। একি ব্যাপার! আমার নামেও যে ঐ নোটিস!

শ্রী। (মহা হর্ষে) দেখি দেখি! তা বেশ হয়েছে? দুজনকে দিয়েছে তবু ভাল! এখন ব্যারিষ্টার সাহেব এর প্রতিবিধান?

শ। কিন্তু দুজনকেই কেন দিলে—আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিনে।

শ্রী। আমি পেরেছি—হো হো হো!

শ। আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে উঠেছে—আর তোমার এখন হাসি কি বুঝেছ শুনি।

শ্রী। তুমি যে মেয়েকে দেখেছ—আমিও তাকেই দেখেছি। এ যাত্রাতেও আমরা দুজনে এক ঘাটেই জল খেয়েছি।

শ। তাই নাকি! আমাকে জব্দ করার জন্য দিদিমণি সেদিন এক কুরূপার অবতারণা করেছিলেন বটে!

শ্রী। আর আমাকে জব্দ করার জন্য বৌদিদিও ঐ একই কার্য্য করেছিলেন। অমন মেয়ে দুটি আর কে কোথায় পাবে—বেশ বোঝা যাচ্ছে দুজনে ঐ একটি টোপই বঁড়শিতে গেঁথেছিলেন।

শ। ঠিক ঠিক! এইটেই প্রকৃত রহস্য। এখন কি করা যায়? এজন্য যদি কোর্টে দাঁড়াতে হয়—

শ্রী। হো হো হো!

শ। আবার হাসি! এই বিপদে তোমার এত হাসি আসে কোথা থেকে তাও ত বুঝতে পারিনে।

শ্রী। আমার একটা উপায় মনে এসেছে—হো হো হো!

শ। হাসিটা রেখে এখন উপায়টা বলবে?

শ্রী। ভোলাদাদাকে বর জুটিয়ে দেওয়া যাক। যেমন দেবা তেমনি দেবী মিলবে—তারাও বর পেয়ে খুসী হবে—আর আমরাও রেহাই পাব। (উভয়ের হাস্য)

শ। বেশ বেশ! অতি উত্তম—অতি উত্তম! আঃ ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো! যাও হে তবে এখন শীঘ্র যাও সব বন্দোবস্ত করগে।

শ্রী। আর তুমি সেই প্যাঁচামুখোর কোটরে বন্দী হবে, বুঝেছি দাদা, সব বুঝেছি। (হাস্য)

শ। (স্বগতঃ) মজালে দেখ্‌ছি, চন্দ্রাকে যদি দেখতে চায় তবেইত মুস্কিল! তাহলেই আমাদের দুজনে আবার চুলোচুলি বাধবে। তার চেয়ে ওর যাতে মালতীর দিকে মন যায় সেইটে কর্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) দেখ শ্রীধর, মালতী আগে ভাল দেখতে ছিল বলছ—তা তাকে একবার দেখইনা। তোমার যদি একলা যেতে লজ্জা করে—আমিও সঙ্গে যাব।

শ্রী। (স্বগতঃ) সেটি হচ্চেনা দাদা,—আমার মালতীকে আমি তোমাকে দেখাচ্ছিনে। তোমার চন্দ্রা কেন যতই রূপবতী হোননা,—মালতীকে একবার দেখলে সে রূপ চোখে লাগবেনা। (প্রকাশ্যে) যাও দাদা, তুমি চন্দ্রাকে ভাল করে দেখগে। আমার এখন মালতীকে দেখতে যাবার সময় নেই, আমি যাই—ভোলাদাদার বিয়ের বন্দোবস্ত করিগে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(ললিতা ও শ্রীধর)

শ্রী। তুমিই ত এটি ঘটালে !

ল। ঘটিয়েছি ঘটিয়েছি তোমার সেজন্য ভাবনা কি ? ভোলাদাদার উপর চালান দিলেই ত হোল।

শ্রী। তাদের তাতে মন উঠবে ত ?

ল। না উঠবে না ! ঐত মেয়ের শ্রী ! ভোলাদাকে পেলে তারা বত্তে যাবে। মেয়ে পার করতে পারলেই ভাগ্যি বলে মানবে। এই যে ভোলাদাদা।

(হুঁকা হস্তে গান গাইতে গাইতে ভোলাদাদার প্রবেশ)

ব্রাদার হে তোমার
যদি উর্দ্ধে উঠতে ইচ্ছা হয় একবার
তবে গঞ্জিকা রঞ্জিকা পিয়ে তার সঙ্গে ভাং মিশিয়ে
খেয়ো একবার, দাদা, খেয়ো একবার।
বেজায় গাঁজায় ধূম চড়িয়ে, দম কষিয়ে ভোঁ হইয়ে
যাবে তুমি হিমালয়,
কৈলাস হবে তোমার আলয়
বাসা ছেড়ে ব্যোম ভোলানাথ কর্‌বে হাহাকার।

শ্রী। বড় যে স্ফূর্ত্তি দাদা ! পরের সর্ব্বনাশ করে এখন গাঁজায় দম টানবে ত কি ?

ভো। সর্ব্বনাশ ! অ্যাঁ, অ্যাঁ সর্ব্বনাশ !

শ্রী। মহা সর্ব্বনাশ ! আমার কনেটিকে আগে থাকৃতে দেখে তাকে এমন মোহিত করে এসেছ যে সে আর—

বৌ। তোমা বই কাকে আনে না।

ভো। (নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) সত্যি নাকি ? তা আমার কি দোষ ভায়া ! সেটা বিধাতার দোষ !

বৌ। তাত সত্যি ! এখন কলকেটা নামাও।

ভো। কলকেটা নামাব ? কেন—কেন ?

শ্রী। কেন আবার কি ? বর সাজতে হবে, গোঁপটা কামাতে হবে।

ভো। বর সাজব ! হাঃ হাঃ সেত উত্তম কথা ! রাগ করবে না ত ?

শ। না দাদা আমি Martyr হয়ে আমিই তোমাদের হাতে হাতে বেঁধে দেব। যাই ক্ষুরটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান।

বৌ। এখন কলকেটা রাখ্‌বে ?

ভো। সেটি পারছিনে, দিদি তাহলে প্রাণটি যাবে !

বৌ। সেত আগেই গেছে, যেদিন তাকে দেখেছ সেই দিনই।

ভো। হা, হা, হা !

প্রাণ ত অন্ত হোল আজ আমার, কমল আঁখি
একবার হৃদ্‌কমলে দাঁড়াও দেখি।

(শ্রীধরের ক্ষুর লইয়া প্রবেশ)

শ্রী। এখন আগেত গোঁপটার অন্ত হোক। (জোর করিয়া হুঁকা কাড়িয়া লইয়া তাহা গৃহকোণে রাখিয়া ভোলাদাদাকে কামাইতে উদ্যত।)

ভো। অ্যাঁ অ্যাঁ কর কি দাদা, কর কি ?

শ্রী। এই চৌকিতে বস বল্‌ছি—নইলে এই ক্ষুর গলায় বসিয়ে দেব।

ভো। ও কি কথা, এ'কেই কি বলে বর সাজা—আগেই গলায় ফাঁশ।

শ্রী। ফাঁশ নয়, একেবারে ক্ষুর দাদা ক্ষুর।

বৌ। আমি যাই আল্‌তা পাউডার আনি।

ভো। আল্‌তা পাউডার ? কেন দাদা ? [প্রস্থান।

(ললিতার পুনঃ প্রবেশ)

শ্রী। আমার হয়েছে, বৌদিদি এবার সাজাও।

ভো। আল্‌তা পাউডার ! হাঃ হাঃ বিবি সাজ্‌তে হবে ?

বৌ। (আলতা পাউডার মাখাইতে মাখাইতে) বিবি-বর দেখ্‌লে কনের চোখের পাতা আর বুজ্‌বে না, একবার চেহারাখানি দেখ দেখি দাদা। (হস্তে আয়না প্রদান)।

আয়না হস্তে করিয়া ভোলানাথের গান ও নৃত্য—

তোম তোম তানা না না ; আহা মরি কি কার্‌খানা
চতুরঙ্গে বিবিয়ানা, বাজারে গা !
শিরেতে সিঁদুর ছি ছি—কেবা পরে মিছি মিছি
ছাঁটা কেশে আঁটা থর সা সা নি নি সা !
নাকে নাই নথ মুক্তা, মুখে নাই পান দোক্তা
বাঁকা হাসি ফাঁকা ঠোঁটে বাহা কিরে বা !
ঢাকা শান্তিপুরে ফেল, ঘরে ঘরে লেশ ভেল
দিলমাৎ গসনেলে, তেরে কেটে তা।
পায়ের আল্‌তা গালে ঠোঁটে, মল নীরব জুতার চোটে
করে বাজে পিয়ানোতে ঠুং ঠাং ঠা !
কলিকালের এম্‌নি মেয়ে হার মেনে যায়, বি এ এম এ
বিয়ের তক্কা কেবল ফক্কা বলীহারী যা !

শ্রী। বৌদিদি তোমাকে গাল দিচ্ছে।

বৌ। আমরা কেন বিবি হব—তোমার বৌ বিবি হোক্‌। আমার সিঁথিতে দেখ সিঁদুর টক্‌ টক্‌ কর্‌ছে—আমি লেশও পরিনে, গশনেলও মাখিনে,—তোমার বিয়ের দিন কনেকে ভেল পরিয়ে ঐ গান গেয়ে নৃত্য করো এখন। এখন চল তারা বরের অপেক্ষায় হা হুতাশ কর্‌ছে।

[তুড়ি দিয়া গান গাইতে গাইতে ভোলার প্রস্থান।

(সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর ও ললিতার গমন)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(স্ত্রী-আচারস্থল, মালতীর পার্শ্বে শ্রীধর এবং চন্দ্রাবতীর পার্শ্বে শশীনাথ দণ্ডায়মান। বরণডালা প্রভৃতি হস্তে লইয়া প্রভাবতী, ললিতা এবং অন্যান্য যুবতীগণের প্রবেশ এবং গান গাহিতে গাহিতে বরকন্যাদিগকে প্রদক্ষিণ)

প্রভা ও ললিতা। যে তোমারে চায় ওগো আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে—শেষে হায় হায়।

যুবতীগণ। ওগো সেই ফুটাবে হৃদয়কুঞ্জে সুগন্ধফুল পুঞ্জে পুঞ্জে,
মনো অলি উঠ্‌বে গুঞ্জে মধুর মলয় বায়।

প্রভা ও ললিতা। যে তোমারে চায় ওগো আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে শেষে হায় হায়।

সকলে। তারি চোখে জ্বল্‌বে তারা, অধর পাতায় পুলকধারা,
ভূলোক হবে দ্যুলোক পারা প্রেমের মহিমায়।
যে তোমারে চায় আদরে লও তায়,
ফিরালে আর নাহি পাবে—শেষে হায় হায়!

(গান গাহিতে গাহিতে পটক্ষেপ, ও রঙ্গমঞ্চে ভোলাদাদার প্রবেশ। বাঁশরীর তান উত্থিত)

ভো। তারা এখন ফুলের মালা পরুক, আর শুভদৃষ্টি করুক আমি এইবার পাত সাজানর বন্দোবস্তটা কি হচ্চে দেখে আসি।
(তুড়ি দিয়া)

বাজারে বাঁশরী বাজা!
বরকন্যা পরে কুসুমের মালা, কন্যাকর্ত্তা তোরা ত্বরা এইবেলা
বরযাত্র তরে বেশ ভাল করে পাতগুলো সব সাজা।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নর্ত্তকী। কি দাদাঠাকুর কি গান হচ্চে ?

ভো। তোমরা বুঝি বরকন্যার মজ্‌লিসে বাড়ী ভিতরে নাচতে যাচ্ছ ? তা এইখানেই একবার আরম্ভ করনা।

নর্ত্তকী। তোমার গানটি গাও দাদাঠাকুর আমরা নাচি।

দ্বি, নর্ত্তকী। গানটি শিখে নিয়ে বরকন্যার কাছে গাব।

ভো। হ্যা হ্যা—তা হোল ভাল, আমাকে যে তারা বাড়ীর ভিতরে যেতে দিলেনা নইলে আমিই গেয়ে দিতুম। যেদিন আমার বিয়ে হবে সেদিন ত আর আমাকে বাড়ী ভিতরে না নিয়ে গেলে চল্‌বে না। হ্যা হ্যা হ্যা।

নর্ত্তকী। তোমার বিয়ে হবে নাকি ? কবে দাদাঠাকুর ?

ভো। এই পোষ মাসের পিটে পার্ব্বণের দিনে।

নর্ত্তকী। কি বল দাদাঠাকুর ! সে দিন কি কারো বিয়ে হয় ?

ভো। তবে বুঝি চড়ক্‌ সংক্রান্তির দিনে ?

নর্ত্তকী। দাদাঠাকুরের কথার শ্রী শোন ! তাও নাকি হয়।

ভো। হয় গো হয়। মেয়ে অরক্ষিতা হলে সব কালেই বিয়ে হয়। আমি ঠিক্‌ শুনে এসেছি একটা কোন পরবের দিনে আমার বিয়ে হবে। তোমরা বল্লেইত আর আমার বিয়ের দিন ওল্টাবে না।

ন। তা দাদাঠাকুর, তোমার বিয়েতে যেন আমরা ফাঁকে না পড়ি।

ভো। অবিশ্যি, অবিশ্যি। তোমরা না এলে আমার নৃত্যটা দেখ্‌বে কে ? মনের ইচ্ছাটা এই রকম যে, গিন্নিকে যদি রাজি করতে পারি ত তাকে শুদ্ধ নিয়ে নাচব। গজেন্দ্রগামিনী গো গজেন্দ্র-

(ভোলার গান, নর্ত্তকীদের নৃত্য।)

ভো। বাজারে বাঁশরী বাজা!
বরকন্যা পরে সুমঙ্গল মালা।—
সমস্বরে। কন্যাকর্ত্তা তোরা ত্বরা এই বেলা,
বরযাত্র তরে বেশ ভাল করে, পাতাগুলি সব সাজা।
ভো। উহারা করুক্ সুমঙ্গল দৃষ্টি,
সমস্বরে। মোরা চাহি সবে সরাভরা মিষ্টি,
মেঠাই সন্দেশ, রসগোল্লা বেশ, পানতুয়া খাসা খাজা।
ভো। বাজা ঢাক্ ঢোল বাজা,
উহারা দেখুক্ আননের আলো
মোর পাতে দাদা ভাল করে ঢালো—
সমস্বরে। কালিয়া পোলাও, লুচি কোপ্তা চপ, গরম্ গরম্ ভাজা।
ভো। বাজা ঢাক ঢোল বাজা
ওরা পান করে সৌন্দর্য্যের সুধা—
আমার তাহাতে আরো বাড়ে ক্ষুধা
আস্ত-রুই-মুড়ো, আন হেথা খুড়ো, বুড়োটিরে দিও ন্যাজা।
সমস্বরে। বাজারে নহবৎ বাজা
খুরীতে হবে না আন দাদা হাঁড়ি
রয়ে বসে ঢাল নাহি তাড়াতাড়ি
দই ক্ষীর আর ছানার পায়েস দেখেই প্রাণটা তাজা।

নৃত্যগীতে পটক্ষেপ।

ইতি সমাপ্ত।

প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।*

(২)

প্রথম প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে) বলিয়াছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরেই বিষয়শিক্ষা বিদেশীয় ভাষায় না দিয়া দেশভাষার সাহায্যে দেওয়া উচিত এবং ইংরাজীভাষা দ্বিতীয়-ভাষাস্বরূপ পঠিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার করিব। বাঙ্গালী প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিতে বিভক্ত। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' এই গৌরবান্বিত নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কল্পনা হইতেছে, তথায় এই দুই জাতির নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্য (হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত, ও মুসলমানের পক্ষে আরবী ও পার্শী) কিভাবে স্থান পাইবে, এই প্রশ্ন সমাধান করা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। †

সরকারী বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে, এক এফ্‌এ পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায়ই প্রাচীন ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় (compulsory) নহে, এফ্‌এ পরিক্ষায়ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় প্রাচীন ভাষা লওয়া চলে। প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে (ছাত্রীদিগের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র) মাতৃভাষা লইতে দেওয়া হয়না।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† এই প্রবন্ধে হিন্দুজাতির দিক্ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মুসলমান জাতির দিক্ হইতে আরবী, পার্শী শিক্ষা সম্বন্ধে সেই সব কথা বলা যায়। সংস্কৃতভাষার সহিত বাঙ্গালা ([illegible]

নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিধিব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে, তাহাতেও নাকি ভারতীয় প্রাচীন ভাষার আদর বিশেষ বাড়ে নাই, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রাচীন ভাষার ত এই হাল। ভবিষ্যতের আশাস্থল আধুনিক ছাত্রগণের হৃদয়ে জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য, জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে, জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, এখন যাঁহারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতে বসিয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা জানিবার জন্য সমগ্র সমাজ ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। স্বধু সরকারী সাহায্য বর্জ্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করিলেই তাহা 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' পদবাচ্য নহে, তথায় জাতীয় আদর্শে জাতীয় চরিত্রগঠনের অনুকূল শিক্ষা দিলেই ঐ নাম সার্থক হইবে। এ কথাটা যেন ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ স্মরণ রাখেন।

ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য ভারতবাসিগণকর্ত্তৃক স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয় (compulsory) হওয়া উচিত। কথাটা এত সহজ যে, কথাটা পড়িবামাত্র সকলেরই ত ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়, প্রমাণ প্রয়োগ চাহিতে কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা হয় না। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় সহজ কথাটাও আমাদের কাছে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে কথাটার মীমাংসা করিতে বেগ পাইতে হইতনা। কিন্তু আজ পরাধীন ভারতবর্ষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা-ভব্যতার মালমসলা বিদেশ হইতে আহরণ করিতে হইতেছে। এ অবস্থায় সুসভ্য ইংরাজের ভাষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত, অনেকের এইরূপ মত। এ কথাটার বিস্তারিত আলোচনা

সংস্কৃতশিক্ষা (ও মুসলমানের পক্ষে আরবী ও পার্শীশিক্ষা) প্রয়োজনীয়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করি।*

প্রথম, এই এই ভাষায় উভয় জাতীর ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিত। জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় সমাজ, জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা প্রয়োজনীয়। শিক্ষা ধর্ম্মসাধনের সহায়, প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মজ্ঞান উন্মেষিত করিবার জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত, শিক্ষার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মহীন শিক্ষা দেওয়া অনুচিত, ইহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। যে ভাষায় ও যে সাহিত্যে ধর্ম্মাচারের ও সমাজতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম নিহিত আছে, তাহার সহিত শিক্ষার্থিগণের পরিচয় স্থাপন না করিলে, তাহারা কিরূপে ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে? প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিলে কৃতবিদ্য ছাত্রগণ নিজের ধর্ম্ম ও সমাজের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে যত্নশীল হইবেন এবং সনাতন আচার পদ্ধতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন। অবিচারিতভাবে সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড মানিয়া লইতে হইবে ও জড়ভাবে তাহা পালন করিতে হইবে, এরূপ জবরদস্তির কথা এখনকার দিনে চলিবেনা; এরূপ জবরদস্তির ফলে হয় অসাড়তা, না হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, না হয় কপটাচার (hypocricy), উপস্থিত হইবে। অতীতের দৃষ্টান্তে আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। বিশেষতঃ এখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষা-দীক্ষার হিড়িকে সমাজে নানা রূপে আচারভ্রংশ ঘটিতেছে এবং বিলাতী রীতি নীতি আচারঅনুষ্ঠানের অনুকরণ সবেগে চলিতেছে। এ ক্ষেত্রে হিন্দুসন্তানের সংস্কৃতশিক্ষা, এই অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তির কতক পরিমাণে প্রতিষেধক হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার

* গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা

ফলে প্রকৃত জাতীয়ত্বের ভাব বিকসিত হইবে এবং নিজের জাতির প্রাচীন গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আত্মসম্মান বোধ জন্মিবে ও তাহার ফলে বিলাতী সমাজের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ঘুচিবে। অতএব জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে সংস্কৃত (বা আরবী, পার্শী) ভাষা ও সাহিত্য ছাড়িলে চলিবেনা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বনে গবেষণা, প্রত্নতত্ত্বালোচনা, কাব্যসৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষিত ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এ যাবৎ এ সকল কার্য্য বৈদেশিক পণ্ডিতগণই করিয়া আসিতেছেন; দুই চারিজন মাত্র ভারতবাসী সামান্যরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শিক্ষিত ভারতবাসীর এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রাচীনভাষা শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহাতে ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় প্রাচীনভাষা অনুশীলনের কেন্দ্রস্বরূপ হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রস্তাবিত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে Theodore Morison সাহেব যাহা বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণের সে কথা গুলি যেন মনে থাকে।

তৃতীয়তঃ, মাতৃভাষার উন্নতি করিতে হইলে, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি অঙ্গের পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষার সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিতে হইলে, মাতৃভাষার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচীন ভাষাজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেন না, দেশভাষাগুলি প্রাচীন ভাষার নিকট শব্দসম্পত্তির জন্য পদে পদে ঋণী। এমন কি, সাধুভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝিতে হইলে, অথবা সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দের এবং অপভ্রষ্ট শব্দের বর্ণবিন্যাসের নিয়ম আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

মধ্যে যে পরিমাণ সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিবার জন্য সংস্কৃতভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, সুধু 'খাঁটি বাংলা'র সেবা করিলে কিছুতেই চলিবে না। এই প্রসঙ্গে ইংরাজীনবীশেরা একটা ভ্রান্ত সংস্কার মন হইতে দূর করিবেন। ভাষা হিসাবে আধুনিক ইংরাজীভাষার সহিত অ্যাংলোস্যাক্সন্ এবং ল্যাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদপেক্ষা অনেক নিকট সম্বন্ধ। আর ইংরাজেরা তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থা এবং সভ্যতা যেমন য়িহুদী, গ্রীক, রোমক, অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভৃতি নানা জাতি হইতে পাইয়াছেন, আমরা সেরূপ সর্ব্বদ্বারী নহি।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা যদি পাঠকবর্গ সমীচীন বলিয়া মনে করেন, তবে প্রাচীনভাষা শিক্ষা যে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য, তাহা প্রমাণ হইল।

যাঁহারা কাযের লোক, sentimentএর ধার ধারেন না, তাঁহারা হয়ত বলিবেন—'সবই ত বুঝিলাম, কিন্তু গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে; ইহার উপর যদি ভাষার 'ত্র্যহস্পর্শ' ঘটাও, তাহা হইলে যে ছাত্রদিগের জীবনের ভার দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে।' কথাটা খুব চটকদার (plausible) বটে; কিন্তু ইহার উত্তরটাও অত্যন্ত সোজা। সকলকেই যে সব বিষয় শিখিতে হইবে এমন কোনও 'মাথার দিব্য' দেওয়া নাই, যে শিল্প শিখিবে তাহার দর্শন শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে ইতিহাস শিখিবে তাহার বিজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে গণিত শিখিবে তাহার ইতিহাস শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রমাত্রেরই স্বজাতির প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কেন আছে, তাহার উত্তর প্রবন্ধের পূর্ব্বভাগে দিয়াছি। বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ ভুলিবেন না, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই বিলাতী

শিক্ষার অঙ্গ, কেবলমাত্র ভারতীয় প্রাচীনভাষাই আমাদের বিশেষভাবে নিজস্ব সম্পত্তি। অতএব জাতীয় শিক্ষার হিসাবে, অন্য সমস্ত বিষয় একত্র করিয়া তাহাদের যে গুরুত্ব, একা প্রাচীনভাষার সেই গুরুত্ব, অথবা তদপেক্ষা বেশী গুরুত্ব। সুতরাং, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বরং অপর পাল্লা (scale) হইতে দুই একটা বিষয় সরাইয়া হাল্কা করা চলে, তথাপি ভারতীয় প্রাচীনভাষার দিক্‌টা কমান চলে না।

যাহাহউক, তিনটি ভাষা শিক্ষা যখন অপরিহার্য্য, তখন অনর্থক তাহা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া, কি প্রকারে তিনটীরই স্থান হইতে পারে অথচ প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে, তাদ্বিষয়ে বিচার করা সঙ্গত। তিনটি ভাষা শিখিতে হইলে তিনটিই যে সমপরিমাণে ও একই প্রণালীতে শিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১) বাঙ্গালা* ভাষা ও সাহিত্যের স্থান।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষা দেওয়া ও ছাত্রদিগকে মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে দেওয়াই স্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। এমন কি, ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষার পঠন পাঠনাও মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে; ইংরাজেরা যে ভাবে ফরাসী, ল্যাটিন বা অপর কোনও বিদেশী ভাষা শিক্ষা করেন, এস্থলে তাহারই অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষাকালে মাতৃভাষা হইতে তত্তৎ ভাষায় ও তত্তৎভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা থাকিবে। এই সকল উপায়ে মাতৃ-ভাষার প্রসার খুব বাড়িবে। ইহার উপর মাতৃভাষায় প্রবন্ধরচনার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। এই পর্য্যন্ত গেল ভাষা শিক্ষা। বাঙ্গালা

* প্রবন্ধের এই অংশে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, হিন্দি ও উড়িয়া

সাহিত্যপাঠেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। সচরাচর যে সকল বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তক নিম্নশ্রেণীতে পঠিত হইয়া আসিতেছে (যথা কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চারুপাঠ, নীতিবোধ ইত্যাদি) সেগুলি ইংরাজীর অনুবাদ এবং বিদেশী দৃষ্টান্তে ও বিজাতীভাবে পরিপূর্ণ। ইহার ফলে, প্রথম হইতেই স্বজাতির উপর বিতৃষ্ণা ও বিদেশীর উপর ভক্তি জন্মে; জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা, স্বজাতীয় মহাপুরুষদিগের উপর শ্রদ্ধা, সমাজসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে না। ইহাই হইল প্রকৃত পরাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার-সঙ্কোচ অপেক্ষাও ইহা বিষম। জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিতে হইলে এ সকল পুস্তকে চলিবে না। (আজকাল বিজ্ঞান-রিডার নামধেয় যে সমস্ত পুস্তক চলিতেছে, সে সকল ত খাঁটি সাহিত্যই নহে, কাযেই সে গুলির স্বতন্ত্র নির্দ্দেশেরও প্রয়োজন নাই)। জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সংক্ষিপ্ত করিয়া, বাল্যাবস্থার অনুপযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া, পাঠনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা সুন্দর ও সঙ্গত ব্যবস্থা হইতে পারে না। বালকগণের গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই বেশী অনুরক্তি দেখা যায়, কবির উক্তি হৃদয়ে গভীরভাবে উচ্চভাবগুলি মুদ্রিত করে, অতএব এইরূপ ব্যবস্থাই উপযুক্ত। গদ্য পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইলেও চরিতমালা, চরিতাষ্টক, আর্য্যকীর্ত্তি প্রভৃতি স্বজাতীয় মহাপুরুষগণের জীবনীসম্বলিত আখ্যানগুলিই লইতে হইবে, নতুবা স্বজাতিপ্রেম জাগিবে না; গ্রন্থকারগণ উৎসাহ পাইলে জাতীয়ভাবের উদ্দীপনাপূর্ণ পুস্তক রচনা করিবেন।

(২) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নশিক্ষা (primary education) মধ্যশিক্ষা

তিনটি স্তর থাকিবে, আশা করা যায়। নিম্নস্তরে কেবলমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যেরই ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার স্তরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান করিতে হইবে। যতই উচ্চদিকে উঠিবে, ততই বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাগ কমাইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ভাগ বাড়াইতে হইবে। ইহাতেই পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিক উপকার হইবে, কেন না উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা সাহিত্য সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যদ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুপ্রাণিত। আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সাধারণ লোকে অবশ্য আবহমানকাল কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া এবং যাত্রা, কীর্ত্তন, পাঁচালী, কথকতা শুনিয়া ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া আসিতেছে। (Mass education) লোকশিক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর, তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। মনে রাখিতে হইবে, এই কৃতাবস্থ যুবকেরাই এক কালে সমাজের নেতা হইবে। সমাজের উচ্চস্তরে বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্টভাবের আধিপত্য না হইলে, সংস্কৃত শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যবস্থা রাখিলে, সমাজের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে।

'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনও জন।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণ॥'

শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণিত ধর্ম্মের ঐরূপ বিকৃত আদর্শ প্রচলিত হইবে। ভাবী সাহিত্যেরও যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা ঘটিবে।

অতএব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হিসাবে পড়িতে হইবে; ব্যাকরণ-বিচারে উত্তম পর্য্যবসিত করিলে চলিবে না। সাহিত্যপাঠে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যে সমস্ত উপকার পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আদায় করিতে হইবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া কাব্য-কলা (literary art), রচনাশিল্প বুঝিতে হইবে, ধর্ম্ম ও নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্রকৃতি বুঝিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ ভাব আয়ত্ত করিতে হইবে। নিজেদের সাহিত্য অবলম্বনে এই ভাবে শিক্ষালাভই সহজ, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রণালীও কতকটা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে; তাহা কার্য্যতঃ এক্ষণেও হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই নিয়ম। উপরন্তু মাতৃভাষার প্রকৃতির সঙ্গে পদে পদে তুলনা করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে যে শুধু দুরূহ ভাষা শিখিবার সুবিধা হইবে তাহা নহে; এই উপায়ে মাতৃভাষার সঙ্গেও সম্যক্ পরিচয় ঘটিবে। সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগরীতির সঙ্গে মাতৃ-ভাষার প্রয়োগরীতির কতটা মিল ও কতটা অমিল, কোন্ সংস্কৃত শব্দটির বাঙ্গালায় কি অপভ্রংশ ঘটিয়াছে ইত্যাদি সন্ধান দিতে হইবে। এই প্রণালীতে শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ, অভিধান সঙ্কলন ও ভাষাবিজ্ঞান প্রণয়ন যে কতদূর সুগম হইবে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই প্রণালীতে শিক্ষাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা।

(৩) ইংরাজীভাষা ও সাহিত্যের স্থান।

দুইটি কারণে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রথম, ইংরাজী আমাদের রাজ-ভাষা, রাজভাষায় অল্প-বিস্তর দখল না থাকিলে বিষয়কর্ম্ম চালানর অসুবিধা হইবে এবং বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের নানা

দ্বিতীয়তঃ, কালচক্রের আবর্ত্তনে জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষ আজ সভ্য য়ুরোপের নিকট কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভিক্ষার্থী, এ অবস্থায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারস্বরূপ ইংরাজী (বা তত্তুল্য অপর কোনও য়ুরোপীয় ভাষা) না জানিলে জ্ঞানলাভের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। এ দুইটা কথার কোনওটাই চাপা দিয়া 'স্বদেশী' গোঁড়ামি করিতে গেলে বাতুলতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্ত দুই কারণে ইংরাজী শিক্ষার যে প্রয়োজন, তাহার পক্ষে ভাষা হিসাবে ইংরাজী শিখিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংরাজী হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ, ও মাতৃভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ এই দ্বিবিধ প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংরাজীতে চিঠীপত্র লেখা, বিস্তৃত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন, (abstracts, summaries, precis-writing) বড় জোর প্রবন্ধ রচনা পর্য্যন্ত শিখিলেই এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এইরূপ শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ইংরাজী ভাষায় লিখিত শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মূলগ্রন্থগুলি পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। ইহার জন্য সাহিত্য হিসাবে ইংরাজী পাঠনার তত প্রয়োজন দেখি না।

বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবে ইংরাজী সাহিত্য পাঠনার ব্যবস্থা আছে, অনেকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, সাহিত্যে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ। ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় ও তাহার ফলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ (ইহাকেই কি culture বলিব ?) ঘটে। ইংরাজী সাহিত্য আমাদের সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফলে নানারূপ কু-সংস্কার ও কদাচার, অপধর্ম্ম ও বিকৃত রুচি তিরোহিত হইয়াছে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শে সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের

অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার 'সু' ও 'কু' দুইটা দিক্ আছে। আমাদের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম ইংরাজের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; প্রত্যেক জাতির কাব্যনাটকাদি খাঁটি সাহিত্য, (pure literature) সেই সেই জাতির জাতিগত, সমাজগত, নীতিগত ও ধর্ম্মগত প্রকৃতির পরিপূর্ণ ছায়া। প্রথম বয়সে মনোবৃত্তিসকল এত কোমল ও নমনীয় (plastic) থাকে যে তৎকালে যে সমস্ত ভাব ও আদর্শ মনে অঙ্কিত হয়, তাহা কস্মিন্ কালেও বিলীন হয় না। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, কিশোরবয়স্ক ছাত্রগণকে নির্ব্বিচারে ইংরাজী কাব্যনাটকাদি পাঠ করিতে দেওয়া কি সুসঙ্গত ? এই সকল বিজাতীয় আদর্শ দ্বারা যে আমাদের সামাজিক, নৈতিক এবং সাহিত্যিক আদর্শ কলুষিত ও বিকৃত হয় নাই, ইহা কি কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন ? এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িল। Craik's Pursuit of Knowledge under Difficulties কি এইরূপ একখানা ইংরাজী কেতাবে লেখা আছে যে, এক দরিদ্র বালক বিড়াল মারিয়া সেই চামড়া বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের বেতন দিত। ইংরাজ গ্রন্থকার এই দৃষ্টান্ত দিয়া কিশোরবয়স্ক পাঠককে কত উৎসাহ দিয়াছেন এবং প্রবল জ্ঞানলিপ্সার জন্য বালকটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বকীয় বালক-পুত্রটিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এই গল্পটি পড়িতে শুনিয়া সেই দিনই তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন ; এরূপ অপকর্ম্ম দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা তাঁহার এতই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানে এতই আঘাত লাগিয়াছিল। বর্ত্তমান লেখক সম্প্রতি তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় আত্মজকে Sweet Portia র speechless messages of love বুঝাইতে বাধ্য হইয়াছেন। বাস্তবিক, গুরুজনের অনভিপ্রেত পূর্ব্বরাগ ও বিবাহ, নরহত্যাদ্বারা গৌরব লাভের উৎকট অভিলাষ, প্রভৃতি জিনিস খাঁটি ইংরাজী সাহিত্যে আক্‌সার মেলে। ইংরাজী

কিন্তু সত্ত্বপ্রধান হিন্দুর পুত্রকন্যাদিগের পক্ষেও কি এইগুলি কল্যাণকর ? অবশ্য ইংরাজী উপাখ্যানাদিতে বিশুদ্ধ আদর্শেরও অভাব নাই। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনী হইতে সৎশিক্ষা লাভ করিলে তাহাতেও দোষ আছে। তাহার দরুন ভিন্ন জাতির উপর শ্রদ্ধাভক্তি এবং স্বজাতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মে, নিজের সমাজের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিতে পায় না, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হয়না। মানসিক দাসত্বশৃঙ্খল হাড়ে হাড়ে বসিয়া যায়, এসব কথা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি কথাগ্রন্থে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত নরনারী-চরিত্রের আদর্শ বর্ত্তমান, যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক মত (যথা, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল, জন্মান্তর রহস্য), ধর্ম্মানুষ্ঠান (দানধর্ম্ম, অতিথিসৎকার, আর্ত্তত্রাণ, প্রভুভক্তি) ইত্যাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ রহিয়াছে, সেগুলি যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার বিশেষভাবে অনুকূল, এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও ধীরবিবেচক ব্যক্তিই দ্বিরুক্তি করিবেন না। Addison, Johnson, Goldsmith, Campbell প্রভৃতি যে সমস্ত সুলেখকগণের এবং যে সমস্ত অসংখ্য অজ্ঞাতনামা লেখকগণের রচনা প্রবেশিকা ও এফ্ এ পরীক্ষার্থিদিগকে সচরাচর সাহিত্যস্বরূপ পড়িতে হয়, তাহাতে এমন কোনও উচ্চ বা মহৎভাব অথবা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকলা বা রচনাকৌশল নাই, যাহার সমতুল্য জিনিস হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে মেলেনা, ইহা আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির ত কথাই নাই। তবে কিজন্য মনুষ্যত্বলাভ বা উন্নত আদর্শলাভের জন্য বৈদেশিক সাহিত্যের সেবা করিব ? কৈশোরে সকলেই হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র পড়িয়াছেন, কিন্তু তখন সকলেই দুরূহভাষা আয়ত্ত করিবার ব্যাকুলতায় ও ব্যাকরণের দৌরাত্ম্যে, ভাবের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য এবং রচনার সরসতার দিকে দৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধলেখকের অনুরোধে এখন একবার নূতন করিয়া পড়িয়া দেখিবেন কি ?

ইহা অবশ্য স্বীকার করি, স্বদেশী বিদেশী সকল সাহিত্যেই, উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকাদিতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব ছাড়া, একটা বিরাট, সার্ব্বভৌম ভাব আছে। ইহাও স্বীকার করি, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়না। কিন্তু সে (broad catholicity) বসুধাব্যাপিনী কুটুম্বিতা স্থাপনের সময় কিশোর বয়স নহে। আগে জাতীয় ভাবে বনিয়াদটা গড়িয়া লইয়া পরে ভিন্ন জাতির, ভিন্ন আদর্শের সম্মুখীন হইলে ভয়ের কারণ থাকেনা, নতুবা আদর্শবিকৃতি ও চরিত্রস্খলন অবশ্যম্ভাবী। স্থপতি-বিদ্যায় পিরামিড গঠনে যেমন নীচেটা চওড়া এবং উপরটা ক্রমে ক্রমে ছুঁচ্‌লো হইয়া উঠে, চরিত্রগঠনের বেলায় সেরূপ প্রথম বয়সে সার্ব্বভৌম ভাব ও পরিণত বয়সে সঙ্কীর্ণতা আনিলে চলিবেনা। ইংরাজী ও অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্যে সাহিত্যকলার নূতন নূতন রীতি দেখা যায়, যাহা কালিদাসাদির অগোচর ছিল। সেগুলিও শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়, কেননা তাহাতে ভাবী বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিসর বৃদ্ধি হইবে। আশৈশব ইংরাজী চর্চ্চা করিয়া এবং পঞ্চদশবর্ষকাল ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ইংরাজীবিদ্বেষের ভাব পোষণ করা সঙ্গতও নহে, সম্ভবও নহে। তবে এ কথা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমদানী নব নব রীতির পরিচয় পাইবার পূর্ব্বে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্যে সাহিত্যকলার (Art) যে বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট রীতি বর্ত্তমান তাহা আগে বুঝিতে হইবে, কেননা তাহাই সহজ, স্বাভাবিক এবং কল্যাণকর। উচ্চশিক্ষার স্তরে, যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান বা শিল্পবাণিজ্যের দিকে না ঝুঁকিয়া Arts Course লইবে, তাহারা বিএ, এম্‌এর ন্যায় উচ্চ পরীক্ষায় স্বজাতির প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক সাহিত্য অধ্যয়ন করুক, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহানাটক।

নবম অঙ্কের অনুবৃত্তি।

অবতীর্ণ হলে পুনঃ কুম্ভকর্ণ রণ ভূমিপরে
হেরি' ত্রাসে কপীন্দ্রেরা প্রবেশিল গিরি-গহ্বরে।
কুম্ভকর্ণ পদাঘাতে কেহ হ'ল সুদূরে নিঃক্ষিপ্ত,
দন্তের আঘাতে তার কারো দেহ হ'ল বিচলিত।
নিঃশ্বাসে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নভে কেহ করে বিচরণ,
প্রমত্ত দোর্দ্দণ্ডাঘাতে কেহ করে রুধির বমন।
নিঃশ্বাস হইয়া রুদ্ধ ফুৎকারের ভরে,
অতি কষ্টে কোন কপি প্রাণত্যাগ করে॥
অযুত তড়িৎ-দীপ্ত কৃতান্তের কেতু-সম
উজ্জ্বল অস্ত্রের সেই
শম্ভুর ত্রিশূল।
কুম্ভকর্ণ উত্তোলিয়া হানিল সুগ্রীব-বক্ষে ;
শরে কাটি' রাম তাহা
করিলা নির্ম্মূল॥
কুম্ভকর্ণ অতঃপর করি' এক মুদ্গার গ্রহণ,
বানর-শিবিরে পশি,' কপিদের করিয়া ভক্ষণ,
ক্রোধ-অগ্নি জঠরাগ্নি —একত্র করিল প্রশমন।
পিষ্ট হ'ল কত কপি কুম্ভকর্ণ-চরণ-আঘাতে ;
বাহিরিল যারা তার শ্রুতিরন্ধ্র দিয়া বায়ু পথে,
তাদের ধরিয়া পুনঃ ধীরে রক্ষ লাগিল চিবাতে।
মত্তকরীকর সম বাম করে ঝাঁকায়ে শিবির,
ধরিল সে মহাবল সুগ্রীবেরে—কুম্ভকর্ণ বীর।
অঙ্গদ পিতৃব্যে হেরি' নিপতিত শক্রর কবলে,

সুগ্রীব হইয়া মুক্ত নিঃশ্বাস না ছাড়িতে ছাড়িতে,
সিংহ-পাশে কুম্ভকর্ণ, অঙ্গদেরে বাঁধিল চকিতে।
অগ্নির তনয় নীল —অঙ্গদ-সুগ্রীব-দোঁহে
দেখিয়া বিজিত,
নিজ অগ্নিমূর্ত্তি ধরি' আক্রমিল কুম্ভকর্ণে
হইয়া কুপিত।
স্কন্ধে শিরে কর্ণে বক্ষে নাসা মুখোদরে, তীব্র
পাইয়া আঘাত,
আকুল হইল রক্ষ; —কপিদ্বয় গাত্রোত্থান
করে তৎক্ষণাৎ!

(লঙ্কাশিখরস্থ রাবণ)

কাদম্বিনী-সহচর লঙ্কেশ রাবণ
দেখি' রণে কুম্ভকর্ণে সন্তপ্ত অতি,
অমৃত-সলিল তূর্ণ করিলা মোচন;
সংজ্ঞা লভি' কুম্ভকর্ণ, কৃতান্ত যেমতি
নীল নলে পুনর্ব্বার করিতে ভক্ষণ
ধেয়ে গেল রণস্থলে তাহাদের প্রতি।

উগ্ররোষ জাম্বুবান রণে পশি,—বজ্র-সম বলে
গিরিসম মহাবাহু কুম্ভকর্ণে পাড়িল ভূতলে,
সজোরে ধরিয়া কণ্ঠ, আর বাঁধি' জাম্বুর বন্ধনে।
মুক্ত হ'ল নল নীল পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে;

কিন্তু সে রাক্ষস-বীর করি' শূলাঘাত
নিবারিয়া জাম্বুবানে উঠে তৎক্ষণাৎ॥

কালান্তক সম রিপু কুম্ভকর্ণ রাক্ষসের ভয়ে
রাম ও লক্ষণ দোঁহে অতিশয় শঙ্কাকুল হয়ে
করেন কটাক্ষপাত মহাবীর হনুমান প্রতি;

রণস্থলে অবতীর্ণ হ'ল তৎক্ষণাৎ
উগ্রমূর্ত্তি নরসিংহ যেন সে সাক্ষাৎ ॥
সুমেরু-পর্ব্বত-শৃঙ্গে মৈনাক যেমন
করে ধরে গিরি এক পবন-নন্দন
কল্পান্তে অঞ্জন যথা মন্দর-শিখরে,
তেমতি মুদ্গার এক কুম্ভকর্ণ ধরে।
পর্ব্বত নিঃক্ষেপ যবে করে হনুমান,
মুদ্গারে তা' কুম্ভকর্ণ করে খান্ খান্!
মহারুষ্ট হ'য়ে এবে কপি-বীরবর,
ঝটিতি টানিয়া লেজে লইল মুদ্গার।

অনন্তর :— কুম্ভকর্ণ, বাঁধি ছলে হনু বীরবরে,
দিলা উপহার নিজ ভ্রাতায় আদরে।

রাবণ। (কুম্ভকর্ণ-আনীত হনুমানকে অশোক-বনে
সীতার নিকটে লইয়া গিয়া।)

সীতা! দেখ দেখ :—

স্ত্রীবিরহে করে রাম	প্রাণ বিসর্জ্জন,
লক্ষ্মণো তাহারি শোকে	ত্যজিল জীবন।
সুগ্রীব অঙ্গদ-সৈন্য	বিন্ধ্যাচলে পলাইল ভয়ে ;
কেবা গণে বিভীষণে ?	সে ত হীন কৃপাপ্রার্থী হয়ে
শত্রুর অতিথি এবে ;	লঙ্কাদ্বার ভাঙ্গিতে যে পারে,
আছে এক মাত্র কপি,—	আনিয়াছি বাঁধিয়া তাহারে।

সুন্দরি! মলিন * "ত্রি"দশ-মুখ হবে অবিলম্বে,
তিষ্ঠিতে পারিবে "না", রণে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে ;
অধুনা লঙ্কায় "বি"পদ বড় বানর-সেনার,

সীতা। সপ্তম অক্ষর লোপি' প্রতি পংক্তি পড়' পুনর্ব্বার।

---

* ত্রিদশ-মুখ — দেবতাদের মুখ। সপ্তম অক্ষর "ত্রি" লোপ করিলে দশ মুখ

অনন্তর :— রাবণের বক্ষদেশে পদদ্বয় করিয়া স্থাপন,
খরকর-নখরাগ্রে কর্ণ তার করি' উৎপাটন।
করাতি-কঠিন দন্তে নাসা তার করিয়া ছেদন,
আকাশে উঠিল বেগে উগ্রকর্ম্মা পবন-নন্দন ॥
মহারোষে কুম্ভকর্ণ রণস্থলে আসি' পুনর্ব্বার,
মন্ত্রপূত অস্ত্রজাল চতুর্দ্দিকে করিল বিস্তার।
অসংখ্য শানিত-শর নিঃক্ষেপিয়া রঘুর নন্দন,
রাক্ষসের প্রতি অঙ্গ একে একে করিলা ছেদন ॥

(এই অবসরে বানরগণ)

বানরগণ।— ভয় প্রদর্শন তরে তোমার এ বীরদর্প
অন্য প্রতি শোভা পায় বটে ;
কিন্তু জেনো কুম্ভকর্ণ, —বীর মোরা—এসমস্ত
নিরর্থক মোদের নিকটে।
অন্যের বিক্রম তুমি দেখিয়াও নাহি দেখ
আঁখি মেলি' জন্মান্ধের মত ;
ভিক্ষুক কি মহাদেব ? মানুষ কি রামচন্দ্র ?
বানর কি—মোরা বীর যত ?
হেনকালে রঘুপতি কুম্ভকর্ণে বধিবার তরে
ইন্দ্রদত্ত শর দুটি করিলা মোচন ;
এক শর বক্ষ ভেদি' পশিল ধরার মাঝে
অন্য শর মুণ্ড তার করিল ছেদন ॥

হনুমান। (কুম্ভকর্ণের ছিন্ন মুণ্ড পতনে)
ওহে কূর্ম্মরাজ তুমি ফণিপতি-সহ মিলি'
ধরণীরে ধর' দৃঢ় করি' ;
দিগ্‌গজ ! তোমাদের সমুন্নত উগ্রদন্তে
স্থির রাখো সপ্ত কুলগিরি ;
[illegible] পড়ে কুম্ভকর্ণ-মুণ্ড

রামের শল্লাস্ত্র-ছিন্ন কুম্ভকর্ণ রাক্ষসের
প্রকাণ্ড মুণ্ড ঘোর দংষ্ট্রা প্রকটিত,
আছে পড়ে ভূমিতলে, আর তার গুরুভারে
সমস্ত বানর সৈন্য হয় বিচূর্ণিত;
হনুমান্ তাড়াতাড়ি শূন্যেতে লুফিয়া লয়ে
নিঃক্ষেপ করিলা মহার্ণবে ;
আর যত দেবগণ মহা ঔৎসুক্যভরে
দেখিবারে আইলেন সবে।

হনুমান্। দেবগণ! তোমাদের বিমান সরায়ে লও,
সূর্য্য রথ লয়ে দূরে করুক গমন ;
কপীন্দ্র রাক্ষস সবে! অবিলম্বে তোমরাও
কর পরিত্যাগ এবে সমর-প্রাঙ্গণ ;
অদ্ভুত পদার্থ মাঝে চূড়ান্ত অদ্ভুত যাহা,
—এ লঙ্কার একমাত্র আতঙ্ক কারণ,
চ্যুত-অঞ্জনাদ্রি সম সেই কুম্ভকর্ণ-মুণ্ড
বেগে ধরাতলে দেখ হতেছে পতন!

কুম্ভকর্ণের কথা বর্ণনা কি করিব আর :—
দেহ হতে উৎক্রান্ত হ'ল যবে পরাণ তাহার,
অমনি স্বরগ হতে রথএক নীচে আসে নামি ;
সুর-বধূগণসবে নিতে তারে করে টানাটানি,
মৃদুল মুরজ-রবে নারদাদি করে স্তুতি গান,
তথাপি সে কুম্ভকর্ণ বাঁচাইতে অগ্রজের প্রাণ
সমরের প্রতীক্ষায়, রথে না করিল আরোহণ,
রণধীর রক্ষোবীর ত্যজিল না সমর-প্রাঙ্গণ॥

(ক্রমশঃ)

তাম্রলিপ্তী।

(ঐতিহাসিক ভাণ্ডার)।

তাম্রলিপ্তী বা আধুনিক তমলুক এক মহা তীর্থস্থান। এইস্থলে বহু দেবদেবী বিরাজিত। পুরাকালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থানে অবস্থান করিতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি হয়। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, তাম্রলিপ্তী অপেক্ষা তাঁহার প্রীতিকর স্থান আর নাই। এইখানে তিনি যুগে যুগে অবস্থান করিবেন এইরূপও বলেন।

"পুরা দ্বারাবতী মধ্যে গোষ্ঠী মধ্যে গতোঽর্জ্জুনঃ।
শ্রীকৃষ্ণং পরিপপ্রচ্ছ সাদরং বিস্ময়ান্বিতঃ॥
নাথ! ভূতলমধ্যে তে সর্ব্বথা কুত্র সংস্থিতিঃ।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি দেবেশ তত্র মে প্রীতিরুত্তমা॥
এতৎ শ্রুত্বার্জ্জুনং প্রাহ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
তমোলিপ্তাৎ পরং স্থানং নাস্মাকং প্রীতিরিষ্যতে॥
মামকং হৃদয়ং লক্ষ্যা যথাত্যাজ্যং তথা ময়া।
তমোলিপ্তং হি ন ত্যাজ্যমিদমেব সুনিশ্চিতং॥
ত্যজামি সর্ব্ব তীর্থানি কালে কালে যুগে যুগে।
তমোলিপ্তন্তু কৌন্তেয় ন ত্যজামি কদাচন॥

অর্থাৎ—পুরাকালে অর্জ্জুন দ্বারাবতীর (দ্বারকার) সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আদরে ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে প্রভো "আপনি পৃথিবীর মধ্যে কোন স্থানে সর্ব্বদা বাস করেন, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং সেই বিষয় শুনিতে আমার বিশেষ প্রীতি হয়।" কমললোচন কৃষ্ণ ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "তমোলিপ্ত অপেক্ষা আমার প্রীতিকর অপর স্থান আর নাই। লক্ষ্মী যেমন

ত্যাগ করিতে পারিব না। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও যে, আমি কালে কালে যুগে যুগে আর আর সমস্ত তীর্থ ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তমোলিপ্ত তীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করিব না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত তমোলুকমাহাত্ম্যনামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞে সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্ম্মব্যাথা প্রাপ্ত হন ও দুঃখে কলেবর ত্যাগ করেন। ইহাতে দেবাদিদেব মহাদেব কোপান্বিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের মস্তকচ্ছেদন করেন। ব্রহ্মবধপাপ বশতঃ সেই ছিন্ন মস্তক তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইল না। তৎপরে মহাদেব এই মহাপাপমুক্ত হইবার মানসে পৃথিবীর সকল তীর্থস্থান ভ্রমণ ও দেবদেবাদি দর্শন করিলেন। কিন্তু, তাহাতেও ছিন্নমুণ্ড তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইলনা। শোক, দুঃখ ও সন্তাপে অভিভূত হইয়া একদিন ধূর্জ্জটী নির্জ্জন গিরিগুহায় শয়ন করিয়া স্বীয় পাপের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবান নারায়ণ তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জানিতে চাহিলেন। তদনন্তর ভূতভাবন ভূতেশ সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত তাঁহার নিকটে বর্ণনা করিলেন। কমললোচন নারায়ণ ধূর্জ্জটীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে তাম্রলিপ্তী নগরে গমন করিয়া কপাল মোচন নামক পাপনাশক সরোবরের জলে স্নান করিয়া বর্গভীমা নাম্নী দেবীকে দর্শন করিতে বলেন। ঐ পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"কপালমোচনং নাম যৎসরঃ পরিকীর্ত্তিতং।
তদম্বু স্পর্শনান্মুক্তি নাত্র কার্য্যবিচারণা॥
কপালমোচনে স্নাত্বা মুখং দৃষ্ট্বা জগৎপতেঃ।
বর্গভীমাং সমালোক্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ কপালমোচন নামক যে সরোবর আছে, তাহার জল স্পর্শ

মাত্রেই মুক্তি লাভ হয় ; ইহাতে পাপ পুণ্যের কোন বিচার নাই। এই কপালমোচনে স্নানান্তর জগৎপতির মুখ দর্শন করিয়া বর্গভীমাদেবীকে দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈলাশনাথ তাম্রলিপ্তী নগরে আগমন করেন ও কপালমোচনে স্নান করিয়া দেব ও দেবী সন্দর্শন করেন। তাহাতে তাঁহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ও সেই ছিন্ন মুণ্ড হস্ত হইতে মুক্ত হয়।

এই কপালমোচন সরোবরের নামকরণ বিষয়ে দুইটী কিম্বদন্তী আছে। প্রথমটী এই যে, ভূতভাবন মহাদেব উক্ত সরোবরে স্নান করিলে তাঁহার হস্ত হইতে নৃমুণ্ড স্খলিত হইয়াছিল বলিয়া উহা কপালমোচন নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণস্থ উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পুরাকালে এখানে কপাল-মোচন নামে একটী সরোবর ছিল। বহুকাল হইল সেই সরোবরের অস্তিত্বলোপ পাইয়াছে। বোধ হয়, রূপনারায়ণ নদ কোন সময়ে স্বীয় কলেবর বিস্তার করিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এখনও প্রতি বর্ষে মকর ও মহাবিষুব সংক্রান্তি ও অন্যান্য তীর্থযোগে অসংখ্য নরনারী, সরোবরের সন্ধান করিতে না পারিয়া বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের পাদদেশস্থ নদসলিলে অবগাহনাদি পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

এই ত গেল প্রথম কিম্বদন্তী। কিন্তু, দ্বিতীয় কিম্বদন্তীটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। এই রূপ শুনা যায় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর জ্ঞাতিবধজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন হইলে, তিনি পাণ্ডব-সখা শ্রীকৃষ্ণকে সেই অশ্বের রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাকে

নিকটবর্ত্তী হইলে তৎকালের রাজা তাম্রধ্বজের পুত্রগণ সেই অশ্বকে আবদ্ধ করেন। তাহাতে তাঁহাদিগের সহিত অর্জ্জুনের ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরও অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। যুদ্ধশ্রমে অর্জ্জুনের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। তাঁহার কপোলদেশ হইতে বিন্দুমাত্র স্বেদবারি ভূপতিত হইয়া নদীসলিলাকারে প্রবাহিত হয়। কপোল দেশ হইতে স্বেদ পতিত হইয়া নদী উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া সেই প্রবাহ কপালমোচন নামে অভিহিত ও পৃথিবীর পবিত্র নদীগণ মধ্যে পরিগণিত হয়।

পাণ্ডববীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন বহুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও তাম্রধ্বজ ও তাঁহার পুত্রগণকে পরাজিত করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন "অর্জ্জুন! তুমি যাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তিনি পরম বৈষ্ণব। তাঁহার নিকট জয়লাভ আশা তোমার দুরাশা মাত্র। অতএব এক্ষণে সংগ্রামে নিবৃত্ত হইয়া কৌশল দ্বারা স্বীয় কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ।"

তদনন্তর তাঁহারা উভয়ে ব্রাহ্মণবেশে তাম্রধ্বজের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাম্রধ্বজের ঈশ্বর-পরায়ণতার বহু নিদর্শন দেখাইয়া, উভয়ে স্ব স্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিলেন। ইহাতে সভাস্থ সকলে চমৎকৃত ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। নরপতি তাম্রধ্বজ স্তবস্তুতি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বহু আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তাম্রধ্বজ প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন প্রতিদিন স্বীয় ভবনে, কৃষ্ণার্জ্জুনের যুগল মূর্ত্তি দেখিতে পান। ভগবান্ তাঁহার বরপূর্ণ করিলে তাম্রধ্বজ যজ্ঞাশ্ব মোচন করিলেন ও নানাবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া প্রস্থান করিলেন। * * তাম্রধ্বজ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন এবং স্বীয় রাজভবন মধ্যে সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় তাহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে ও সেই মূর্ত্তিদ্বয় জিষ্ণুহরি নামে আজও বিরাজমান।

পূর্ব্বে স্থানে স্থানে বর্গ-ভীমা নাম্নী দেবীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা যাউক। কাহার দ্বারা যে বর্গভীমা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। এতৎসম্বন্ধে দুইটী কিম্বদন্তী আছে। "তমোলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ" নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিত আছে :—

"নরপতি তাম্রধ্বজের নিয়োজিত ধীবর-পত্নী প্রত্যহ রাজসংসারে মৎস্য প্রদান করিয়া আসিত; সে একদা একটী বনমধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথে রাজবাটীতে মৎস্য লইয়া যাইতেছিল, দেখিল, পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়তন বারিপূর্ণ গর্ত্ত রহিয়াছে। তাহাদের জাতীয় স্বভাবানুসারে তাহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সলিল গ্রহণ করিয়া মৎস্যের উপর বিকীর্ণ করিলে মৃত মৎস্য জীবন প্রাপ্ত হইল। ক্রমে এই বার্ত্তা নরপতির কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন তাহা দর্শন করিতে অভিলাষ করেন। ধীবরীর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, তৎপ্রদর্শিত স্থলে একটী বেদী ও তদুপরি প্রস্তরময়ী একটী দেবীমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাম্রধ্বজ সেই সময় হইতে তাঁহার পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন।"

এইত গেল এক কিম্বদন্তী। কিন্তু, Statistical Account of Bengal নামক পুস্তকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের কিম্বদন্তী লিখিত রহিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, ধনপতি নামক কোন বিখ্যাত সওদাগর বাণিজ্যার্থে সিংহল গমন কালীন এইস্থলে আগমন করেন। তিনি এইস্থলে অবস্থানকালে কোন

স্বর্ণের ভৃঙ্গার দৃষ্টি করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কোথা হইতে উহা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাতে সেই লোকটী বলে যে, নগর নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে একটী কুণ্ড আছে তাহাতে পিত্তলের ভৃঙ্গার ডুবাইতে স্বর্ণময় হইয়াছে এতচ্ছ্রবণে ধনপতি এইস্থলের বাজারের সমস্ত পিত্তল কাংসাদির দ্রব্য ক্রয় করিয়া সেই কুণ্ডের জলে ডুবাইয়া রাখেন; তাহাতে তৎসমুদয় সোণার হইয়া যায়। বণিক সেই সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া সিংহল গমন করেন ও তথায় সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। বাটী প্রত্যাগমন কালে বণিক এইস্থলে পুনরায় আসিয়া দেবী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

এই মন্দিরের শিল্প-নৈপুণ্য অপূর্ব্ব। সাধারণ লোকে আজও ইহা দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এইরূপ বলিয়া থাকে। ইহার গঠনপ্রণালী বৌদ্ধদিগের মঠ-গঠন-প্রণালীর অনুরূপ। সমতল ভূমির উপর উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি এই মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বোধ হয়। বেদীর উচ্চতা বড় কম নহে। ন্যূনকল্পে ৯০ ফিট্। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বে ইহা একখানি প্রকাণ্ড শ্বেতপ্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তৎপরে চারিপার্শ্বে ইষ্টক দ্বারা গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ভিতরের প্রস্তর-মন্দিরের শোভা অতি মনোহর। খাঁজকাটা প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত বলিয়া শোভা আরও খুলিয়াছে।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেব এ মন্দিরকে হিন্দুদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক বলিয়া বলেন। তিনি লিখিয়াছেন:—

"Among the objects of note at Tamluk is a temple of great sanctity and of much architectural interest,

এই দেবীমন্দিরের ঠিক সম্মুখে "যজ্ঞমন্দির" নামে আর একটী মন্দির আছে। সেইটী পূর্ব্বমন্দির হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও ইহা অল্পদিন হইল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বোধ হয়। কথিত আছে যে একটী পতিপুত্রবিহীনা বৃদ্ধা সূতা প্রস্তুত ব্যবসা দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তদ্দ্বারাই ইহা প্রস্তুত হয়। উপরোক্ত দুই মন্দির একটী খিলান দ্বারা সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই খিলানটীকে "জগমোহন" বলে। এতদ্ভিন্ন যজ্ঞমন্দিরের সম্মুখে বলিদান ও যাত্রাদি হইবার জন্য একটী ছাদবিশিষ্ট দালান আছে। ইহারই সম্মুখে দেউড়ি ও তদুপরি নহবৎখানা। মন্দিরের দক্ষিণদিকে ভোগরান্নার ও অধিকারী (পাণ্ডা) মহাশয়দিগের থাকিবার গৃহাদি আছে এবং উত্তর দিকে কুণ্ড আছে, তাহার জলে স্নানাদি করিলে লোকে পূর্ণমনোরথ হয়। বর্গভীমার বেদীর নিম্নে মহাদেব ও তাঁহার মন্দির আছে।

যখন (খ্রীঃ ১৫৬৭-৬৮) দুরন্ত কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করিবার জন্য অগণিত যবনসৈন্য সমভিব্যহারে এই জনপদে আগমন করেন, তখন তিনিও দেবীকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন ও পারসিক (পার্শি) ভাষায় একখানি দলিল লিখিয়া দিয়া যান। সেই দলিল এখনও দেবীর উপাসক মহাশয়দিগের নিকট আছে। তাঁহারা উহাকে "বাদসাহীপঞ্জ" বলিয়া থাকেন।

এমন কি নরপিশাচ বর্গীসৈন্যও এই দেবী দর্শন করিয়া ভীত হয় এবং কোন প্রকার উৎপাত না করিয়া এই জনপদ পরিত্যাগ করে। লিখিত আছে যে, "যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ (বর্গী) নিম্নবঙ্গদেশ লুণ্ঠনে পরিব্যাপ্ত ছিল,—এমন কি যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া ঐ নর-পিশাচগণ গমন করিয়াছিল, পথিমধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর, শান্তিপ্রিয়-জনগণসমন্বিত গ্রাম, শ্যামল-শস্যশোভিত ক্ষেত্র এবং

উদ্যান প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিতে অনুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। সেই হৃদয়বিহীন দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন তমোলুকে উপস্থিত হইল, তখন উক্ত স্থানের কোন প্রকার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, এমন কি ভয়ে ভীত হইয়া ভীমাদেবীর চরণে ষোড়শোপচারে পূজা করিল এবং বহুমূল্য রত্নালঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করিল।"

এই দেবী ব্যতীত এখানে জিষ্ণুহরি, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, রামচন্দ্র, জগন্নাথদেব প্রভৃতি দেবতা বিরাজিত আছেন। জিষ্ণুহরির বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহা আর এখানে পুনরায় বলিবার আবশ্যক নাই। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির বাসুদেব ঘোষ নামক জনৈক কীর্ত্তনিয়া কর্ত্তৃক ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বাসুদেব তদীয় শিষ্য মাধবী দাসের হস্তে মহাপ্রভুর সেবাদির ভার অর্পণ করিয়া দেশপর্য্যটনে বাহির হন। তিনি আর এখানে ফিরেন নাই; বিদেশেই প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পর তমলুক, সুজামুঠা, কাশীজোড়া, দোরো প্রভৃতি স্থানের ভূস্বামিগণ ইঁহার সেবাদি নির্ব্বাহের জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার উপসত্ত্ব হইতে মহাপ্রভুর সেবাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

এখানকার ষট্‌চত্বারিংশৎ রাজা শ্রীমন্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা মহিষী হরিপ্রিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইঁহার সেবাদি নির্ব্বাহের জন্য ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। আর, জগন্নাথদেবকে স্বয়ং রাজা শ্রীমন্ত রায় স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারও সেবাদি রাজগণপ্রদত্ত ভূসম্পত্তির উপসত্ত্ব হইতে নির্ব্বাহ হইতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গালায় যে সকল নগরী বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাম্রলিপ্তীই সর্ব্বাগ্রগণ্য। [illegible]

বাণিজ্যের জন্য খ্যাত ছিল বটে, কিন্তু তাম্রলিপ্তী অপেক্ষা তাহার খ্যাতি অধিক ছিল বোধ হয় না। তৎকালে বহু অর্ণবতরী তাম্রলিপ্তী হইতে ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপসমূহে ও আরব, চীন প্রভৃতি দেশে গমনাগমন করিত। বৌদ্ধদিগের সময় হইতে তাম্রলিপ্তী একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এতদ্‌সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে :—

"Even at this day the ancient Buddhist port (Tamluk) bears traces of its origin. In 1781 an English official reported to Government, that Tamluk was originally a Buddhist town and a large emporium of castern trades, and had many fine monasteries."

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হণ্টার সাহেবও বলেন যে, "It is a Buddhist port that Tamluk emerges upon history."

ভিন্ন জাতীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। প্রসিদ্ধ গ্রীকঐতিহাসিক মেগাস্থেনিস (ইনি মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক সম্রাট্ সেলিউকাস্ কর্ত্তৃক দূত স্বরূপ প্রেরিত হন) কর্ত্তৃক লিখিত বিবরণ পাঠে তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ বহু বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। মেগাস্থেনিস্ ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখেন, তাহা এক্ষণে আর পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার ইতিহাস হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠেও আমরা অনেক বিষয় জ্ঞাত হইতে পারি। গ্রীকগণের পরই বোধ হয় চৈনিকগণ এই দেশে আগমন করেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের সভ্যতা, শাস্ত্রবিদ্যা ও বাণিজ্যের বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আগমন করেন। তিনি এখানে দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন ও নানাবিধ শাস্ত্রের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া ও দেবদেবীর মূর্ত্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়া হিন্দুদিগের একখানি বৃহৎ বাণিজ্যপোতে সিংহল গমন করেন। তথা হইতে তিনি আর একখানি পোতে চীন দেশে ফিরিয়া যান। ফা-হিয়ানের সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন :—

"Going further eastward and southward Fa-Hian came to Tamralipti which was then the great seaport at the mouth of the Ganges. There were 24 sangharamas in this country; all of them had resident priests, and the law of Buddha was generally respected. Fa-Hian remained for two years, writing out copies of the sacred books and drawing image-pictures. He then shipped himself on board a great merchant vessel. Putting to sea, they proceeded in a south-westerly direction, catching the first wind of the winter season. They sailed for fourteen days and nights, and arrived at the 'country of the lions' (Sinhala, Ceylon)."

ফা-হিয়ানের পর হুয়েন সাঙ্ নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণকালে এইস্থানে আসেন ও কিছুদিন অবস্থান করিয়া উড়িষ্যা, কলিঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণে গমন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই স্থানের নানা বিবরণ লিখিয়াছেন। পণ্ডিত-প্রবর মাননীয় এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন :—

Sundarbans), and thence to the port of Tamralipti (Tamluk). He finds in the latter place 10 convents and 50 temples; and he mentions the immense quantity of rare and precious merchandise which was brought to it by land and sea. Here he inquired about Ceylon (Sinhala), and he learned that ships often sailed thither from this port * * *."

উপরের বিবরণ পাঠে জানা যাইতেছে যে প্রাচীনকালে তমলুক একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল এবং এখানে বহু বণিক নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। ইহা পাঠে আরও জানা যায় যে এইখান হইতে সিংহল প্রভৃতি দেশে অর্ণবযানাদি গমনাগমন করিত।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেগাস্থেনিস্ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মে ম্যাক্রিণ্ডেল্ সাহেব লিখিয়াছেন :— "It (*i. e.*, Tamralipti) was in old times the main emporium of the trade carried on between Gangetic India and Ceylon."

এই সমস্ত বিবরণ পাঠে ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে তাম্রলিপ্তী একটী বৃহৎ বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল। বঙ্গদর্শনেও লিখিত আছে যে "তাম্রলিপ্তী ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থান ছিল।"

আরও পোটলেমির বিবরণ পাঠে ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। পোটলেমি বলিয়াছেন :—"As is proved historically by the mention of Tamralipta 600 years before our era, as one of the most frequented ports of Eastern India."

বলেন। যথা:—(১) কর্ণ সুবর্ণ (অথবা ভাগলপুর প্রদেশ প্রভৃতি); (২) পুণ্ড্র (অথবা দিনাজপুর প্রদেশ প্রভৃতি); (৩) কামরূপ (অথবা আসাম প্রদেশ প্রভৃতি); (৪) সমতট (অথবা ঢাকা প্রদেশ প্রভৃতি); (৫) তাম্রলিপ্তী (অথবা তমলুক প্রদেশ প্রভৃতি)।

ফা-হিয়ান ও হুয়েন সাঙ্ প্রভৃতি পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব্বকালে তাম্রলিপ্তী একটা প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল এবং এইখান হইতে বাণিজ্যপোতাদি সিংহল, যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশ সমূহে যাতায়াত করিত। তৎকালে অন্য কোন জাতীয় নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রা করিতে সাহসী হইত না। চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি যে দেশ আছে তাহাই তাহারা জানিতনা। কেবল ভারতবর্ষীয় নাবিকগণ অসমসাহসে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানে সমুদ্র পার হইয়া নানা দিগ্দেশে গমন করিত।

"Long before Hippalus ventured upon the voyage from the mouth of the Red Sea, across Barygaza and Musiris, did Indian vessels cross the Bay of Bengal to Ceylon, to Burma, to Malacca and to Sumatra. No Greek nor Roman ship visited those places. No Arab settlers were found there prior to the birth of Mahamed. The earth in these quarters was unknown to them."

দোললীলা।

"রঙ্গ রাখ রসময় রাখ রঙ্গ ওগো শ্যামরায়,
হারি মানিলাম হরি কুঙ্কুম-রাঙ্গান দুটী পায়।
নির্দ্দয়, নাহিক দয়া, আজি এই অঙ্গপানে চেয়ে,
হেরিছনা হোরিধারা দরদরি পাড়িতেছে বেয়ে।
দেহে, বস্ত্রে, কেশপাশে ঝর্ঝরিয়া সর্জ্জরস সম,
কুঙ্কুমের পঙ্কে দেখ অন্ধ হ'ল দুটি আঁখি মম।
তোমার কি হবে বল কাল অঙ্গে যত দিই ফাগ,
ততই বাড়ে যে শোভা নাহি লাগে কুঙ্কুমের দাগ।
সুচিক্কন শ্যাম অঙ্গে রঙ্গ মম পিছলিয়া যায়,
তাই হারি মানি হরি দেহ ছাড়ি ধরি দুটি পায়।"
—এক নেত্রে মৃদু হাসি' অন্যনেত্রে কোপদৃষ্টি ভরি,
শঠশিরোমণি পদে নিবেদিলা রাধিকা সুন্দরী।
উত্তরে হাসিয়া দুষ্ট করে ভরি' পূর্ণ পিচকারী,
শ্রীরাধার অঙ্গ লক্ষ্য মারিলেন রঙ্গে গিরিধারী।

—একদিন এই চিত্র, মূর্ত্তিমান্ জীবন্ত উজ্জ্বল,
করেছিল বঙ্গদেশ হাস্যে লাস্যে উন্মত্ত চঞ্চল।
আজি তাহা নামে মাত্র,—তবু আজি কি উৎসাহভরে,
মাতিয়াছে পুরবাসী—কি উৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
চির সুন্দরীর সাথে চির সুন্দরের হোলীখেলা,—

আজি তাই ভাবিতেছি বসি একা আকুল অন্তরে,—
সহসা চাহিয়া দেখি পশ্চিমের উন্মুক্ত অম্বরে,
প্রাবৃটের ঘনঘটা অন্ধকার আসিয়াছে নামি,
চলিছে জলদ মন্দ্র দিক্ হ'তে দিগন্তর গামী।
আনন্দের ডম্বরু বাজায়ে—ক্ষুব্ধ ঝটিকার সনে,
সহসা নামিল বৃষ্টি ঘনঘোর ধারা বরিষণে।

ভুলে গেনু সত্য মিথ্যা, গেনু ভুলে তুচ্ছ কাল দেশ,
উদ্‌ভ্রান্ত আঁখির আগে হেরিতে লাগিনু নিনিমেষ—
বিশ্বের সে হোলী খেলা,—বৃষ্টিছলে কৃষ্ণ মেঘ রাজি,
পুলকিত ধরা অঙ্গে পিচকারী মারিতেছে আজি
মহারঙ্গে ;—কলহাস্যে দিগঙ্গনা ছুড়াছুড়ি করে,—
তারি দ্রুত পদধ্বনি শুনা যায় সুদূর অম্বরে।

—তখন পশ্চিমপ্রান্তে সূর্য্যদেব আসছেন নেমে,
শান্ত হ'ল বৃষ্টিধারা, ঝটিকা আসিল ক্রমে থেমে।
রাগরক্ত তরুশির রক্তরাগ অরুণ কুঙ্কুমে,
রাগরক্ত গঙ্গাবারি তারি সেই রক্তরাগ চুমে।
রঞ্জিয়া দিগন্ত কান্তি সান্ধ্য-সূর্য্য অস্তে গেলা ধীরে—
মাখিয়া সন্ধ্যার গণ্ড লালে লাল আবিরে আবিরে।
—চৈত্রপূর্ণিমার নিশি, অপরূপ বিশ্ব-দোললীলা—
আমার বিমুগ্ধ নেত্র ঊর্দ্ধলোকে বিস্ময়ে হেরিলা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

সমসাময়িক ভারত।

আর্থিক অবস্থা।

৩

এখানে যতবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, প্রত্যেক দুর্ভিক্ষের পরেই এক একটা অনুসন্ধান-সমিতি বসিয়াছে। প্রথম সমিতি নির্দ্ধারণ করিলেন,—দেশ দরিদ্র, কৃষিযোগ্য যথেষ্ট ভূমি নাই, মজুরীর হার নিতান্ত অল্প। একটা কথা তাঁহাদের অনুসন্ধানে স্পষ্টরূপে জানা গিয়াছে;—বাস্তবিক পক্ষে এ দুর্ভিক্ষ শস্যের দুর্ভিক্ষ নহে, ইহা অর্থের দুর্ভিক্ষ। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাইতেছি, দুর্ভিক্ষের কঠোরতা নিয়মিত-রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি ?—কারণ আর কিছুই নহে, হিন্দু কৃষক ও হিন্দু মজুরের দৈহিক প্রতিরোধিনী শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ এখানে কখন হয় নাই।

প্রতিবারে নূতন নূতন প্রদেশ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইতেছে ; পূর্ব্বে যে সব প্রদেশ অব্যাহতি পাইয়াছিল, গুজরাটের ন্যায় সেই সব প্রদেশও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইতেছে, দুর্ভিক্ষের শ্মশান-পরিধি ক্রমশঃই বিস্তার লাভ করিতেছে। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু তথাপি এদেশ হইতে য়ুরোপে শস্যের রপ্তানি কখনই বন্ধ হয় নাই। ইহা কুৎসা-রটনা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কথাটা সত্য। দেখা যায়, এদেশের সকল স্থানে একই সময়ে অজন্মা হয় না—শস্যের অভাব হয় না। অভাব হইলেও, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশের শস্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। অতএব, এই আংশিক অজন্মা হইতে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, অর্থের অভাবই

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ হইতে নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে কি কোন বাধা হয়? দ্রব্যাদি চালান করিবার উপায়ের কোন অভাব নাই; অভাব কেবল সঞ্চিত অর্থের—আগাম-খরচ করিবার সামর্থ্যের। তাই, ফসলের একটু এদিক্-ওদিক্ হইলেই রায়তের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়; কাজেই, সুজন্মা ও সুবৃষ্টির উপর তাহাকে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়।

দ্বিতীয় অনুসন্ধান-সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে,—শ্রম-শিল্পের উচ্ছেদ বশতঃই কৃষিরও ঘোর দুরবস্থা ঘটিয়াছে। Baines (British Empire Series—1 Vol—India—p. 27) এইরূপ বলেন:—"ভারতের অন্নসংস্থানের সমস্যাটি সেই পুরাতন সমস্যা—যাহা Brobdingnag এর রাজা উপস্থিত করিয়াছিলেন;—"পূর্ব্বে যেখানে ধানের একটি শিষ্ গজাইত সেখানে কি-করিয়া দুইটি শিষ্ গজানো যাইতে পারে"—এই সমস্যা। না,—ইহাই সমস্ত সমস্যা নহে। আমি বিস্মিত হইলাম যে একজন ইংরাজ আসল কথাটা ভুলিয়া যাইবেন। বস্ত্র-বয়নাদি ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিকে প্রকাণ্ড ভীষণ প্রতিযোগিতার সম্মুখে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া, কি-করিয়া উহাদিগকে বিদলিত করা হইয়াছে, তাহা কি তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন?

ইহারই দরুণ অনেক তাঁতি বেকার অবস্থায় পড়িয়া লাঙ্গল ধরিতে বাধ্য হয়। তাহারি অব্যবহিত ফলে মজুরীর হার—এমনিই ত কম ছিল—আরও কমিয়া গেল। ভূমিও, এত অসংখ্য লোকের অন্ন যোগাইয়া উঠিতে পারিল না। কাজেই একদল মজুরের সৃষ্টি হইল—যাহাদের অনিশ্চিত সামান্য মজুরী ভিন্ন আর কোন উপায় রহিল না। এবং সর্ব্বাগ্রে ইহারাই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইল।

ভারত নিতান্তই কৃষিজীবী হইয়া পড়িয়াছে। ভূমিই উহার একমাত্র জীবিকা। এই জন্য অজন্মা হইলেই চূড়ান্ত বিপদ,—তাহার

আর কোন প্রতীকার নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুখবাদী-সুলভ আশা-প্রবণতা (optimism) ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের একপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বরাবরই এদেশের দুর্ভিক্ষকে এরূপভাবে দেখেন যেন উহা শুধু একটা নাভসিক উৎপাৎ—এমন-একটা প্রাকৃতিক উপদ্রব যাহা নিবারণ করা যায় না—যাহার পূর্ব্ব হইতে কোন প্রতিবিধান হয় না। যাঁহারা ভাবী সুজন্মার প্রতীক্ষায় হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ব্যাখ্যাই সুবিধা-জনক। তাই, তাঁহারা অনুসন্ধান-সমিতির সিদ্ধান্তগুলি, অকেজো-কাগজের ঝুড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বেও তাঁহারাই দাদাভাইর ভয়সূচক হিসাবাদি হাসিয়া উড়াইয়াছিলেন। এই অনর্থের গভীর-নিহিত মূলগুলা সর্ব্বাগ্রে দাদাভাইরই চক্ষে পড়ে। এবং তদবধি এই কথা, তিনি কতকগুলি বধিরের কাণে অক্লান্তভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন—সেই সব লোকের কাণে যাহারা বধির অপেক্ষাও অধম,—কেন না তাহারা শুনিয়াও শুনিবে না। সেই দাদাভাই চখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, রায়তের ভীষণ দারিদ্র্যই এই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ।

ভারত-সরকার নিজের দফ্‌তর-ডেস্কোর দেরাজ খালি করিতে নিতান্ত নারাজ। ৩০ বৎসর হইল, যখন দাদাভাই কলিকাতার হিসাব-সমিতির নিকট এই বিষয়ের হিসাব-তালিকাদি চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা যেন নিতান্ত দায়ে পড়িয়া, কতকগুলা হিসাবের অঙ্ক তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। সেই টুক্‌রা-টাক্‌রা হিসাবের অঙ্কগুলা নিতান্ত অসম্পূর্ণ—বিজ্ঞান-পদ্ধতির একান্ত বিরুদ্ধ। তাই দাদাভাই সেগুলা ছাড়িয়া নিজেই দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং ১৮৭৬ সালে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল—লণ্ডনের (বোম্বাই-শাখা)

তাঁহার হিসাব একেবারে সঠিক্ না হইলেও—বাস্তবের অনেকটা কাছাকাছি। সেই হিসাব হইতে তিনি প্রতিপন্ন করিলেন যে,—সহজ-সচ্ছল বৎসরে, মাথা-পিছু ২০৲ টাকা করিয়া ভারতবাসীর আয়। তাহার পর, তিনি সখের খরচ বাদ দিয়া—বিভিন্ন প্রদেশের শুধু জীবন যাত্রার ব্যয়—অশন বসন বাড়ী ভাড়া ইত্যাদির ব্যয়—উক্ত হিসাবের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইলেন। শুধু জীবনধারণের জন্য একজন চাষার খরচ হয়, আহমেদাবাদে—৬২৲ টাকা; বোম্বায়ে ৪৮৲ টাকা; পুনায় ৮০৲ টাকা। অতএব দেখা যাইতেছে কতকগুলি প্রদেশে, এই ২০৲ টাকা জীবনধারণোপযোগী ব্যয়ের চতুর্থাংশ মাত্র; এবং অন্য কতকগুলি প্রদেশে, অর্দ্ধাংশও হয় কিনা সন্দেহ। সুতরাং সহজ-সচ্ছল বৎসরেও প্রায়ৎ বাধ্য হইয়া টাকা ধার করে, অথবা অর্দ্ধাশনে দিনপাত করে। দাদাভাই এই স্থলে যে একটা তুলনা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রসঙ্গে নূতন কথার একটু আভাস (suggestive) পাওয়া যায়;—তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—সুবৎসরেও চাষার যে বার্ষিক আয় হয়, তাহা অপেক্ষা একজন জেল্‌খানার কয়েদীও বেশী পায়। বেশ বুঝা যাইতেছে—তাঁহার হিসাব গড়-পড়তার হিসাব। সুতরাং উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের আয় যদি এই ২০৲ টাকা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে, জনসাধারণের আয় সেই পরিমাণে আরো কত কম হইবে। • • • একজন মজুর-চাষার কত মজুরী—তুমি কি জানিতে চাহ?—দেড় আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত; গড়ে দৈনিক দুই আনা।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই হিসাব লইয়া দাদাভাইকে কেহ কেহ উপহাস করিতে ছাড়েন নাই। একজন ইঙ্গভারতীয় রাজপুরুষ, বেশ-একটু ভঙ্গীসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন:—"ইহা যদি সত্য হয়, হিন্দু চাষা এখনও কি করিয়া বাঁচিয়া আছে?" তিনি ভুলিয়া

ভারতীয় রাজপুরুষকে কোনক্রমে অবিশ্বাস করা যায় না, সেই হণ্টারের সাক্ষ্যের কথাও তিনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন? হণ্টার এইরূপ বলিয়াছেন:—"৪০ কোটী ভারতবাসী শুধু একবেলা আহার করিতে পায়।" এই সমস্ত সাক্ষ্যের মধ্যে বিলক্ষণ ঐক্য দেখা যায়। আমি নিজে দাদাভাইয়ের হিসাবের অঙ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, Sir Evelin Baring—অধুনা Lord Cromer—কিয়ৎ বৎসর পরে ভারতবাসীর আয়, গড়ে ২৮৲ টাকা নির্দ্ধারিত করেন; এবং তিনি বলেন,—এ আয়ের অঙ্কও, বড় একটা আশ্বাসজনক নহে। ৪ বৎসর পরে, বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি-বাহাদুর লর্ড কর্জ্জনও এই ২০৲ টাকার অঙ্কই স্থির রাখেন। কিন্তু ইহা যেন মনে থাকে, এখনকার হারে এই ২০৲ টাকা ৩৪ ফ্র্যাঙ্কের তুল্য মূল্য; তাহার পর, ইহা হইতে রাজকর তিন ফ্রাঙ্ক বাদ দিলে দাঁড়ায়—২৮ ফ্রাঙ্ক—৯০ সেণ্টিম্; পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ নাই, যেখানে এইরূপ আয়ে লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু সরকারি-হিসাব-দক্ষ বিশেষজ্ঞেরা, গোঁজামিল দিয়া কিরূপে হিসাব প্রস্তুত করিতে হয় তাহার কৌশল বিলক্ষণ জানেন।

এই অতুলনীয় দারিদ্র্যের পরিণাম কি?—ক্ষুদ্র চাষা-ভূম্যধিকারিগণের উচ্ছেদ সাধন। গ্রাম-শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানকার ভূসম্পত্তি কত ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডগুলি সহজ-সচ্ছল বৎসরেও, স্বীয় ভূস্বামীর আহার যোগাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে;—সমস্তই করভারে ভারাক্রান্ত; সরকারী তহবিলের দুর্নিবার তৃষ্ণাশান্তির নিমিত্ত কখন কি প্রয়োজন সহসা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য সরকারের সতর্ক দৃষ্টি উহার উপর সর্ব্বদাই রহিয়াছে; কাজেই রায়ৎ জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিতে বাধ্য হয়। সুবৎসরে অর্থ সঞ্চিত করিয়া সেই অর্থে বন্ধকী জমি যে খালাস

করিবে, কিংবা সেই জমি পুনঃক্রয় করিবে, চাষা তাহাও পারে না। মহাজন যদি ঐ জমি বাঁধা রাখিয়া তাহার সত্ত্বাধিকারটুকু বজায় রাখে তাহা হইলেই সে সন্তুষ্ট। কিন্তু কে এই মহাজন? সে ঐ গ্রামের লুব্ধ সুদ-খোর বেণিয়া,—প্রায়ই মারোয়ারী, কিংবা গ্রামের শেঠ (চেটি)। সেই মহাজন আসিয়া সমস্ত গ্রামগুলা আত্মসাৎ করিয়া লয়। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিহ্বল কর্ত্তৃপক্ষের চোখের সাম্‌নেই, জমির প্রকৃত মালিকদিগকে ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা হয়। আজ বলিয়া নহে, বহুকাল হইতেই, কতিপয় সূক্ষ্মদর্শী ইঙ্গভারতীয় ইংরাজ এই চিরন্তন ক্ষতস্থানের উপর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। হণ্টার বলেন ঃ—"আর একটা দ্বিতীয় আয়র্লণ্ড আমরা ঘাড়ে করিয়া লইতেছি যাহার ভার আয়র্লণ্ড অপেক্ষা পঞ্চাশগুণ অধিক।" হাঁ, একটা সমস্ত জাতি মজুর বনিয়া যাইতেছে; এখন সেই অসংখ্য মজুরের গুরুভার বহন করিতে হইবে।

ক্ষতস্থানের বহির্ভাগটাই সকলে দেখিতে পায়; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য—যাহা সহজ-চখে পড়ে না সেই সকল মুল-কারণ আবিষ্কার করা —আমূল প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ করা। কর্ত্তৃপক্ষের মনে হইল, এইজন্য প্রথমেই মহাজনকে ধরা আবশ্যক। বোম্বাই ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কর্ত্তৃপক্ষ "রায়তের ঋণভার লাঘবের আইন" প্রবর্ত্তিত করিলেন। এই আইনের দ্বারা মারোয়ারীর দাবী-দাওয়ার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং বন্ধকী ভূমি রায়ৎকে ফেরৎ দিবারও উপায় বিধান করা হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ভূমির দরুণ রায়তের যে প্রভূত পরিমাণ ঋণ হয়, তাহা কমাইয়া দেওয়া জজের ইচ্ছা। কিন্তু বিচারকালে জজ দেখিতে পান্‌, সুদ জমিয়া গিয়াই এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। হয়-ত রায়ৎ উহার কিয়দংশ পরিশোধ করিয়াছে—কৃষিজাত দ্রব্য দিয়া। জজ যে ধার-দেওয়া

টাকার উপর কাঁচি চালাইবেন, মহাজন তাহা পূর্ব্ব হইতেই আঁচিয়া, যাহা বাস্তবিক তাহার খরচ হইয়াছে তাহার প্রকৃত মূল্য অনেকটা কমাইয়া হিসাব দাখিল করে। হতভাগ্য রায়তের না-আছে দাখিলা, না-আছে কোন হিসাবপত্র। আদালত, প্রতিবাদীর ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দেন; কিন্তু বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও রায়তের পক্ষে দুঃসহ। এই আইনের যে এইরূপ আশ্চর্য্য পরিণাম হইবে, কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। একজন মহাজনের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, রায়ৎ প্রায়ই অন্য মহাজনের শরণাপন্ন হয়। ১৯০০ সালের জাতীয় কংগ্রেস সভায় চন্দ্রবর্কার বলেন:—"আমার ন্যায় যাঁহারা ওকালতি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাঁহারা প্রায়ই দেখিতে পান, রায়ৎ শুধু সাক্ষীগোপাল; তাহার পশ্চাতে এমন একটি লোক থাকে যে তাহার হইয়া বাদবিসম্বাদ করে, অর্থব্যয় করে, মোকদ্দমা চালায়, এবং যাহা কিছু লাভ হয় সমস্তই সে আত্মসাৎ করে। ইহার প্রতি-বিধানার্থ, কর্ত্তৃপক্ষ এক্ষণে মনে করিতেছেন, রায়ৎকে ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করিতে না দিয়া, তাহাকে শুধু তাহার ভূমিতে আবদ্ধ রাখিয়া, তাহার স্বত্বাধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন। কিন্তু ইহার ফলে রায়ৎ খুব-সম্ভব মহাজনের নিকট হইতে আর ধার পাইবে না, অনাহারে মরিবে; কিন্তু তাহা হইলেও, ভূমির স্বত্বাধিকারী থাকিয়াই ত মরিবে! ইহা উপস্থিত মত কাজ চালাইবার নীতি—ফিকির ফন্দির নীতি—রোগ চাপা দিবার নীতি—অভাবপক্ষের নীতি! কি করিয়া এই অনিষ্ট সাক্ষাৎভাবে নিবারিত হইতে পারে, চন্দ্রবর্কার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি বলেন,—কৃতকর্ম্মা বহুদর্শী নিখলসন্ সাহেবের সুচিন্তিত প্রস্তাব-অনুযায়ী কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করা আবশ্যক—এবং সর্ব্বাগ্রে ভূমির সেই কর-ভার লাঘব করা আবশ্যক যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া রায়ৎকে ক্রমেই পিষিয়া ফেলিতেছে—যাহা নানাপ্রকার

ফিকির ফন্দি অবলম্বন করিতে রায়ৎকে বাধ্য করিতেছে এবং তাহাকে মহাজনের করাল কবলে নিক্ষেপ করিতেছে।

এই কথাই কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখেন নাই। না ভাবিবার কারণ আছে। ইহাই তাঁহাদের ধ্রুববিশ্বাস যে, করদাতা হিন্দুকে আরো দুই এক বার খাজ্‌নার যাঁতায় পেষা যাইতে পারে। অমুক ইংরাজ কোষাধ্যক্ষ একথা বলিতে সংকুচিত হন নাই যে, ভারতের কর-ভার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। একজন ইংরাজ কিংবা ফরাসী অপেক্ষা, একজন ভারতবাসীকে কম খাজ্‌না দিতে হয় সত্য; কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, ইংরাজ ও ফরাসী, ভারতবাসী অপেক্ষা বহুপরিমাণে ধনশালী। করদাতার অর্থ-সম্বল ও তাহার দেয় রাজকর —এই দুয়ের তুলনাসূত্রেই রাজকরের গুরুলঘুত্ব নির্ণীত হইতে পারে; ধনীর অনাবশ্যক বাহুল্য অনেকটা ছাঁটিয়া দিলেও তাহার পক্ষে তেমন দুঃসহ নহে; কিন্তু দরিদ্রের নিতান্ত আবশ্যক সম্বল হইতে স্বল্পপরিমাণ কমাইলেও তাহার পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে। গড়পড়তা ২০৲ টাকা আয় হইতে হিন্দু রায়ৎ ৩৲ টাকা রাজকোষে দেয়—অর্থাৎ শতকরা ১৫৲ টাকা; পক্ষান্তরে, একজন ইংরাজকে দিতে হয় শতকরা ৮৲ টাকা। মনে রাখিও হিন্দু রায়তের ঐ ৩৲ টাকা তাহার নিতান্ত আবশ্যক সম্বল হইতে ছাঁটা যায়। পক্ষান্তরে, এইরূপে সংগৃহীত রাজস্ব হয়-ত পরিশেষে কোন একটা নিষ্ফল যুদ্ধে খরচ হইয়া যায়। আমাদের দেশে যে ব্যক্তি রাজকর দেয়, সেই রাজকর, বিবিধ সুবিধার সমষ্টিরূপে আবার তাহারি নিকটে ফিরিয়া আইসে। কিন্তু, ভারতবর্ষে,—সেই রাজকর হইতেই অবসর-বৃত্তি দেওয়া হয়, ইংরাজ রাজপুরুষদের মোটা-মোটা বেতন দেওয়া হয়, রেলপথের ক্ষতিপূরণ করা হয়, সরকারী ঋণের সুদ দেওয়া হয়, এসিয়ার কন্‌সল্‌দিগের ব্যয়ভার বহন করা হয়,

পাঠান হয়, ইণ্ডিয়া আফিসের জন্য খরচ করা হয়, এডোয়ার্ড রাজার অভিষেকের ব্যয়নির্ব্বাহ করা হয়,—কে জানে আরো কত কি হয়। বিশেষ কোন আবশ্যক মুহূর্ত্তে, কর্ত্তৃপক্ষ যখন রাজকোষ শূন্য দেখেন, তখন তাঁহারা দুর্ভিক্ষ-তহবিল হইতেই সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। এত জিনিষের জন্য যখন তাঁহাদের খরচ করিতে হয়, তখন তাঁহারা যে কৃষি-বিদ্যালয়ের জন্য, কৃষি-ব্যাঙ্কের জন্য, খরচ করিতে পারিবেন না, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রায়তের এই দুঃখ যে, যাহা জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক সেই সব দ্রব্যের উপর সরকার ক্রমাগত কর বৃদ্ধি করেন;—যেমন মনে কর লবণের উপর। আরও তাহাদের দুঃখের কথা এই যে, সরকার প্রতি ত্রিশ বৎসরে, নির্দ্দিষ্ট ভূমি-করের পুন-র্নির্দ্ধারণ করেন—বলা বাহুল্য প্রজার করভার লাঘবের জন্য নহে। লৌহপথ, ও খালাদির সুবিধার জন্য, জমির মূল্য অবশ্যই বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু রেলপথ খালাদির জন্য রায়ৎ যে পূর্ব্বেই দিয়া চুকিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—বোম্বাই প্রদেশে তরিতরকারীর চাষ কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ একজন ইংরাজ রাজপুরুষ বলেন—চাষার স্বাভাবিক আলস্য জড়তা, অথবা ভূমিকরের পুনর্নির্দ্ধারণ-কালের নিকট-বর্ত্তিতা। আর একজন বলেন,—কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে চাষা, সরকারী তহবিলের উন্নতিকল্পে না খাটিয়া, হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে।

আমি বলি, ভেড়ার লোম এমন করিয়া কাটো, যাহাতে তাহার চামড়া-শুদ্ধ উঠিয়া না আইসে। সৌভাগ্যক্রমে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ যখন এমন একটা ভাল উৎস পাইয়াছেন—এটা কি নিতান্ত গোড়ার কথা নহে যে, এই উৎসটি যাহাতে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য তাঁহাদের সতর্ক-দৃষ্টি থাকা আবশ্যক? রাজসরকারের স্বার্থই এই—দেশের প্রাকৃতিক সম্বল প্রথমে নিজ হস্তে লইয়া তাহার সুব্যবস্থা করা; পরে শিক্ষার

দ্বারা, মূলধনের দ্বারা, যন্ত্রাদি দ্বারা প্রজাবর্গকে সাহায্য করিয়া সেই প্রাকৃতিক সম্বলের বৃদ্ধি করা। আসল কথা, দেশীয় লোকের স্বার্থ রক্ষা করিয়া, কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ রাজনীতির অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের পক্ষেও অধিক ফলদায়ী হইত। কিন্তু যতই চেষ্টা কর, শুধু কৃষির দ্বারা ২৮ কোটি ভারতবাসীর কখনই উদর-পূর্ত্তি হইতে পারে না। ইহার জন্য দেশের শ্রমশিল্প সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহার আটঘাট বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কেন না, ম্যাঞ্চেষ্টার তাহা কিছুতেই হইতে দিবে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনন্ত-জীবন।

(৩)

আমরা বলিলাম "যদি স্থূলদেহ কালক্রমে তিরোহিত হয়, তবে মানবও অনন্তে লীন হইবে।" কিন্তু তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা কি? কিছুরই ত নাশ সম্ভবে না। যাহা আছে, তাহা থাকিবেই; তবে, একরূপে না থাকিয়া অন্যরূপে থাকিবে, এই মাত্র। এস্থলে তিরোহিত শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করিলাম যে, দেহ স্থূলভাব পরিত্যাগ করতঃ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এক অচিন্তনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই অনুমানের মূল কি? মূল আছে। দেহের প্রত্যেক অংশ পৃথক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইতে পারে যে উহারা ধ্বংশের পথে অনেক দূর অগ্রসর

হইয়াছে।* সে আলোচনা বহুবিস্তৃত হয়; সুতরাং সংক্ষেপে একটী মাত্র কথাই উল্লেখ করিব। কিন্তু তদগ্রে পৃথিবীর অতীত অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। এই অবস্থাকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—(১) অজীবাবস্থা; (২) উদ্ভিদযুগ; (৩) জন্তুযুগ। বলা বাহুল্য যে উদ্ভিদযুগেও জন্তু ছিল, এবং জন্তুযুগেও উদ্ভিদ আছে। তবে গরিষ্ঠ লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ বিভাগ করা গেল। এক্ষণে, অতীত ভু-তত্ব অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, জন্তুযুগের মধ্যাবস্থায় (Miocene-যুগ) জীবদেহ একরূপ চরম উপযোগীতা লাভ করিয়াছিল; দেহও বৃহদায়তন প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকলের পর আর দেহের অধিকতর পরিবর্ত্তনে কিম্বা পরিবর্দ্ধনে তৎকালীয় জীবগণের এই ধরাপৃষ্ঠে বাস করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হইত, এমত বোধ হয় না।† সুতরাং এই সময় হইতে জীবদেহের বিবর্দ্ধন স্থগিত হইয়া আসিতেছে; এবং উত্তরোত্তর দেহ জীবের প্রয়োজন সাধনে অপটু হইতেছে। এই অবস্থার শেষ পরিণামে দেহের দশা কি হইবে, তাহা কল্পনার অবিষয় নহে। যেমন এই সময় (Miocene—যুগ) হইতে দেহের অবনতি আরম্ভ হইল, তেমনি মস্তিষ্কের উন্নতি হইতে লাগিল। এখন হইতে মস্তিষ্ক যে কেবল আয়তনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল তাহা নহে, উহার ক্রিয়াশক্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল।‡

---

* সাহিত্য ১৩১১, ৭২৫ পৃষ্ঠা ও ১৩১২, ৯৯ পৃষ্ঠা। এই দুই প্রবন্ধে হস্ত ও পদ, এবং অঙ্গুলি সকলের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সমস্ত মানবদেহ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ঐ পত্রিকায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

† "It seems that we have to imagine that the adaptation of mammalian form to the various conditions of life had in Miocene times reached a point when further alteration and elaboration of the various types, which we know then existed, could lead to no advantage."—Ray Lankester, *Nature and Man*, p. 19.

‡ "It is a very striking fact that it was not in the ancestor of man alone that this increase in the size of the brain took place at the same period, *viz.* the Miocene. * * * Other great mammals of the Tertiary period were in the same case."—*Nature and Man*, p. 18.

কিন্তু কিছুকাল এইরূপ হইবার পর মস্তিষ্কের আয়তন আর বর্দ্ধিত হয় নাই। যখন মানব সেই প্রাথমিক অবস্থা হইতে কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিল, তখন হইতেই মস্তিষ্কের আয়তন আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না; কেবল উহার ক্রিয়া শক্তিই ক্রমশঃ উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে।* তবেই দেখা যাইতেছে যে জন্তুযুগের মধ্য ভাগ হইতেই জীবদেহের পতন ও মস্তিষ্ক শক্তির উন্নতি হইয়া আসিতেছে। সুতরাং মানবের স্থূলদেহের নাশ সুদূর ভবিষ্যতের সম্ভবপর ঘটনা। যদি সেই সুসময় সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মানব আর মানব পদ-বাচ্য থাকিবে না। যাহা হউক, এই সময়ে চিৎ-শক্তি যে অত্যব উন্নত ভাবাপন্ন হইবে, তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ এই শক্তির যে উৎকর্ষতা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নিবৃত্ত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না; বরং উত্তরোত্তর মানবের জ্ঞানোন্নতির সহিত ইহারও উন্নতি অনিবার্য্য।

স্থূলদেহ, অর্থাৎ অন্নময়-কোষ তিরোহিত হইবে। তখন জীব-শক্তি (অর্থাৎ জীবাত্মা) অনেকাংশ বাধা-বিমুক্ত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কোষ আশ্রয় করিবে। সেই উন্নত চিৎ-শক্তির পক্ষে স্থূলদেহ বিসদৃশ এবং অনুপযোগী হইবে। চিৎ-শক্তির একত্ব অসীম, ইহার সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। সুতরাং চিৎ-শক্তি উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইবে, তাহার কোষও ততই সূক্ষ্ম হইয়া তাহার কার্য্য সাধনের উপযোগী হইবে। অবশেষে চিৎ-শক্তি অনন্তে লীন হইবে, তখন

---

* "Man, it would seem, at a very remote period attained the extraordinary development of brain which marked him off from the rest of the animal-world, but has ever since been developing the powers and qualities of this organ without increasing its size."—

উহা কোষশূন্য, অরূপ, অবিষয়। তখন জীবব্রহ্মে অপ্রভেদ, তখন জীবব্রহ্ম এক। স্থূল দেহের লোপই ব্যাপ্তি; এবং তখনই জীবাত্মার বদ্ধ-মুক্তি। দেহের নাশ নৈসর্গিক কারণেই হইতেছে। তথাপি মানব-প্রযত্নে সেই দীর্ঘ সময়কে নিকটস্থ করা অসম্ভব নহে। ফল এক-ই। যে জীবাত্মা আদিতে দেহ গড়িয়া লইয়া ছিল, যে অসীম স্বেচ্ছায় দেহ-বদ্ধ হইয়াছিল, দেহনাশে সে পুনরায় মুক্ত হইল। প্রথমে পৃথক্ দেহ গ্রহণ করে নাই, তখনও তাহার গতি অনন্তের দিকে; এবং পৃথক্ দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল সীমাবদ্ধ থাকিবার পর দেহমুক্ত হইয়া আবারও গতি অনন্তে। অনন্ত-জীবনের ইহাই প্রকৃত মর্ম্ম, ইহাই প্রকৃত রহস্য।

শ্রীশশধর রায়।

সম্মোহন-বিদ্যা।

(৯)

সেদিন একজনকে সম্মোহিত করিবার পরমুহূর্ত্তেই মিডিয়ম অতিশয় চঞ্চল হইয়া ভয়ঙ্কর ভাবে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া এক একবার নিজের বক্ষের উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, একস্থানে স্থির হইয়া শুইয়া রহিল না, গড়াইয়া গড়াইয়া একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিল। মাথার চুল ছেঁড়া, হাত কামড়ান, মাটীতে হাত-পা ঠোকা অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল।

ইহার পূর্ব্বে কখনও এরূপ হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, মন্দ-আত্মার

(evil spirit) আবির্ভাব হইলে, মিডিয়মের প্রতি এইরূপ অত্যাচার হয়।

একবার ঘুঁসিটা মুখের উপর আসিয়া পড়িল, দাঁতে ও ঠোঁটে লাগিয়া রক্তপাত হইয়া গেল। মিডিয়মের এই রকম অবস্থা দেখিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। জোর করিয়া দুজনে দুখানা হাত ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু এক ঝাঁকানিতে আমরা দুজনেই পড়িয়া গেলাম; শেষে চারি জনেও কিছুই করিতে পারিলাম না। ধরিয়া রাখে কার সাধ্য! যেন মত্ত হস্তীর বল তখন মিডিয়মের দেহে আসিয়াছিল!

মন্দ-আত্মাকে শান্ত করিতে হইলে গান গাহিবার নিয়ম আছে। আমাদের মধ্যে একজন সুগায়ক ছিলেন, তাঁহাকে গান গাহিতে বলা হইল, তিনি

"গাও হে তাঁহারি নাম,
রচিত যাঁর বিশ্বধাম" ইত্যাদি।

এই গানটী গাহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ গাহিবার পর মিডিয়ম একেবারে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

আমরা ভাবিলাম, বুঝি প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাই মিডিয়মের নাম ধরিয়া তাহাকে ডাকিয়া, ঠেলিয়া তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মিডিয়ম কোন সাড়াও দিল না, উঠিয়াও বসিল না। তখনও প্রেতাত্মা তাহার দেহে অবস্থান করিতেছিলেন।

আমরা তখন তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরও পাইলাম। আবার প্রশ্ন করিলাম—"কিসের জন্য আপনি মিডিয়মের দেহে এত দৌরাত্ম্য করিলেন?"

উত্তরে তিনি বলিলেন—"আপনাদের মিডিয়ম আমার পুত্র; সে গয়ায় পিণ্ডদান না করায় আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি; সে পুত্রের মত

ব্যবহার করে নাই, তাই তাহার উপর আমার রাগ হইয়াছিল, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ওরূপ কষ্ট দিয়াছি ; ও পুত্র আমার কুলাঙ্গার। পুত্র হইয়া পিতার প্রতি কর্ত্তব্য করেনা। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ওকে আমার জন্য গয়ায় পিণ্ড দিতে বলিবেন, অতি অবশ্য বলিবেন, নিশ্চয়ই বলিবেন।"

আমরা উত্তর করিলাম—"আচ্ছা বলিব।"

"ত্রিসত্য করুন।"

আমরা বলিলাম, "বলিব, বলিব, বলিব।"

প্রেতাত্মা চলিয়া গেলেন।

মিডিয়মের জ্ঞান হইলে, সে সমস্ত শরীরে বড় বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। ঠোঁট কাটিয়া গিয়াছে দেখিয়া বড়ই অভিযোগ করিল, বলিল—"এ আপনাদের ভারি অন্যায়, আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার দেহ যে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিয়াছেন!"

আমরা সকলে মিলিয়া বলিলাম যে, তাহার কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্পর্শ করি নাই।

মিডিয়মের সেদিন একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিল। সে কেবলই বলিতে লাগিল—"আমার শরীরটা আজ বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে, খালি ঘুম পাচ্ছে, সমস্ত শরীর টাটাইয়া আড়ষ্ট হইয়াছে!"

আমরা তাহাকে গোটাকতক "পাস" দিতে সে কতকটা সুস্থ হইল, তখন তাহার নিকট পিণ্ডদানের কথাটা উত্থাপন করিলাম।

বলিতে ভুলিয়াছি, সেদিনকার মিডিয়ম আমাদের বিশেষ পরিচিত ছিলনা, কাজেই তাহার পরিচয়, বা পিতার নাম ইত্যাদি জানিতাম না ; প্রেতাত্মা যখন তাঁহার নাম বলেন নাই তাই চিনিতে পারি নাই।

(১০)

ইহার পর মন্দ-আত্মার আবির্ভাব প্রায়ই হইতে লাগিল। আমরা বিব্রত হইয়া পড়িলাম। সম্মোহন-বিদ্যায় এতদিন যে স্ফূর্ত্তিটুকু পাইতেছিলাম এখন ক্রমশঃই তাহা কষ্টে পরিণত হইয়া উঠিল। আর প্রশ্ন করিবার অবসর কোথা? মিডিয়মকে শান্ত করিবার জন্য কেবলই গান চলিতে লাগিল, তাহার অস্থিরতা ক্রমেই যেন বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, যখনই গান হয়, তখনই মিডিয়ম স্থির হইয়া থাকে, আবার গান বন্ধ হইলে সে যেমন অস্থির তেমনই। এ অবস্থায় আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইতনা।

এই সময়ে হঠাৎ একদিন রামলাল আসিয়া হাজির হইল। সেদিন রামলালেরও একটু উগ্রমূর্ত্তি, বেশ চড়া চড়া কথা। আসিয়াই বলিল—"তোমরা এখনও এ সব ছাড়নি, তোমাদের কি কোন কায-কৰ্ম্ম নাই, রাত্রিদিন বসিয়া কেবলই এই হিপনটিসমের চর্চ্চা করিতেছ, তোমরা বড়ই ছেলেমানুষ দেখিতেছি জগতে ঢের কাজ আছে, তাই করগেনা, এ সব কাজে বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ কেন? এতে লাভ কি? এ আর কোরোনা—ছেড়ে দাও।"

আমরা বলিলাম—"কই এতদিন ত তুমি বারণ করনি—এখন বারণ করিতেছ কেন?"

রা—আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমাদের দুদিন খেয়াল চাপিয়াছিল তাই করিতেছিলে, শীঘ্রই ছাড়িয়া দিবে।

আমরা বলিলাম—"এই হিপনটিসমের চর্চ্চা করাতে যখন কাহারো কোন ক্ষতি হইতেছেনা, তখন ইহা করিতে আপত্তি কি?"

রা—ক্ষতি হইতেছে না কি করিয়া জানিলে—ক্ষতি যথেষ্ট হইতেছে, তোমরা নিজেদেরই খুব অনিষ্ট করিতেছ—যাক্, সে যব এখন

বলিব না। আর একটা কথা, এ সব কায ভাল করিয়া শিক্ষা না করিয়া করা উচিত নহে।

আ—আমাদের কি সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ হয় নাই ?

রামলাল হাসিয়া বলিল—"সম্পূর্ণ কি—কিছুই হয় নাই, অতি সামান্যই শিখিয়াছ; তোমাদের যে শিক্ষা-গুরু আমেরিকাবাসী তাহারাই এ বিষয়টা এখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, আর পারিবেও না, তাহারা একটা ভুল পথ ধরিয়াছে। যাক্ সে সব কথা, তোমরা এটা ছাড়িয়া দাও।"

আ—আমাদের কি শিক্ষা করিবার কোন উপায় নাই ?

রা—তোমাদের শিক্ষা করিবার দরকার নাই—আর তোমাদের মত লোক যে কখন কৃতকার্য্য হ'বে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই ভারতবর্ষেই এখনও এমন লোক আছেন, যাঁরা এ বিষয়ে খুব অভিজ্ঞ—এ হচ্ছে যোগের একটা নিম্নস্তর, সে রকম লোকের কাছ থেকে যদি শিক্ষা নিতে পার, তা হ'লে হ'বে, তবে তাঁদের পাওয়া দুর্লভ।

আ—আচ্ছা, আমরা যদি হিপনটিসমের চর্চ্চা না ছাড়ি ?

রা—তাহ'লে এর বিষময় ফল অচিরেই ভোগ কোর্ত্তে হ'বে। তোমরা এ জিনিসটাকে একটা ছেলে-খেলার মত করে যাচ্ছ, যে শক্তি তোমরা অর্জ্জন করে এ বিষয়ে একটু কৃতকার্য্য হয়েছ তা তোমাদের দিন দিন ক্ষয় হ'চ্ছে. তোমরা তা রাখ্‌তে পাচ্ছনা, এই শক্তি যখন আরো হীন হয়ে পড়বে, দেখ তখন কি হয় !

আ—কি হ'বে ?

রা—কোন আত্মাকে আর বশীভূত রাখতে পারবেনা, তখন মহা মুস্কিলে পড়বে।

রা—যায়, কিন্তু সে এরকম ক'রে ছেলে-খেলা কল্লে হবেনা।

আ—শক্তি বাড়ানর উপায় কি ?

রা—তা আমি ঠিক জানিনা। যেখান থেকে, যে উপায়ে তোমরা এই বিদ্যা শিক্ষা করেছ, সেখানেই সন্ধান কর।

আ—যদি আত্মাকে বশীভূত রাখিতে পারি তাহা হইলে ক্ষতি কি ?

রা—ক্ষতি গুরুতর, মিডিয়মের প্রাণসংশয়।

রামলাল আবার জিজ্ঞাসা করিল—“তোমরা ছেড়ে দেবেত ?” আমরা কোন উত্তর করিলাম না। রামলাল তখন বলিল—“দেখ, আজ তোমরা প্রেতাত্মা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছ, অনেককে তোমরা শাস্তির ভাগী করিতেছ, যখন তোমাদের মৃত্যু হইবে, তখন সেই সব আত্মা তোমাদের উত্যক্ত করিবে, তোমাদের লইয়া ছেঁড়াছিঁড়ি করিবে।”

আমরা সে কথায় বড় কাণ দিলাম না।

(১১)

রামলালের কথা লইয়া সেদিন আমাদের মধ্যে খুব আলোচনা হইয়া গেল। আমাদের মধ্যে কেহ বলিলেন, আর ওসব করিয়া কায নাই ; কেহ বলিলেন, আর কিছুদিন দেখাই যাক্ না কি হয়। আমরা পশ্চাৎপদ্ হইলাম না।

রামলাল আসিবার কিছুদিন পরেই আমরা একজনকে সম্মোহিত করিলাম। প্রথম হইতেই উৎপাৎ, সেই হাত-পা ছোঁড়া-ছুঁড়ি ! অনেক কষ্টে স্থির করান গেল। আমরা প্রশ্ন করিলাম, প্রেতাত্মা কোন জবাব দিলেন না। আমরা ক্রমাগতই যখন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, তখন একটু কড়াভাবে বলিলেন—“আমার নাম বলিব না।”

সেদিন ক্রমাগত ধ্বস্তা-ধ্বস্তিতে আমাদেরও মেজাজ একটু চড়া হইয়াছিল, আমরা বলিলাম—“তবে আপনি বিদায় নিন, আমরা

প্রেতাত্মা দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"যাইব না।" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—হাত-পা ছোঁড়া তখন বন্ধ ছিল।

তখন বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছিল, কোন কথাবার্ত্তা নাই, চুপ্-চাপ করিয়া মিছা-মিছি একজনকে অজ্ঞান করিয়া রাখাতে আমরা বড়ই বিরক্তি বোধ করিতেছিলাম। খানিকক্ষণ পরে আবার বলিলাম—"আপনি যান্, আমরা মিডিয়মের জ্ঞান-সঞ্চার করিব।"

আবার সেই এক উত্তর—"যাইব না।"

আমরা বলিলাম—"যাইতেই হইবে।"

প্রে—"কখনই না—আমি সাতদিন এখানে থাকিব।"

সাত দিন থাকিবার কথা শুনিয়া আমরা একটু ভীত হইলাম। তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলাম—"আপনাকে থাকিতে দিব না, যে উপায়ে পারি তাড়াইব।"

প্রে—"ক্ষমতা থাকে, তাড়ান।"

সেই মুহূর্ত্তে দর্শকদিগকে ঘর হইতে বাহিরে যাইতে বলা হইল—ঘরে মিডিয়ম লইয়া আমরা তিন জন মাত্র রহিলাম।

ইহারই মধ্যে, মিডিয়মকে অজ্ঞান করিবার পর প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছিল।

প্রেতাত্মাকে তাড়ান নিয়মবহির্ভূত হইলেও সেদিন তাহা না করা ভিন্ন উপায় রহিলনা। প্রেতাত্মাকে তাড়ানর একটা উপায় আছে আমরা দুইজনে তাহাই অবলম্বন করিলাম। একে একে আরো দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল, আমরা কৃতকার্য্য হইলাম না। তখন বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম, একপ্রকার হতাশও হইলাম তখন প্রেতাত্মা বলিলেন—"তাড়াও আমাকে, কেমন বেগ পাইতে হইতেছে!" আমরা বলিলাম—"আপনাকে আর বেশীক্ষণ থাকিতে দিতেছিনা।"

অস্থির হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমি শীঘ্রই যাইতেছি, আমাকে আর পাঁচ মিনিট থাকিতে দিন।"

আমরা বলিলাম—"আচ্ছা।"

ঠিক পাঁচ মিনিট্‌ পরেই তিনি চলিয়া গেলেন। এখানে বলা আবশ্যক প্রেতাত্মাকে তাড়াইবার একটা প্রধান উপায় ইচ্ছা-শক্তির (will force) প্রয়োগ।

প্রেতাত্মাকে তাড়াইবার জন্য এত কষ্ট পাওয়ায় সেদিন হইতে আমরা একটু দমিয়া গেলাম, মনে একটা সংশয় হইল যদি ভবিষ্যতে তাড়াইতে না পারি।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

খেয়াল খাতা।

বসন্তের উদয়।

মাঘ মাসের সংক্রান্তিতে কিম্বা পহেলা ফাল্গুনে,—
সংবৎটা মনে নাই—কাজ্ কি বা কি কাল্ গুণে ?
রতি বল্লেন মদনকে, "প্রিয় পতি আমার,
ষড়ঋতুর মধ্যে কর বসন্তটা খামার।
আছে ফুল, আছে পাখী, রাখি ওটা নিজেরা ;
প্রতি বছর নাইবা দিলে কবির হাতে ইজেরা।
কাজ কিবা খাজনায় ; কিবা ছাই লভ্য ?
দিক্ করে গো লিরিক্ দিয়ে যত কবি নব্য।"

মদন কহেন রতিকে প্রিয়া বলে ডাকি,
"মোরা বরং গ্রীষ্মটাকে খামার ক'রে রাখি।
সাঁঝ সকালে বাতাস ভাল, পাখীগুলোও ডাকে ;
বিশেষতঃ জানইত যে আম কাঁঠাল পাকে।
ঘনদুধের সঙ্গে সেটা উপাদেয় খাসা।
দুপুরেতে গরম হলে খেল্‌ব তাস ও পাশা।"
শুনে খুসী রতি দেবী ; ঠোঁটে ফুট্‌ল হাসি।
সেই হাসিতে উদয় হলেন বসন্তটি আসি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ঘুঘু।

আমরা ঘুঘু বলি কপোতকে। ঐ কবিপ্রিয় পাখীর নামে ভিটেয় ঘুঘুচরা প্রবাদ হইয়াছে কি? মহারাষ্ট্রে, মধ্যভারতে এবং বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে হুতুম্ পেঁচাকে ঘুঘু বলে। হুতুম্ পেঁচা ঘরে বসিলে যে অমঙ্গল হয়, এবিশ্বাস সকল প্রদেশেই দেখিতে পাই। বঙ্গদেশেও পূর্ব্বকালে হুতুম্ পেঁচার নাম ঘুঘু ছিল না ত? মনে হয় যেন হুতুম্ পেঁচার নামেই ভিটেয় ঘুঘুচরা প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব।

কেহ কেহ বলেন, যে জাতি সমতল ভূমিতে বাস করে তাহারা অন্য জাতি অপেক্ষা অধিক ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হয়। সমভূমি ইংলণ্ডদেশ-নিবাসী লোকদিগের অপেক্ষা পার্ব্বত্য স্কটলাণ্ডদেশনিবাসী লোকদিগের মধ্যে অধিক ন্যায়-শাস্ত্রবিৎ দার্শনিক পণ্ডিত জন্মিয়াছে—যথা, Sir William Hunter, Reid, Brown, ইত্যাদি—পক্ষান্তরে Bacon, Newton প্রভৃতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত অপেক্ষাকৃত সমভূমি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত মতটী কি করিয়া টিঁকিতে পারে? পার্ব্বত্যদেশ অপেক্ষাকৃত বিজন ও কোলাহল বিরহিত; এই প্রকার প্রদেশ কি ধ্যান, চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টির অনুকূল নহে? এই ভাবে দেখিতে গেলে পার্ব্বত্যপ্রদেশই বিশেষরূপে ন্যায়-শাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতিরিক্ত বাধা অনেক

সময়ে সভ্যতা ও উন্নতির বিরোধী—সামান্য জীবিকার জন্য পর্ব্বতবাসিদিগের এতটা পরিশ্রম করিতে হয় ও বাধা অতিক্রম করিতে হয় যে তাহারা আর কোন দিকে চিন্তাপ্রয়োগ করিবার অবসর পায় না। অতএব পর্ব্বতবাসিদিগের সভ্যতার প্রথম অবস্থা ন্যায়-শাস্ত্র অনুশীলনের প্রতিকূল—কিন্তু যদি নানাপ্রকার ঘটনাচক্রে পর্ব্বতবাসিরা একবার সভ্য হইয়া উঠে তখন তাহাদিগের বহির্দৃশ্য বরং তাহাদিগের অন্তর্দৃষ্টির অনুকূল হয়। এই জন্য সভ্য স্কটলণ্ডে এত দার্শনিকের প্রাদুর্ভাব।

বঙ্গদেশ সমভূমি বলিয়াই কি ন্যায়-শাস্ত্রের প্রতি বাঙ্গালিদের এত অনুরাগ? বঙ্গভূমি যদি সমভূমি "সাহারা" হইত তাহা হইলে বাঙ্গালিরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া চিন্তা করিতে পারিত? চিন্তার জন্য অবসর চাই—প্রাচুর্য্য ও ভূমির উর্ব্বরতা হইতে অবসর উৎপন্ন হয়। যে সকল বিদ্যার আলোচনায় অপেক্ষাকৃত শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয় সেই সকল বিদ্যার আলোচনায় কেন এই অবসর তবে নিয়োজিত হয় নাই? তাহার কারণ বাঙ্গালা দেশের জলবায়ু—তাহারই প্রভাবে বাঙ্গালীর আলস্য ও জড়তা উপস্থিত হয়—কাজেই ন্যায়-শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাহারা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই।

চুট্‌কী।

(১) বিলাতী ওক্ ও দেশী বটবৃক্ষ।

ওক্‌গাছ ইংলণ্ডের গৌরবের সামগ্রী, বিলাতী পার্কের বিরাট্ বনস্পতি। এ কাঠ বড় মজবুত, ইহা হইতে টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি গৃহসজ্জার আসবাব প্রস্তুত হয়, আর এই কাঠে জাহাজ গড়িয়া ইংরেজ বাণিজ্যবিস্তার ও রাজ্যবিস্তার করেন। গৃহসজ্জা, বাণিজ্যপ্রসার ও রাজ্যসমৃদ্ধি ইংরেজ ওক্‌গাছের প্রসাদেই লাভ করেন। অতএব ওক্‌গাছ ইংরেজের শ্রীসম্পদের একমাত্র নিদান ও নিদর্শন। আর ভারতের গৌরব বিরাট্ বটপাদপ। ইহার তক্তায় গৃহসজ্জার আসবাব বা বাণিজ্যপোত, যুদ্ধপোত গড়া যায় না। কিন্তু রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরে অযত্নসংবর্দ্ধিত এই বিরাট্ বনস্পতি ছায়াদানে শ্রান্তপথিকের ক্লেশ দূর করে, ফলদানে পশুপক্ষীর ক্ষুধা প্রশমন করে, ইহার ঘনপল্লবে অসংখ্য জীব আশ্রয় লাভ করে, এবং ইহা হইতে শত শত নূতন বৃক্ষের উদ্ভব হয়। ভোগবিলাস বা পার্থিব ঐশ্বর্য্য কখনও ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার আদর্শ ছিল না। ইহা ফলচ্ছায়াদানে বিশ্বমানবের ক্ষুধাশ্রান্তি দূর করিয়াছে, ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান, গীতাউপনিষদ্ কত যুগ ধরিয়া মনুষ্যহৃদয়ে দুঃখযন্ত্রণার অপনোদন করিয়া সুখশান্তিবিধান করিয়াছে ও অমৃতফলদানে চিরদিনের তরে মানবাত্মার ক্ষুধা দূর করিয়াছে; আর ভারতের পূত, শান্ত সভ্যতা হইতে 'তিব্বতচীনে ব্রহ্মতাতারে' নব নব সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছে। তাই বলিতেছি, বটবৃক্ষই ভারতীয় প্রকৃতির পবিত্র আদর্শ ও নিদর্শন।

(২) Mobile equilibrium of intelligence.

মাষ্টারী করিলে লোকে ক্রমশঃ বোকা হইয়া যায়, এইরূপ একটা অপবাদ আছে। দশ বৎসর মাষ্টারী করিলে তাহাকে আর কোনও

ঝুঁকির কাজের ভার দেওয়া হয় না, কোন্ সভ্যমুলুকে নাকি এইরূপ নিয়ম। কথাটা নিতান্ত অন্যায় নহে। মাষ্টারেরা সারাজীবন নিজেদের চেয়ে অল্পবুদ্ধি ও অল্পবিত্ত বালকদিগের সঙ্গে মেশেন, নিজেদের চেয়ে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকের সঙ্গে মিশিবার কোনও সুযোগ পান না। সুতরাং তাঁহাদের আত্মোন্নতির কোনও উপায় থাকে না। তাঁহারা মূর্খকে পণ্ডিত করিতে গিয়া নিজেরা দিন দিন মূর্খ হইয়া পড়েন। ছাত্রদিগের Exercise সংশোধন করিয়া তাহাদের বানান দোরস্ত করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজেরা বানান ভুলিতে থাকেন। 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে,' কথাটা কবিকল্পনা বই আর কিছুই নহে। এই ব্যাপার দেখিলে পদার্থবিজ্ঞানের mobile equilibrium of temperature নিয়মের কথা মনে পড়ে। ঘরে পাঁচটা জিনিসের মধ্যে একটা খুব গরম জিনিস রাখিলে খানিক পরে দেখা যাইবে, গরম জিনিসটা কতকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, কিন্তু ঘরের অন্য জিনিসগুলা কতকটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। তপ্ত জিনিসের তাপ অন্য জিনিসে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ তাপবিকীরণ খানিকক্ষণ চলিতে থাকিলে দেখা যাইবে, ঘরের সব জিনিসগুলিতেই সমান পরিমাণ তাপ আছে, ঠাণ্ডা জিনিসটা গরম হইয়াছে, গরম জিনিসটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, ইহাকেই বলে mobile equilibrium of temperature. এক্ষেত্রেও দেখা যাইবে, ছাত্রদিগের বিদ্যাবুদ্ধি যে পরিমাণে বাড়িয়াছে মাষ্টার মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধি সেই পরিমাণে কমিয়াছে। শেষে বহুদর্শী মাষ্টারের ও সর্দ্দারপড়ুয়ার বিদ্যাবুদ্ধি সমান হইয়া দাঁড়ায়।

(৩) মৃণ্ময়পাত্র ও কাংশময় পাত্র।

অনেক স্ত্রীলোকের রূপ নাই, কিন্তু কেমন একটা মধুর আকর্ষণী-শক্তি আছে; সেইগুণে তাহাদের সাহচর্য্যে শান্তি ও প্রীতিলাভ হয়,

হৃদয় স্নিগ্ধ ও সরস হয়। এগুলি মাটীর নাগরী, কিন্তু ইহাদের প্রেমরস মধুর ও শীতল। আর অনেক রমণীর রূপযৌবন সবই আছে, কিন্তু সে উদ্দামসৌন্দর্য্যে আকর্ষণী-শক্তি নাই, তাহাতে মন মজেনা, প্রাণ টানে না। এগুলি পিতলের ঘড়া, বাহিরে মাজাঘষা তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে, কিন্তু ভিতরে বন্যার ঘোলা জলে পরিপূর্ণ। প্রেমতৃষ্ণা নিবারণের জন্য 'স্বচ্ছঃ সুগন্ধিঃ তুষারো বারিধারা' উছলিয়া পড়ে না।

(৪) ন পুং স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি,' স্ত্রীলোক কোনও বয়সেই স্বাধীন নহে। সেকালে এইরূপই ছিল বটে। কিন্তু 'কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ' অর্থাৎ কলিতে সবই উল্টা। এখনকার দিনে পুরুষ কোনও বয়সেই স্বাধীন নহে। বাল্যে মাতার বা পিসিমার, যৌবনে পত্নী (বা তৎসদৃশী অন্য কাহারও), আর প্রৌঢ়াবস্থায় কন্যার অধীন অর্থাৎ কন্যাদায়গ্রস্ত। অতএব শাস্ত্রীয় বচনটি ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইবেন :—

মাতা রক্ষতি কৌমারে পত্নী রক্ষতি যৌবনে।
ভক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্র্যঃ ন পুং স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

(৫) আধুনিক প্রেমের কবিতা।

আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে তুলনা দিতে ইচ্ছা করে। খাবারের দোকান এখন অলিতে গলিতে, পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনটা ছিলনা; কবিতাও এখন হাটে ঘাটে। আগে লোকে মুড়ি ও ঝুণা নারিকেল খাইত, খাদ্যটা কিছু নীরস ও শুক্‌না গোছের কিন্তু বড় পুষ্টিকর; এখন মুটে মজুরও গজাজেলাপী খায়। আগে লোকে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, কথকতা, কীর্ত্তন শুনিত; তখনকার চণ্ডীর গান, ধর্ম্মমঙ্গল, মনসার ভাসান প্রভৃতিতে ধর্ম্মপ্রসঙ্গই থাকিত;

জিনিসটায় তত রসকস ছিল না, কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত ; আর তাহার জায়গায় এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাতশ্মশ্রু বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত থিয়েটারী-ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে ব্যস্ত। খাবারের দোকানে থরে থরে হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে বড় বাহার, কিন্তু খাইলেই অম্বল হয়, বুক জ্বলে, গলা জ্বলে, দুই এক ঝলক বমি হইয়া উঠিয়াও যায়। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও নানা ভঙ্গীর নানা কবি কবিতার পশরা সাজাইয়া বসিয়া আছেন ; সে সব প্রেমের কাহিনী পড়িতে গেলেই কিন্তু হৃদয়ে জ্বালা ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ারা এক আধটু ঝরিতে থাকে। টাট্‌কাভাজা কচুরি নিম্‌কি জেলাপি বেশ মুচ্‌মুচে, মুখে দিলে মিলাইয়া যায় ; কিন্তু একটুখানি জুড়াইয়া গেলেই বাদামের তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা করে না। কবিতাগুলিও মাসিক পত্রিকার পাতা কাটিয়া পড়িবার সময়, বেশ মোহকর—বেশ প্রাণের সঙ্গে মিশিয়া যায় ; কিন্তু একটু জুড়াইয়া গেলে, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্‌টে গন্ধ ছাড়ে, পুস্তক পড়িতে প্রবৃত্তি হয় না। খাবারের দোকানগুলি না উঠাইলে সহরের স্বাস্থ্য ভাল হইবে না, প্রেমের কবিতার হাট না ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ্য শোধ্‌রাইবে না।

(৬) Absolute value ও Local value.

স্ত্রীজাতি সংখ্যাতত্ত্বে শূন্যজাতীয়। ইহাদের নিজের কোন মূল্য নাই ; যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার জোরে ইহাদের মূল্য হয়। যথা, মুন্‌সেফ বাবুর গৃহিণী বলিয়া এক নারীর আদর, জমীদারের ঘরণী বলিয়া আর এক নারীর আদর, ইত্যাদি। আবার ইহারাই যদি পূজারি-ব্রাহ্মণ বা নাঙ্‌লা-কায়েতের ঘরে যাইতেন, তাহা হইলে

ইঁহাদের কেহ পুঁছিত না ! সুধু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এই ইতরবিশেষ। Absolute value এবং Local valueর প্রভেদ ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়।

আবার দেখুন, শূন্য যে সংখ্যার পাশে বসে তাহার মূল্য দশ গুণ বাড়াইয়া দেয়। যে পুরুষের সদ্‌গৃহিণী যোটে, তাঁহার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হইয়া থাকেন, তাঁহার এক আড়ি ধনে দশ আড়ি হয়, তাঁহার ধূলা মুঠাটা সোণামুঠা হইয়া যায়। তবে যে সকল নারী সদ্‌গৃহিণীও নহেন, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণীও নহেন, তাঁহারা কেহ ডাহিনে যেতে বাঁয়ে যান, তাহাতে স্বামীর আয়পয় দেখেন না, তাঁহারা যে শূন্য সেই শূন্যই থাকিয়া যান।

(৭) Maximum density.

অনেক ছাত্র পড়াশুনা যত করুক আর না করুক টায়ে টোয়ে পাশটা হয়। আবার হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলেও তাহারা ফলে বড় বেশী সুবিধা করিতে পারে না, সেই সমানই দাঁড়ায়। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া maximum density of water at 4° centigrade এর কথাটা মনে পড়ে।

(৮) বালির পিণ্ডি।

কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেক বেসরকারী স্কুল কলেজে প্রকৃত-রূপে শিক্ষা দেওয়ার কোনও সরঞ্জাম নাই; ভাল পুস্তকাগার নাই, ভাল শিক্ষক নাই, কলেজ বা স্কুলগৃহটি পর্য্যন্ত নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও নোঙরা। ঢাল নাই তরওয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার ! এইরূপ বিনা-আয়োজনে ছাত্রদিগকে যোগেযাগে পাশ করানর বন্দোবস্ত ঠিক যেন দরিদ্রসন্তানের পিতৃপ্রেতকৃত্যে বালির পিণ্ডির ব্যবস্থা ;—পিতৃপুরুষের পেট ভরে না, কোনও রকমে ঠাট বজায় রাখা মাত্র।

(৯) যাত্রার দল না কলেজ ?

কলিকাতার বেসরকারী কলেজগুলি এক একটী যাত্রার দল। প্রোফেসারেরা যুড়ী, এক এক বিষয় যোড়া যোড়া প্রোফেসার আছেন। তাঁহারা যুড়ীর গানের ধরণে কখনও দক্ষিণে কখনও বামে মুখ ফিরাইয়া বক্তৃতা (বা কথকতা) করেন নতুবা সকল শ্রোতার মন রাখা যায় না। যাঁহার বক্তৃতা জমিয়া যায়, তাঁহারই জয় জয়কার; সে কলেজে ছেলের ভিড় জমে। আবার পাকা যুড়ীরা কখনও কখনও চটিয়া বাহির হইয়া নূতন দল খোলেন। কোনও কোনও কলেজ স্থাপনার ইতিহাসও ঠিক এইরূপ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভরসা হয়, যদি হাল আইনের ফলে এ সকল কলেজ উঠিয়া যায়, তবে কলেজওয়ালারা স্বচ্ছন্দে এক একটা থিয়েটার বা যাত্রার দল খুলিতে পারেন। তাঁহারাও বোধ হয় আখেরের কথা ভাবিয়া আগে হইতেই ছেলেদের তালিম করিতেছেন; সেই জন্যই প্রত্যেক কলেজেই এক একটা সখের থিয়েটারের আখ্ড়া দেখা যায়।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কণিকা।

ভাল ছিদ্রহীন নৌকাখানি পারঘাটে বাঁধা থাকে, স্রোতের জল ার নীচ দিয়ে তর্ তর্ করে বহে যায়, তরঙ্গেরা এসে তাকে াদর করে দুলিয়ে দিয়ে যায়, এক পারে যাত্রী সব তারি উপর ারোহী হয় অপর পারে তারি অপেক্ষায় বসে থাকে, পারাণী মহানন্দে নৌকা খুলে দেয়। আর ভাঙ্গা ফুটো নৌকাখানি তার বুকের সবগুলি াঁজর বার করে কাৎ হয়ে শুক্নো ডাঙ্গার উপর পড়ে থাকে, তাকে কউ ফিরেও পৌঁছেনা। অথচ সেই সম্পূর্ণ নৌকাখানি আপন সৌভাগ্য সম্বন্ধে যেমন অজ্ঞান, ভগ্ন তরীখানিও আপন হতভাগ্য ষয়ে ঠিক তেমনি অচেতন।

যেদিন লিখ্বার ঝোঁক চাপে সে দিন অকস্মাৎ একেবারে এত ছন্দ, কথা, এত ভাব মনের মধ্যে এসে পড়ে যে অস্থির হয়ে উঠ্তে হয়। সঙ্গে কোকিল, পাপিয়া, চাতক, কলহংস সবগুলি ডাকতে আরম্ভ। একত্রে বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ সবগুলি ছুটে এসে পড়ে। কতক বা বলা হয় তো অনেক পড়ে থাকে—একলা একটু খানি মানুষের পরে উঠবে কেন? এত বড় পৃথিবী এমন বিশাল তাতেও পর্য্যায়-ঋতুগুলি দেখা দেয়, একে একে কোকিল, দয়েল, চাতক, কল-গান গাইবার অবসর পায়।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বিবিধ কবিতা।

পরস্পর গুণগান।

উটে উটে বিবাহেতে গাধা গীত গায়,
কিবা রূপ, কিবা ধ্বনি! এ ওরে বাড়ায়।

উষ্ট্রাণাংচ বিবাহেষু গীতং গায়ন্তি গর্দ্দভাঃ।
পরস্পরং প্রশংসন্তি অহো রূপমহো ধ্বনিঃ।

মন্ত্র ভেদ।

ছয় কাণে মন্ত্রভেদ, চার কাণে স্থিরতর,
দুই কাণে বদ্ধমন্ত্র, ব্রহ্মারও সে অগোচর।

ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রশ্চতুষ্কর্ণঃ স্থিরো ভবেৎ।
দ্বিকর্ণস্থ তু মন্ত্রস্য ব্রহ্মাপ্যন্তং ন গচ্ছতি॥

ইস্‌পার কি উস্‌পার।

কেশব নহে ত শিব—একই ঈশ্বর;
দরী বা সুন্দরী নারী—কি তাহে অন্তর?
ভূপতি অথবা যতী,—মিত্র সে সমান,
নগরে অরণ্যে কিবা—একই বাসস্থান।

একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা
একা নারী সুন্দরী বা দরী বা।
একং মিত্রং ভূপতির্বা যতির্বা
একো বাসঃ পত্তনে বা বনে বা॥

ভয়।

পবনে বৃক্ষের ভয়, হিম-ভয়ে নলিনী শুকায়,
পর্ব্বতের ভয় বজ্রে, সাধুজন দুর্জ্জনে ডরায়।

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ং॥

অসম্ভাব্য।

অসম্ভাব্য না কহিবে, মনে মনে রাখি দিবে,
প্রত্যক্ষ যদিও তাহা হয়।
শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।

অসম্ভাব্যং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরন্তি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ॥

অব্যবস্থিত চিত্ত।

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রুষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট বার বার,
যে চিত্ত অব্যবস্থিত প্রসাদও ভীষণ তার।

ক্ষণে তুষ্টঃ ক্ষণে রুষ্ট স্তুষ্টোরুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

সঙ্ঘর্ষণ।

যতীরে হেরিলে যতী, বৈদ্যে বৈদ্য, নট বা নটেরে,
ভিক্ষুরে হেরিলে ভিক্ষু কুকুরের মত গর্জ্জি ফেরে।

দৃষ্ট্বা যতির্যতিং সদ্যো বৈদ্যো বৈদ্যং নটং নটঃ।
যাচকো যাচকং দৃষ্ট্বা শ্বানবৎ গুরগুরায়তে॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাময়িক কথা।

"বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনে কাশ্মীরের লাভ।"

কাশ্মীর হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—"স্বদেশী আন্দোলনের গুণে কাশ্মীরে পশমী কাপড়ের ব্যবসায় খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কাটতি খুব বেশী হওয়াতে দামও অনেক চড়িয়াছে। গত বৎসর যে কাপড় ৬৲ টাকায় অনায়াসে পাওয়া গিয়াছে তাহা এবার ৭৷০ টাকায় ও পাওয়া যায় না। তথাপি বঙ্গদেশে এই সব কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানি হইতেছে। বন্দে মাতরম্! যে বাঙ্গালীরা সর্ব্বদা বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিত এবং স্বদেশী কাপড়চোপড় ঘৃণার চক্ষে দেখিত এখন কিনা সেই বাঙ্গালীরাই সমস্ত ভারতবর্ষের দৃষ্টান্তস্থানীয় হইয়াছে। এখানকার পশমী কাপড় পূর্ব্বে যেরূপ মোটা ছিল এখন আর সেরূপ নাই। ইহার অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং বিদেশী কাপড় অপেক্ষা কোন অংশ নিকৃষ্ট নহে বরং শ্রেষ্ঠ। যদিও কাশ্মীরের তাঁতিরা বিদেশীয় তাঁতিদের অপেক্ষা অনেক কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করিয়া কাজ করে তথাপি তাহাদের তৈয়ারী—"পশমীনা"র সৌন্দর্য্য এবং টেঁকসই গুণে পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন কাপড় তাহার সমকক্ষ নহে। তারপর "পট্টি এবং রাফাল" বিদেশীয় গরম কাপড় —যে গুলিকে লোকে বিলাতীকাশ্মীরা বলে তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ —বিদেশী কাপড়গুলি—এক বৎসর ব্যবহার করিলেই রঙ্গ উঠিয়া যায় এবং অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু দেশী কাপড়ের কোনদিনও রঙ্গ উঠে না এবং উহা খুব টেঁকসই। যাহা হউক ইহা খুব সুখের বিষয়, এত কাল পর ভারতের উন্নতিইচ্ছুকেরা এরূপ আবশ্যকীয় অথচ বহুকাল পরিত্যক্ত বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন। ছোট ছোট অনেক মহাজন এই সকল কাপড়ের কারবার করিতেছেন। কিন্তু যদি দুই একজন খুব বড় মহাজন এই ব্যবসায়ে হাত দিতেন এবং ভারতের সর্ব্বত্র এই কাপড় সরবরাহ করিতেন তবে এই গরীব তাঁতিদের এবং দেশেরও প্রকৃত উপকার সাধিত হইত। এই তাঁতিকুল নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছিল। যদি উৎসাহ পায় তবে তাহাদের প্রাণে নববল সঞ্চার হইবে। কাশ্মীর অনেক

পশ্বাদির উৎপত্তিস্থান। আমি এবিষয় নিশ্চিত বলিতে পারি যে, ভালরূপে কাজ চালাইতে পারিলে কেহ লাভবান্ ব্যতীত ক্ষতিগ্রস্থ হইবেন না, অথচ দেশের এবং দশের উপকার করিবেন। ✓

বিগত ২২শে জানুয়ারী রাত্রিতে অনেক ভারতবাসী কয়েকজন ইউরোপবাসী-সমভিব্যাহারে কুইন্ ষ্ট্রীটস্থ সেণ্ট কেন্সিংটন হলে প্রফেসর ভাই পরমানন্দকে অভ্যর্থনা

"প্রফেসার ভাই পরমানন্দ এম, এ।"

করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছিলেন। ইনি একজন আর্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ। কয়েক দিবস পূর্ব্বে তিনি নেটাল এবং ট্রেন্সভাল হইতে কেপ-কলনীতে পৌঁছিয়াছিলেন। মিঃ আর, আর, নাইডু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি পি, এ, মুদালিয়ার ও জি, এন্, এম, পিলে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতের রীতি অনুসারে ভাই পরমানন্দকে মাল্যদানের পর একটী সুন্দর রচনা পাঠ করা হইল এবং সেটী তাঁহাকে উপহার দেওয়া হইল। তৎপর ভাই পরমানন্দ তাঁহার এরূপ সাদর অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এবং "পুরাতন ভারত" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে যদিও আজকাল ভারতবর্ষ কোন উন্নত দেশের সমকক্ষ নহে তথাপি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ একটী উন্নত দেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। আজকালকার যে সকল সভ্যজাতি আছেন তাঁহাদের জন্মের অনেক পূর্ব্বে ভারতবাসীরা কেবল যে সভ্য ছিল তাহা নহে কিন্তু অন্যান্য জাতিকে সভ্যতা শিক্ষা দিয়াছিল। জার্ম্মানী প্রভৃতি পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাতে বিজ্ঞ হইয়া এবিষয় অনেকটা সভ্যজগতে প্রকাশ করিয়াছেন· এবং তারপর হইতেই অনেকে সে বিষয় তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়াছেন। সংস্কৃতভাষাতেই বিজ্ঞান অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। গ্রীক্ এবং ইউরোপের অন্যান্য ভাষা হইতে বেশ সপ্রমাণ হয় যে, এই সমস্ত জাতি—যাহারা এখন পরস্পরকে বিজাতি বলিয়া ঘৃণা করে—সকলেই এক আর্য্যজাতি হইতেই উৎপন্ন। ইহারও বেশ প্রমাণ আছে যে ভারতবাসীরা সেই আর্য্যজাতির প্রধান অংশ এবং টিউটন, স্লেভনিয়ন্ এবং পারসীক প্রভৃতি অন্যান্য জাতি তাহাদের শাখামাত্র, এবং তাহাদের সেই সংস্কৃতভাষা যদিও সমস্ত জাতির মাতৃভাষা না হইয়া থাকে তথাপি সংস্কৃতভাষা অন্যান্য ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট এবং অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ভারতবাসীদের পূর্ব্বে যেরূপ সভ্যতা ছিল অন্য

কোন জাতি আজও তাহা লাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রথম মনোযোগের বিষয় ছিল ধর্ম্মশাস্ত্র। হিন্দুদের বিশ্বাসমতে বেদ প্রথম মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করে। এবং সমস্ত জাতিই বেদকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। মক্ষমুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেখাইয়াছেন যে বেদই প্রথম "ঈশ্বর এবং আত্মা" সম্বন্ধে মানুষের প্রতীতি জন্মায়, এবং ধর্ম্ম বিষয়েও অনেক শিক্ষা দেয়। তাহার পর শত শত বৎসর পরে উপনিষদ ইত্যাদি রচিত হয়। এই সকল গ্রন্থকে জর্ম্মান পণ্ডিত "সোপেন্‌হায়ার" তাঁহার "জীবনের এবং মরণের" সান্ত্বনাদায়ক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উপনিষদ প্রকাশিত হওয়ার আরও অনেক পরে "দর্শনশাস্ত্র" শিক্ষার জন্য ছয়টী স্কুল স্থাপিত হয়। দর্শনশাস্ত্রের জন্য তখন ভারত এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়া ছিল যে, "পাইথেগোরাস" (Pythagorus) প্রভৃতি অনেক গ্রীক পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার জন্য এদেশে আগমণ করিয়াছিলেন। ভৈষজতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রধান গ্রন্থই সংস্কৃতভাষাতে লিখিত ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে পূর্ব্বে তাহারা যথেষ্ট বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতেন ইতিহাসে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে গ্রীক্ এবং আরবেরা ভারতবাসিদের নিকট হইতে ভৈষজ্যবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইহা ব্যতীত অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা এবং কবিত্ব প্রভৃতি অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শিক্ষা বিভাগ স্বাধীন এব সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। পূর্ব্বকালে যে তাঁহারা চারিটী সামাজিক বিভা করিয়াছিলেন তাহা তখন আবশ্যকীয় ছিল; কার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ বিভা করিয়াছিলেন। মৃতদেহ দগ্ধ করায়ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞানের পরিচয় দেয় তাঁহাদের চরিত্রের বিষয় গ্রীক্ এবং চীনবাসী অনেকে লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারত বাসীরা সত্যবাদী, অপায়ী এবং স্ত্রীলোকেরা সতী ছিলেন। তাঁহারা ইহকাল অপেক্ষ পরকালে সুখভোগ করার জন্য যত্ন করিতেন। তৎপর ভাই পরমানন্দ তাঁহার স্বদেশ বাসিদিগকে পূর্ব্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে এবং তাঁহারা জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে সকল গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে উপস্থিত ইউরোপবাসিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হয়ত আবার এরূপ দিন আসিবে যে পূর্ব্বকালের ন্যায় তাঁহারা সকলে একবংশগত ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবেন।" তামিল ভাষায় বক্তৃতাটি বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

LIBR